জীবনীকোষ

(ভারতীয়-ঐতিহাসিক)

শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম সংস্করণ

পৃথ্বীশচন্দ্র রায়—বিশ্বসিংহ।

১৩৪৭ বঙ্গাব্দ

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

মূল্য পাঁচ টাকা

প্রকাশক
শ্রীদেবব্রত চক্রবর্ত্তী এম্ এ
২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

কলিকাতা
২০৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
জীবনী-কোষ মুদ্রাযন্ত্রে
শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মুখবন্ধ

এই পঞ্চম খণ্ডে পৃথ্বীশচন্দ্র রায় হইতে বিশ্বসিংহ পর্য্যন্ত গেল। ১৩৪৫ হইতে ১৭৯২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ইহাতে আছে। সত্বর গ্রন্থ শেষ করিতে আমরা চেষ্টা করিতেছি। যুদ্ধের জন্য কাগজের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি পাইলেও আমরা গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করিলাম না। ইহাতে আমাদের অনেক ক্ষতি হইতেছে।

30.9.40

খাইয়া স্বীয় স্ত্রীর উপর অকথ্য অত্যাচার করিতেন। একদিন পৃথ্বীরাজ স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া পাভুরায় জয়মল্লের গলদেশে অসি সংলগ্ন করিলেন। কিন্তু ভগিনী ও ভগিনীপতির কাতর প্রার্থনায় অসি অপসারিত করিলেন। জয়মল্ল স্ত্রীর পাদুকা শিরে ধারণ করিয়া রক্ষা পাইলেন। পৃথ্বীরাজ ভগিনীপতি জয়মল্লকে ক্ষমা করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু পাপমতি জয়মল্ল এই অপমান ভুলিলেন না। বিষ প্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিলেন। এই শোকে রায়মল্লও অচিরে গতায়ু হইলেন।

পৃথ্বীশচন্দ্র রায়—প্রসিদ্ধ দেশহিতব্রতী রাজনৈতিক নেতা। ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত উলপুরের প্রসিদ্ধ বসু রায়চৌধুরী বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরীর তিনি সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ছিলেন না। কিন্তু জ্ঞানে, মানে ও কৃতিত্বে তিনি কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। তাঁহার প্রবল জ্ঞানানুরাগ ও রাজনৈতিক বিষয়ের অনুশীলনে ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। তিনি দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসভার এবং ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সম্পাদক ছিলেন। মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে, দিনশা-ওয়াচা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশের নেতাগণ, কলিকাতায় আসিলে, তাঁহার সহিত অবশ্য দেখা করিতেন এবং কেহ কেহ তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। মুখ্যতঃ রাজনৈতিক বিষয় আলোচনার জন্য তিনি 'ইণ্ডিয়ান ওয়ারল্ড' নামে (The Indian World) ইংরেজী ভাষায় একখানা মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। অচিরকাল মধ্যেই সুধীসমাজে ইহা বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। পরে ইহা সাপ্তাহিক হইয়াছিল। তিনি কিছুকাল দৈনিক বেঙ্গলী পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার ইংরেজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থের মধ্যে দারিদ্র্য সমস্যা, ভারতের দুর্ভিক্ষ, ভারতের মানচিত্র, আমাদের স্বরাজের দাবী ও চিত্তরঞ্জন দাসের জীবন রচিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি দীর্ঘকাল ফরিদপুর সেবা সমিতির সভাপতি ছিলেন। উলপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার কাল হইতে নয় বৎসর তিনি তাহার সম্পাদক ছিলেন। এই স্কুলের উন্নতির জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি ১৯২৮ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার দুই পুত্র দীপ্তীশচন্দ্র রায় এম্, এ, বি, এল, ও প্রীতীশচন্দ্র রায় এম্, এ, বি, এল কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল।

পৃথ্বীসিংহ— তিনি যোধপুরের রাণা যশোবন্ত সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজীব রাণা যশোবন্ত সিংহের বিক্রম অবগত ছিলেন।

তিনি কৌশলে তাঁহাকে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। এই সময়ে আফগানিস্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি মিত্রতার ভান করিয়া যশোবন্ত সিংহকে আফগানিস্থানের বিদ্রোহ দমনার্থ প্রেরণ করিলেন। যশোবন্ত গমনের প্রাক্কালে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র পৃথ্বীসিংহের উপর রাজ্য পরিচালনার ভার সমর্পন করিয়া গেলেন। কিছুকাল পরেই সম্রাট আওরঙ্গজীব পৃথ্বীসিংহকে রাজদরবারে দিল্লীতে আহ্বান করিলেন। আহূত রাজকুমার দিল্লীদরবারে উপনীত হইলে সম্রাট তাঁহাকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং অতি মূল্যবান পোষাক উপহার প্রদান করিলেন। এই মূল্যবান পোষাক পরিধান করিয়াই তিনি অসুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। এই বিষাক্ত পরিচ্ছদ পরিধানের ফলে তিনি অসুস্থ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন. যশোবন্ত সিংহ দেখ।

পে আলোয়ার—পে অর্থ উন্মাদ। তিনি সর্ব্বদা ঈশ্বর প্রেমে উন্মত্ত থাকিতেন বলিয়া তাঁহার এই নাম হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ৪২০২ অব্দে কার্ত্তিক মাসে শতভিষা নক্ষত্রে মান্দ্রাজের দক্ষিণাংশে ময়লাপুর নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিষ্ণুর খড়্গাবতার বলিয়া কথিত হন।

পেউ কলঅ—(Peu Kelaos) তিনি ভারতীয় একজন গ্রীক রাজা। তাঁহার নামীয় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তিনি খ্রীঃ প্রথম শতকের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

পেত্তা দীক্ষিত—নারায়ণ দীক্ষিতের পুত্র। তিনি খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে বেদান্ত পরিভাষার এক টীকা প্রণয়ন করেন। এই টীকার নাম 'প্রকাশিকা'।

পেরিয়া আলোয়ার—একজন বৈষ্ণব ভক্ত। তিনি খ্রীঃ পূঃ ৩০৫৬ অব্দে, পাণ্ড্য দেশের অন্তর্গত বিল্লপুত্তুর নগরে জ্যৈষ্ঠ মাসের স্বাতী নক্ষত্রে বিষ্ণুর রথাংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় ভক্ত ছিলেন। একদা তুলসী চয়ন করিতে যাইয়া তুলসী ক্ষেত্রে একটী পরমা সুন্দরী কন্যা পাইয়াছিলেন। কথিত আছে এই মধুর ভাষিণী অতি ভক্তিমতী কন্যাকে নারায়ণ বিবাহ করিয়াছিলেন। কন্যার নাম অণ্ডাল ছিল। তিনি তদবধি বিষ্ণুর শ্বশুর ও পেরিয়া আলোয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত) নামে খ্যাত হন

পেরিয়া পেরাট্টি—অন্য নাম মহাদেবী। তিনি শ্রীশৈলপূর্ণের কনিষ্ঠা ভগিনী। কমলনয়ন ভট্টের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে গোবিন্দ ও বালগোবিন্দ নামে দুই পুত্র জন্মে। এই গোবিন্দই রামানুজের সহাধ্যায়ী, সহচর ও শিষ্য ছিলেন। মহাদেবী রামানুজের মাতৃস্বসা ছিলেন। রামানুজাচার্য্য দেখ।

পেস্তমজী জাহাঙ্গীর, সি, আই, ই, খাঁ বাহাদুর—সুরাট নগরে এক সম্ভ্রান্ত পারসী বংশে ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮শ শতাব্দীতে দিল্লীর সম্রাট হইতে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা নেসুবন্দ খাঁ ও তবিয়র খাঁ উপাধি এবং জায়গীর পাইয়াছিলেন। এই বংশীয়েরা ইংরেজ কোম্পানীর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তাঁহাদের একজন সুরাটের নিকটবর্ত্তী বোধরেন যুদ্ধে নিহত হন। পেস্তমজী স্বয়ং ছয়চল্লিশ বৎসর গবর্ণমেন্টকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য তিনি ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে সি, আই, ই, (C. I. E.) উপাধি প্রাপ্ত হন।

পোঁইহে আলোয়ার—তিনি একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণবাচার্য্য। কাঞ্চী নগরে তাঁহার জন্ম হয়। কাঞ্চীর দেব সরোবরের মধ্যে জল রাশির নিম্নে এক মন্দির আছে। সেই মন্দিরে ধ্যানস্থ মহাপুরুষ পোঁইহে আলোয়ারের বিগ্রহ আছে। প্রতিদিন তাঁহার পূজা অর্চ্চনা হইয়া থাকে। আলোয়ার শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শাসনকর্ত্তা। ভক্তি বলে যিনি সমস্ত জগৎ শাসন করেন, তিনি আলোয়ার।

পোন্ন—কানাড়ী ভাষার বিখ্যাত একজন জৈন কবি। পম্প, পোন্ন ও রন্ন এই তিনজন কানাড়ী ভাষার তিন রত্ন বলিয়া কথিত হন। তাঁহারা সকলেই খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

পৌস্কলা বত—তিনি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা কাশীরাজ দিবোদাসের অন্যতম শিষ্য। তিনি স্বীয় নামে একখানা আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাহা এখন আর পাওয়া যায় না।

প্যারীচরণ দাস—একজন সংবাদপত্রসেবী ও দেশহিতকর্ম্মী। তিনি 'শ্রীহট্ট প্রকাশ' নামক সাপ্তাহিক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। শ্রীহট্ট জিলার করিমগঞ্জ উপবিভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং জাতিতে বৈশ্য সাহা ছিলেন। তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া ভারত সরকারের ফরেন ডিপার্টমেণ্টে কেরাণী পদে নিযুক্ত হন; কিন্তু কোন কারণে তাঁহার পদচ্যুতি ঘটে। তৎপর তিনি স্বদেশে আসিয়া দেশহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং শ্রীহট্ট প্রকাশ নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করেন। সেই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে সাপ্তাহিক পত্র একমাত্র 'ঢাকা প্রকাশ' ছিল। তাঁহার সম্পাদনায় শ্রীহট্ট প্রকাশ পত্রিকাখানি বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

প্যারীচরণ সরকার—খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী, গ্রন্থকার, সংবাদ-পত্র পরিচালক ও দেশহিতব্রতী। ১৮২৩ খ্রীঃ

অব্দের জানুয়ারী মাসে (১২৩০ বঙ্গাব্দের মাঘ) কলিকাতা চোরাবাগান পল্লীর এক মৌলিক কায়স্থ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভৈরবচন্দ্র সরকার। তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস হুগলী জিলার অন্তর্গত তড়া গ্রামে ছিল। প্যারীচরণের পিতামহ শিবরাম কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। শিবরামের পিতামহ বীরেশ্বর দাস নবাব সরকারে সুখ্যাতির সহিত কাজ করিয়া সরকার উপাধি প্রাপ্ত হন।

কৈশোরেই প্যারীচরণ পিতৃহীন হন। তাঁহার অন্যতম অগ্রজ পার্ব্বতীচরণের নিকট প্রধানতঃ তাঁহার বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয় এবং কিছুকাল চোরবাগানে অবস্থিত হেয়ার (David Hare) সাহেবের পাঠশালাতেও পাঠ করেন। পরে পার্ব্বতীচরণ চাকুরী ব্যপদেশে ঢাকায় গমন করিলে, প্যারীচরণও তথায় গমন করেন। এক বৎসর পরে কলিকাতায় আসিয়া কলুটোলাতে অবস্থিত হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। মেধাবী ও সুশীল ছাত্ররূপে তিনি হেয়ার সাহেবের বিশেষ প্রিয় ভাজন হন। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি জুনিয়ার স্কলারসিপ (Junior Scholarship) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক আট টাকা বৃত্তি পান। অতঃপর তিনি হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। তথায়ও তিনি অধ্যবসায় ও মেধাবলে তিন বৎসরকাল মাসিক চল্লিশ টাকা করিয়া বৃত্তি লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত Library Medal Examination নামক একটি বিশেষ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইয়া পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি শিক্ষা সমাপনান্তে হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করেন। ছাত্রাবস্থায় বিবিধ সদ্‌গুণের জন্য তিনি শিক্ষকগণের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন।

প্যারীচরণ হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করিবার কিছু পূর্ব্বেই তাঁহার অভিভাবক পার্ব্বতীচরণের মৃত্যু হয় এবং প্যারীচরণ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে, কলেজ পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই, মাসিক আশী টাকা বেতনে, হুগলী ব্র্যাঞ্চ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। দুই বৎসর পরে প্রায় দ্বিগুণ বেতনে তিনি বারাসত নবপ্রতিষ্ঠিত সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন। তাঁহার সুপরিচালনা গুণে অল্পকাল মধ্যেই বারাসত স্কুলের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। তথায় অবস্থানকালে তিনি, কৃষি বিদ্যালয়, শ্রমজীবিদের জন্য ব্যবহারিক শিল্প বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, বালিকা-বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া নিজের অসাধারণ কর্ম্মকুশলতা ও পরোপচিকীর্ষার পরিচয় প্রদান করেন। বারাসতে অবস্থানকালে প্যারীচরণ কালী-

কৃষ্ণ মিত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন। কালীকৃষ্ণ প্যারীচরণের সকল প্রকার সৎকার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিতেন।

বারাসতে প্রায় দুই বৎসর থাকিবার পর প্যারীচরণ কলিকাতা কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। এইখানেও তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় স্কুলের বিশেষ উন্নতি হয় এবং তিনি তজ্জন্য বিশেষ বিভাগীয় পুরস্কার লাভ করেন। তাঁহারই প্রধান চেষ্টায় ঐ বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া 'হেয়ার স্কুল' হয়। সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি বিবিধ জনহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। স্ত্রী-শিক্ষার তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি এজন্য চোরবাগানে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদেশাগত শিক্ষার্থীগণের বাসের জন্য তাঁহারই বিশেষ উৎসাহে একটি ছাত্রাবাস (ইডেন হিন্দু হোষ্টেল) স্থাপিত হয়। তদ্ভিন্ন দুস্থ ছাত্রগণের সুবিধার জন্য তিনি প্রিপেরটারী স্কুল (Preparatory School) নামেও একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি প্রথমে অস্থায়ীভাবে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজির অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। চারি বৎসর পরে স্থায়ী ভাবে ঐ পদ লাভ করেন।

১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি "এডুকেশন গেজেট" নামক পত্রিকার সম্পাদন ভার প্রাপ্ত হন। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে সরকার পক্ষ হইতে ঐ পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। হজসন প্রাট (Hodgeson Pratt) নামক একজন ইংরেজ উহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। প্যারীচরণের সম্পাদন কুশলতায় পত্রিকাখানির বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। ঐ পত্রিকাতে তিনি নূতন প্রকাশিত পুস্তকাবলীর নিরপেক্ষ সমালোচনা করিয়া লেখকবর্গকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন। প্রায় দশ বৎসরকাল পত্রিকা সম্পাদন করিবার পর, ১২৭৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে সংঘটিত এক দুর্ঘটনার এক বিবরণী ও তৎসহ তাঁহার মন্তব্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তদানীন্তন ছোটলাট তাঁহার মন্তব্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন। ইহাতে প্যারীচরণ ক্রুদ্ধ হইয়া সম্পাদন ভার পরিত্যাগ করেন (ইং ১৮৬৮ জুন)। এডুকেশন গেজেটে সম্পাদনকালেই তিনি "হিতসাধক" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন। ঐ পত্রিকায় সমাজ সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার, সুরাপান নিবারণ প্রভৃতি বহু হিতকর বিষয়ে তাঁহার সুরচিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত।

বারাসত-বিদ্যালয়ে কাজ করিবার সময়ে তিনি ইংরেজি শিক্ষার সুবিধার

জন্য কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার রচিত ঐ সকল পুস্তক (First Book of Reading, Second Book of Reading প্রভৃতি) দীর্ঘকাল বাঙ্গালা দেশের বহু বিদ্যালয়ে পঠিত হইত। শিক্ষকতা কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ কুশলতা ছিল। তিনি শিক্ষাদান নৈপুণ্যের জন্য 'Prince of Indian Teachers; Arnold of the East' প্রভৃতি আখ্যা পাইয়াছিলেন।

প্যারীচরণের প্রধান জনহিতকর কার্য্য ছিল সুরাপান নিবারণের প্রচেষ্টা। এই কার্য্যের জন্য ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি "বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সমাজ" (Bengal Temperance Society) প্রতিষ্ঠা করেন এবং "Well Wisher" নামে একখানি ইংরেজি ও 'হিতসাধক' নামে একটি বাঙ্গালা পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন। পত্রিকা দুইখানি দীর্ঘকাল প্রচারিত হইয়া সুরাপান নিবারণের অনেক সাহায্য করিয়াছিল। পারিবারিক নানা কারণে বিব্রত হইয়া ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে উহাদের প্রচার বন্ধ করিতে বাধ্য হন। স্বরচিত পুস্তকাদির মুদ্রণের সুবিধার জন্য তিনি 'স্কুল বুক প্রেস' (The School Book Press) নামে একটি মুদ্রাযন্ত্রও স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নানাস্থানে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। প্যারীচরণ তখন ধনী ও বদান্য বন্ধুবর্গের সহায়তায় নিজ পল্লীতে একটি অন্নসত্র স্থাপন করেন। প্রায় তিন মাস কাল ঐ অন্নসত্র হইতে বহু বুভুক্ষু নরনারীকে অন্ন প্রদান করা হইত।

ইংরেজি সাহিত্যে প্যারীচরণের অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল। ইংরেজি ব্যাকরণ, ভূগোল প্রভৃতি অনেক পুস্তক তিনি রচনা করেন। কৃষি ও উদ্ভিদ বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা (Theosophy), ভৌতিক বিদ্যা প্রভৃতিতেও তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল এবং ঐ সকল বিষয়ে তিনি অনেক জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল সরকারী চাকুরী করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করিবার মনস্থ করেন। কিন্তু সে সুযোগ আর তাঁহার ঘটে নাই। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন ১২৮২ বঙ্গাব্দ) তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার ছয় কন্যা ও সাত পুত্রের মধ্যে তিন কন্যা ও পাঁচ পুত্র তাঁহার মৃত্যুকালে জীবিত ছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করিতেছিলেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র—খ্যাতনামা লেখক ও জনহিতব্রতী। ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে (শ্রাবণ ; ১২২১ বঙ্গাব্দ) কলিকাতা নিমতলা পল্লীতে পিতৃভবনে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রামনারায়ণ মিত্র রাজা রামমোহন রায়ের

একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস হুগলী জিলার অন্তর্গত পানিসেহালা গ্রামে ছিল। প্যারীচাঁদের পিতামহ গঙ্গাধর কলিকাতায় বসতি স্থাপন করেন। প্যারীচাঁদের আরও চারি সহোদর ছিলেন। স্বনামখ্যাত কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁহার অনুজ।

পিতৃভবনে গুরু মহাশয়ের নিকট তাঁহার বাল্য শিক্ষা আরম্ভ হয়। কিছু বাঙ্গালা শিক্ষার পর তিনি অল্পকাল ফারসী ভাষাও শিক্ষা করেন। তদনন্তর প্রায় পনের বৎসর বয়সে তিনি হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। ডাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রাজা দিগম্বর মিত্র, খ্যাতনামা বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার প্রভৃতি দেশবিখ্যাত ব্যক্তিগণ তাঁহার সহপাঠী ছিলেন।

মেধাবী ছাত্ররূপে প্যারীচাঁদ বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি ইংরেজিতে এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া সার জন পীটার গ্র্যাণ্ট (Sir John Peter Grant) কর্ত্তৃক প্রদত্ত এক বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। তদ্ভিন্ন প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তিনি মাসিক ষোল টাকা করিয়া এক বৃত্তিও লাভ করেন। সাহিত্যেই তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল; কিন্তু অপেক্ষাকৃত ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন বলিয়া গণিতের অধ্যাপক রহস্যচ্ছলে তাঁহাকে 'দার্শনিক' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

পাঠ্যজীবন সমাপ্ত হইলেই, অর্থোপার্জ্জনের জন্য তাঁহাকে বিব্রত হইতে হয় নাই। তজ্জন্য প্রথমে তিনি কতিপয় বন্ধুর সহায়তায় নিজ বাসভবনেই একটি অবৈতনিক ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, পল্লীর বালকদিগকে শিক্ষা দান করিতে থাকেন। স্বনামখ্যাত ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি মনস্বীগণ এই কার্য্যে তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন।

১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদাতা লর্ড মেটকাফের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তাঁহার নামে সাধারণের ব্যবহারোপযোগী একটি পাঠাগার (Library) স্থাপন করেন। উহা 'কলিকাতা সাধারণ পাঠাগার' (Calcutta Public Library) নামেও পরিচিত ছিল। প্যারীচাঁদ উহার প্রথম সহকারী অধ্যক্ষ (Deputy Librarian) হইয়া উহার উন্নতির জন্য নানাভাবে প্রভূত পরিশ্রম করেন। পরে ঐ পাঠাগারের নিজস্ব ভবন নির্ম্মিত হইলে তিনি উহার প্রধান অধ্যক্ষ (Librarian) নিযুক্ত হন। সুদীর্ঘকাল তিনি উহার কর্ম্মকর্ত্তার পদে আসীন থাকিয়া ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে স্বেচ্ছায় উহা পরিত্যাগ করেন।

ইতিপূর্ব্বেই তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও কালাচাঁদ শেঠ নামক দুইজন বন্ধুর

সহিত মিলিত হইয়া তিনি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। চাকুরী ছাড়িবার পর তিনি ব্যবসায়তেই প্রধান ভাবে মনোযোগ প্রদান করেন এবং নিজে পৃথকভাবেই কারবার চালাইতে থাকেন। *ব্যবসায়ে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হয়। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে এই ব্যবসায়তেই* তাঁহার বহু অর্থ নষ্ট হইয়াছিল।

কর্ম্মজীবনের প্রথম হইতেই তিনি বহু জনহিতকর কার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দে জর্জ্জ টমসনের সহিত মিলিত হইয়া প্যারীচাঁদ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি (The British India Society) স্থাপন করেন এবং তিনি উহার প্রথম কর্ম্মাধ্যক্ষ হন। ঐ সভারই নাম পরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশন হয়। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডালহৌসীর শাসন সময়ে এদেশের পুলিশ বিভাগের সংস্কার সাধনের জন্য এক অনুসন্ধান সমিতি (Commission) নিযুক্ত হয়। বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি উহার নিকট নিজ নিজ মত ব্যক্ত করেন। প্যারীচাঁদ ঐ সমিতির নিকট নির্ভীকভাবে যে সকল মন্তব্য করেন এবং পুলিশ কর্ম্মচারীদের যে সকল দোষ ও অত্যাচার কাহিনীর বর্ণনা করেন, তাহাতে প্রভূত ফল দর্শে। জনহিতকর যে সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তাহাদের মধ্যে—কলিকাতা বেথুন সোসাইটি, জীব নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভা (Society for the Prevention of Cruelty to Animals), কৃষি সভা, হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড সোসাইটি (Hare Prize Fund Society), এবং পল্লী দাতব্য সমিতির (District Charitable Society) অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষরূপে বিশেষ কর্ম্মকুশলতার পরিচয় প্রদান করেন। তদ্ভিন্ন তিনি দুই বৎসর বাঙ্গালা দেশের ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council), এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিরও সদস্য ছিলেন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য থাকিবার সময়ে তিনি জীব-নিষ্ঠুরতা নিবারণ উদ্দেশ্যে দুইটি আইন প্রণয়নে বিশেষ সাহায্য করেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি একজন জষ্টিস অব দি পিস (Justice of the Peace) হইয়াছিলেন। এইভাবে সর্ব্বজনহিতকর বিবিধ কার্য্যের সহিত সংযুক্ত থাকিলেও তিনি সাহিত্য সেবা হইতে বিরত ছিলেন না। The Englishman, Indian Field, Calcutta Review, Hindu Patriot, The Friend of India প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রিকার তিনি একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। ঐ সকল পত্রিকাতে তাঁহার বহু সারগর্ভ বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ক্যালক্যাটা রিভিউ পত্রিকাতে তাঁহার 'রাজা ও জমিদার' শীর্ষক নিবন্ধ

প্রকাশিত হইলে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে আন্দোলন উপস্থিত হয়। ইংরেজিতে তিনি ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত; রামকমল সেনের জীবন চরিত এবং ধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধাবলী, এই তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখকরূপেই প্যারীচাঁদ বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর মধ্যে আলালের ঘরের দুলাল সমধিক প্রসিদ্ধ। উহা তিনি ১২৬৪ বঙ্গাব্দে, টেকচাঁদ ঠাকুর এই ছদ্ম নামে রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে তিনি প্রচলিত কথোপকথনের ভাষায় সহজ ও সাবলীল ভাবে ঘটনার বর্ণনা করেন। তৎপূর্ব্বে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের রচিত গ্রন্থসমূহে অতিরিক্ত সংস্কৃতমূলক পদ সমূহের ব্যবহারে বঙ্গভাষা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল। উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর সহজ ভাষায় বক্তব্য বর্ণন করিবার একটি বিশেষ আগ্রহ পরিদৃষ্ট হইল। S. B. Oswell নামক একজন ইংরেজ উহার একখানি অনুবাদ প্রকাশ করেন। উহা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এদেশ প্রবাসী ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদের বিভাগীয় পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্য ছিল। অভেদী; কৃষিপাঠ; যৎকিঞ্চিৎ; বামাতোষিণী, বামারঞ্জিকা, আধ্যাত্মিক গীতাঙ্কুর, মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তন্মধ্যে অভেদী ও আধ্যাত্মিকা, অধ্যাত্মবাদ বিষয়ক উপন্যাস। 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি স্ত্রী পাঠ্য সাময়িক পত্রিকাও তিনি কিছুকাল পরিচালনা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহযোগীতায় তিনি 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে একখানি পত্রিকাও কিছুকাল সম্পাদন করেন।

১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে পত্নী বিয়োগের পর তিনি আর বিষয় কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ দিতেন না। প্রধানতঃ ধর্ম্ম তত্ত্ব ও প্রেততত্ত্ব আলোচনায় লিপ্ত থাকিতেন। সম্মোহন বিদ্যাতেও তিনি বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করিয়াছিলেন। যোগের অলৌকিক ক্ষমতায় তাঁহার বিশেষ বিশ্বাস ছিল। The Spiritual Stray Leaves নামক গ্রন্থে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে ভূতযোনীর সহিত তাঁহার আলাপ হইত। এমেরিকার ও ইংলণ্ডের প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় পত্রিকাতে এই বিষয়ে তাঁহার অনেক রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে (১২৯৪ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ) পরিণত বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। কলিকাতা টাউন হলে (Town Hall) তাঁহার আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তি (Bust) এবং মেটকাফ হলে তাঁহার তৈলচিত্র সংরক্ষিত আছে

প্যারীমোহন দেববর্ম্মা— উদ্‌ভিদ বিদ্যাবিশারদ প্যারীমোহন ত্রিপুরা রাজ্যের এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি,এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর, বোটানিকেল সার্ভে বিভাগে তিনি সহকারীরূপে নিযুক্ত হন। ঐ কাজে তিনি শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেনে অবস্থান করিতেন। তাঁহার অনেক প্রবন্ধ নেচার, জার্ণেল অব হেরিডেটী, জার্ণেল অব ইণ্ডিয়ান বোটানি, মডার্ণ রিভিউ, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, কৃষক প্রভৃতি দেশী, বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি লণ্ডনের লিনিয়ান সোসাইটী ও রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী এবং আমেরিকার জেনেটিক এসোসিয়েসন প্রভৃতির সভ্য ছিলেন। স্বাধীন ত্রিপুরার কৈলা সহরউপবিভাগের অন্তর্গত ঊনকোটী তীর্থ সম্বন্ধে তিনি একখানা পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। মেজর বামনদাস বসু প্রণীত ভারতীয় ভেষজ সম্বন্ধীয় গ্রন্থের নূতন সংস্করণ বাহির করিবার নিমিত্ত উদ্ভিত বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অংশে, তিনি গ্রন্থকারকে সাহায্য করিতেছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে তিনি একটী বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নিজ ব্যয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া তিনি নানাপ্রকার উদ্ভিদের বহু নমুনা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং কতক গবর্ণমেণ্টকে উপহার দিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু যম তাঁহাকে ইহা সম্পন্ন করিতে দিল না। তিনি মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে ১৯২৫ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিয়াছেন।

প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়— তাঁহার জন্ম স্থান কলিকাতার নিকটবর্ত্তী উত্তর পাড়া। ইহা হুগলী জিলার অন্তর্গত। সিপাহী বিদ্রোহের তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনি কাশীস্থ কোন আত্মীয়ের নিকট উপস্থিত হন। এখানে অধ্যয়নাদির পর মুন্‌সেফী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এলাহাবাদের নিকট মঞ্জনপুর নামক স্থানে মুনসেফের কাজে নিযুক্ত হন। এই সময়ে সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। কতকগুলি বড় বড় জমিদার বিদ্রোহীদলে যোগ দিয়া গ্রাম জ্বালাইয়া প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। এমন কি গবর্ণমেণ্টের খাজানাখানা লুট করিবারও আয়োজন করে। সেই সময়ে তিনি অধীনস্থ লোকজন ও কতিপয় ক্ষতিগ্রস্ত জমিদারকে স্বপক্ষে আনয়ন পূর্ব্বক এক সৈন্যদল গঠন করেন। এই সৈন্যদলের সাহায্যে সুদক্ষ সেনাপতির ন্যায় শিবির সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে রীতিমত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে দুর্দ্দান্ত বিদ্রোহী দলপতি ধাথল সিং এবং আরও কতিপয় বিদ্রোহী সর্দ্দার নিহত হয়। এই জয় লাভের পরে

বিদ্রোহীরা আর যমুনা নদী পার হইতে সাহস পায় নাই। তখন তিনি দ্বাবিংশ বর্ষীয় যুবক মাত্র। তাঁহার এই সাহসিক কার্য্যের জন্য তিনি যুদ্ধা মুন্সেফ নামে (Fighting Munsiff) খ্যাত হন। তৎকালীন বড় লাট লর্ড ক্যানিং এই সাহসী যুবককে তাঁহার বীরত্বের জন্য কাণপুর দরবারে বহু মূল্য খিলাত ও জায়গীর প্রদান পূর্ব্বক সম্মানিত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত রাজ ভক্তির পুরস্কার স্বরূপ তিনি ডিপুটী কালেক্টারের পদ প্রাপ্ত হন। প্যারী বাবুর সময়োচিত এই কার্য্যদ্বারা বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর মান সম্মান শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীরা তাঁহার কার্য্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। একবার তাঁহাকে স্থানান্তরে বদলী করিবার কথা হয়। কিন্তু পাছে স্থানীয় বিদ্রোহীরা আবার মস্তক উত্তোলন করিবার সুযোগ পায়, এই জন্য উপরিতন রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহাকে অন্যত্র বদলী করিতে দিলেন না। ইং ১৮৬৬ সালে এলাহাবাদে হাই কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্যারীমোহন বাবু ওকালতি আরম্ভ করেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও পূর্ব্বকীর্ত্তির কথা অবগত হইয়া, কাশীনরেশ গবর্ণমেণ্টের অনু-মোদনক্রমে, তাঁহার হস্তে স্বীয় জমিদারীর ভার সমর্পণ করেন। মিউর সেণ্ট্রেল কলেজ স্থাপনে তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। প্যারীমোহন বাবু তদ্দেশবাসীর এতদূর শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পরে তদ্দেশ-বাসী জনসাধারণ, তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ অর্থ সংগ্রহ করেন এবং সংগৃহীত অর্থ দ্বারা প্রতি দুই বৎসরে স্থানীয় কলেজের পদার্থবিদ্যাধ্যায়ী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে একটী সুবর্ণ পদক পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (রাজা) —খ্যাতনামা ভূম্যধিকারী ও দেশ নায়ক। হুগলী জিলার অন্তর্গত উত্তর পাড়ার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের তিনি মধ্যম পুত্র। ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে (১২৪৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন) তাঁহার জন্ম হয়। রাজা জয়কৃষ্ণ পুত্রকে উচ্চ শিক্ষা দিতে উৎসুক ছিলেন। প্যারীমোহনও শিক্ষা লাভের সুযোগ অবহেলা করেন নাই। উত্তর পাড়া ইংরেজি বিদ্যালয় হইতে তিনি শেষ পরীক্ষায় (Junior Scholarship) উত্তীর্ণ হন এবং ক্রমে ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ ও আইন (B. L.) পরীক্ষায় সফলতা লাভ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কর্ম্মজীবনের প্রথম হইতেই তিনি রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিবিধ জনহিতকর কার্য্যের সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

পাঁচ বৎসর পরে রাজ প্রতিনিধি লর্ড রিপন তাঁহাকে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মনোনীত করেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে প্রজাসত্ব বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময়ে জমিদারী ও রাজস্ব বিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। উহার পর বৎসর, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের সুবর্ণ জয়ন্তী (Golden Jubilee) উপলক্ষে তিনি একই সময়ে "রাজা" ও সি-এস-আই (C. S. I.) উপাধি প্রাপ্ত হন।

প্যারীমোহন দীর্ঘকাল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের (British Indian Association) সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন; কিছুকালের জন্য তিনি উহার কার্য্যাধ্যক্ষ (Secretary) ছিলেন ও একবার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

জনহিতকর কার্য্যে তিনি মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করিতেন। প্যারীমোহন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন। তিনি সুবক্তাও ছিলেন। বিভিন্ন স্থলে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতা সমূহ ভাষার ওজস্বিতায় এবং যুক্তির অসাধারণত্বে বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। তিনি সৎকর্ম্মানুরাগী, ধীর প্রকৃতি, অমায়িক পুরুষ ছিলেন। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (১৯২২ খ্রীঃ) তিরাশী বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্যারীমোহন সেন—তিনি কলোটোলার প্রসিদ্ধ দেওয়ান রামকমল সেনের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। সর্ব্বাঙ্গে হরি নামের ছাপ দিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও সর্ব্বপ্রকারে স্বামীর অনুগতা ও অতিশয় ভক্তিমতী ছিলেন। এই প্রকার পুণ্যশীল দম্পতির পুত্র প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

প্রকট—কাশ্মীরের অধিপতি ক্ষেমগুপ্তের (৯৫৫—৯৫৮ খ্রীঃ) সমকালবর্ত্তী পর্ণোৎসের অন্তর্গত বদ্দিবাস গ্রামের অধিবাসী খস জাতীয় বাণের পুত্র। প্রকট তাঁহার ভ্রাতা তুঙ্গ প্রভৃতির সহিত মহিষপালকরূপে কাশ্মীরে আসিয়া ছিলেন এবং প্রথমে পত্র বাহকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তুঙ্গ ক্ষেম গুপ্তের মহিষী দিদ্দার প্রণয় পাত্র হইয়া প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করেন। তুঙ্গের প্রকট প্রভৃতি অন্যান্য ভ্রাতারা সেই সুযোগে উচ্চ উচ্চ রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন।

প্রকাশ—খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীতে কিদারকুষণ নামে একজাতি বা রাজবংশ আফগানিস্থানে রাজত্ব করিত। তাঁহাদের মুদ্রা কুষণ রাজগণের অনুকরণে মুদ্রিত। এই সকল মুদ্রার একদিকে রাজার নাম ও অপর দিকে জাতি অথবা বংশের নাম কিদর বা গড়হর লিখা আছে। তন্মধ্যে কৃতবীর্য্য, সর্ব্বযশ, প্রকাশ, ভাস্বন্, শীলাদিত্য, কুশল প্রভৃতি রাজার নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ দেবী—তিনি কাশ্মীরের কর্কোটকবংশীয় নরপতি প্রতাপাদিত্যের বৈশ্য জাতীয়া মহিষী ছিলেন। ধার্ম্মিক রাজা প্রতাপাদিত্যের ন্যায় (৬৩৭—৬৮৭ খ্রীঃ) তাঁহার মহিষী প্রকাশ দেবীও অতিশয় ধার্ম্মিকা ছিলেন। তিনি স্বীয় নামে প্রকাশিকা নামে একটী বৌদ্ধ বিহার স্থাপন ও অন্যান্য সৎকার্য্যানুষ্ঠান করিয়া যশস্বিনী হইয়াছিলেন।

প্রকাশ মতি—চীন দেশীয় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক হিউয়েন সাঙ বা ইউয়ান চাং এর ভারতীয় নাম। চীন দেশের অন্তর্গত 'তই' প্রদেশে ইহার জন্ম হয়। অতি অল্প বয়সেই তিনি ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন। বয়প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্ম গ্রন্থ পঠন মানসে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক গ্রন্থ, বিশেষতঃ মহাযান সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ছিল। এই সকল গ্রন্থ পাঠকালে ভারতবর্ষের একটী চিত্র তাঁহার মানসপটে উদিত হইয়া, তদ্দেশ দর্শনে তাঁহাকে প্ররোচিত করিল। অবশেষে যষ্ঠিমাত্র সম্বল করিয়া ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সীমাহীন দিগন্তব্যাপী মরুভূমি, দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত মালা কিছুই তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। দৈব কৃপায় দস্যুদলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া অতি কষ্টে তীব্বতে আসিয়া উপনীত হইলেন। সেই সময়ে তীব্বতের র চীন দেশীয় এক রাজ কন্যা ছিলেন। তাঁহার সাহায্যে ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তস্থ জালন্দর প্রদেশে উপনীত হইলেন। এই স্থানের রাজা তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। এই স্থানে তিনি কিছুকাল অবস্থান করেন। তৎপরে তিনি গয়ার মহাবোধি গমন করিয়া তথায় চারি বৎসর অবস্থান পূর্ব্বক বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি গয়া হইতে নালন্দা বৌদ্ধ বিহারে গমনপূর্ব্বক তথাকার জিনপ্রভ সূরী ও রত্নসিংহের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎপর তিনি চন-পু নামক নরপতির রাজ্যে উপনীত হইয়া বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হন। ইতিমধ্যে চীন দেশীয় এক রাজদূত ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চীন সম্রাটের নিকট প্রকাশ মতির গুণকীর্ত্তন করিলে, চীন সম্রাট ভিক্ষু প্রকাশ মতিকে স্বদেশে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহাকেই পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। ভিক্ষু প্রকাশ মতি ভারতের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া নেপাল তীব্বতের মধ্য দিয়া স্বদেশে উপনীত হইলেন। চীন সম্রাট অতি সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। ভিক্ষু প্রকাশ মতি ৬২৯—৬৪৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ষোড়শ বর্ষকাল ভারতে অবস্থানপূর্ব্বক

ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার সুবিধা হইয়াছিল। তিনি অতি শ্রদ্ধার সহিত ভারতবাসীর বিবিধ সদ্‌গুণের প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে উত্তর ভারতে প্রসিদ্ধ হর্ষ বর্দ্ধন রাজা ছিলেন। তিনি হর্ষবর্দ্ধনের প্রয়াগ ক্ষেত্রের দান যজ্ঞেও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বিবরণ পাঠ করিলে তৎকালীন ভারতের একটী সমুজ্জ্বল চিত্র আমাদের নয়ন পথে উদ্ভাসিত হয়। সেই সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষ একশত ঊনচল্লিশটী খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে তিনি একশত দশটী রাজ্যে স্বয়ং গমনপূর্ব্বক তাঁহাদের অবস্থা স্বয়ং স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। এই ভ্রমণ কার্য্যে সুদীর্ঘ ষোড়ষ বর্ষ যাপন করিয়াছিলেন।

তিনি স্বদেশে গমন করিয়াও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ভারতবর্ষ হইতে বিশিষ্ট পণ্ডিত মণ্ডলী আনয়নপূর্ব্বক বহু সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করাইয়া ছিলেন। এই প্রকারে ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্ম চীনদেশে প্রচারিত হইয়াছিল।

প্রকাশাত্ম যতি—একজন অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। তাঁহার অন্য নাম প্রকাশানুভব। খুব সম্ভব তাঁহার জন্মস্থান দাক্ষিণাত্য প্রদেশ। তিনি খ্রীঃ একাদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি পদ্মপাদাচার্য্যকৃত 'পঞ্চপাদিক গ্রন্থের উপর পঞ্চপাদিকা বিবরণ' নামে এক টীকা রচনা করিয়া মায়াবাদের বিরুদ্ধবাদীদিগকে পরাস্ত করেন। তাঁহার গুরুর নাম অনন্যানুভব।

প্রকাশাদিত্য—স্কন্দগুপ্তের রাজত্বের পর প্রকাশাদিত্য নামে একজন রাজার নাম কোনও কোনও মুদ্রায় পাওয়া যায়। তাঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ এখনও অজ্ঞাত।

প্রকাশানন্দ-- তাঁহার অন্য নাম মল্লিকার্জ্জুন যতীন্দ্র। তিনি খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি আচার্য্য জ্ঞানানন্দের শিষ্য। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী। ইহা বেদান্তের অদ্বৈত মতের প্রকরণ গ্রন্থ এবং শ্রীহর্ষ মিশ্রের খণ্ডনখণ্ড খাদ্য গ্রন্থের অনুকরণে রচিত। তিনি শাঙ্কর মতবাদেরই পরিপোষক। তাঁহার গ্রন্থের অনেক টীকা রচিত হইয়াছে।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী—কাশীবাসী একজন দণ্ডী। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। কাশীস্থিত বিন্দুমাধব হরির যে মন্দির ছিল, তাহার নিকটে তিনি অবস্থান করিতেন। তিনি একজন বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া দ্বৈত মত গ্রহণ করেন এবং শ্রীচৈতন্যের শিষ্য হন। তখন মহাপ্রভু তাঁহার নাম প্রবোধানন্দ রাখেন।

প্রগলভ মিশ্র—তিনি একজন অদ্বৈতবাদী দার্শনিক পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—খণ্ডন খণ্ডনম্।

প্রচণ্ড দেব—খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে তিনি বর্ত্তমান শান্তিপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের রাজা ছিলেন। তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া সিদ্ধাচার্য্য হইয়াছিলেন এবং তৎপর তাঁহার নাম হইয়াছিল 'শান্তিকর'। তাঁহার এই শান্তিকর নাম হইতে ঐ স্থানের নাম শান্তিপুর হইয়াছে। তিনি নেপালে গমন করিয়া স্বয়ম্ভূক্ষেত্র প্রকাশ করেন। বর্ত্তমানে স্বয়ম্ভুক্ষেত্র নেপালী,তিব্বতী ও মঙ্গোলীয় বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থস্থান।

প্রচেতা—তিনি একজন স্মৃতিশাস্ত্রকার। পদ্মপুরাণে আরও অনেক স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিতের নাম জানিতে পারা যায়। কিন্তু তাঁহাদের অনেকের রচিত গ্রন্থপাওয়া যায় না।

প্রজাপতি দাস—বৈদ্যকুল জাত জ্যোতিষী পণ্ডিত প্রজাপতি দাস পঞ্চসরা বা গ্রন্থ সংগ্রহ নামে এক জাতক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বঙ্গ দেশে প্রচলিত খনার বচন তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

প্রজাপতি নন্দী—তিনি 'রাম চরিত' রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা। বঙ্গের পালবংশীয় নরপতি রামপালের মহাসান্ধি বিগ্রহিক (প্রধান মন্ত্রী) ছিলেন।

প্রজ্ঞা—একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। কাবুলের নিকটে কপিশা নামক স্থানের (Kapisa) তিনি অধিবাসী ছিলেন। প্রথমে তিনি উত্তর ভারতবর্ষে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। পরে জ্ঞানলাভার্থ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করেন। এই স্থানে অষ্টাদশ বর্ষকাল অধ্যয়নে যাপন করিয়া পরে যোগ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য উড়িষ্যার রাজার স্থাপিত বৌদ্ধ মঠে গমন করেন। এই স্থান হইতে তিনি উড়িষ্যার করবংশীয় প্রথম বৌদ্ধ নরপতি শোভাকরের দূতরূপে চীন সম্রাট 'তি-সোং' এর নিকট, রাজার স্বহস্তে লিখিত মহাযান সম্প্রদায়ের একখানা ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া গমন করেন। প্রজ্ঞার প্রতি চীন ভাষায় ইহার অনুবাদ করিবারও আদেশ ছিল। ৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে মহাজ্ঞানী সন্ন্যাসী প্রজ্ঞা চীন দেশে গমন করেন। হায়, ভারত! সেই একদিন ছিল, যেদিন তুমি দেশ বিদেশে এইরূপে জ্ঞান বিতরণ কবিতে।

প্রজ্ঞাকর মতি—একজন বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ও ভিক্ষু। তিনি বিক্রমশীলা বিহারের অন্যতম দ্বার পণ্ডিত ছিলেন। তিনি দক্ষিণদ্বারে অবস্থান করিতেন। তিনি খুব বিদ্বান্ ও জ্ঞানী ছিলেন। যে সকল ছাত্র বিক্রমশীলা বিহারে অধ্যয়ন করিবার জন্য আসিতেন তিনি তাঁহাদিগকে

পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত বোধ করিলে বিহারে থাকিয়া অধ্যয়ন করিবার অনুমতি দিতেন। তিনি পালবংশীয় রাজা চণকের সময়ে (৯৫৫—৯৮৩ খ্রীঃ অব্দ) বর্ত্তমান ছিলেন। প্রজ্ঞাকর মতি, অভিসময়ালঙ্কারবৃত্তি পিণ্ডার্থ ও বোধিচর্য্যাবতার পঞ্জিকা নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। মহাপণ্ডিত সুমতীকীর্ত্তি এই দুই গ্রন্থের তীব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থখানা মৈত্রেয়নাথ কৃত অভিসময়ালঙ্কার কারিকার টীকা মাত্র।

প্রজ্ঞা গুহ্য—যে সকল ভারতীয় বৌদ্ধ আচার্য্য, ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে, চীন ও তীব্বতে গমন করিয়া, বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ তৎতৎদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

প্রজ্ঞা দেব—একজন চীন দেশীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্য। তাঁহার চৈনিক নাম উচিং। তিনি সমুদ্র পথে সুমাত্রা, মালয় উপদ্বীপ হইয়া দাক্ষিণাত্যের-কিয়া-পোতন-ন (বর্ত্তমান নাগপত্তন) নগরে উপনীত হন। সে স্থান হইতে জলপথে দুই দিনে সিংহল দ্বীপে উপনীত হন। আবার সে স্থান হইতে সমুদ্র পথে এক মাসে হরিকেলদেশে (পূর্ব্ববঙ্গে) উপনীত হন। এই স্থানে তিনি এক বৎসর যাপন করেন। তৎপরে আর একজন চীন দেশীয় ভিক্ষুসহ তিনি নালন্দায় গমন করেন। পরে তাঁহারা মহাবোধি বিহারে গমন করেন। তথায় তাঁহারা রাজা কর্ত্তৃক অতি সমাদরে গৃহীত হন। তাঁহারা অচিরে বিহার স্বামীর পদে বৃত হইলেন। তৎপরে তাঁহারা নালন্দা ও তিলার বা (ফল্গু নদীর তীরবর্ত্তী তিলাড়া গ্রাম) বিহারে গমন করেন। প্রজ্ঞাদেব নানা বৌদ্ধশাস্ত্র ব্যতীত যোগশাস্ত্র, কোষশাস্ত্র, হেতুবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। নালন্দা বিহারেই তিনি পরলোক গমন করেন।

প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী, স্বামী—তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁহার পিতার নাম ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়। বরিশাল জিলার অন্তর্গত উজিরপুর গ্রামে ১২৯১ বঙ্গাব্দের ২৮শে শ্রাবণ তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যক্ষ। সতীশ বাল্যকালে গ্রাম্যবিদ্যালয়ে পাঠ আরম্ভ করিলেন। ক্রমে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া পাশ করিলেন। এফ্, এ, পরীক্ষায় প্রথমবারে অকৃতকার্য্য হইয়া, দ্বিতীয়বারে পাশ করেন। এই সময়ে তাঁহার মাতা তাঁহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন কিন্তু অকৃতকার্য্য হন। তাঁহার মন সংসারের দিকে বিমুখ ছিল। সুতরাং সেইদিক হইতে দূরে থাকিতেই তিনি চেষ্টা করিতেন। বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলে কাজ করিবার সময়ে তিনি সহর হইতে দেড় মাইল দূরে মহামায়ার

মন্দিরে প্রায়ই যাইয়া, তথায় রাত্রি যাপন করিতেন এবং প্রাতঃকালে চলিয়া আসিতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিনি সন্ন্যাসের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন সময়ে ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ হইল। এই ঘটনায় তাঁহার মনকে সংসারের দিক হইতে অনেক দূরে লইয়া গেল। তাহার পর বৎসর ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে বরিশালে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। প্রসিদ্ধ নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের সহকর্ম্মীরূপে তখন তিনি কর্ম্মে ঝাপাইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিকট কর্ম্মহীন ধর্ম্ম ও ধর্ম্মহীন কর্ম্ম উভয়ই নিস্ফল বোধ হইত।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিলেন। সেজন্য তিনি তাঁহারই নামে ১৩১৭ বঙ্গাব্দে বরিশালে শঙ্কর মঠ স্থাপন করেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে তিনি গয়াধামে যাইয়া শঙ্করানন্দ সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার নাম হইল প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী। তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা পূর্ব্ব হইতেই প্রবল ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাহা আরও প্রবলতর হইল। তিনি তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য কাশীতে গমন করিলেন এবং একাগ্রতার সহিত পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় বিশেষ জ্ঞান লাভ করিলেন। এখন তাঁহার জীবনের আর এক অধ্যায় আরম্ভ হইল। তাঁহার নির্ভীক বাণী শ্রবণ করিয়া একদল যুবক তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল। এই আত্মত্যাগী যুবকদের লইয়া, তিনি ভারতের কল্যাণ কামনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। সমুদয় সঙ্কীর্ণতার বন্ধন হইতে দেশকে মুক্ত করাই ছিল, তাঁহাদের সাধনা। দেশের তখনকার রাজনৈতিক আবহাওয়া বড় সুবিধাজনক ছিল না। দেশকর্ম্মের ছলে কতক যুবক বিপ্লবীদল গঠন করিয়াছিল। সেজন্য গবর্ণমেণ্ট দেশকর্ম্মী সকলকেই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতীও সেই সন্দেহের অতীত ছিলেন না। বাঙ্গালার স্বাধীনতাকামী যুবকদলের নায়ক সন্দেহে, কাশীতে অবস্থানকালে, ১৩২২ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ অন্তরীণের এক পরোয়ানা পাইলেন। তাঁহার অনুচর যুবক দলও একে একে বন্দী হইলেন। স্বামীজীকে প্রথমে বরিশাল হইতে গলাচিপায়, পরে মেদিনীপুর জিলার মহিষাদল গ্রামে এবং আরও নানাস্থানে চারি বৎসর অন্তরীণ করিয়া রাখা হইল। এই অবরোধ সময়েই তিনি 'বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস' তিন খণ্ড, 'রাজনীতি' ও 'কর্ম্মতত্ত্ব' নামক পুস্তকগুলি প্রণয়ন করেন। এই অন্তরীণ অবস্থায়ও তাঁহার

মনের বল ও তেজস্বিতা কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। সর্ব্বপ্রকার অধীনতার বিরুদ্ধেই তাঁহার সংগ্রাম চলিয়াছিল। সেই জন্যই বোধ হয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিপ্লবী বলিয়া সন্দেহ করিতেন। রাজনৈতিক সন্ন্যাসী সন্দেহে, সরকারী নিগ্রহের কোন দুর্ভোগই তাঁহার ভাগ্যে বাকী ছিল না। কিন্তু মন যাঁর দুর্জ্জয় বললাভে বলীয়ান্, শারীরিক নিগ্রহ তাঁহাকে কি করিবে? এই নির্য্যাতনের ভিতরেও তাঁহার প্রফুল্ল মুখের প্রসন্নতার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। মহিষাদল গ্রামে অবস্থানকালে তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। এই রোগের বার বার আক্রমণের ফলে, তাঁহার দেহ ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইতেছিল। কিন্তু সেদিকে একেবারেই দৃষ্টি দিতেন না। একবার শীতকালে তিনি খুব কাতর হইয়া পড়েন। শিষ্যবৃন্দ খুব চিন্তিত হইলেন, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাব কিছুই ছিল না। অবশেষে ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ২৩শে মাঘ তিনি কলিকাতায় ইহধাম ত্যাগ করিলেন। তাঁহার শিষ্যবৃন্দ তাঁহার মৃতদেহ ২৫শে মাঘ বরিশালে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শঙ্কর মঠে সমাহিত করেন। মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে ভারতের উন্নতিকামী এই সন্ন্যাসী পরলোক গত হইলেন।

প্রজ্ঞাপাল—যে সকল ভারতীয় বৌদ্ধ আচার্য্য, ধর্ম্ম প্রচার ব্যপদেশে, চীন ও তিব্বতে গমন করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ তৎতৎদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, প্রজ্ঞা পাল তাঁহাদের অন্যতম।

প্রজ্ঞা বর্ম্মা—অনেক ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য্য তিব্বত ও চীন দেশে গমন পূর্ব্বক, বৌদ্ধ ধর্ম্ম শাস্ত্র সকল তৎতৎ দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন।

প্রজ্ঞা শ্রীজ্ঞান—যে সকল ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য্য তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশে গমন পূর্ব্বক, বৌদ্ধ ধর্ম্ম শাস্ত্র সকল তৎতৎ দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, প্রজ্ঞা শ্রীজ্ঞান তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

প্রতাপ—কুষণবংশীয় একজন রাজা। তাঁহার নামাঙ্কিত দুই একটি মুদ্রা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। আর কোনও বিবরণ জানা যায় না।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ—একজন রাজকর্ম্মচারী ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। তিনি কলিকাতা বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটের অধিবাসী বিখ্যাত হরচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এশিয়াটিক সোসাইটীর সহকারী লাইব্রেরীয়ানের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর ঐ কার্য্য করিবার পর, কলিকাতার ডিড ও জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানীর রেজিষ্ট্রারের

পদ লাভ করেন। এই পদ তৎকালে এদেশীয় লোকের পক্ষে দায়িত্বে ও মর্য্যাদায় একটী উচ্চপদ বলিয়া পরিচিত ছিল। তিনি অতি যোগ্যতার সহিত ঐ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ, কর্ম্মবিধিজ্ঞ, শ্রমশীল ও আত্মমর্য্যাদারক্ষক রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে, তিনি তিব্বতীয় লামাদের সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন, অনুশীলন ও গবেষণায় মনোনিবেশ করেন এবং ফলে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মকরন্দ ঘোষের অধস্তন চতুর্দ্দশ বংশধর রাম-ই মঞ্জুরাম মঞ্জুশ্রী। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পরে, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মানুসারে ক্রিয়াকলাপ করিতেন। তিনি ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, পালি ও তিব্বতীয় ভাষা জানিতেন। বঙ্গাধিপ পরাজয়' নামে তিনি একখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত নানা বিষয়ে তাঁহার অনেক অমুদ্রিত রচনা রহিয়াছে। তাঁহার বারাণসী ঘোস ষ্ট্রীটস্থ বাড়ীতে নানাবিধ পাথরের কাজ ও পাথরে খোদিত নানা পৌরাণিক মূর্ত্তি আছে, উহা একটী দেখিবার জিনিষ। সরকারী কার্য্য হইতে অবসর বৃত্তি গ্রহণ করিবার পর, তিনি বিন্ধ্যাচলে বাস করিতেন। ১৩২৭ বঙ্গাব্দে প্রায় একাশী বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—(১) খ্যাতনামা বাঙ্গালী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। তিনি পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যায় সুশিক্ষা লাভ করিয়া প্রথমে অ্যালোপ্যাথী মতে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। পরে তাঁহার শ্বশুর বিহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয়ের পরামর্শে হোমিওপ্যাথি প্রণালীতে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং অল্পকাল মধ্যে প্রভূত যশ অর্জ্জন করেন। তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্যের খ্যাতি ভারতের অনেক দূরবর্ত্তী স্থানেও বিস্তার লাভ করে। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দের প্রথমভাগে এমেরিকার শিকাগো (Chicago) নগরীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-চিকিৎসক সম্মেলনীতে তিনি আহূত হন এবং তথায় বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে তিনি যে সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে চমৎকৃত হইয়া এমেরিকার বিদ্বন্মণ্ডলী তাঁহাকে এম্-ডি (M. D.) উপাধি প্রদান করেন।

সামাজিক মতে তিনি সংস্কার পন্থী ছিলেন। বিহারীলালের বিধবা কন্যাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। খ্যাতনামা নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার অন্যতম জামাতা ছিলেন।

১৩২৯ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে (অক্টোবর, ১৯২২ খ্রীঃ) কলিকাতা নগরে তিনি পরলোক গমন করেন।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—(২) বাঙ্গালী ধর্ম্ম নেতা, বক্তা ও দেশসেবক। ১৮৪০

খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে হুগলী জিলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র; তাঁহার পিতামহ সঙ্গতিশালী লোক ছিলেন। সুতরাং শৈশবে প্রতাপচন্দ্র সুখে ও আদরেই লালিত পালিত হইয়াছিলেন।

গরিফা গ্রামে শৈশব অতিক্রম করিয়া পাঠশালার শিক্ষা সমাপনান্তে প্রতাপচন্দ্র হুগলী কলেজে এক বৎসর অধ্যয়ন করেন। পর বৎসর কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে হেয়ার স্কুলে এবং তৎপরে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। বিদ্যালয়ে গণিত ব্যতীত অপর সকল বিষয়েই তিনি বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেন। হিন্দু কলেজে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়া ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি বিদ্যালয় হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

বাল্যকাল হইতেই প্রতাপচন্দ্র ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। কলিকাতায় আসিবার পর তিনি তাঁহার আত্মীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সাহচর্য্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ লাভ করেন এবং কেশবচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে নানারূপ বাধা বিপত্তির মধ্যেও তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

কেশব ও প্রতাপ পরস্পর আত্মীয় ও বন্ধু ছিলেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তিনিও কলেজ হইতে বিদায় লইয়া ব্যাঙ্কে চাকুরী গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অল্প দিন মধ্যেই উভয়েই বুঝিলেন, ব্যাঙ্কের কেরাণীগিরি তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র নহে। ব্যাঙ্কের কাজ করিতে করিতে প্রতাপচন্দ্র প্রার্থনা করিতেন, সময় সময় উপাসনার ভাবে বিভোর হইতেন। তিনি ব্যাঙ্কের কাজ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে বুঝিতে পারিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তখন তিনি সমাজচ্যুত হইয়াছেন। শৈশবেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, তিনি সস্ত্রীক সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। অগত্যা পুনরায় তিনি চাকুরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি কিয়ৎ পরিমাণ স্বকীয় ক্ষমতানুরূপ সুবিধাজনক কর্ম্ম পাইলেন।

১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে ইণ্ডিয়ান মিরার যখন দৈনিক সংবাদপত্ররূপে বাহির হইল প্রতাপ বাবু তখন তাহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিরারের উন্নতির জন্য প্রতাপ বাবু অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেন। মানুষ যখন সরল নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সহিত কোন সৎকার্য্যে ব্রতী হয়, সেই কাজই তাঁহাকে উচ্চ করিয়া তোলে। মিরারের জন্য প্রবন্ধ রচনা করিতে প্রতাপ বাবু যে শ্রম করিতেন, তাহাতে তাঁহার মানসিক শক্তির যথেষ্ট উন্নতি

সাধিত হইয়াছিল এবং এই সূত্রে অপূর্ব্ব সম্পদশালী ইংরেজী সাহিত্য বিশেষতঃ ইংরেজী দর্শন অধ্যয়নে তিনি প্রগাঢ় ভাবে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই অধ্যয়ন ও পরিশ্রমের ফলে প্রতাপচন্দ্র কালে বক্তা ও লেখকরূপে যে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ভারতের শিক্ষিত সমাজে সর্ব্বত্র সুবিদিত। ইংরেজী ভাষায় বাগ্মীবর প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের অসাধারণ দক্ষতার কথা, তাঁহার অপূর্ব্ব ভাব ও শব্দসম্পদ এবং বাক্যবিন্যাস নিপুণতার কথা শিক্ষিত বঙ্গবাসীর নিকট অধিক করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

যৌবনে ২৫ বর্ষ বয়সেই প্রতাপচন্দ্র বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানীতে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। ধীর সুগভীর সরল ও শুদ্ধ শব্দবিন্যাস করিয়া, সৌম্য দর্শন প্রতাপচন্দ্র যখন সুগম্ভীর ভাবে তাঁহার শ্রোতাদিগকে সম্বোধন করিতেন, তখন তাঁহার প্রত্যেকটি শব্দ শ্রোতার হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রবেশ করিত।

১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দে প্রতাপচন্দ্র প্রথমবার ইংলণ্ড গমন করেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে পুনরায় তিনি ইংলণ্ড হইতে আমেরিকা গমন করেন এবং তথা হইতে জাপান গমন করিয়া তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন। এই বৎসরই 'Oriental Christ' নামক তাঁহার সুবিখ্যাত পুস্তক প্রকাশিত হয়। তৎকালে এই পুস্তকের অত্যন্ত সমাদর হইয়াছিল। খ্রীষ্টের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও আধ্যাত্মিক প্রতিভা এই পুস্তকে সুপ্রকীর্ত্তিত। তিনি ইংরেজী ও বাঙ্গালায় আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ইংরেজীতে 'কেশবচন্দ্রের জীবনী' "The Spirit of God" "The Heart Beats" প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে সেপ্টেম্বর মাসে সিকাগো (Chicago) ধর্ম্ম মহাসভায় আহুত হইয়া গমন করেন। এই মহাসভায় তিনি 'এসিয়ার নিকট ধর্ম্ম বিষয়ে পৃথিবীর ঋণ' সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তথা হইতে 'লাউয়েল ইন্‌ষ্টিটিউটে' ভারত প্রসঙ্গে চারিটি বক্তৃতা প্রদানের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া বোষ্টন নগরে গমন করেন। এই বক্তৃতাগুলি শ্রোতাদের মন এমনভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল যে, তাঁহাদের একান্ত অনুরোধে তিনি কোনও কোনও বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি করিতে বাধ্য হন ; বিভিন্ন খ্রীষ্টিয় উপাসকমণ্ডলী তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্ব স্ব উপাসনা মন্দিরে আচার্য্যের আসন প্রদান করেন।

প্রতাপচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের এক বিপ্লব বা সংস্কার যুগের লোক ছিলেন।

কুচবিহারের নাবালক রাজার সহিত কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহ লইয়া ব্রাহ্ম সমাজে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহাতে প্রতাপচন্দ্র বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে প্রতাপবাবু এক সময়ে সমাজ সংস্কার ও লোকহিতকর কার্য্যেও সবিশেষ অনুরাগী হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভুতপূর্ব্ব ছোটলাট চার্লস ইলিয়টের যোগে তিনি Society for the Higher Training of Young men. (বর্ত্তমান ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট) নামক যুবকদের উন্নতি বিধায়িনী সভা স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ বাহ্যিক কর্ম্ম সাধনা অপেক্ষা চিন্তা ও অধ্যয়নেই তাঁহার অধিকতর অনুরাগ ছিল। শেষ জীবনে নির্জ্জনতাই তাঁহার সাময়িক প্রিয় হইয়াছিল। বার্দ্ধক্য ও পীড়াতে বহুদিন পূর্ব্বেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। রোগশয্যায় পড়িয়াও তিনি আশীষ নামক তাঁহার শেষ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও কলিকাতা অ্যালবার্ট হলে (কৃষ্ণবিহারী সেন অথবা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন দেখ) রবিবাসরিক সম্মিলিত উপাসনা মণ্ডলীতে উপাসনা করিতেন।

প্রতাপচন্দ্র উচ্চশ্রেণীর বাগ্মী ছিলেন। দেশে বিদেশে তাঁহার উদাত্ত বক্তৃতায় শত শত নরনারী মুগ্ধ হইতেন। শিকাগো (Chicago) ধর্ম্ম মহাসম্মিলনীতে (Parliament of Religion ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দ) তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা যে কিরূপ গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় তৎকালীন পত্রিকা আদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শেষ জীবনে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শয়ান থাকিয়া ১৩১২ বঙ্গাব্দের জ্যেষ্ঠ মাসে (১৯০৫ খ্রীঃ মে) তিনি পরলোক গমন করেন। কলিকাতাস্থ সাকুলার রোডে কেশবচন্দ্রের বাসভবনের পার্শ্বে তিনি শান্তিকুটীর নামে নিজ বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

প্রতাপচন্দ্র রায়, সি-আই-ই—একজন সাহিত্যসেবী। তিনি মহাভারত, হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগত ও রামায়ণের বঙ্গানুবাদ ও মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদ করেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দের ১৫ই মার্চ্চ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সাঁকো নামক গ্রামে উগ্রক্ষত্রিয় কুলে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামজয় রায় ও মাতার নাম দ্রবময়ী। তাঁহার জন্মের দুই মাস পরেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয় এবং তিনি কৃষ্ণমণি নামক এক বিধবার দ্বারা প্রতিপালিত হন। তাঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা অতিশয়

অসচ্ছল ছিল। সেই জন্য প্রতাপচন্দ্র কিছু বয়স্ক হইয়া এক ব্রাহ্মণের গোরক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন; কিন্তু লেখাপড়া শিক্ষার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অন্তরে ছিল। ব্রাহ্মণ তাঁহার এই স্পৃহা লক্ষ্য করিয়া আপন ছেলেদের সঙ্গেই তাঁহার লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ষোল বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন। তৎপর তিনি নিঃসম্বল অবস্থায় কলিকাতা আগমন করেন এবং মহাভারতের সুবিখ্যাত বঙ্গানুবাদক ও জমিদার কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অধীনে সাত টাকা বেতনে এক চাকুরীতে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকার সময়েই মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি অনুবাদের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অন্তরে জাগরিত হয়। কিছু কাল পরে কালীপ্রসন্ন সিংহ পরলোক গমন করেন এবং তিনি যোড়াসাঁকো অঞ্চলে একটি মনোহারী ও পুস্তকের দোকান আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায় দ্বারা তিনি কয়েক বৎসর মধ্যে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া প্রায় আঠার বৎসর পরে স্বগ্রামে গমন করেন। ঐ সময় তিনি বিবাহ করেন এবং কিছুদিন পর সস্ত্রীক কলিকাতা চলিয়া আসেন। এইবার তিনি মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং পণ্ডিত দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে সাত বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি সমগ্র মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদের মূল্য বিয়াল্লিশ টাকা ছিল। তৎপর তিনি একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। সেই সময় ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার স্ত্রী একটী মাত্র শিশুকন্যা বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তখন তিনি মানসিক অশান্তি নিবারণের জন্য দেশ ভ্রমণে বাহির হন। ঐ সময় তিনি অবিক্রীত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রায় সহস্র খণ্ড বিনা মূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'দাতব্য ভারত কার্য্যালয়' স্থাপন করেন এবং মহাভারতের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করেন। দ্বিতীয় সংস্করণের মূল্য ৬।৵০ আনা ছিল। ক্রমে তিনি দেশীয় ধনবান্ ব্যক্তিগণের সাহায্য লাভে সমর্থ হন এবং তাঁহাদের সাহায্যে সাত বৎসরের মধ্যে দাতব্য ভারত কার্য্যালয় হইতে নয় সহস্র খণ্ড মূল ও অনুবাদ মহাভারত, তিন সহস্র খণ্ড মূলসহ বঙ্গানুবাদ রামায়ণ এবং নয় সহস্র খণ্ড হরিবংশ বাহির করিয়াছিলেন। মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদ তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। সুপ্রসিদ্ধ কিশোরীলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা সমগ্র মহাভারতের শ্লোকানুযায়ী তিনি ইংরেজী অনুবাদ করান। এই

বিরাট কার্য্যে তাঁহার এক লক্ষেরও অধিক মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল এবং দেশের দানশীল রাজা, মহারাজা, জমিদারবর্গ ও সরকারের নিকট হইতে উহার অধিকাংশ অর্থই সাহায্য স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি এই কার্য্যে ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। মহাভারতের অনুবাদের ফলে দেশ বিদেশের বিদ্বজ্জন সমাজে তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল এবং ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে ভারতসরকার তাঁহাকে সি-আই-ই (C. I. E.) এই সম্মানজনক উপাধি প্রদান করেন। ইংরেজী অনুবাদের ৯৪ খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দের ১৩ই জানুয়ারী তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তৎপর তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী সুন্দরীবালা স্বামীর অসম্পন্ন ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য সামান্য মাত্র নিজ সঞ্চিত অর্থও ব্যয়িত করিয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলি প্রকাশ করেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে কার্য্যারম্ভের দশ বৎসর পরে ইহা সমাধা হইয়াছিল।

প্রতাপচন্দ্র রায়চৌধুরী—একজন সংবাদ পত্র সেবী। ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত উলপুর গ্রামে বসু রায়চৌধুরী বংশে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ব্রজমোহন রায়চৌধুরী। প্রতাপচন্দ্র সুশিক্ষিত ও সুলেখক ছিলেন। উলপুর বাস কালীন তিনি 'চিত্রকর' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। লেখার গুণে সুধী সমাজে উহা সমাদৃত হইয়াছিল। পরে তিনি 'নৃপবর' নামে আর একখানি পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন ফরিদপুর কালেক্টরীতে কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপর মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত তমলুক মুন্‌সেফ কোর্টের সেরেস্তাদারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই ১৩১১ বঙ্গাব্দে সাতান্ন বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

প্রতাপচন্দ্র সিংহ রাজা—তিনি কান্দির জমিদার রাজা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধর, রাজা শ্রীনারায়ণ সিংহের পোষ্য পুত্র। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (লালা বাবু) পরলোক গমন করিলে, তাঁহার স্ত্রী রাণী কাত্যায়নী নাবালক পুত্র শ্রীনারায়ণের অভিভাবিকা হইয়া রাজ্য শাসন করেন। শ্রীনারায়ণ সিংহ মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। তাঁহার দুই রাণী প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। তাঁহারা রাণী কাত্যায়নীর ভ্রাতা রসোড়া নিবাসী কৃষ্ণ সুন্দর ঘোষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র। ১৮২৭ খ্রীঃ অব্দে প্রতাপচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি বদান্য, পরোপকারী ও সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। কলিকাতা মেডিকেল

কলেজের ফিমার হাসপাতাল নির্ম্মাণ জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক সৎকাজে বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি গবর্ণমেণ্টকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া ছিলেন। ১৮৫৪ সালে তিনি রাজা বাহাদুর ও পরে সি, এস, আই উপাধি লাভ করেন। তাঁহার বেলগেছিয়া ভিলা নামক সুরম্য উদ্যানে ভারতের লোকান্তরিত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ১৮৭৫ সালে যুবরাজরূপে দেশীয়গণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া শুভাগমন করেন। তাঁহার এই উদ্যানেই বাঙ্গালার নাটক প্রথম অভিনীত হয়। এই স্থান হইতেই ঐক্যতান বাদনের প্রণালী উদ্ভূত হইয়াছিল। তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। বিধবা বিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা দান প্রভৃতি কাজে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায় ও পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দের ২৯ শে জুলাই তিনি গিরিশচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, কান্তিচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র নামে চারি পুত্র ও স্ত্রী রাণী পদ্মমুখীকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

প্রতাপ দেব, রাজা—তিনি উড়িষ্যার অন্তর্গত বোদ রাজ্যের মুসলমান রাজত্ব কালের একজন রাজা। তিনি একবার দিল্লীর সম্রাটের সৈন্যদিগকে, তাঁহার রাজ্য মধ্য দিয়া গমনকালে সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ঐ সৈন্যদলের অনেকে জ্বরাক্রান্ত হইয়া তাঁহার রাজ্যে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। রাজা মাসাধিককাল তাঁহাদিগকে যত্নে পরিচর্য্যা করিয়া আরোগ্য করেন দিল্লীর সম্রাট ইহা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে 'স্বস্তি শ্রী দেড় লক্ষ দুর্গাধিপতি ঝাড় খণ্ড মণ্ডলেশ্বর' এই গৌরবজনক উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন। বোদ রাজ্যের বর্ত্তমান অধিপতির নাম যোগীন্দ্র দেব। রাজ্যের পরিমাণ ফল ২০৬৪ বর্গ মাইল ও লোক সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ, তন্মধ্যে প্রায় ৩৭ হাজার অসভ্য পার্ব্বত্যজাতি ব্যতীত প্রায় সকলেই হিন্দু।

প্রতাপ ধবল—রোহিতাশ্ব দুর্গের (রোটাসগড়) নিকটবর্ত্তী জাপিল গ্রামের মহানায়ক প্রবল পরাক্রান্ত প্রতাপ ধবল খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি দুর্গ মধ্যে কতক গুলি কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

প্রতাপধ্বজ—তিনি কামরূপের অধিপতি সিংহ ধ্বজের মন্ত্রী ছিলেন। প্রতাপধ্বজ সিংহধ্বজকে বিনাশ করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। সম্ভবত এই ঘটনা ১৩০৫ খ্রীঃ অব্দে সংঘটিত হয়। তিনি ১৩০৫—১৩২৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত

রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার মহিষী পার্বতী দেবীর পুত্র দুর্লভনারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন। সন্ধ্যা দেখ।

প্রতাপনারায়ণ সিংহ, সার—তিনি অযোধ্যার অন্তর্গত মহদোনার রাজা। ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহারা সিংহলদ্বীপের ব্রাহ্মণ বংশজাত। এই বংশের স্থাপয়িতা সদাসুখ পাঠক ভোজপুরের রাজস্ব সংগ্রাহক ছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র ভক্তবর সিংহ প্রথমে সামান্য সৈনিকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ নগরে অবস্থানকালে নবাব সাদত আলী খাঁর দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। নবাব সরকারে প্রথম জমাদার, পরে রেসালদার, এইরূপে ক্রমশঃ উচ্চপদ লাভ করিয়া, দিল্লীর তদানীন্তন সম্রাট মোহাম্মদ শাহের নিকট হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে সার উইলিয়ম শ্লিমানের সঙ্গে তিনি অযোধ্যা ভ্রমণে গমন করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দর্শন সিংহ ১৮২৭ খ্রীঃ অব্দে সুলতানপুর ও ফয়জাবাদের নাজিম নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজা উপাধিও পাইয়াছিলেন। ১৮৪৪ সালে দর্শন সিংহ পরলোক গমন করিলে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মানসিংহ নরিয়াবাদ, রুদৌলী ও সুলতানপুরের নাজিম নিযুক্ত হইয়াছিলেন। একজন রাজস্ব অনাদায়ী বিদ্রোহী জমিদার ও একজন বিখ্যাত দস্যুকে ধৃত করিয়া তিনি নবাবের নিকট হইতে রাজা উপাধি এবং মনিয়ারপুরের বিদ্রোহী গর্গবংশীয় পরপালকে ধৃত করিয়া তিনি 'কায়েম জঙ্গ' উপাধি পাইয়াছিলেন। রাজা মানসিংহকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া ভক্তবর সিংহ ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। অযোধ্যা ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হইলে, রাজস্ব বাকীর জন্য মানসিংহের জমিদারী বাজেয়াপ্ত হয়। পরে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে মানসিংহ অনেক ইউরোপীয়কে আশ্রয় দিয়া ও গবর্ণমেণ্টকে অন্যান্য প্রকারে সাহায্য করিয়া সমস্ত সম্পত্তি পুনপ্রাপ্ত হন। ১৮৭০ সালে মানসিংহ পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার স্ত্রী রাণী শোভাকুমারী ১৮৭৫ সালে একটী পোষ্য পুত্র গ্রহণে অভিলাষী হন। কিন্তু মানসিংহের দৌহিত্র প্রতাপনারায়ণ সিংহ (অযোধ্যার নরসিংহ নারায়ণ সিংহের পুত্র) ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করেন। ইংলণ্ডের প্রিভিকাউন্সিলে, পোষ্যপুত্র অগ্রাহ্য করিয়া প্রতাপনারায়ণকেই সম্পত্তি প্রদান করেন। তিনি অযোধ্যার তালুকদার শ্রেণীর মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'ভারত সাম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণের সময়ে তিনি মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন।

প্রতাপ ভানু— 'প্রতাপ মার্ত্তণ্ড' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

প্রতাপ মাণিক্য (প্রথম)—ত্রিপুরার মহারাজ রত্ন মাণিক্যের মৃত্যুর পরে ১৩৪৭ঃ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপ মাণিক্য রাজা হন। কিন্তু তিনি অধার্ম্মিক ও অত্যাচারী ছিলেন বলিয়া সেনাপতিরা তাঁহাকে নিহত করিয়া তাঁহার অনুজ মুকুট মাণিক্যকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সমগ্র বঙ্গের স্বাধীন সুলতান ছিলেন। তিনি একবার ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন।

প্রতাপ মাণিক্য (দ্বিতীয়)—ত্রিপুরাধিপতি ধর্ম্ম মাণিক্যের (১৪৩১—১৪৬২ (খ্রীঃ) দ্বিতীয় পুত্র। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের মৃত্যুর পরে সেনাপতিগণ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র প্রতাপ মাণিক্যকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। ১৪৯০ খ্রীঃ অব্দে এক মন্দমতি সেনাপতি গোপনে তাঁহাকে হত্যা করিলে তাঁহার অগ্রজ ধন্য মাণিক্য (১৪৯০—১৫২০ খ্রীঃ) রাজপদ লাভ করেন। তাঁহার সময়ে নবাব আলাউদ্দিন হোশেন শাহ ও তাঁহার পুত্র নশরৎ শাহ বাঙ্গালার নবাব ছিলেন।

প্রতাপ রাও গুজর—তিনি ছত্রপতি শিবাজীর একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি। নানা যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। একবার বিজাপুরের সেনাপতি আবদুল করিম তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তখন আবদুল করিম তাঁহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাকে বিনা বাধায় ফিরিয়া যাইতে দিলে তিনি মহারাট্টাদের লুণ্ঠনে কিছুমাত্র বাধা দিবেন না। প্রতাপ রাও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহাকে যাইতে দিলেন। শিবাজী ইহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। শত্রুকে সমূলে বিনাশ করিবার এই সুযোগ পরিত্যাগ করাতে, শিবাজী প্রতাপ রাওকে অতিশয় তিরস্কার করিয়াছিলেন। আবদুল করিম বিজাপুরে আসিয়াই, বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া শিবাজীর অধিকৃত পানহালা দুর্গ আক্রমণ করিলেন। শিবাজী প্রতাপ রাওকে আদেশ করিলেন যে, বিজাপুর সেনাপতি আবদুল করিমকে বিনাশ না করিয়া যেন তিনি রাজসভাতে উপস্থিত না হন। প্রতাপ রাও ইহাতে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া আবদুল করিমকে আক্রমণ করিলেন। ফলে প্রতাপ রাও যুদ্ধক্ষেত্রেই শয়ন করিলেন। এই সময়ে অন্যতম মহারাট্টা সেনাপতি হাসজী মোহিতে প্রবল বিক্রমে আবদুল করিমকে এমন আক্রমণ করিলেন যে, আবদুল করিম যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য

হইলেন। প্রতাপ রাওএর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া ছত্রপতি শিবাজী অতিমাত্র দুঃখিত হইয়াছিলেন।

প্রতাপ রায়—আসামের অন্তর্গত জয়ন্তিয়ার রাজা বিজয় মানিক্যের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি জয়ন্তিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি খ্রীষ্টীয় ১৫৮০ হইতে ১৫৯৬ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

প্রতাপরুদ্র কাকতীয় (দ্বিতীয়)—দাক্ষিণাত্যের কাকতীয় বংশের শেষ রাজা। ১৩০৯ খ্রীঃ অব্দে আলাউদ্দিন খিলজীর সেনাপতি মালেক কাফুর, প্রথমে তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করেন। কাকতীয় রাজবংশের রাজধানী ওয়ারঙ্গল-দুর্গ অতিশয় দুর্ভেদ্য বলিয়া খ্যাত ছিল। দীর্ঘকাল অবরোধের পর প্রতাপরুদ্র বশ্যতা স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন এবং নিজের ধনসম্পত্তির প্রায় সমস্তই প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া রাজ্যকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিলেন।

কয়েক বৎসর পরে পুনরায় গিয়াস-উদ্দিন তোগলকের রাজত্বকালে প্রতাপরুদ্রের রাজ্য পাঠানরাজ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। আলাউদ্দিন খিলজীর মৃত্যুর পর কুতব-উদ্দিন মুবারকের রাজত্বকালে প্রতাপরুদ্র পূর্ব্ব অঙ্গীকার অস্বীকার করিয়া, দিল্লীর সম্রাটকে দেয়কর প্রদান করিতে বিরত হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি অন্য নানাভাবেও নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। কিন্তু গিয়াস-উদ্দিন প্রেরিত বাহিনীর আক্রমণ তিনি প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই। ১৩২৩ খ্রীঃ অব্দের দ্বিতীয় বারের আক্রমণে তিনি পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করা হয় এবং সেই সঙ্গে কাকতীয় রাজবংশ বিলুপ্ত হইল।

প্রতাপরুদ্র দেব—উড়িষ্যার সূর্য্য-বংশীয় নরপতি পুরুষোত্তমের পুত্র। তিনি ১৪৯৭—১৫৪২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়ে বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। ১৫১০ খ্রীঃ অব্দে চৈতন্যদেব উড়িষ্যা দেশে গমন করেন। রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার শিষ্য ছিলেন। ইহার ফলে রাজ্য শাসন ও রাজ্য রক্ষায় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। রাজার ন্যায় রাজ্যের প্রধান দুইজন সেনাপতিও শ্রীচৈতন্যের শিষ্য হইলেন। ইহাদের একজন রামানন্দ রায় কর্ণাটের শাসন-কর্ত্তা ও অপর ব্যক্তি গোপীনাথ বড়-জেনা মেদিনীপুর অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। ফলে রাজ্যের সীমা অচিরেই অতিশয় খর্ব্ব হইল। বিজয় নগরপতি ও মুসলমান রাজারা উড়িষ্যার সমস্ত দক্ষিণ অংশ অধিকার করিল।

যেটুকু বাকী ছিল, তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহা পূর্ণ হইল। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পরে প্রথম তাঁহার পুত্র কালুয়া দেব ও তৎপরে কালুয়ার ভ্রাতা কথারুয়া দেব রাজা হন। গোবিন্দ বিদ্যাধর তৎপরে রাজা হন। তিনিই ভুইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

প্রতাপ সিংহ—(১) তিনি মিবারের রাণা উদয় সিংহের পুত্র। উদয় সিংহের পঞ্চবিংশতি তনয় ছিল। চরমকালে শূন্য শাসনদণ্ড লইয়া উদয় সিংহ আপন পুত্রগণের মধ্যে এক বিবাদের বীজ বপন করিয়া গেলেন। চিরন্তন বিধি লঙ্ঘন করিয়া সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র যোগমলকে তিনি উত্তরাধিকারী করিয়া গেলেন। জ্যেষ্ঠ প্রতাপ সিংহ, শনিগুরু সর্দ্দার অখিল রাওএর দৌহিত্র, সুতরাং তাঁহার মাতুল শনিগুরু তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে প্রধানতম সামন্ত চন্দাবৎ শিরোমণি কৃষ্ণের সাহায্যে প্রতাপ সিংহ মিবারের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার রাজধানী, সহায় সম্বল, উপায় অবলম্বন কিছুই নাই। নির্ভীক প্রতাপ তাহাতে কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হইলেন না। উচ্চতম পদ ও বিপুল ধন লাভের আশায় অনেক রাজপুত স্বীয় বংশের মান মর্য্যদা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক দিল্লীর মুসলমান সম্রাট আকবরের বশীভূত হইয়াছিলেন। ক্রূর চরিত্র আকবর নানাপ্রকার প্রলোভনে প্রতাপের অনুগত সামন্ত ও সর্দ্দারদিগকেও হস্তগত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। চিতোরের যাহা কিছু সৌন্দর্য্য, যাহা কিছু শোভা সম্পদ, সকলই আকবরের বিদ্বেষানলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। জননীর পরলোক প্রাপ্তি হইলে, সন্তান যেরূপ শোক চিহ্ন ধারণ করে, সকল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন করে, স্বদেশ প্রেমিক প্রতাপও সেইরূপ জননী জন্মভূমির পরাধীনতা শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া শোক নিদর্শন বহনপূর্ব্বক সকল প্রকার ভোগ সুখ পরিত্যাগ করিলেন। হৈম ও রজত পাত্রের পরিবর্ত্তে বৃক্ষপত্র ভোজন পাত্র হইল, সুখপ্রদ সুকোমল শয্যার পরিবর্ত্তে তৃণগুচ্ছ শয়ন কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। তিনি একাই এই কঠোর ব্রত যাপন করিতে ব্রতী হইলেন না, যতদিন না চিতোরের উদ্ধার হয়, তাঁহার বংশধরদের প্রতিও এই আদেশ প্রদত্ত হইল। মিবারের রণদামামা সৈন্য শ্রেণীর পুরোভাগে সর্ব্বদা গমন করিত, প্রতাপ আদেশ করিলেন যে, চিতোর উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা শোক চিহ্নের ন্যায় পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিতি করিবে। হায়, চিতোরের উদ্ধার আর হইল না, এখনও তাঁহার

সেই আদেশ সম্পূর্ণভাবে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। অন্যান্য আদেশ সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিকভাবে প্রতিপালিত হইতেছে। এখনও তাঁহার বংশধরেরা শ্মশ্রুরাজিতে একবারও ক্ষুর-স্পর্শ করান না। এখনও ভোজন পাত্রের নীচে বৃক্ষপত্র রাখিয়া আহার করেন। সুকোমল শয্যার নীচে তৃণ রাখিয়া শয়ন করেন। প্রতাপ কি ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন? না, তাহা নহে। তিনি জানিতেন অগণিত মুঘল বাহিনীর তুলনায় তাঁহার দ্বাবিংশতি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সমুদ্রে বারি বিন্দুর ন্যায়। সুতরাং সমতল ক্ষেত্রে মুঘলের সম্মুখীন হওয়া কিছুতেই সমীচীন হইবে না। সেই জন্য তিনি সর্দ্দারদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সমতল ক্ষেত্রে হইতে জনপদ অপসারিত করিতে লাগিলেন। তিনি আদেশ করিলেন—"যে কেহ আমার বশ্যতা স্বীকার করিতে সম্মত, সে অচিরে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে পর্ব্বত মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করুক নতুবা সে শত্রু মধ্যে গণ্য হইবে এবং প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।" এই আদেশ প্রচারিত হইবামাত্র দলে দলে প্রজাগণ স্ব স্ব বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক মিবারের নিবিড় পর্ব্বতমালার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। লোকালয় ঘন অরণ্যে পরিণত হইল অট্টালিকা বন্য শ্বাপদের আবাস ভূমি হইল, শস্য-ক্ষেত্রতৃণ গুল্মে পরিপূরিত হইল। এখন দুর্দ্দান্ত মুঘল সৈন্যের সহিত সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইতে হইবে। অর্থ কোথায়? তাঁহার বিশ্বস্ত সর্দ্দারগণ এক উপায় নির্দ্দেশ করিলেন। এই সময়ে ইউরোপের সহিত মুঘলদিগের বিস্তৃত বাণিজ্যের ব্যাপার চলিতেছিল। তজ্জন্য পণ্য দ্রব্যাদি মিবারের মধ্য দিয়া সুরাট প্রভৃতি বন্দরে নীত হইত। সর্দ্দারগণ সুযোগ ক্রমে এই সমস্ত পণ্য দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। সম্রাট আকবর প্রতাপকে দমন করিবার জন্য বিপুল এক সৈন্যদল গঠন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে একটী ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। শোলাপুরের যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া মানসিংহ প্রত্যাবর্ত্তন-কালে কমলমীরে প্রতাপের আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য সমাচার প্রেরণ করিলেন। মানসিংহকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রতাপ সিংহ উদয়সাগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। সেই সরোবরের সমুচ্চ তীরস্থ শিলাময় অঙ্গনে অম্বরপতি মানসিংহের জন্য নানাপ্রকার পান ভোজনের আয়োজন হইল। ক্রমে আহার্য্য সামগ্রী প্রস্তুত ও সজ্জিত হইল। রাজকুমার অমর সিংহের আহ্বানে ভোজন স্থানে উপস্থিত হইয়া মানসিংহ, রাণা প্রতাপের অনুসন্ধান করিলেন। রাজকুমার অমর সিংহ বিনয় নম্র বচনে বলিলেন—"পিতার

শিরঃপীড়া হইয়াছে তজ্জন্য তিনি আসিতে পারিলেন না।" মানসিংহের সন্দেহ আরও বাড়িল। তিনি সবিনয়ে বলিলেন—"রাণাকে বল, আমি তাঁহার শিরঃপীড়ার কারণ বুঝিতে পারিয়াছি। এক্ষণে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, যে ভ্রমে পতিত হইয়াছি, তাহা আর সংশোধন করিবার উপায় নাই, তবু যদি তিনি আমার সহিত ভোজন না করেন, তবে আর কে করিবে? প্রতাপ আরও নানাপ্রকার ছল করিলেন কিন্তু কিছুতেই মানসিংহের সন্দেহের অপনোদন হইল না। তিনি কিছুতেই আহার করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে রাণা বলিয়া পাঠাইলেন যে—"যে রাজপুত তুর্কীর করে আপনার ভগিনীকে অর্পণ করিয়াছেন, যিনি সম্ভবতঃ তুর্কীর সহিত একত্র ভোজন করিয়াছেন, সূর্য্যবংশীয় বাপ্পা রাওএর বংশধর তাঁহার সহিত একত্র আহার করিতে পারিবে না।" মানসিংহ ইহাতে অত্যন্ত অপমানিত মনে করিয়া বলিলেন—"আমি যদি তোমার দর্প চূর্ণ করিতে না পারি, তবে আমার নাম মানসিংহ নহে।" প্রতাপ কহিলেন—"আপনার কথায় সন্তুষ্ট হইলাম, রণক্ষেত্রে আপনাকে দেখিতে পাইলে, পরম আহ্লাদিত হইব।" সেই সময়ে রাণার একজন সর্দ্দার বলিলেন—'দেখিও তোমার ফুপা আকবরকে সঙ্গে করিয়া আনিতে যেন ভুলিও না।' সেই দিন উদয় সাগর তীরে যাহা সংঘটিত হইয়াছিল, সম্রাট আকবর তাহা সমস্ত শুনিলেন। মানসিংহের অপমানকে নিজের অপমান বলিয়া মনে করিলেন। অচিরে যুবরাজ সেলিমের নেতৃত্বে এক বিশাল সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত হইল। মানসিংহও সাগরজির জাতিভ্রষ্ট পুত্র মহব্বৎ খাঁ পরামর্শ দিবার জন্য সঙ্গে চলিলেন। প্রতাপ আরাবল্লির বিস্তৃত কূট পন্থাময় দুষ্প্রবেশ্য প্রদেশ মধ্যে সদলে অতি সতর্কভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই প্রদেশ মধ্যে নবনগর উদয়পুরের পশ্চিমে সংস্থিত। ইহা দৈর্ঘে ৮০ মাইল প্রস্থেও ৮০ মাইল হইবে। ইহা কেবল পর্ব্বত ও কানন মালায় পরিবেষ্টিত মধ্যে মধ্যে অগণ্য ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী বক্রগতিতে প্রবাহিত। উদয়পুর ইহার মধ্যস্থলে অবস্থিত। দুর্গম সংকীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করিয়া তথায় প্রবেশ করিতে হয়। সে সকল পথ এত সঙ্কীর্ণ যে দুইখানা গাড়ী তাহার মধ্য দিয়া যাইতে পারে না। সেই নিবিড় দুর্গম সঙ্কীর্ণ পথে দণ্ডায়মান হইয়া যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই অত্যুচ্চ গিরি প্রাকার ও ঘন দ্রুমরাজি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহারই নাম 'হলদিঘাট'। এই হলদিঘাটের উত্তুঙ্গ গিরি ব্রজের পাদপ্রস্থে ও উচ্চ অধিত্যকা প্রদেশে রাজপুত বীরগণ

সশস্ত্র দণ্ডায়মান হইলেন। ভিলগণ পর্ব্বতরাজির শৃঙ্গদেশে অবস্থান করিতে লাগিল। তাঁহাদের পদতলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা খণ্ড রাশীকৃত। শত্রুকে হয় সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে অথবা প্রকাণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপে সংহার করিবে। এই দুর্গম গিরিপথে রাণা প্রতাপ মিবারের প্রধান প্রধান বীরকুলের সহিত শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দের শ্রাবণ মাসের সপ্তম দিবসে উভয় দলে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বীরবর প্রতাপ সিংহ সবিক্রমে শত্রু সেনা বুহ ভেদ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সামন্ত ও সর্দ্দারগণ মুঘল বাহিনীর উপর অবিরত আক্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রতাপের আশা ফলবতী হইল। মুঘল বাহিনী ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ক্রুদ্ধ প্রতাপ রাজপুত কুল কলঙ্ক মানসিংহকে কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে অসংখ্য শত্রু নিপাত করিতে করিতে সেলিমের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শাণিত অসির আঘাতে সেলিমের শরীর রক্ষীদিগকে ভূতলশায়ী করিয়া সেলিমকে শূল দ্বারা আঘাত করিলেন। সেই শূল স্থুল লৌহ পাত্রে মণ্ডিত হাওদায় প্রতিহত হইল। কিন্তু গজপালকে নিহত করিল। রণমাতঙ্গ তদবস্থায় সেলিমকে লইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। প্রতাপ সেলিমের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। সেলিমকে রক্ষা করিবার জন্য মুঘল সৈন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই ভীষণ যুদ্ধে প্রতাপের জীবনও কয়েকবার সঙ্কট অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। শত্রু সেনা তাঁহার রাজ চিহ্ন দেখিয়া বিশেষভাবে তাঁহাকেই আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহা বুঝিতে পারিয়া ঝালাপতি মান্না উল্লম্ফনপূর্ব্বক রাণা প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইয়া রাজ-ছত্র স্বীয় মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক প্রতাপকে নিরাপদ করিলেন। শত্রু সেনা ঝালা-পতি মান্নাকেই প্রতাপ মনে করিয়া আক্রমণ করিল. মান্না প্রবলবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া স্বীয় প্রভুকে রক্ষা করিতে যাইয়া নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। এই প্রথম দিনের যুদ্ধে প্রতাপের দ্বাবিংশতি সহস্র সৈন্যের মধ্যে মাত্র অষ্ট সহস্র জীবিত ছিল। যুদ্ধাবসানে প্রতাপ একাকী প্রস্থান করিলেন। একজন মুলতানী ও একজন খোরাসানী সৈনিক তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছিল। এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে শক্তসিংহ তাহাদিগকে গুলি করিয়া হত্যা করিলেন এবং প্রতাপকে সম্বোধন করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আবার দুই ভ্রাতার মিলন হইল। শক্তসিংহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপের সঙ্গে বিরোধ করিয়া শত্রু সেলিমের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। আজ ভ্রাতার স্বদেশ প্রীতি

তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার হৃদয়ে অনুতাপের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া আজ তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছে। তাই ভ্রাতার প্রাণ রক্ষার্থ নিজের জীবনকেও বিপন্ন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। প্রতাপ প্রথমে শক্তসিংহকে সন্দেহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার আচরণে পরম প্রীত হইলেন। শক্ত-সিংহ ভ্রাতার পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা চাহিলেন। প্রতাপ আনন্দে ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিয়া, হৃদয়ে ধারণ করিলেন। প্রতাপের চৈতক অশ্বটী স্বীয় প্রভুকে রক্ষা করিয়া, নিরাপদ স্থানে আনিয়া, চির বিদায় গ্রহণ করিল। শক্তসিংহ নিজের অশ্বটী ভ্রাতাকে অর্পণ করিয়া নিহত মুলতানী সৈনিকের অশ্ব গ্রহণ করিলেন এবং ভ্রাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সেলিম শিবিরে উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতাকে বলিয়া আসিলেন, সুযোগ উপস্থিত হইলেই, তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন। সেলিম শক্ত-সিংহকে বিলম্বে আগত দেখিয়া সন্দেহ করিলেন। শক্তসিংহ নির্ভয়ে সকল প্রকাশ করিয়া বলিলেন। উদার হৃদয় সেলিম, তাঁহার সত্যবাদিতায় সন্তুষ্ট হই-লেন; কিন্তু তাঁহাকে রাখা নিরাপদ নহে মনে করিয়া বিদায় দিলেন। শক্তসিংহ প্রতাপের সহিত পুনর্মিলিত হইলেন। বর্ষা সমাগমে কিছুদিন যুদ্ধ স্থগিত ছিল। বর্ষার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আবার রণভেরী বাজিয়া উঠিল। প্রতাপের জন্য যে সমুদয় বীর জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে গোয়ালিয়রের পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত নরপতি রাম শা ও তাঁহার পুত্র খাঁদে রাও অন্যতম ছিলেন। শনিগুরু সর্দ্দার ভনসিংহ মুঘলদের হস্ত হইতে চৌন্দ দুর্গ উদ্ধার করিতে যাইয়া আত্মবিসর্জ্জন দিলেন। এই কঠোর যুদ্ধে মিবারের প্রধান ভট্ট কবি জীবন আহুতি দিলেন। ফরিদ খাঁ চৌন্দ দুর্গ অবরোধ করিয়া নিজেকে নিরাপদ ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতাপ কৌশলে তাঁহাকে এক গিরি সঙ্কটে আবদ্ধ করিয়া সমূলে বিনাশ করিলেন। এইরূপে অবিরাম যুদ্ধে, বর্ষের পর বর্ষ অতিবাহিত হইতে লাগিল, প্রতাপ কিছুতেই মুঘলের অধীনতা স্বীকার করিলেন না। এক এক দিন এমন হইত যে, পাঁচ বার আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াও আহারের অবসর পান নাই। এই সময়ে আত্মরক্ষার চেয়েও পরিবার-বর্গকে রক্ষা করার চিন্তা প্রবল হইল। গিহ্লোটকুলের পরম মিত্র ভিলগণ তাঁহাদিগকে কখনও কখনও বেত্রকরণ্ডে স্থাপন করিয়া বৃক্ষে ঝুলাইয়া রক্ষা করি-তেন। একদিন রাণার স্ত্রী ও পুত্রবধূ রুটি প্রস্তুত করিয়া বালক বালিকাদের হস্তে দিয়াছেন, এমন সময়ে এক বন্য বিড়াল আসিয়া রাজনন্দিনীর হস্তের রুটি লইয়া পলায়ন করিল। বালিকা

রোদন করিয়া উঠিল। রাণার মনে বালিকার ক্রন্দন বড়ই বাজিল। তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। সম্রাট আকবরের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। আকবর এই পত্র পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এই সময়ে বিকানীরের রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পৃথ্বী-রাজ আকবরের নিকট বন্দী ছিলেন। আকবর তাঁহাকে এই চিঠি প্রদর্শন করাইলেন। পৃথ্বীরাজ ইহা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তিনি আকবরের অনুমতি লইয়া নিজ দূত দ্বারা প্রতাপের নিকট একখানা পত্র প্রেরণ করিলেন। সেই পত্রের মর্ম্ম এই—"হিন্দুর সমস্ত আশা ভরসা হিন্দুর উপর নির্ভর করিতেছে। রাজপুত কুলরূপ বিশাল বিপণীতে আকবরই একমাত্র ক্রেতা। একমাত্র উদয়ের পুত্র ভিন্ন তিনি আর সকলকেই ক্রয় করিয়াছেন; কিন্তু প্রতাপ অমূল্য। হামিরের বংশধর এই অবমাননা হইতে আত্ম রক্ষা করিয়াছেন। মানব বিপণীর এই ক্রেতা চিরজীবী নহেন। একদিন তাঁহাকে ইহধাম ত্যাগ করিতে হইবে। তখন আমাদের বংশ গৌরব রক্ষার ভার প্রতাপের করে ন্যস্ত হইবে। যাহাতে ইহা রক্ষা পায়, সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে তাহার জন্য প্রতাপের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।" প্রতাপ পৃথ্বীরাজের এই তেজস্বিনী কবিতা পাঠ করিয়া প্রচণ্ড উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। প্রতাপের মুহ্যমান হৃদয় আবার নবোৎসাহে নব বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিল। প্রতাপকে বিনীত মনে করিয়া মুঘল সেনাপতিগণ আমোদ প্রমোদে রত হইলেন। প্রতাপ তখন আপন সেনা দল লইয়া মুসলমানদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। অনেকে নিপাতিত হইল, অনেকে প্রাণ লইয়া পলাইল; কিন্তু ফল কিছুই হইল না। অগণ্য মুসলমান সৈন্য তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইল না। কিন্তু প্রতাপ দিন দিন সৈন্য ক্ষয়ে একে-বারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। উপায়া-ন্তর না দেখিয়া স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সিন্ধু নদের সৈকতস্থিত সগদি রাজ্যে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার অনুগত সর্দ্দারেরা তাঁহার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। এমন সময়ে তাঁহার পরম বিশ্বস্ত মন্ত্রী ভামশা স্বকীয় ও পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত বিপুল ধনরাশী তাঁহার চরণে আনিয়া উৎসর্গ করিলেন। এই অর্থ দ্বারা পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈনিকের দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। এই বিপুল দানের জন্য ভামশা মিবারের উদ্ধার কর্ত্তা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। প্রতাপ এই বিপুল অর্থ লাভ করিয়া আপন সৈন্য সামন্তদিগকে একত্রিত করিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই শাবাজ খাঁকে সদলে নিপাত করিলেন।

পলায়মান সৈন্যের অনুসরণ করিয়া আমৈত নামক স্থানের মুঘলদিগকে উৎসাদিত করিলেন। কমলমীর আক্রমণ করিয়া তথাকার সেনাপতি আবদুল্লাকে সদলে বিনাশ করিলেন। এইরূপে অল্পকালের মধ্যে বত্রিশটী দুর্গ তিনি অধিকার করিলেন। এই সমস্ত দুর্গের সমুদয় মুসলমানকেই তিনি সংহার করিলেন। চিতোর, আজমীর ও মণ্ডলগড় ভিন্ন সমস্ত মিবার তাঁহার হস্তগত হইল। স্বদেশদ্রোহী অম্বররাজ মানসিংহকে জব্দ করিবার জন্য প্রতাপ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তত্রত্য প্রধান বাণিজ্য নগর মালপুর উৎসাদিত করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই উদয়পুরও তাঁহার হস্তগত হইল, সম্রাট আকবর প্রতাপের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যোগ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু প্রতাপের দুঃখ ও মনোবেদনা দূর হইল কি ? না তাহা হয় নাই, চিতোর উদ্ধার হয় নাই। প্রতাপ পেশলা সরোবরের তীরে কয়েকটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হিন্দুকুল সূর্য্য রাণা প্রতাপ সিংহ তাহাতেই অন্তিম শয্যায় শয়ন করিলেন। পঞ্চবিংশতি বৎসর অবিরত সংগ্রাম করিয়া রাণার নশ্বর দেহ বিলীন হইল, কিন্তু তাঁহার অমর কীর্ত্তি চির উজ্জ্বল হইয়া রহিল। রাণা প্রতাপের সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অমর সিংহ সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন।

প্রতাপ সিংহ—(২) রাজা ভগবান দাসের পুত্র। আকবরের একজন সেনপতি ছিলেন।

প্রতাপ সিংহ—(৩) শ্রীহট্টের অন্তর্গত প্রতাপগড়ে প্রতাপ সিংহ নামে একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন। তিনি ত্রিপুরাপতির সামন্ত নৃপতি ছিলেন।

প্রতাপসিংহ,—(৪) মিবারের রাণা। ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দে তিনি মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অকর্ম্মণ্য ও রাজ্য পরিচালনায় অযোগ্য ছিলেন। তাহার রাজত্বকালে বিশেষ কোন বর্ণনীয় ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। তিনি তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ঐ তিন বৎসর কেবল মহারাষ্ট্রীয় উৎপীড়নে অতীত হইয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যে মার্হাট্টাগণ তিনবার মিবার আক্রমণ করিয়া প্রতাপসিংহের নিকট হইতে পণ ও কর আদায় করিয়াছিল। প্রতাপসিংহ, অম্বরের রাজা জয়সিংহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই মহিষীর গর্ভে তাঁহর জয়সিংহ নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে জয়সিংহ মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

প্রতাপসিংহ—(৫)উত্তররাঢ়ে অবস্থিত ঢেক্করীয় নামক নগরের রাজা। তিনি তিনি গৌড়াধিপতি রামপালের সামন্ত নরপতি ছিলেন। রামপালের বারেন্দ্র

অভিযানে প্রতাপসিংহ প্রভৃতি বহু সামন্ত নরপতি তাঁহার অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

প্রতাপ সিংহ—(৬) তিনি একজন চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত। তাঁহার গ্রন্থের নাম 'অমৃত সাগর'।

প্রতাপ সিংহ—(৭) তিনি অম্বরের *অধিপতি মান সিংহের অন্যতম পুত্র।* রাজা মান সিংহ, দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহের সময়ে ১৫৮৭—১৬০৬ খ্রীঃ অব্দে পর্য্যন্ত বাংলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মধ্যে কিছু দিনের জন্য সম্রাট মান সিংহকে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে প্রেরণ করেন। এই সময়ে রাজা মান সিংহের অন্যতম পুত্র প্রতাপ সিংহ ও মোহন সিংহ তাঁহার প্রতিনিধি রূপে কিছুদিন বাঙ্গালা দেশ শাসন করিয়াছিলেন।

প্রতাপ সিংহ—(৮) তিনি পঞ্জাব প্রদেশের অম্বালা জিলার অন্তর্গত মিয়াপুরের সর্দ্দার। এই উপাধি তাঁহাদের বংশ গত। তিনি ইং ১৮৪৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি লালা যশোবন্ত সিংহের বংশধর। যশোবন্ত সিহের পৌত্র গুরুদিত সিংহ ১৮শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে যুদ্ধ করিয়া এই রাজ্য অধিকার করেন। ১৭৯১ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র দল সিংহ রাজ্যাধিকারী হন। দলসিংহের পরে তাঁগার পুত্র ধেয়ান সিংহ রাজা হন। এই ধেয়ান সিংহেরই পুত্র প্রতাপ সিংহ। তিনি ১৮৪৫—৪৬ সালের শিখ যুদ্ধে ও ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়া বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে, তাঁহার পুত্র সর্দ্দার শমসের সিংহ *রাজ্যাধিকারী হইয়াছেন।*

প্রতাপ সিংহ—(৯)আসামের অন্তর্গত জয়ন্তীয়ার রাজা বাণসিংহ ১৬৬৯ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, প্রতাপ সিংহ রাজা হইয়া ১৬৭৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে লক্ষ্মীনারায়ণ রাজা হইয়া ১৬৯৪খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

প্রতাপসিংহ—(১০)আসামের আহমবংশীয় একজন রাজা। তিনি ইতিহাসে চুচেংফা স্বর্গদেব এবং বুদ্ধি স্বর্গনারায়ণ নামেও পরিচিত। খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে তিনি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার শাসনকালে রাজ্যের নানাবিধ উন্নতি সাধিত হয়। ঐ সময় হইতেই বিশেষভাবে আসামে আর্য্যধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার হইতে থাকে। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী শেমাই তামুলি বড়বরুয়া অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সাহায্যেই প্রতাপ সিংহ রাজ্যের আভ্যন্তরিক অনেক বিষয়ের উন্নতি করেন।

প্রতাপসিংহ—(১১)আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্বের শেষভাগে পাটিখালি

ও কাম্পিলা অঞ্চলে (বর্ত্তমান ফররুকাবাদও ইটা জিলা) তিনি একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। সুলতান বহলুল লোদীর রাজত্বের সময়ে তাঁহার রাজ্য কিঞ্চিৎ বিস্তৃতি লাভ করে। তিনি বহলুলের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া নিজ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখেন।

প্রতাপসিংহ—(১২) তিনি বর্ত্তমান নেপালরাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা পৃথ্বীনারায়ণসিংহের পুত্র। ১৭৭১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে তিনি রাজা হইয়াছিলেন। চারি বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া, ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে রাণা বাহাদুর নামে একটী শিশু পুত্র রাখিয়া, তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার মহিষী রাজেন্দ্রলক্ষ্মী অতি দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। পৃথ্বীনারায়ণ সিংহ দেখ।

প্রতাপসিংহ, ছত্রপতি রাজা—তিনি র পৌত্র রাজা রামের পুত্র। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দের শেষ মহারাষ্ট্র যুদ্ধের পর ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সেতারার সিংহাসনে স্থাপন করেন। ১৭৯১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়, সুতরাং রাজ্য পাওয়ার সময়ে তাঁহার বয়স ২৭ বৎসর ছিল। কাপ্তান ডাফ সেতারা রাজ্যে ব্রিটিশ পক্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজ্য শাসনের সহায়তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্য্যন্ত শাসনে সুনিয়ম রক্ষা করিতে পারেন নাই। ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে সিংহাসন প্রদান করেন। প্রতাপসিংহ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া কাশীবাসী হইলেন।

প্রতাপসিংহ দত্ত—একজন বাঙ্গালী বীরপুরুষ। তিনি বাঙ্গালার স্বাধীন হিন্দু নরপতি প্রতাপাদিত্যের প্রধান সেনাপতিগণের অন্যতম ছিলেন।

প্রতাপ সিংহ দেব—তিনি একজন চিকিৎসা শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম প্রতাপকল্পদ্রুম।

প্রতাপসিংহ মহারাও রাজা—তিনি আলোয়ার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। বর্ত্তমান জয়পুর রাজবংশের তাঁহারা কচ্ছাবহ শাখাভুক্ত। তিনি প্রথমে মাত্র পৈত্রিক আড়াইখানা গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে জিতেরা দুর্ব্বল হইয়াছিল এবং জয়পুর রাজ্যও গৃহবিবাদে লিপ্ত ছিল। এই সুযোগে ধীরে ধীরে তিনি স্বীয় রাজ্য সীমা বাড়াইতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে অতি সহজে মেওয়াত অধিকার করিলেন। পরে আলোয়ার অধিকার করিলেন। এই সময়ে মোঘল সেনাপতি মির্জা নজফ খাঁ প্রতাপসিংহকে জয়পুরের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত করিয়া ব্যর্থকাম হন। রাজপুতদের শক্তি বৃদ্ধিতে মুঘলেরা ভীত হইয়াছিলেন। এদিকে জয়পুর ও অন্য দুই একটী রাজপুত রাজাও প্রতাপসিংহের প্রতি

সন্তুষ্ট ছিলেন না। মির্জা নজফ খাঁ এই এই সুযোগে রাজপুতদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বাঁধাইতে সচেষ্ট ছিলেন। প্রতাপ সিংহ এই ফাঁদে পা দিলেন না। ধীরে ধীরে তিনি শক্তি সঞ্চয় করিয়া ১৭৭৩ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট হইতে মহারাও রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পোষ্যপুত্র ভক্তবর সিংহ রাজা হইয়াছিলেন। ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে মহারাট্টদের সাহিত ইংরাজের যুদ্ধে, তিনি ইংরেজ পক্ষ অবলম্বন করেন। ভক্তবরের পরে তাঁহার ভগিনীপুত্র বনীসিংহ রাজা হইয়াছিলেন। বনীসিংহ ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র শিববদন সিংহ ১৩ বৎসর বয়সে রাজা হইয়াছিলেন। ১৮৭৪ সালে শিববদন অপুত্রক পরলোক গমন করিলে, আলোয়ার রাজপদে সেই বংশের মঙ্গল সিংহ প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি ১৮৯২ সালে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার দশ বৎসর বয়স্ক পুত্র জয়সিংহ রাজা হইয়াছেন।

প্রতাপাদিত্য—দেশ প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী স্বাধীন নৃপতি। তিনি বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ছিলেন। এই দ্বাদশ ভৌমিকের নাম এইরূপ—(১) যশোহর—প্রতাপাদিত্য। (২) চন্দ্রদ্বীপ—কন্দর্পনারায়ণ, প্রতাপের বৈবাহিক। (৩) শ্রীপুর (বর্ত্তমান বিক্রমপুর)—চাঁদ রায় ও কেদার রায়। (৪) ভাওয়াল—ফজলগাজি। (৫) ভূষণা—মুকুন্দরাম রায়। (৬) খিজিরপুর—ঈশাখা মসনদ্ আলা। (৭) ভুলুয়া লক্ষ্মণ মাণিক্য। (৮) বিষ্ণুপুর—হাম্বীরমল্ল। (৯) তাহের-পুর—কংসনারায়ণ। (১০) দিনাজপুর—গণেশ রায়। (১১) পুটিয়া ও (১২) পাবনা এই দুই স্থানের ভৌমিকদের সঠিক নাম অজ্ঞাত।

প্রতাপাদিত্যের পিতার নাম শ্রীহরি। তাঁহারা কায়স্থ প্রধান বিরাট গুহের বংশধর। ঐ বংশীয় ভবানন্দের পুত্র শ্রীহরি এবং ভবানন্দের অনুজ গুণা-নন্দের পুত্র জানকীবল্লভ। শ্রীহরি পাঠানরাজ দায়ুদের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ইতিহাসে বিক্রমাদিত্য ও জানকী-বল্লভ বসন্ত রায় নামেই সমধিক প্রাসদ্ধ। (বিস্তৃত বিবরণ তৎতৎ নামে দ্রষ্টব্য)।

প্রতাপ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন শ্রীহরি বা বিক্রমাদিত্য মুঘল-পাঠানের বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া মধ্যবঙ্গে সুন্দরবনের সন্নিকট-বর্ত্তী স্থানে বসতি স্থাপন করিয়া বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। তৎপূর্ব্বেই শ্রীহরি যখন গোড়ে অবস্থান করিতে-ছিলেন তখন প্রতাপ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি শৈশব হইতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অকুতো-ভয়তা প্রভৃাত নানা বীরোচিত গুণের পরিচয় প্রদান করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মৃগয়া, মল্লক্রীড়া প্রভৃতি পুরুষোচিত

কার্য্যে বিশেষ উৎসাহী এবং পারদর্শী হন। নানাবিধ অস্ত্র চালনায় তিনি অতিশয় সুদক্ষ ছিলেন। তিনি যে উত্তরকালে একজন ক্ষমতাশালী পুরুষ হইবেন, তাহার পরিচয় বাল্যকাল হইতেই পাওয়া গিয়াছিল।

গৌড়ে অবস্থান করিবার সময়েই তিনি কিছু ফারসী ও আরবী শিক্ষা করেন। যশোহরে আসিবার পর তিনি সংস্কৃত ভাষাতেও কিছু অধিকার লাভ করেন। বঙ্গজ কায়স্থবংশীয় জিতামিত্র নাগের কন্যার সহিত তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। পরে গোপাল ঘোষ নামক এক ব্যক্তির কন্যাকেও তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। এই দুই পত্নীর গর্ভে তাঁহার অনেকগুলি পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

বয়োবৃদ্ধির সহিত শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তিনি কিয়ৎ-পরিমাণে উদ্ধত প্রকৃতি হইয়া উঠেন। শ্রীহরি তাঁহার চালচলনে শঙ্কিত হইয়া পড়েন। শ্রীহরির সহিত জানকীবল্লভের (বসন্ত রায়ের) বিশেষ সৌভ্রাত্র ছিল। পাছে প্রতাপের কোন ব্যবহারে বসন্ত রায় অসন্তুষ্ট হন, এই আশঙ্কায় শ্রীহরি কিছুদিন পুত্রকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন এবং সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহাকে আগ্রাতে প্রেরণ করিলেন। ইহাতে প্রতাপ সন্দেহ করেন যে পিতৃব্য বসন্ত রায়ই, শ্রীহরির মৃত্যুর পর রাজসিংহাসন অধিকার করিবার দুরভিসন্ধিতে তাঁহাকে আগ্রাতে প্রেরণ করিতে পরামর্শ দেন। এই সন্দেহের ফলে বসন্ত রায়ের বিরুদ্ধে তাঁহার বিশেষ আক্রোশ উপস্থিত হয় এবং এইরূপ মনোভাব পরে অতি বিষময় ফল প্রসব করে।

আগ্রাতে তিনি মুঘল দরবারে বিশেষ সমাদরের সহিতই গৃহীত হন এবং বংশগৌরবে অচিরেই সম্ভ্রান্ত সমাজে পদোচিত মর্য্যাদা লাভ করেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি যশোহর রাজ্যের অধিপতির সনন্দ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি কিরূপে এবং কি কারণে ঐ সনন্দ লাভ করেন, তদ্বিষয়ে প্রতাপাদিত্যের জীবনী লেখক রামরাম বসু যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কোন কোনও ঐতিহাসিক তাহা অযৌক্তিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রামরাম বসু বলেন যে যশোহর হইতে মুঘল সরকারের নিকট যে রাজস্ব প্রেরিত হইত, প্রতাপ তাহা যথাস্থানে প্রদান না করিয়া নিজের নিকট গচ্ছিত রাখেন। কিছুকাল পরে রাজস্ব অনাদায়ের কারণ অনুসন্ধান করা হইলে, প্রতাপ রাজস্ব প্রেরিত না হইবার সমুদয় দায়ীত্ব পিতৃব্য বসন্ত রায়ের উপর আরোপ করেন। ইহাতে বিক্রমাদিত্যকে রাজ্যচ্যুত করিবার আদেশ প্রদত্ত হইলে, প্রতাপ নিজে সমুদয় অপ্রদত্ত রাজস্ব প্রদান করিয়া

যশোহর রাজ্যের সনন্দ নিজ নামে লিখাইয়া লন। অতঃপর সনন্দ লাভ করিয়া তিনি যথোচিত আড়ম্বরের সহিত যশোহরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পিতার জীবিতকালে যদিও তিনি স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা মনে রাখিয়া নানাভাবে নিজের প্রাধান্য ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে থাকেন। পিতৃব্যের প্রতি পূর্ব্ব-সঞ্জাত বিদ্বেষ পুনরায় উদ্ভূত হইল এবং তাঁহার ক্ষমতাও যাহাতে অযথা বৃদ্ধি না পাইতে পারে, তদ্বিষয়েও তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন।

বসন্ত রায়ের প্রতি প্রতাপের মনোভাবের বিষয় শ্রীহরির অজ্ঞাত ছিল না। ভবিষ্যতে তাঁহার অবর্ত্তমানে, যাহাতে কোনও গুরুতর বিপদ উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য তিনি ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিয়া রাজ্যকে দুইভাগে বিভক্ত করেন এবং কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধাংশ প্রতাপকে অবশিষ্টাংশ ভ্রাতাকে প্রদান করিতে মনস্থ করেন। পুত্র ও ভ্রাতা উভয়েই এই ব্যবস্থায় সম্মত হন। মূল রাজ্যের পশ্চিমাংশ বসন্ত রায়ের অধিকারে আসিল এবং প্রতাপ প্রধানতঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অংশের অধিপতি স্বীকৃত হইলেন।

কিছুকাল পরে, অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ভাবে চলিবার সুবিধা হইবে মনে করিয়া তিনি যশোহরের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে ধূমঘাট নামক স্থানে এক নগরীর পত্তন করেন এবং তথায় নিজ বাসোপযোগী ভবনাদি নির্ম্মাণ করাইতে থাকেন। কিছুকাল পরে শ্রীহরির মৃত্যু হইলে তিনি ধূমঘাটেই নিজের অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করাইয়া, স্বাধীন নৃপতির ন্যায় চলিতে আরম্ভ করিলেন।

দিল্লীর বাদশাহের (সম্রাট আকবর) সনন্দাধিকারে তিনি যশোর রাজ্য লাভ করেন বটে, কিন্তু প্রথমাবধি মুঘলের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। সেই সময়ে বাঙ্গালাতে মুঘলের প্রতিপত্তি বিশেষ হ্রাস পাইয়াছিল। পাঠান সর্দ্দার দায়ুদ খাঁ ও তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ নানা স্থানে বিদ্রোহী হইয়া মুঘল সম্রাটের প্রভুত্ব অস্বীকার করিতে থাকেন। সেই সুযোগে বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকেরাও নিজ নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। সুতরাং প্রতাপও যে নিশ্চেষ্ট থাকিবেন তাহা সম্ভব নয়। তিনিও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার জন্য যথাসাধ্য বল সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

দায়ুদের পতনের পর তাঁহার অনুবর্ত্তী কতলু খাঁর সহিত মুঘলদের বিরোধ চলিতে থাকে। কতলু উড়িষ্যার অধিকাংশ এবং মেদিনাপুর ও বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত নিজ অধিকার বিস্তার করেন। কতলু খাঁকে সাহায্য করিবার জন্য প্রতাপ উড়িষ্যায় গমন করেন এবং কিছু-

কাল পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজেকে স্বাধীন ভূপতি (ভূঁইয়া) বলিয়া প্রচার করিলেন। বাঙ্গালার মুঘল সেনাপতি আজম খাঁ সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দমন করিবার জন্য প্রথমে ইব্রাহিম খাঁ নামে একজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। কিন্তু ইব্রাহিম প্রতাপের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হওয়ায়, আজম খাঁ স্বয়ং বৃহত্তর সৈন্য-দল লইয়া প্রতাপের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তখন পর্য্যন্তও প্রতাপ যথেষ্ট বল সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ফলে তিনি পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন। আজম খাঁর সঙ্গে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থবংশোদ্ভব ভবেশ্বর রায় নামক একজন সেনাপতি ছিলেন। আজম খাঁ প্রতাপকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ ভবেশ্বর রায়কে প্রদান করেন। এই ভবেশ্বর রায়ই চাঁচড়া (যশোহর) রাজবংশের আদিপুরুষ।

আজম খাঁর হাতে নিগৃহীত হইয়া প্রতাপ দীর্ঘকাল আর স্বাধীনভাবে চলিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি ধীরে ধীরে শুধু নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টাই করিতে থাকেন। তিনি রাজ্যের নানা-স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় সৈন্য সংস্থান করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরীপুর, মুকুন্দপুর, মৌতালা, গড় প্রতাপনগর গড় কমলপুর, বড়িষা বেহালা, জগদ্দল প্রভৃতি স্থানে প্রতাপের নির্ম্মিত দুর্গের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। রাজধানীর সন্নিকটেও তিনি সৈন্যাবাস স্থাপন করিয়া পর্ত্তুগীজ সেনাপতিদিগের দ্বারা তাহা-দিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে লাগি-লেন। স্থানে স্থানে আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন করিলেন। অদ্যাপি সেই সকল স্থান দমদমা ও লোহাগড়ার মাঠ নামে তাহাদের পূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিতেছেন। এই ভাবে স্থল যুদ্ধের উপযোগী নানারূপ আয়োজন করিয়া তিনি নৌ-যুদ্ধেরও যথাযোগ্য আয়োজন করিতে থাকেন। স্থানে স্থানে পোত নির্ম্মাণ, সংস্কার ও রক্ষার ব্যবস্থা হইল। জল যুদ্ধের উপযোগী শিক্ষাও সৈন্যগণকে দেওয়া হইল। এইভাবে নানাপ্রকারে প্রতাপ শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ক্ষিতীশ বংশাবলী-চরিত, জয়পুর বংশা-বলী, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার বিপুল সৈন্য বাহিনীর উল্লেখ করা হই-য়াছে। এইভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রতাপ পুনরায় স্বাধীন ভূপতির ন্যায় চলিবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু বসন্ত রায় এ বিষয়ে তাঁহার সহিত এক মত ছিলেন না। প্রতাপও তাহা অজ্ঞাত ছিলেন না। এই জন্য তিনি বসন্ত রায়ের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। পিতৃব্যের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিবার অন্য কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এ সকল ভিন্ন প্রতাপ বসন্ত রায়ের নিকট চাকসিরি পরগণার অধিকার প্রার্থনা করিয়া

বিফল হওয়ায়, তাঁহার বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পায়। চাকসিরি পরগণাটি প্রতাপের নৌ-বাহিনী রক্ষার বিশেষ উপযোগী ছিল। উহা রাজ্য বিভাগের সময়ে বসন্ত রায়ের অংশে পড়ে। প্রতাপ নিজ আবশ্যকের জন্য উহা চাহিয়া বিফল মনোরথ হন। এই সমুদয় কারণে তিনি পিতৃব্যকে নিজ অভীষ্ট সম্পাদনের বিঘ্ন স্বরূপ মনে করিতেন এবং তাঁহাকে বধ করিতে না পারিলে নিজ মনোরথ পূর্ণ হইবে না মনে করিয়া, অতি কাপুরুষের ন্যায়, বসন্ত রায়ের পিতৃ-সাম্বৎসরিক দিবসে নিরস্ত্র পিতৃব্যকে স্বহস্তে সংহার করেন। তৎপরে বসন্ত রায়ের কতিপয় পুত্রও প্রতাপের হস্তে নিহত হন। কেবল রাঘব রায় (যিনি পরে কচু রায় নামে পরিচিত হন) কোনও ক্রমে প্রাণ রক্ষা করেন।

এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গালার অন্যত্র পাঠান ও মুঘলের একাধিক সংঘর্ষ হয় এবং বাঙ্গালার রাজনীতির ইতিহাস দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। সেই সকল ঘটনার সহিত প্রতাপের সাক্ষাৎ কোনও সম্বন্ধ ছিল না। আজম খাঁর পরে মানসিংহ বাঙ্গালার সুবাদার হইয়া আগমন করেন তখনও প্রতাপ নিজেকে মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হইবার যোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। মানসিংহের শাসনকালে তিনি নীরবেই অবস্থান করিয়াছিলেন। মানসিংহ উড়িষ্যা হইতে পাঠান সর্দ্দারগণকে বিতাড়িত করিয়া, তাঁহাদের অনেককে প্রতাপের রাজ্য সীমার মধ্যেই সরকার খলিফাবাদে জায়গীর প্রদান করিলেও তিনি প্রতিবাদ করেন নাই। বস্তুতঃ মানসিংহ যতদিন বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন ততদিন তিনি বাদশাহের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। ১৬০৪ খ্রীঃ অব্দে মানসিংহ আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জাফরবেগ আসফ খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার হইয়া আগমন করেন। তখনই প্রতাপ স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার এক উৎকৃষ্ট সুযোগ লাভ করিলেন। আসফ খাঁ প্রধানতঃ বিহারেই অবস্থান করিতেন। কাজেই নিম্ন বঙ্গের শাসন ব্যাপারে তিনি তাদৃশ মনোযোগ দিতে পারিতেন না। তদ্ভিন্ন আফগান সর্দ্দারেরাও উপদ্রব করিতে একেবারে নিরস্ত হন নাই। আগ্রাতেও ঐ সময়ে আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। এই সকল উপদ্রবের সহিত প্রতাপের বিদ্রোহ মিলিত হইয়া এক ঘোরতর অশান্তির সৃষ্টি হইল।

মুঘল সেনাপতি মানসিংহের হস্তেই প্রতাপ পরাজিত হইয়া রাজ্যচ্যুত হন, এইরূপ একটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব বহুদিন হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। সেই বিবরণী মতে আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর সম্রাট হইলে সেনাপতি মান-

সিংহ পুনরায় প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য বাঙ্গালায় প্রেরিত হন। মানসিংহের সহিত বাইশজন আমির ও প্রতাপের খুল্লতাত ভ্রাতা কচুরায়ও ছিলেন। মানসিংহ প্রথমে রাজমহলে উপনীত হন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে যশোর রাজ্যের সীমান্তে উপস্থিত হন। (মানসিংহ ও ভবানন্দ মজুমদার দ্রষ্টব্য)। প্রতাপও সংবাদ পাইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন। ক্রমে মানসিংহ পরিচালিত মুঘল বাহিনীর সহিত যশোহরপতির সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই যুদ্ধে উভয়-পক্ষেরই সেনাপতিগণ অসীম বীরত্ব প্রকাশ করেন। কিন্তু বিপুল বিক্রম মুঘল বাহিনীর নিকট বাঙ্গালী সৈন্যকে শেষে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। প্রতাপ পরাজিত ও বন্দী হন। মানসিংহ তাঁহাকে লৌহ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া আগ্রায় লইয়া যাইবার জন্য যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বারাণসীধামে পীড়িত হইয়া প্রতাপের দেহাবসান হয়। কিন্তু মনীষি যদুনাথ সরকার একখানি ফারসী পুঁথির সাহায্যে মানসিংহের হস্তে প্রতাপের পরাজয়ের উপরোক্ত বিবরণ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। যদুনাথের মতে মানসিংহ আকবরের রাজত্ব কালে(১৫৮৯ খ্রীঃ অব্দে) বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত হন এবং আকবর শাহের মৃত্যু পর্য্যন্ত (১৬০৫ খ্রীঃ) ঐ পদে নিযুক্ত থাকেন। জাহাঙ্গীর সম্রাট হইয়াও কিছুদিন মানসিংহকে ঐপদে নিযুক্ত রাখেন। কন্তু ১৬০৬ খ্রীঃ অব্দের মধ্যভাগে মান সিংহের পরিবর্ত্তে কুতবুদ্দিন খাঁ সুবাদার নিযুক্ত হন। সুতরাং মানসিংহের হস্তে প্রতাপের পরাজয় হইলে তাহা ঐ সময়ের মধ্যেই হইত। কিন্তু ১৬০৯ খ্রীঃ অব্দেও যে প্রতাপ জীবিত ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ সময়ে বাঙ্গালার নূতন সুবাদার ইসলাম খাঁর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। প্রথমে প্রতাপের কনিষ্ঠ পুত্র সংগ্রাম-আদিত্য রাজমহলে যাইয়া সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করেন (১৬০৮ খ্রীঃ)। পরবর্ত্তী বৎসরের প্রথমভাগে (এপ্রিল মাসে), বর্ত্তমান নাটোর সহরের সন্নিকটস্থ এক স্থানে ইসলাম খাঁর সহিত প্রতাপের সাক্ষাৎ হয়। সুবাদার যশোহর-পতিকে যথাযোগ্য সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করেন এবং আলোচনান্তে স্থির হয় যে সুবাদার যখন পরবর্ত্তী কোনও সময়ে নিম্নবঙ্গের জমীদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন, তখন প্রতাপ ইসলাম খাঁকে যথোপযুক্ত সাহায্য করিবেন।

কিন্তু যথাকালে প্রতাপ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ইসলাম খাঁ, ইনায়েৎ খাঁ নামক সেনাপতিকে যশোহর-পতির বিরুদ্ধে অভিযান করিতে আদেশ দেন। প্রথমে সালকা নামক স্থানে প্রতাপের জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্যের সহিত মুঘল সেনাপতির

যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ঐ যুদ্ধে পাঠান সর্দ্দার কৎলু খাঁর পুত্র জমাল খাঁ উদয়াদিত্যের সাহায্য করেন। কিন্তু উদয় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। তাহার কিছুকাল পরে মুঘল বাহিনী যশোর রাজধানীর সমীপে উপস্থিত হইল। সৈয়দ হাকিম নামক একজন সেনাপতি বাকলা-অধিপতি রামচন্দ্রকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন এবং রামচন্দ্রকে ঢাকাতে বন্দী করিয়া রাখিবার জন্য প্রেরণ করিয়া দক্ষিণদিক হইতে যশোর রাজ্য আক্রমণ করেন। এইবার দুইদিক হইতে যশোর রাজ্য আক্রান্ত হইল। প্রতাপ যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়াও শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন। কাগরঘাটা নামক স্থানে তিনি মুঘল সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। ইনাএৎ খাঁ প্রতাপকে লইয়া ঢাকায় উপস্থিত হইলেন। তথায় ইসলাম খাঁ প্রতাপকে বন্দী করিয়া যশোর রাজ্য মুঘল অধিকার ভুক্ত করিলেন। ইনায়েৎ খাঁ উহার প্রথম প্রথম শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। ইহার পর, খুব সম্ভব বন্দী অবস্থায় আগ্রা প্রেরিত হইবার সময়েই পথে কাশীতে প্রতাপের মৃত্যু হয়।

প্রতাপের চরিত্রে কতকগুলি পরস্পর বিরোধী গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে তিনি যেমন নির্ভিক, স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন, অপরদিকে নিজ অভীষ্ট সাধনে তিনি কাপুরুষোচিত কার্য্য সম্পাদনেও পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি উদার প্রকৃতি ছিলেন। মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণ তাঁহার অধিকারের মধ্যে স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রচার করিবার স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। নিজে স্বধর্ম্ম পরায়ণ হিন্দু ছিলেন এবং রাজ্য মধ্যে হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকলাপাদি সম্পাদনে বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার চরিত্র ইন্দ্রিয়দোষ শূন্য ছিল এবং পরোপকারে তিনি সর্ব্বদাই উৎসাহী ছিলেন।

প্রতাপের রাজত্বকালে পর্ত্তুগীজ জেসুইট পাদ্রীগণ নিম্ন বঙ্গের নানাস্থানে ধর্ম্ম প্রচারার্থ আগমন করেন। তাঁহাদের বিবরণীতে প্রতাপকে চ্যাণ্ডিকান অধিপতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ সকল বিবরণী হইতে জানা যায় যে প্রতাপের আমন্ত্রণে দুইজন পর্ত্তুগীজ পাদ্রী তাঁহার রাজধানীতে উপস্থিত হন এবং রাজার নিকট হইতে যশোর রাজ্যে ধর্ম্ম প্রচার ও গির্জ্জা নির্ম্মাণের অধিকার লাভ করেন। চ্যাণ্ডিকান পাদ্রীরা যে গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন তাহাই বাঙ্গালা দেশের প্রথম খ্রীষ্টান ভজনালয় (১৫৯৯ খ্রীঃ)। সমসাময়িক অন্যান্য ঐতিহাসিক বিবরণীতে চ্যাণ্ডিকানের উল্লেখ না থাকিলেও উহা যে প্রতাপেরই রাজ্যভুক্ত ছিল তাহা অন্যান্য পারিপার্শ্বিক

বিবরণীর দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। এই চ্যাণ্ডিকান, ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের মতে বর্ত্তমান সাগর দ্বীপেরই নামান্তর। খুব সম্ভব পর্ত্তুগীজরাই উহাকে ঐ নামে অভিহিত করিতেন (যেমন তাঁহারা গঙ্গাকে চ্যাবেরিস বলিতেন)। বিখ্যাত পর্ত্তুগীজ সেনাপতি (অনেকের মতে জলদস্যু) কার্ভালো প্রতাপের আদেশেই তাঁহার রাজধানীতে নিহত হন। (কার্ভালো দেখ, অনেকের মতে ইহা অমূলক)। বাকলার অধিপতি, বারভূঁইয়ার অন্যতম কন্দর্প রায়ের পুত্র রামচন্দ্র প্রতাপের কন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করেন। এইরূপ কথিত হয় যে, প্রতাপ বাকলা রাজ্য অধিকার করিবার মানসে বিবাহ রাত্রেই জামাতা রামচন্দ্রকে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। বিন্দুমতীর কৌশলেই রামচন্দ্র পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন।

কতলু খাঁর সাহায্যার্থ উড়িষ্যায় গমন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে প্রতাপ পুরীধাম হইতে গোবিন্দ দেব বিগ্রহ ও উৎকলেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আনয়ন করেন। উৎকলেশ্বরকে বসন্ত রায় বেদকাশী নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং গোবিন্দ দেবের মন্দির গোপালপুর নামক স্থানে, এতদ্ভিন্ন যশোহরের সন্নিকটেই ঈশ্বরীপুরে প্রতাপের ইষ্টদেবতা দেবী যশোহরেশ্বরীর মন্দির নির্ম্মিত হয়। প্রতাপকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মানসিংহ যশোহরেশ্বরীকে জয়পুরে লইয়া যান বলিয়া একটি মত বহুদিন যাবৎ প্রচলিত রহিয়াছে। উহা এক্ষণে অনেকে অমূলক বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ধুমঘাটে রাজধানী স্থাপন করিয়া প্রতাপ যশোহরেশ্বরী দেবীর মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। খ্যাতনামা বাঙ্গালী পণ্ডিত অবিলম্ব সরস্বতী প্রতাপের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তদ্ভিন্ন আরও অনেক পণ্ডিত ও পদকর্ত্তা তাঁহার রাজসভার গৌরববর্দ্ধন করিতেন।

প্রতাপাদিত্য—কাশ্মীরের একজন রাজা। তিনি উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্যের জ্ঞাতি ছিলেন। কাশ্মীরের অধিপতি যুধিষ্ঠির অতিশয় অত্যাচারী হইলে, মন্ত্রীরা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া প্রতাপাদিত্যকে সিংহাসন প্রদান করেন। তিনি বত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র জলৌকা কাশ্মীর সিংহাসনে আরোহন করেন।

প্রতিনিধি তেওয়ারী—ইহার জন্মস্থান গোরখপুর জিলা। প্রতিনিধি ও তাঁহার ভ্রাতা কনকনিধি উভয়ে নেপালের তথ্য সংগ্রাহক ডাঃ ফ্রেন্সিস বুকানন হেমিলটন (Francis Buchanan Hamilton) সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই তথ্য সংগ্রহ

কার্য্যে আর একজনও লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার নাম রামজয় ভট্টাচার্য্য। তাঁহাদের সাহায্যে ডাঃ হেমিলটন নেপাল বিবরণ নামক গ্রন্থ (Accounts of *Nepal*) প্রণয়ন করেন। তিনি ১৮০২—৩ সালে কাটমুণ্ডুর নিকটে দূতস্বরূপ গিয়াছিলেন। সেই সময়ে এই তথ্য সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থ নেপালের সহিত যুদ্ধের সময়ে ইংরেজদের বিশেষ দরকারে লাগিয়াছিল।

প্রতিভা চৌধুরী—একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী মহিলা সঙ্গীতজ্ঞা। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী ও হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ছিলেন। তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তদ্ভিন্ন কয়েকটি ভাষাও জানিতেন এবং সাধারণতঃ লোকে যাহা শিক্ষা করিয়া থাকে, সেই সব গৃহ কর্ম্মেও তিনি সুশিক্ষিতা ছিলেন। সঙ্গীত শিক্ষা দিবার জন্য তিনি 'সঙ্গীত-সঙ্ঘ' স্থাপন করিয়াছিলেন। সঙ্গীত বিষয়ে যাহাতে ছাত্র ছাত্রীরা সুশিক্ষা লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য তিনি যত্নবতী ছিলেন এবং অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা' নামক সঙ্গীত বিষয়ক একখানি বাঙ্গালা পত্রের সম্পাদিকা ছিলেন। ১২২৮ বঙ্গাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ছিলেন।

প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্যার—পঞ্জাব প্রবাসী একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা নগরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। জেনারেল এসেম্ব্লী (General Assembly বর্ত্তমান স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ) স্কুলে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে এম্-এ এবং ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে তিনি বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা হাইকোর্টে উকীল তালিকায় নাম ভুক্ত করাইয়া তিনি লাহোরে ব্যবহারজীবের কার্য্য করিতে গমন করেন। স্বীয় প্রতিভা বলে অচিরেই তিনি তথায় বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন এবং ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি তথাকার প্রধান আদালতের (Chief Court) বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন। অতপর তিনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া প্রথমে আইন বিভাগের (Faculty) সম্পাদক (Secretary) ও পরে সভাপতি (Dean) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম প্রণয়নে তিনি তদানীন্তন ভাইস চান্সেলর স্যার উইলিয়ম রটিস্থানকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের জন্য সরকার হইতে তিনি রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। ১৯০৩ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর অভিষেকোৎসব কালে "সি-

আই ই" (C.I.E.) উপাধি ভূষিত হন। ১৯০৪ খ্রীঃ তিনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-সর্ব্বাধিকারী (Vice Chancellor) পদ লাভ করেন এবং ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ঐ সময় পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এল, এল, ডি (L. L. D.) উপাধি প্রদান করেন। তিনি তথাকার সাধারণ পাঠাগারের (Public Library) সভাপতি ও ভিক্টোরিয়া ডায়মণ্ড জুবিলি হিন্দু টেক্‌নিকেল ইনষ্টিটিউটের পরিচালক সভার সভাপতি ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা নানা দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল। তিনি লাহোরে ফ্রী-মেসন (Free Mason) সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন এবং ঐ সমিতির সকল প্রকার সম্মানজনক উপাধি প্রাপ্ত হইয়া 'পোষ্ট ডিপুটি গ্রাণ্ড মাষ্টার' পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি পঞ্জাবের সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যের সহিত যুক্ত থাকিয়া পঞ্জাববাসীদের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন। ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তৎপর সমাজ সংস্কার ও নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। পঞ্জাব হিন্দু সভার তিনি একজন অনুরাগী সভ্য ছিলেন। ১৩২৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে (১৯১৭ খ্রীঃ) সত্তর বৎসর বয়সে কলিকাতা নগরে স্বীয় ভবনে পক্ষাঘাত রোগে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি বঙ্গের কৃতি সন্তান ছিলেন এবং স্বীয় অধ্যবসায়, ধীশক্তি ও ঐকান্তিক কর্ম্মনিষ্ঠার দ্বারাই তিনি লোক সমাজে এইরূপ যশস্বী হইয়াছিলেন। প্রবাসী প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীর দিগের মধ্যে তিনি অতিউচ্চ স্থান অধিকার করিতেন।

প্রত্যক্ স্বরূপ—এই দার্শনিক পণ্ডিত চিৎসুখাচার্য্য প্রণীত 'তত্ত্ব প্রদীপিকা' গ্রন্থের 'নয়ন প্রসাদিনী' নামে এক উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

প্রদ্যুম্ন—তিনি একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। ব্রহ্মগুপ্ত তাঁহার বিষয় স্বীয় সিদ্ধান্তে উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র— তিনি শ্রীহট্টবাসী ও চৈতন্যদেবের জ্ঞাতি ভাই ছিলেন। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উদয়াবলী" নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

প্রদ্যুম্ন সূরী—(১) মধ্যযুগের একজন জৈন আচার্য্য ও সংস্কৃত গ্রন্থকার। তিনি খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি ধর্ম্মকুমার রচিত 'শালিভদ্র চরিত্র' সংশোধন করিয়া আলঙ্কারিক ভাষায় পুন সঙ্কলন করেন। প্রাকৃত ভাষায় 'বিচার-সার-প্রকরণ' নামে একখানি তর্কশাস্ত্রের গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করেন।

প্রদ্যুম্ন সূরী—(২) জৈন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের রাজগচ্ছ শাখার একজন নৈয়ায়িক। তিনি খ্রীঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর তার্কিকও ছিলেন এবং বহুস্থলে দিগম্বর সম্প্রদায়ের আচার্য্যদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া যশ লাভ করেন। তিনি অন্যতম জৈন নৈয়ায়িক অভয়দেব সূরীর গুরু ছিলেন।

প্রদ্যুম্ন সেন—বঙ্গের অন্যতম স্বাধীন ক্ষত্রিয় সেনবংশীয় নরপতি শুকদেব সেনের পুত্র প্রদ্যুম্ন সেন ও বরেন্দ্র সেন। তাঁহারা আদিশূরের দৌহিত্র ছিলেন।

প্রদ্যুম্নাকর—অতি প্রাচীন কালে আরাকানে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। খ্রীঃ সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে আরাকানে ভারতীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের অন্য কোন পরিচয় আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কেবল শ্রীশিব, যারিক্রিয়, প্রীতি, রম্যাকর, ললিতাকর, প্রদ্যুম্নাকর ও অম্বাকর নরপতির মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় নরপতি ছিলেন। খ্রীঃ ৭৮৮-৯৮৭ সাল পর্য্যন্ত তাঁহারা রাজ্য ভোগ করিয়া ছিলেন।

প্রদ্যোত—অবন্তীর অধিপতি। বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহাকে অনেক স্থলে 'চণ্ড প্রদ্যোত' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহার দুই পুত্র—গোপালক ও পালক; এবং এক কন্যা বাসবদত্তা। বৎসরাজ উদয়নের সহিত বাসবদত্তার বিবাহ হয়। মগধরাজ অজাতশত্রু তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন এবং বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য হইতে জানা যায় যে অবন্তী ও মগধের মধ্যে বিশেষ বৈরীভাব ছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যে এবং পুরাণেও তাঁহাকে ক্রূর প্রকৃতি, নীতি বিগর্হিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, গ্রন্থকার, সাময়িক পত্রিকাদির লেখক ও নানা ভাষাবিদ্ পণ্ডিত। ১২৫৬ বঙ্গাব্দের ১২ই আশ্বিন নদিয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত নারায়ণপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম সারদাসুন্দরী দেবী। প্রফুল্লচন্দ্র পিতার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান। পিতার অবস্থা বিপর্য্যয়ে তিনি শিশুকাল হইতে অত্যন্ত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে লালিত পালিত হন। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। পরে তিনি মামজোয়ানী গ্রামে 'ব্যবস্থা-দর্পণ' গ্রন্থপ্রণেতা সুবিখ্যাত শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। শৈশব হইতেই তিনি তীক্ষ্ণধী ও মেধাবী ছিলেন। ঐ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন। তখন তাঁহার

বয়স পনর বৎসর। সংসারের অভাব বশতঃ এই বয়সেই তাঁহাকে লেখাপড়া পরিত্যাগ করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের জন্য বাহির হইতে হইল। চাকরীর উদ্দেশ্যে নানাস্থান ভ্রমণ করিয়াও কোন সুবিধা হইল না। পরিশেষে তাঁহার বাড়ীর নিকটে আড়ংঘাটায় ষ্টেশন স্থাপিত হইলে, তিনি রেলওয়ে অফিসে কার্য্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং কয়েক মাস পর রামনগর ষ্টেশনে একটী চাকুরী প্রাপ্ত হন। ছয়মাস এই কার্য্য করিবার পর তিনি কুষ্টীয়া নারায়ণগঞ্জের জাহাজে ত্রিশ টাকা বেতনে এক চাকরী প্রাপ্ত হন। কিন্তু উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী কাপ্তেন সাহেবের সহিত মতানৈক্য হওয়ায়, তিনি এই চাকরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে দার্জ্জিলিং লাইনে, কারাগোলা ডাক ঘরে কুড়ি টাকা বেতনে, তিনি পুনরায় এক কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। ঐ স্থানে থাকাকালীন তিনি নিজ চেষ্টায় ও মেধা বলে, বহু ইংরেজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া, উভয় ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞান লাভ করেন। ডাক বিভাগে তিনি স্বীয় পারদর্শিতা ও কার্য্য নিপুণতার পরিচয় প্রদান করিয়া, ক্রমে সাতশত টাকা বেতনে পূর্ব্ববঙ্গের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ স্থানে অবস্থানকালে তিনি ভৈরবচন্দ্র ন্যায়ভূষণ নামক একজন পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি বালেশ্বরে বদলী হন। এখানে তত্বজ্ঞান বিষয়ক বহু সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থ পাঠ করেন, নিজের চেষ্টায় উড়িয়া ও তৈলঙ্গ ভাষা এবং দার্পো নামক একজন রোমান ক্যাথলিক পাদরীর নিকট লাটীন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা করেন। এই স্থানে অবস্থানকালে, তিনি প্রাচীন হিন্দু রাজত্বের ইতিহাস রচনার জন্য উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত'. 'মণিহারী', 'গ্রীক ও হিন্দু' 'অনুভূতি' ও দুইখানি কবিতার গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তাঁহার বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত এবং গ্রীক ও হিন্দু নামক গ্রন্থ দুইখানি পূর্ব্বে বঙ্কিম বাবুর নব প্রকাশিত বঙ্গ দর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। ক্রমাগত প্রায় আট বৎসরকাল গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া তিনি গ্রীক ও হিন্দু নামক পুস্তকখানা রচনা করেন। এই গ্রন্থের জটিল ভাষায় তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও সৃজনীশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। 'বাল্মিকী ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত'ও তাঁহার একটী গভীর গবেষণা মূলক পুস্তক। মণিহারী একখানি সন্দর্ভ। অনুভূতি তাঁহার মনোবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। তিনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের একখানা ইতিহাসও

রচনা করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মেল খণ্ডে যে সকল কথা প্রকাশিত হইয়াছে, উহার অনেকাংশই ঐ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। বিবিধ সাময়িক ও সংবাদ পত্রেও তাহার গবেষণা মূলক বহু প্রবন্ধ বাহির হইত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত 'কৃত্তিবাস পণ্ডিত' ও 'বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধ তাঁহার গবেষণার বিশেষ পরিচায়ক। তিনি কোন কোন সাময়িক ইংরেজী পত্রিকাতেও প্রবন্ধ লিখিতেন। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক (Assistant Secretary) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইবার কয়েকদিন পরেই ১৯০০ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে, (ভাদ্র ১৩০৭ বঙ্গাব্দ) তিনি পরলোক গমন করেন।

প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, রাজা—কলিকাতার একজন বিশিষ্ট নাগরিক। পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঠাকুর উপাধিধারী ব্রাহ্মণ জমীদারবংশীয় রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পৌত্র। ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে (১২৯৪ বঙ্গাব্দ কার্ত্তিক) তাঁহার জন্ম হয়। শৈশবেই তাঁহার পিতা শরদিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোক প্রাপ্তি হওয়ায় তিনি পিতামহের তত্ত্বাবধানেই প্রতিপালিত হন। স্বাস্থ্যের হীনতার জন্য তিনি গৃহশিক্ষকের নিকটে শিক্ষা লাভ করিতে থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ বসু ও রামকৃষ্ণ-কথামৃত, রচয়িতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহার শিক্ষক ছিলেন।

তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দেশের বিবিধ জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করেন। ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দ হইতে তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের (British Indian Association) সভ্য হন। ১৯২৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি উহার কার্য্যাধ্যক্ষ (Secretary) এবং চারি বৎসর পরে উহার সভাপতি হন। ১৯২৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি উক্ত পরিষদের কার্য্যাধ্যক্ষরূপে, বাঙ্গালার ভূম্যধিকারীদের এক প্রতিনিধি মণ্ডল লইয়া বড়লাট লর্ড আরউইন (Lord Irwin) সমীপে গমন করেন। ১৯৩০ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতার শেরিফ (Sheriff) হইয়াছিলেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের রাজত্বের জয়ন্তী (Silver Jubilee) উপলক্ষে যে অর্থ সংগ্রহ হয় তিনি সেই ফাণ্ডের ধনাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে "রাজা" উপাধি দেওয়া হয়।

তিনি 'কলিকাতা ক্লাবের' সভাপতি, সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধিনী সভার (Anti-Terrorist Committee) সভাপতি; কলিকাতা ব্রতী-বালক সঙ্ঘের (Boys Scout Association)

একজন সম্মানীত কর্ম্মচারী (District Commissioner) প্রভৃতি বহু সম্মানীত পদে আসীন থাকিয়া জনসেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

সাহিত্য ও শিল্পকলায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। জনকল্যাণকারী বহু প্রতিষ্ঠান তাঁহার দানে পুষ্ট হইত। কাশীর বিশ্ববিদ্যালয় দৌলতপুর কলেজ, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ প্রভৃতি তাহাদের মধ্যে প্রধান।

১৯৩৮ খ্রীঃ অব্দে জুলাই মাসে (আষাঢ়, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) তিনি পরলোক গমন করেন।

প্রবর সেন (প্রথম)—মধ্য ভারতের বাকাটকবংশীয় নৃপতি। তাঁহার পিতার নাম বিন্ধ্যশক্তি ; পৌত্র রুদ্রসেন (১ম)।

প্রবর সেন (দ্বিতীয়)—বাকাটকবংশীয় নৃপতি। তাঁহার মাতা প্রভাবতী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মহিষী কুবেরনাগার গর্ভজাত ছিলেন।

প্রবীণা বাঈ—বুন্দেল খণ্ডের রাজা ইন্দ্রজিৎ সিংহের রাজসভায় যেমন পুরুষ কবি ছিলেন, তেমনি প্রবীণা বাঈ নামে একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া স্ত্রীকবিও ছিলেন। তাঁহার কবিতা রচনায় অসাধারণ দক্ষতা ছিল।

প্রবুদ্ধ ঘোষ—উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে শাণ্ডিল্য গোত্র ঘোষ বংশে প্রবুদ্ধ ঘোষ নামে এক বীর পুরুষ বা প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণ অংশে ছিল। তাঁহার বংশধরগণ বৌদ্ধাচার সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া, সমাজে সমুচিত সম্মান পাইতেন না। ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের সময়ে সকলেই হিন্দু গণ্ডীতে আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। যাঁহারা পূর্ব্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন, কুলীন সমাজ তাঁহাদের সহিত আদান প্রদানে বিমুখ ছিলেন। বোধ হয় এইরূপ কোন ঘোষ জমিদার বংশে বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রবোধচন্দ্র দে (এফ, আর, এইচ, এস)—বাঙ্গালার একজন খ্যাতনামা কৃষিবিদ্যা বিশারদ ব্যক্তি। ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। যে সময় কৃষিকার্য্যের প্রতি এদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আদৌ তৎপর ছিলেন না, সেই সময় তিনি ইহার বিজ্ঞান সম্মত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে দেশী ও পাশ্চাত্য কৃষি বিদ্যা বিশারদদিগের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া এবং স্বহস্তে কৃষি কার্য্য করিয়া ইহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। আলু কার্পাস, আম্র ও অন্যান্য শাকসব্জী, কলা, পুষ্পরক্ষাদি এবং উদ্যান রচনা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব অনন্য সাধারণ ছিল। দ্বারভাঙ্গা মহারাজার বিখ্যাত উদ্যান, মুর্শিদাবাদ নবাব

সরকারের আম্রকানন, মহীশূরের রাজধানী বাঙ্গালোর সহরের বিখ্যাত উদ্যান এবং আসাম তেজপুর রেলওয়ে বাগান রচনাতে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কৃষিক্ষেত্র মৃত্তিকাতত্ত্ব, কার্পাস চাষ, ভূমিকর্ষণ, সব্জীবাগ, গোলাপ বাড়ী প্রভৃতি ১৮ খানি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক তিনি রচনা করেন। ১৩৪০ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে (১৯৩৪ খ্রীঃ, জানুয়ারী) তিনি পর লোক গমন করেন।

প্রভব স্বামী—একজন জৈন গুরু। খ্রীঃ পূ ৪০৩—৩৯৭ অব্দ পর্যান্ত তিনি জৈন সঙ্ঘ পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে উপকেশ, পত্তন নামক স্থানে সর্ব্ব প্রথম পূজার জন্য মহাবীর স্বামীর মূর্ত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল। তদবধি সকল জৈনেরাই মহাবীর স্বামীর মূর্ত্তি পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। বহু পরে তাঁহাদের দেখা দেখি বৌদ্ধ ও হিন্দুরাও পূজা করিতে আরম্ভ করেন।

প্রভাকর—তিনি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ ভাস্করাচার্য্যের প্রপিতামহ। প্রভাকর নিজেও একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। প্রভাকরের পিতা গোবিন্দ সর্ব্বজ্ঞ ও পুত্র মনোরথ উভয়েই বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। মনোরথের পুত্র কবীশ্বর মহেশ্বরাচার্য্য। ভাস্কর দেখ।

প্রভাকর—(২) বঙ্গের পালবংশীয় নরপতি ধর্ম্মপাল খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীতে বিক্রমশিলা বৌদ্ধ বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা বর্ত্তমান ভাগলপুর জিলার পাথরঘাটা নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। লামা তারানাথ বিক্রমশীলার বিবরণ দিতে যাইয়া তৎকালে জীবিত কল্যাণ গুপ্ত, সাগর মেঘ, সিংহমুখ, প্রভাকর প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রভাকর গুপ্ত—একজন বৌদ্ধ নৈয়ায়িক। তিনি খুব সম্ভব খ্রীঃ দশম শতাব্দীর মধ্য ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম 'দ্বারপাণ্ডিত' (অর্থাৎ বিভাগীয় অধ্যক্ষ) হইয়াছিলেন। 'প্রমাণ বার্ত্তিকালঙ্কার', 'সহাবলম্ব নিশ্চয়' এবং 'তর্কভাষা' এই তিনখানি গ্রন্থ তাঁহার রচিত। প্রথমখানি ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রণীত প্রমাণবার্ত্তিকের টীকা। ভাগারাজ নামক এক কাশ্মীর দেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত উহা তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। পরে একাধিক ব্যক্তির দ্বারা উহা সংশোধিত হয়। নেপালবাসী বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্তিভদ্র দ্বিতীয় গ্রন্থখানি তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। তর্কভাষার মূল এখন পাওয়া যায় না। তিব্বতী অনুবাদ মাত্র আছে। উহা প্রত্যক্ষ, স্বার্থানুমান

এবং পরার্থনুমান, এই তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত। বৌদ্ধাচার্য্য যমারী প্রমাণ-বার্ত্তিকালঙ্কারের এক টীকা রচনা করেন (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী)।

প্রভাকর দেব—তিনি কাশ্মীরের শৌণ্ডিক বংশীয় নরপতি শঙ্করবর্ম্মার (৮৮৪-৯০২ খ্রীঃ) মন্ত্রী ছিলেন। প্রভাকরের পিতামহ বীরদেব পিশাচপুরের এক সংব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতা কামদেবও অতিশয় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মন্ত্রী মেরুবর্দ্ধনের পুত্রদের শিক্ষক ছিলেন। পরে মন্ত্রীর কোষাধ্যক্ষ হন। এই কামদেবের পুত্র প্রভাকর দেব প্রথমে রাজা শঙ্করবর্ম্মার কোষাধ্যক্ষ ও পরে মন্ত্রী হইয়াছিলেন। শঙ্করবর্ম্মার মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র গোপালবর্ম্মা রাজা হন। সেই সময়ে শঙ্করবর্ম্মার মহিষী সুগন্ধা দেবীর প্রণয়পাত্র প্রভাকর ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া প্রবল পরাক্রমশালী হন। গোপালবর্ম্মা প্রভাকরকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইয়া নিহত হইলেন। মন্ত্রী প্রভাকর রামদেব নামক এক তান্ত্রিক দ্বারা তাঁহাকে বধ করান। তৎপরে শঙ্করবর্ম্মা মাত্র দশদিন রাজত্ব করেন। মন্ত্রী প্রভাকরের পুত্র পণ্ডিত যশস্কর এক সময়ে দরিদ্রতার পীড়নে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিধাতার বিচিত্র বিধানে পরে তিনিই কাশ্মীরের রাজা হইয়াছিলেন।

প্রভাকর বর্দ্ধন—খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর একজন পরাক্রান্ত নৃপতি। তিনি স্থাণ্বীশ্বরের (প্রাচীন নাম শ্রীকণ্ঠ) পুষ্যভূতি বংশীয় ছিলেন। গুপ্তবংশীয় মহাসেন গুপ্ত তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহারকন্যা রাজ্যশ্রী মৌখারী বংশীয় গ্রহবর্ম্মার মহিষী ছিলেন।

প্রভাকর, রাজা—তিনি আসামের অন্তর্গত দিনারুয়ার রাজা ছিলেন। জয়ন্তিয়াপতি ধনমাণিক্য তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন। পরে ব্রহ্মপুরের (হৈরম্ব বা কাছাড়) রাজা শত্রুদমনের সাহায্যে মুক্ত হন।

প্রভাকর মিত্র—বৌদ্ধ আচার্য্য ও গ্রন্থকার। তিনি 'মহাযান সূত্রালঙ্কার' নামক একখানি গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

প্রভাকর রায়—খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, বর্ত্তমান ডায়মণ্ড হারবার প্রদেশে, প্রভাকর নামে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি শিবের উপাসক ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম—দক্ষিণ রায়। পীর জাফর খাঁ গাজীর পুত্র বড় খাঁ গাজীর সহিত প্রথমতঃ দক্ষিণ রায়ের বিবাদ ও পরে সদ্ভাব স্থাপিত হয়। ১২১৩ খ্রীঃ অব্দে বড় খাঁ গাজীর মৃত্যু হয়। এই দক্ষিণ রায়ই সুন্দর বন অঞ্চলে ব্যাঘ্র বাহন দক্ষিণ রায় দেবতা নামে পূজিত হন।

প্রভাচন্দ্র—একজন জৈন গ্রন্থকার। তিনি 'প্রভাবক চরিত্র' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রদ্যুম্নসূরী উহা সংশোধিত করিয়া পুনরায় প্রচার করেন। উহাতে অনেক জৈন আচার্য্য, কবি ও গ্রন্থকারের জীবনী আছে। তাঁহার গুরুর নাম পদ্মনন্দী অথবা কুন্দকুন্দ। প্রভাচন্দ্র মাণিক্যনন্দী বিরচিত 'পরীক্ষামুখসূত্র' নামক গ্রন্থের একখানি টীকা রচনা করেন। তিনি 'ন্যায়কুমুদ চন্দ্রোদয়' এবং 'প্রমেয়কমল মার্ত্তণ্ড' নামক আরও দুইখানি ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থে উপবর্ষ, শবর স্বামী, ভর্ত্তৃহরি, বাণ, কুমারিল প্রভাকর, দিঙ্‌নাগ, উদ্দ্যোতকর, ধর্ম্মকীর্ত্তি, বিদ্যানন্দ প্রভৃতি আচার্য্য ও গ্রন্থকারগণের উল্লেখ আছে। তিনি দিগম্বর সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন এবং 'কবি প্রভাচন্দ্র' নামেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায়কুমুদ চন্দ্রোদয় গ্রন্থখানি অকলঙ্ক বিরচিত "লঘীয়স্ত্রয়" গ্রন্থের টীকা। প্রভাচন্দ্র খ্রীঃ নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার সমাধি মন্দিরে খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করেন।

মীমাংসাকার কুমারিলের সমসাময়িক একজন জৈন আচার্য্য প্রভাকরের নামও পাওয়া যায়। তাঁহার সহিত কুমারিলের দার্শনিক বিচার হইয়াছিল। প্রথম প্রভাচন্দ্র অকলঙ্কের শিষ্য ছিলেন। তিনি অনেক জৈন শাস্ত্রের সংস্কৃত টীকাও রচনা করেন। খ্রীঃ দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতেও ঐ নামে অনেক জৈন আচার্য্য ও গ্রন্থকার প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—স্বনামখ্যাত বাঙ্গালা গল্প লেখক। ১২৭০ বঙ্গাব্দে (১৮৬৩ খ্রীঃ) তাঁহার জন্ম হয়। যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি কিছুকাল সরকারী টেলিগ্রাফ বিভাগে চাকুরী করেন। কিছুকাল পরে আইন অধ্যয়ন করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন এবং যথাসময়ে ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং প্রথমে কিছুকাল রঙ্গপুরে থাকিয়া পরে গয়াতে আইন ব্যবসায় করিতে থাকেন।

চাকুরী জীবনের প্রথম হইতে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় ছোট ছোট গল্প লিখিতে থাকেন। এই ছোট গল্প রচনায় বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের অন্যতম ছিলেন। কয়েকখানি উপন্যাসও তিনি রচনা করেন। কিন্তু তাঁহার ছোট গল্পগুলিই বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। প্রথম সাহিত্যিক জীবনে তিনি কিছু কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্প ইংরেজিতে অনু-

বাদ করিয়া তিনি মডার্ণ রিভিউ (The Modern Review) নামক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। নাটোরের মহারাজার সহযোগীতায় তিনি কয়েক বৎসর 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করেন। আইন ব্যবসায় অপেক্ষা সাহিত্য সেবাই তাঁহার প্রিয় হওয়ায় তিনি ওকালতী ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং প্রধানতঃ সাহিত্য সেবাতেই আত্ম-নিয়োগ করেন। এই সময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট আইন বিভাগে অধ্যাপনাও করিতে থাকেন।

ইংলণ্ডে গমন করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। তদবধি তিনি বিপত্নীক ছিলেন। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে (১৯৩২ খ্রীঃ এপ্রিল) কলি-কাতা নগরে তাঁহার দেহান্ত হয়।

প্রভাবতী গুপ্তা, রাণী—মগধের গুপ্তবংশীয় নরপতি সমুদ্রগুপ্তের পৌত্রী এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতীর সহিত বাকাটকগণের অধিপতি রুদ্র-সেনের বিবাহ হইয়াছিল। প্রভাবতী রুদ্রসেনের প্রধানা মহিষী ছিলেন। তাঁহাদের পুত্র দিবাকর সেন। খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীতে তাঁহারা বর্ত্তমান ছিলেন।.

প্রভাবতী রাণী—(১) তিনি বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম কেদার রায়ের অন্যতমা কন্যা। মুঘলসেনাপতি মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাজয় করিয়া, কেদার রায়কে আক্রমণ করেন। কেদার স্বীয় দুহিতা প্রভা-বতীকে মানসিংহের সহিত বিবাহ দিয়া, তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। রাজপুতনার ইতিহাস পাঠে জানা যায় অমরের শীলাদেবী (সল্লাদেবী) রাণী প্রভাবতীর সহিত অম্বরে নীত হইয়া-ছিলেন। সেই সময়ে তৎসঙ্গে বাঙ্গালী পুরোহিতও তথায় নীত হন। তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও তথায় অবস্থান করিতেছেন। রাজা মানসিংহের মৃত্যুর পরে তিনি সহমৃতা হইয়াছিলেন।

প্রভাবতী, রাণী—(২) উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত রূপনগর একটী প্রধান সহর। ইহা ১৬৭২ খ্রীঃ অব্দে একজন শোলাঙ্কী রাজপুতকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। রূপনগরপতি যোধপুরের রাণার সামন্ত নরপতি ছিলেন। রূপনগরের রাজার প্রভাবতী নামে এক পরম রূপবতী কন্যা ছিল। দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজীব তাঁহার রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে হস্তগত করিবার জন্য সচেষ্ট হন এবং বিবাহ প্রস্তাব করিয়া একজন সেনাপতিকে দুই হাজার সৈন্যসহ রূপ-নগরে প্রেরণ করেন। রূপনগরপতির এমন শক্তি ছিল না যে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু বুদ্ধিমতী প্রভা-বতী এই বিপদে বিচলিত না হইয়া যোধপুরপতি রাণা রাজসিংহের নিকট স্বীয় পুরোহিতকে প্রেরণ করিয়া

তাঁহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। রাণা রাজসিংহ নানা কারণে সম্রাট আওরঙ্গজীবের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি এই সুযোগ ছাড়িলেন না। তিনি সসৈন্যে রূপনগরে উপস্থিত হইয়া তুমুল সংগ্রামের পর মুঘল বাহিনীকে পরাস্ত করিলেন। তখন কৃতজ্ঞ রূপনগরপতি স্বীয় কন্যা প্রভাবতীর সহিত রাজসিংহের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

প্রভামিত্র—একজন বৌদ্ধ স্থবির। ইউয়ান চাং তাঁহাকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতদের অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রভাশঙ্কর পট্টণী, স্যার—বোম্বাই প্রদেশের একজন খ্যাতনামা রাজনীতিক ও ভবনগর রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রী। কাথিয়াবাড় এবং অন্যান্য রাজ্যের রাজাগণ কোন প্রকার সঙ্কটে পতিত হইলেই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নীতির জন্য ভবনগর রাজ্য বিশেষ উন্নত ও সমৃদ্ধশালী হইয়াছে। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত অনন্ত রায় পট্টণী ভবনগর রাজ্যের দেওয়ান নিযুক্ত হইলে, তিনি রাজস্ব বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। অতপর তিনি ভবনগর রাজ্যের পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রয়োজনীয়তা, এবং চাষাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য রাজ্যের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করেন। এই ব্যাপক সফরের ফলেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় এবং ক্রমে অসুস্থ হইয়া পড়েন। ১৯৩৮ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

প্রভাসচন্দ্র মিত্র, স্যার—অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী বাঙ্গালা রাজনীতিক। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে (১২৮১ বঙ্গাব্দ মাঘ) কলিকাতা নগরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বনামধন্য স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের তৃতীয় ও সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন।

১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে তিনি হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগদান করেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি এম্ এ আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ সময়ে স্যার বিনোদলাল মিত্র, স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, স্যার ভূপেন্দ্র নাথ মিত্র, দেওয়ান বাহাদুর জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী মিঃ চারুচন্দ্র দত্ত, আই-সি-এস (I. C. S); বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি স্বনামখ্যাত ব্যক্তিগণও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতেন।

১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র হাইকোর্টে ব্যবহারজীবীর কার্য্যে যোগদান করেন। এই কার্য্যে তিনি প্রথমে সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে

পারেন নাই। সেই কারণে অল্প সময় পরেই তিনি কলিকাতা নগরীর রেজিষ্ট্রারের কার্য্য গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে তিনি পুনরায় হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। তিনি কংগ্রেস আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উহাতে কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই যোগদান করেন। ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা টাইবোলী উদ্যানে কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি স্বেচ্ছা সেবকের কার্য্য করিয়াছিলেন। তদানীন্তন রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন।

ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের কারণ ও প্রসার বিষয়ে কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য ও বিপ্লববাদের দমনোপায় নির্দ্ধারণের জন্য যে তদন্ত সমিতি নিযুক্ত করা হইয়াছিল ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে তিনি উহার সদস্য পদ গ্রহণ ও তাঁহার বিবরণীতে স্বাক্ষর করায় দেশের জন সাধারণের বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। উক্ত অনুসন্ধান সমিতি সাধারণতঃ রাউলাট (Rowlatt) কমিশন নামে পরিচিত।

তাঁহার কোন বিষয় বিশেষভাবে আয়ত্ব করিবার অসাধারণ শক্তি ছিল। যে কার্য্যে হাত দিতেন সেই কাজেই তিনি বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিতেন। বাংলার রাজস্ব, শিক্ষা বিষয়ক নানা তথ্য; জমীর খাজানা বিষয়ক নানা ব্যবস্থা, ইত্যাদি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নিখুঁত জ্ঞান তাঁহার মত কম লোকেরই ছিল।

ভারতের শাসন তন্ত্রের একটা খসড়া প্রস্তুত করিবার জন্য মিঃ কার্টিস (Lionel Curtis) যখন এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন প্রভাসচন্দ্র ভারতের শাসনতন্ত্র কিরূপ হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে স্বীয় মত স্পষ্ট ভাষায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার মতামতই মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের ভিত্তি স্বরূপ ছিল। মণ্টেগু-শাসন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে, তিনি শিক্ষা মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখনকার (১৯২১ খ্রীঃ) অন্যান্য মন্ত্রী বর্গের মধ্যে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবাব নবাবআলী চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ক্রমাগত পাচ বৎসর কাল শিক্ষাসচিবের পদে সমাসীন ছিলেন। ১৯২২ খ্রীঃ অব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে যখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল, মন্ত্রী মণ্ডলের পর মন্ত্রী মণ্ডল অনাস্থা প্রস্তাবের ফলে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল এবং কোন স্থায়ী মন্ত্রী মণ্ডল গঠিত হইতে পারিতেছিল না, সেই সময় একটি স্থায়ী মন্ত্রী মণ্ডল গঠনের জন্য প্রভাসচন্দ্রকে আহ্বান করা হয়। তিনি তখন ইংলণ্ডে ছিলেন। এই আহ্বানে তিনি বাঙ্গালায়

আগমন করেন এবং নবাব মুসারফ হোসেন খাঁর সহযোগীতায় এক মন্ত্রী মণ্ডল গঠন করেন। ১৯২ খ্রীঃ অব্দের ১০ ই অক্টোবর হইতে ১৯২ খ্রীঃ অব্দের ৩১ শে জুলাই পর্য্যন্ত তিনি মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা সরকারের শাসন পরিষদের (Executive Council) সদস্য মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যু হইলে ১৯২৮ খ্রীঃ তিনি উক্ত পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার কার্য্যকাল উত্তীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার কার্য্যকাল আরও একবৎসর বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। ১৯৩৪ সালের জুন মাসে তাঁহার অবসর গ্রহণের কথা ছিল, কিন্তু তাঁহার আর সে সুযোগ ঘটে নাই। তিনি ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন (Bengal Tenancy Act) বিধিবদ্ধ করিতে সাহায্য করেন। বাঙ্গালার উদারনৈতিকদিগের মধ্যে তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বহু বৎসর ভারতসভার (Indian Association) ও জাতীয় উদারনৈতিক (National Liberal Federation) সঙ্ঘের সভাপতি এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের (British Indian Association) সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 'লীডার' ছিলেন। ১০৩২ খ্রীঃ অব্দের প্রথম ভাগে তিনি বাঙ্গালা সরকারের শাসন পরিষদের সহকারী সভাপতির (Vice President) পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩০ ও ১৯৩১ খ্রীঃ অব্দে ক্রমান্বয়ে দুইবার তিনি বাঙ্গালার হিন্দু প্রতিনিধি হিসাবে ইংলণ্ডে গোল টেবিল বৈঠক (Round Table Conference) যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে তথায় পাট রপ্তানী শুল্কের উপসত্ব বাঙ্গালার রাজস্বে দিবার আন্দোলন করেন। তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় ভারতবর্ষ ক্যাপিটেশন চার্জ্জের কিয়দংশ হইতে নিস্কৃতি পাইয়াছে। (ভারতবর্ষে যত ইংরেজ সৈন্য কাজ করিতে আসে, তাহাদের সংগ্রহ ও শিক্ষাদান বাবতে ভারতবর্ষকে অনেক টাকা সর্ব্বদাই ইংলণ্ডকে দিতে হইয়া আসিতেছে। এই টাকার হিসাব সৈন্যদের মাথা পিছু ধরা হইত বলিয়া ইহার নাম ক্যাপিটেশন চার্জ্জ)। তিনি বহু বৎসর বঙ্গ ও আসামের অনুন্নত শ্রেণী সমূহের উন্নতি বিধায়িনী সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং ইহার কাজ চালাইবার জন্য বহু টাকা সাহায্য করিতেন। ১৩৪০ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (১৯৩৪ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী) প্রায় ষাট বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল। প্রভাস-

চন্দ্র মৃত্যুকালে চারি পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞ সরকারী কর্ম্মচারী, যোগ্য ব্যবহারজীব স্নেহময় পিতা ও আর্ত্তের বন্ধু ছিলেন।

প্রভুদেব—হঠযোগ প্রদীপিকার মতে বৌদ্ধজন প্রধান হঠযোগী নাথ ছিলেন। তন্মধ্যে প্রভুদেব অন্যতম।

প্রভুনারায়ণ সিংহ—তিনি কাশীর রাজা ঈশ্বরী প্রসাদ নারায়ণ সিংহ বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও পোষ্যপুত্র। ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের নভেম্বর মাসে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতৃব্যের মৃত্যুর পরে তিনি তিনি রাজা হন। ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি জি, সি, আই,ই (G. C. I. E.) উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার সম্মানার্থ তেরটী তোপধ্বনি হইত। তাঁহারা ভূমীহার ব্রাহ্মণবংশীয়।

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মৌসারাম দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহের সময়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অযোধ্যার নবাবের অধীন ছিলেন। ১৭৩৯ খ্রীঃ মৌসারামের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র বলবন্তসিংহ রাজা হইয়াছিলেন। তিনি তদানীন্তন দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে রাজা উপাধি এবং জৈনপুর, কাশী ও চুনারের স্বামীত্ব লাভ করেন। সেই সময়ে বলবন্ত সিংহ অযোধ্যার নবাবের অধীন ছিলেন। ইংরেজদের সহিত বাঙ্গালার নবাব মীরকাশীমের বক্সার নগরে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে অযোধ্যার নবাব ও দিল্লীর সম্রাট মীরকাশীমের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং অযোধ্যার নবাবের আদেশে বলবন্ত সিংহও যুদ্ধে উপস্থিত হইতে বাধ্য হন। মীরকাশীম এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। বলবন্ত সিংহ যদিও যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, তবু ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। ইংরেজেরা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিয়া তাঁহাদের অধীনতায় রাজ্য প্রদান করেন। ১৭৭০ খ্রীঃ অব্দে বলবন্ত সিংহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র চৈৎ সিং ইংরেজের অধীনে পূর্ব্বের ন্যায় রাজা হইয়াছিলেন। তিনি ইংরেজদিগকে নিয়মিতভাবে রাজস্ব প্রদান করিতেন। একবার ইংরেজদের দাবী অনুসারে পাঁচলক্ষ টাকা অতিরিক্ত দিয়াছিলেন। ইহার পরে ওয়ারেণ হেষ্টিংস, তাঁহাকে তাঁহার ব্যয়ে একদল ইংরেজ সৈন্য পোষণ করিতে অনুরোধ করেন। চৈৎ সিংহ ইহাতে অসম্মত হন। তজ্জন্য ওয়ারেণ হেষ্টিংস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জরিমানা করেন এবং টাকা আদায়ের জন্য সসৈন্যে কাশীতে উপস্থিত হইয়া চৈৎ সিংহকে বন্দী করিলেন। ইহাতে রাজার সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়া হেষ্টিংসের সৈন্যদিগকে সমূলে বিনাশ করিল। হেষ্টিংস অতি কষ্টে পলায়ন

পূর্ব্বক নিজের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। চৈৎসিংহ বুন্দেলখণ্ডে পলায়ন করিলেন। ইংরেজেরা চৈৎসিংহের ভাগিনেয় মহীপ নারায়ণকে কাশী রাজ্য প্রদান করিলেন। বলা বাহুল্য তাঁহার নিকট হইতে বর্দ্ধিত হারে রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত হইল। চৈৎসিংহ গোয়ালিয়র রাজ্যে নির্ব্বাসিত হইয়া জীবন অতিবাহিত করিলেন। ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে মহীপ নারায়ণের মৃত্যুর পরে, তাঁহার তনয় উদিৎ নারায়ণ সিংহ রাজা হইয়াছিলেন। ১৮৩৫ সালে তিনি পরলোক গমন করিলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও পোষ্যপুত্র রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ সিংহ রাজা হইয়াছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়া তিনি মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি কে, সি, এস, আই (K.C.S.I.) উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৯ সালে তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর রাজা হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৯৮ সালে কে, সি, আই, ই (K.C.I.E.) উপাধি প্রাপ্ত হন।

প্রমথনাথ বসু—প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে ১৩৪১ সালে রাঁচীতে সুপণ্ডিত ও সুলেখক, ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সংস্কৃতি ও জীবন-যাত্রার প্রণালীর অনুরাগী এবং সমর্থক প্রমথনাথ বসু পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু ছোট নাগপুর নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বাহিরে যাহারা ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব অনুভব করেন, তাঁহারাও এই ক্ষতি অনুভব করিয়াছিলেন।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছিলেন নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে, কিন্তু পরে নিজের চেষ্টায় সাহিত্য ও দর্শনে, জ্ঞানবান ও পারদর্শী হয়েন। তিনি তাঁহার গ্রন্থাবলীও নানা প্রবন্ধ দ্বারা স্বদেশবাসীদিগকে সেই জ্ঞানের অংশী করিয়া গিয়াছেন। তিনি গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি (Gilchrist) পাইয়া বিলাতে গমন করেন এবং তাহার সঙ্গে অন্য কোন কোন বিজ্ঞান শিখিয়া ১৮৮১ খ্রীঃ ভূতত্ত্ব বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি দক্ষতা ও নিপুণতার সহিত চাকরী করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় লোক বলিয়াই, তাঁহার অধস্তন একজন ইংরাজ কর্ম্মচারীকে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া উচ্চপদ দেওয়ায় তিনি ১৯০৩ সালে চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি উড়িষ্যার গোরু মহিষানী, বাদামপুর, পাঁচগীর ও কালীমাটিতে লৌহখনি আবিষ্কার করেন। তিনিই মিঃ জামশেদজী টাটাকে জামশেদপুরে লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করিতে পরামর্শ দেন এবং তদনুসারে

সেইখানে কারখানা স্থাপিত হয়। ইহা এক্ষণে ভারতের প্রধান এবং পৃথিবীর অন্যতম লৌহ ইস্পাতের কারখানা।

সরকারী চাকরী ছাড়িয়া দিবার পর তিনি ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের ভূতত্ত্ববিৎ হন। তাঁহাকে ময়ূরভঞ্জের স্বর্গীয় মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেব এই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। মহারাজা অধ্যাপক যোগেন্দ্র-চন্দ্র রায়ের ছাত্র ছিলেন। যোগেন বাবু একদা বলেন, "তোমার রাজ্যে কোথায় কি বহুমূল্য সম্পদ আছে, তাহা তুমি জান না; তুমি কিরূপ মহারাজা? অতঃপর বসু মহাশয় ভূতত্ত্ব-বিদের কার্য্যে নিযুক্ত হন। গবর্ণমেণ্টের চাকুরীতে থাকিবার সময় তিনি জব্বলপুর ও দার্জ্জিলিঙে কয়লা এবং রায়পুর জেলায় গ্রানাইট ও অন্যান্য খনিজ আবিষ্কার করেন। প্রমথনাথ বসু মহাশয় চরিত্রবান্, বিনয়ী পুরুষ ছিলেন।

প্রমথনাথ মিত্র—একজন সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি। তিনি সুদীর্ঘকাল চন্দননগর পুস্তকাগারের অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ও যত্নে পুস্তকাগারের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তিনি চন্দননগরের একজন হিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মোহাম্মদ মহসীনের একটী জীবন চরিত রচনা করিয়াছিলেন। (১৮৮০ খ্রীঃ)।

প্রমথনাথ রায়, রাজা বাহাদুর—তিনি ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীঘাপাতিয়ার রাজা প্রসন্ননাথ রায়ের পোষ্যপুত্র ছিলেন। রাজা প্রসন্ন নাথের মৃত্যুর সময়ে তিনি মাত্র ১২শ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন। তিনি রাজা রাজেন্দ্র লালের প্রতিষ্ঠিত ওয়ার্ড ইনিষ্টিটিউসন হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে বিষয় সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা যে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করিতে পারেন নাই, তিনি তাহা সম্পন্ন করেন। তিনি রামপুর বোয়ালিয়ার প্রসন্ন নাথ দাতব্য চিকিৎসালয়ের বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। রাজসাহী বালিকা-বিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য, রামপুর বালিকা-বিদ্যালয়ে বৃত্তি, তাঁহার নাখিলা কাছারিতে দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কাজে অর্থ সাহায্য করেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ দিল্লীর দরবারে তিনি রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন।

তিনি স্বদেশে শিল্পকার্য্য প্রসারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য কলিকাতা ও মুর্শিদাবাদ হইতে সুদক্ষ শিল্পী আনয়ন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য ইতিমধ্যে তিনি ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। সেই সময়ে তাঁহার প্রমদা নাথ, বসন্তকুমার, শরৎ

কুমার ও হেমেন্দ্রকুমার নামে চারি পুত্র বিদ্যমান ছিলেন। তিনি এক চরম পত্র দ্বারা সমস্ত বিষয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এবং অন্যান্য পুত্রদের জন্য বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়া যান।

প্রমথ সিংহ—১৭৪৪ খ্রীঃ অব্দে আসাম প্রদেশের অহমবংশীয় নরপতি শিবসিংহের মৃত্যুর পরে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকেরা শিবসিংহের পুত্রদেরে অতিক্রম করিয়া তাঁহার সহোদর ভ্রাতা প্রমথ সিংহকে রাজপদ প্রদান করেন। তাঁহার অন্য নাম সুনেনফা ছিল। তাঁহার সময়ে গৌহাটীর রুদ্রেশ্বর ও শুক্লেশ্বর মন্দির নির্ম্মিত হয়। তিনি জমির জরিপ করিয়াছিলেন; লোক গণনাও করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সময়ে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য তেমন কোন ঘটনা ঘটে নাই। ১৭৪৪ হইতে ১৭৫১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। ১৭৫১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, রুদ্রসিংহের চতুর্থ পুত্র রাজেশ্বর সিংহ রাজা হইয়াছিলেন।

প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার—খ্যাতনামা প্রবাসী বাঙ্গালী ব্যবহারজীবী। তাঁহাদের পৈতৃক নিবাস হুগলী জিলার উত্তরপাড়া গ্রামে। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে মেদিনীপুর নগরে তাঁহার জন্ম হয়। প্রমদাচরণ উত্তর পাড়ার উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়েই শিক্ষারম্ভ করেন। ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ উপাধি ও আইন (B. L) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টেই আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে বিহার প্রদেশের আরা নগরে যাইয়া ওকালতী করিতে থাকেন পরে তথা হইতে এলাহাবাদে গমন করেন। এইখানেই তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অবস্থান করেন এবং সেই খানেই তাঁহার গৌরবময় কর্ম্মজীবন শেষ হয়।

এলাহাবাদে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিবার কিছুকাল পরে তিনি বিচার বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন (১৮৭২ খ্রীঃ) এবং ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে করিতে আগ্রার ছোট আদালতের বিচারপতির পদ লাভ করেন। আরও কিছুকাল পরে ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি নিযুক্ত হন। সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল ঐ সম্মান-জনক পদে সমাসীন থাকিয়া ১৯২৩ খ্রীঃ অব্দে পঁচাত্তর বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। তখন পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সেই জন্যই তিনি এত দীর্ঘকাল বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে তিনি অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির পদে আসীন ছিলেন।

দীর্ঘ কর্ম্মজীবনের মধ্যে তিনি একা-

ধিক জনহিতকর ও শিক্ষা-সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানাদির সহিত যুক্ত ছিলেন। দুইবার তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগীয় পরামর্শ সমিতির (Faculty of Low) সভাপতি (Dean) নির্ব্বাচিত হন। ১৯১৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ (Vice-Chancellor) নিযুক্ত হন। পর বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানজনক ব্যবস্থাচার্য্য (Honorary Doctor of Law) উপাধি লাভ করেন। বিচারপতিরূপে তিনি প্রভূত সম্মান লাভ করেন। কঠিন মোকর্দ্দমা সমূহে তাঁহার বিচার নিষ্পত্তির ফলাফল জানিবার জন্য লোকে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত।

প্রমদাচরণ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন এবং শ্রদ্ধার সহিত সামাজিক ও ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপাদি সম্পন্ন করিতেন। অধ্যয়ন স্পৃহা তাঁহার শেষ জীবন পর্য্যন্ত ছিল। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হওয়াতে পত্রিকাদি পড়িয়া শুনাইবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

মধুর অমায়িক ব্যবহার, বিদ্যাবত্তা, অকলঙ্ক চরিত্র প্রভৃতি সাধুজনোচিত বিবিধ গুণের জন্য তিনি স্থানীয় সকল সম্প্রদায়ের লোকের পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। হিন্দু আইন সম্বন্ধে তাঁহার মতামত বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইত।

প্রমদাচরণের তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম পুত্র আইন অধ্যয়নের জন্য ইংলণ্ডে গমন করিয়া তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। জ্যেষ্ঠ ললিতমোহন এলাহাবাদেই আইন ব্যবসায় করিতেন। তিনিও পরে হাইকোর্টের একজন বিচারপতির পদ লাভ করেন।

১৯৩০ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, চৈত্র) মাসে তাঁহার দেহান্ত হয়। মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী বিয়োগ হইয়াছিল।

প্রমদাচরণ সেন—১২৭৬ বাঙ্গালার ৬ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার (১৮ই মে ১৮৬৯ খ্রীঃ) তাঁহার কলিকাতায় জন্ম হয়। তাঁহার পৈত্রিক বাসভূমি খুলনা জিলার সেনহাটী গ্রাম। তাঁহার পিতা তখন কলিকাতা পুলিসে কাজ করিতেন। প্রথমতঃ গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়, পরে হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময়ে তিনি গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা দেন কিন্তু অকৃতকার্য্য হন। তিনি ঐসময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী হওয়ায় পিতার বিরাগভাজন হন। পিতা তাঁহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন। তিনি তখন নকিপুর স্কুলে চাকুরী গ্রহণ করেন। সেই স্কুল উঠিয়া গেলে পরে কলিকাতায় সিটি স্কুলে কাজ গ্রহণ করেন। এই সময়ে বিলাতের বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে বি, এ, পরীক্ষা দিবার জন্য সচেষ্ট হন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি বালক বালিকাদের জন্য সখা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। বালক বালিকাদের সৎশিক্ষার জন্য তিনি খুব সচেষ্ট ছিলেন। এমনকি এই স্বদেশ প্রেমিক যুবক নিরাশ্রয় দরিদ্র বালক বালিকাদের জন্য একটী আশ্রম বাটীকাও নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহা-দিগকে শিক্ষা দিবার সংকল্প করিয়া-ছিলেন। কিন্তু এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই তিনি ১২৯১ সালের ৮ই আষাঢ় রবিবার (২১শে জুন-১৮৮৫ ইং) পরলোক গমন করেন। সখা পত্রিকা ব্যতীত তিনি মহাজীবনের আখ্যায়িকাবলী, চিন্তাশতক, সাথী নামক পুস্তকগুলিও লিখিয়াছিলেন।

প্রমদাদাস মিত্র, রায় বাহাদুর— তিনি বিখ্যাত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র বরদা দাস মিত্রের পুত্র। কলিকাতার উপকণ্ঠে শুঁড়া নামক পল্লীতে তাঁহাদের বাসস্থান আছে। এতদ্ব্যতীত কাশীস্থিত চৌখাম্বা নামক স্থানে তাঁহাদের বাড়ী আছে। কাশী জিলায় ও রাজসাহী জিলায় তাঁহাদের বিস্তৃত জমিদারী আছে। এই মিত্র পরিবার অনন্যসাধারণ বদান্যতা, লোকহিতব্রত ও পাণ্ডিত্যের জন্য সর্ব্বত্র বিখ্যাত। প্রমদা দাস মিত্র মহাশয় বংশের এই সমস্ত গুণেরই অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও অতিশয় জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। তিনি বারাণসী কলেজের ইংরেজি ও সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন। অর্থ-লোভে তিনি এই কার্য্য গ্রহণ করেন নাই। প্রবল জ্ঞান পিপাসাই তাঁহাকে অধ্যাপকের পবিত্র ব্রত গ্রহণে প্ররোচিত করিয়াছিল। তিনি পণ্ডিতগণকে সংস্কৃতের সাহায্যে ইংরেজি শিক্ষা দিতেন। অনর্গল সরল সংস্কৃতে বক্তৃতা দিতে পারিতেন। তিনি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থও লিখিয়াছেন। কাশী হইতে প্রকাশিত পণ্ডিত নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রিকায় তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। আচার ও পোষাক পরিচ্ছদে তাঁহাকে একজন নিরীহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়া বোধ হইত।

প্রমদানাথ রায়, রাজাবাহাদুর— তিনি ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে দিঘাপাতিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রাজা প্রমথনাথের ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে মৃত্যু সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র সাত বৎসর ছিল। তাঁহার নাবালক অবস্থায় জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন ছিল। তিনি সাবালক হইয়া ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন। ইং ১৮৯৮ সালে তিনি রাজাবাহাদুর

উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি খুব বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। রাজসাহী কলেজ সংলগ্ন ছাত্রাবাস তাঁহারই অর্থ ব্যয়ে নির্মিত হয়। ইহা তাঁহার পিতার নামে পরিচিত। এতদ্ভিন্ন কলেজে অনেকগুলি বৃত্তিরও ব্যবস্থা করেন। দিঘাপাতিয়া স্কুলে বৃত্তি, রাজসাহী রেশম বিদ্যালয়ে পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের ভূমি দান, প্রমথনাথ বালিকা বিদ্যালয়ে ছয় হাজার টাকা ব্যয়ে বাটী নির্মাণ, স্বীয় জননী দ্রবময়ীর নামে ১২ হাজার টাকা ব্যয়ে বালিকাদের জন্য বোর্ডিং নির্মাণ, দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন প্রভৃতি কার্য্যে বহু অর্থ দান করিয়াছেন। তিনি রাজসাহী এসোসিয়েশনের সভাপতি, বঙ্গীয় জমিদার সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। ইং১৯১১ সালে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ছোট লাটের ব্যবস্থাপক সভায় জমিদারগণ-কর্তৃক মনোনীত সদস্য নিযুক্ত হন।

তিনি একজন দাতা, বিদ্যোৎসাহী, কর্ত্তব্যপরায়ণ জমিদার ছিলেন। তাঁহার বহু দানের কথা উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তিনি ইং ১৯৩৩ সালে প্রতিভানাথ, বিজনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

প্রয়াগ দত্ত—তিনি চিকিৎসক ও আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ রচয়িতা। তিনি লোলম্ব বিরহিত বৈদ্য জীবনগ্রন্থের বিজ্ঞানকরী নামে এক টীকা রচনা করেন।

১৭৭—১৭৮

প্রয়াগ দাসজী বীহাণী— ভক্ত দাদূর বাহান্নজন প্রধান শিষ্যের অন্যতম। তিনি যোধপুরের অন্তর্গত ভীডবানা ও ফতেহপুরে অবস্থান করিতেন। দাদূর অন্যতম প্রধান শিষ্য ছোট সুন্দর দাসজী তাঁহার কাছে থাকিয়া ধর্ম্মালোচনা ও সাধনা করিতে ভালবাসিতেন। হিন্দু ও মুসলমান সাধনার ফলে যে একটী বিরাট উদার সমাজ গঠিত হইতে পারে, সেইভাব তাঁহারা অন্তরে পোষণ করিতেন। ১৬৩১ খ্রীঃ অব্দে প্রয়াগ দাসজীর মৃত্যু হয়। ভীডবানা এই সম্প্রদায়ের একটী প্রধান তীর্থস্থান।

প্রলম্ব—শালস্তম্ভ বংশীয় নরপতিদের পরে প্রলম্ব আসাম প্রদেশের অধিপতি হন। প্রলম্বের পিতার নাম অরথা। আরথ নামে প্রলম্বের আর এক জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। প্রলম্বের রাজ্য প্রাপ্তির পূর্ব্বেই আরথের মৃত্যু হইয়াছিল। ৮৩০ খ্রীঃ অব্দের প্রলম্বের পুত্রের একখানা তাম্রলেখা পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে মনে হয় তিনি ৮০০ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি রাজপদ গ্রহণ করিয়াই পূর্ব্ববর্ত্তী রাজবংশীয়দিগকে, হয় বিনাশ, না হয় নির্ব্বাসন, করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী জীবাদা হইতে হর্জ্জর জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশীয়েরা শৈব ছিলেন। হারুপেশ্বর নামক স্থানে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। হারুপেশ্বরের স্থান

নির্দ্দেশ এখনও হয় নাই। বোধ হয় বর্ত্তমান তেজপুর সহরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ইহা ছিল। ইহারা কতকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। ত্যাগ সিংহ নামক নরপতিকে পরাস্ত করিয়া, পাল বংশীয় নরপতি ব্রহ্মপাল আসাম প্রদেশে অধিকার করেন। বোধ হয় এই ত্যাগ সিংহ প্রলম্ভেরই বংশধর হইবেন। অনুমান ৮০০ খ্রী: অব্দ হইতে ১০০০ খ্রী: অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজত্বকাল। তাঁহাদের বংশাবলী ও আনুমানিক রাজত্বকাল—

প্রলম্ভ—জীবাদা দেবী। ৮০০—৮২০ খ্রী: অব্দ।

হর্জ্জার—তারাদেবী। ৮২০—৮৩৫।

বনমাল বর্ম্মা—৮৩৫—৮৬০।

জয়মাল বর্ম্মা—৮৬০—৮৭৫। }
বীরবাহু—অম্বা। }

বলবর্ম্মা তৃতীয়—৮৭৫—৮৯০।

ত্যাগ সিংহ—৯৭০—৯৮৫।

কেহ কেহ বলেন জয়মাল বর্ম্মার অন্যনাম বীরবাহু।

প্রশস্তপাদ—বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত তিনি খ্রী: চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি বৈশেষিক সূত্রের পদার্থ-ধর্ম্ম-সংগ্রহ নামে এক ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। এই ভাষ্যে তিনি অন্যান্য অনেক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। খ্রী: দশম শতাব্দীতে ইহার উপর শ্রীধরের ন্যায় কন্দলী ও উদয়নের কিরণাবলী লিখিত হইয়াছে।

প্রশস্তরাজ— লবণ্যবংশীয় হর্ষদেব কাশ্মীরপতি হর্ষদেবের (১০৮৯—১১০২ খ্রী:) অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। রাজার জ্ঞাতি উচ্চল ও সুস্‌সলকে রাজা হর্ষদেব বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, প্রশস্তরাজ স্বীয় ভ্রাতা শিহ্লরাজের পরামর্শে তাঁহাদিগকে ভিন্ন দেশে গোপনে প্রেরণ করিয়া, তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী, রায় বাহাদুর—একজন বিশিষ্ট জমিদার ও পরহিতব্রতী। ১৮৬২ খ্রী: অব্দে ময়মনসিংহ জেলাস্থ ধলা গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ চক্রবর্ত্তী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পণ্ডিত গোবিন্দবর বিদ্যালঙ্কার নদীয়া হইতে তদানীন্তন মুসলমান অধিপতি শাহ সুজার নিকট রণভাওয়াল পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া ধলা গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করেন।

রায় বাহাদুর মহাশয় তাঁহার স্বগ্রামের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেন। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রম, চেষ্টার ফলে ধলা গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয়, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, বাজার, রেলওয়ে ষ্টেশন, পোষ্ট আফিস প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে এবং ধলা একটী উন্নত পল্লীতে

পরিণত হয়। তিনি বহুকাল ময়মনসিংহ জিলা বোর্ডের সদস্য ছিলেন এবং অনেক জনহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় তাঁহার নিজ গ্রামে ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে অনেক রাস্তাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। তিনি বহুদিন ময়মনসিংহ সারস্বত সমাজের সম্পাদক (Secretary) ছিলেন এবং ঐ সময় ময়মনসিংহ সহরে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর ন করিয়া কর্ম্মকুশলতার পরিচয় প্রদান করেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গ ও ময়মনসিংহ ভূমাধিকারী সভার আজীবন সভ্য ছিলেন এবং এক সময়ে তিনি কলিকাতাস্থ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্য ছিলেন। তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসরের অধিক ময়মনসিংহে অবৈতনিক বিচারপতি (Honourary Magistrate) ছিলেন এবং তাঁহার কার্য্য দক্ষতার নিদর্শনরূপে তাঁহাকে শেষ বয়সে ঐ বেঞ্চের (Bench) আজীবন সভ্য (Life Member) করা হইয়াছিল। ১৯৩৭ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে (১৩৪৪ বঙ্গাব্দে, পৌষ) তিনি পরলোক গমন করেন।

প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাঙ্গালী কবি ও সাধক। ১২৫৫ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে ঢাকা জিলার অন্তর্গত বাহেরক গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি এক বৎসর বয়সেই পিতৃহীন হন। তাঁহার এক মাতুল এই দুঃসময়ে তাঁহাদের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করেন। তিনিও প্রসন্নকুমারের দুই বৎসর বয়সের সময়েই পরলোক গমন করেন। মাতা অবশেষে এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া বালক পুত্রের পড়াশুনার বন্দোবস্ত করেন। এইরূপে অতি কষ্টে প্রসন্নকুমার নর্ম্যাল দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া একটী পণ্ডিতের কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি নানা স্থানে পণ্ডিতের কার্য্য করিয়া অতি কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তিনি কালীভক্ত ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত ও কাব্য রচনায় তাঁহার আসক্তি ছিল। ১৪।১৫ বৎসর বয়সেই তিনি যাত্রা, কবি ও ঢোলীর গান রচনা করিয়া দল বাঁধিয়া গান করিতেন। তাঁহার রচিত গানের মধ্যে শ্যামা সঙ্গীতই বেশী।

তিনি স্বভাব কুলীন ছিলেন। তাঁহার তিন বিবাহ; প্রথমা পত্নীর গর্ভে এক কন্যা, দ্বিতীয়ার চারি পুত্র জন্মে। তৃতীয়া নিঃসন্তানা ছিলেন।

অর্থাভাবে তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি তিনি ছাপাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার কবিতা গ্রন্থ ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩০৬

সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর—কলিকাতার যোড়াসাঁকো অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশীয় ভূম্যধিকারী ও দেশহিত ব্রতী। উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল মনস্বী দেশহিতৈষণার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন, প্রসন্নকুমার তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। ১৮০১ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা নগরে পৈতৃক বাস ভবনে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গোপীমোহন ঠাকুরও তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। 'বেণীসংহার' নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকের রচয়িতা ভট্টনারায়ণ তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন।

সারবোর্ণ সাহেবের (সারবোর্ণ দ্রঃ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। পরে ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, তিনি তথায় প্রবেশ করেন এবং কয়েক বৎসর তথায় পাঠ করিয়া শিক্ষা সমাপন করেন।

পিতার মৃত্যুর পর তিনি বিষয় সম্পত্তির পরিচালনা করিতে থাকেন। তৎসঙ্গে তিনি নীলের ব্যবসায় ও তৈলের কল স্থাপন করেন। কিন্তু ঐ দুই ব্যবসায়ে তাঁহার প্রভূত অর্থ নষ্ট হয়। এই সংস্রবে কয়েকটি মোকর্দ্দমায় পরাজিত হইয়া তাঁহার মনে ধারণা হয় যে, অধিকাংশ ব্যবহারজীবিই যথেষ্ট সততার সহিত মক্কেলের কাজ পরিচালনা করেন না। তাহাতে মোকর্দ্দমা প্রার্থীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই কারণে তিনি স্বয়ং সদর দেওয়ানী আদালতে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই কার্য্যে অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার প্রভূত প্রতিপত্তি লাভ হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই অশেষ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। সেই সময়ে তদানীন্তন সরকারী উকীল বেলী সাহেবের মৃত্যু হইলে, তিনি তাঁহার পদাভিষিক্ত হন। বঙ্গদেশের নানাস্থানে তাঁহার ভূসম্পত্তি ছিল বলিয়া, ঐ পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করার বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ সে আপত্তি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নাই। সেই সময়ে তাঁহার সমকক্ষ ব্যবহারজীবি আর কেহ ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার ছিল। আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই তিনি দেশীয় ও পাশ্চাত্য ব্যবহার শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

তৎকালে রাজনৈতিক ও অন্যান্য নানাবিধ জনহিতকর আন্দোলনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে তিনি রিফর্ম্মার (The Reformer) নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র স্থাপন করেন। উহা দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মুখপাত্র

স্বরূপ ছিল। 'অনুবাদক' নামে বাঙ্গালা ভাষাতে একখানি সংবাদপত্র তিনি প্রকাশ করেন। উহাতে রিফর্ম্মারে প্রকাশিত অনেক বিষয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হইত। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের শাসনকালে যখন লাখেরাজ প্রথার উচ্ছেদ করিবার প্রথম চেষ্টা হয়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া তিনি উহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করেন। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া তিনি ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি (Land Holders' Society) নামে একটি জমীদার সভা প্রতিষ্ঠা করেন। অধুনা লুপ্ত ইংলিশম্যান পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক ও প্রসন্নকুমার উহার যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন। ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবারকালে প্রসন্নকুমার ভূমি সংক্রান্ত অনেক জটিল সমস্যার সমাধানে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দে লাখেরাজ প্রত্যাহারের জন্য পুনরায় বিধি প্রণয়নের উদ্যোগ হইলে উক্ত জমীদার সভা হইতে প্রবল ভাবে প্রতিবাদ করা হয়। এই উপলক্ষে টাউন হলে বিরাট-সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সকল প্রতিবাদের ফলেই প্রধানতঃ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের চেষ্টা পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে বেঙ্গল হরকারা (The Bengal Hurkara) নামক পত্রিকায় প্রসন্নকুমারের অনেকগুলি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে উক্ত জমিদার সভা, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সহিত মিলিত হইয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন (British Indian Association) স্থাপিত হয়। প্রথমাবধি প্রসন্নকুমার এই প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং কতিপয় বর্ষ পরে উহার প্রথম সভাপতি রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের মৃত্যুর পর তিনিই উহার সভাপতি মনোনীত হন। ইহার পূর্ব্বে ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দেই তিনি সরকারী উকীলের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার পিতা গোপীমোহন ঠাকুর হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন বলিয়া তাঁহার বংশ হইতে দুই ব্যক্তিকে উক্ত শিক্ষায়তনের পরিচালক সঙ্ঘের সদস্য নির্ব্বাচিত করা হইত। সেই কারণে গোপীমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দ্রকুমারের মৃত্যুর পর প্রসন্নকুমার অন্যতম সদস্য হন। ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে হিন্দু কলেজকে যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত করার আয়োজন হয়, তখন প্রসন্নকুমার, ঐ কলেজে তাঁহাদের বংশানুক্রমিক যে স্বত্ব ছিল তাহা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু সেই উপলক্ষে তিনি অতি দৃঢ়তার সহিত কর্ত্তৃপক্ষকে জানান যে 'নূতন কলেজটির স্থাপন ও পরিচালনার জন্য যে আমূল পরিবর্ত্তন-

মূলক বিধি প্রণীত হইতেছে, তাহাতে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাতৃগণের প্রধান উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ লুপ্ত হইবে, এমন কি ভবিষ্যতে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁহাদের দানের কথা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইবে। ইহাতে লর্ড ডালহৌসী নির্দ্দেশ দেন যে উক্ত কলেজ ভবনে, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাতৃগণের একটি স্মারক চিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু দীর্ঘকাল এ বিষয়ে কিছুই করা হয় নাই প্রসন্ন কুমারের উত্তরাধিকারী মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চেষ্টায় অবশেষে উহা সম্পন্ন হয়।

ব্যবহার শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকারের কথা কর্তৃপক্ষেরও গোচর ছিল। এই জন্য কোনও নূতন বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইলে তাঁহার মতামত গ্রহণ করা হইত। ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা যখন নূতন ভাবে গঠিত হয়, তখন লর্ড ডালহৌসী মাসিক বারশত মুদ্রা বেতনে তাহাকে একটি উচ্চপদ প্রদান করিতে চাহেন। অর্থের দিক দিয়া ঐ পদ গ্রহণ তাঁহার পক্ষে আদৌ লোভনীয় ছিল না, কিন্তু দেশের কল্যাণ করিতে সমর্থ হইবেন, এই বিশ্বাসেই তিনি ঐ পদ গ্রহণ করেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা পুরতন্ত্রের নূতন বিধি প্রণীত হইবার সময়ে নানাভাবে সাহায্য করেন এবং পুরতন্ত্রের একজন সদস্য মনোনীত হন।

প্রথম জীবনে তিনি রাজা রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসিয়া একেশ্বর বাদে বিশ্বাসী হন এবং উহার প্রচার কল্পে "An Appeal to my Countrymen" নামক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তৎসত্ত্বেও দেশপ্রচলিত পূজাপার্ব্বণাদিতে তিনি বিরূপ ছিলেন না। রামমোহন রায় প্রমুখ মনস্বীগণের চেষ্টায় সতীদাহ নিবারণের যে বিধি প্রবর্ত্তিত হয়, তিনি তাহার জন্য বিশেষ সাহায্য করেন। কিন্তু সাধারণতঃ সামাজিক সংস্কারে সরকারের হস্তক্ষেপের তিনি বিশেষ পক্ষপাতি ছিলেন না। এই কারণে গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ ও বহু বিবাহ নিবারণ কল্পে আইন প্রণয়নের চেষ্টা হইলে তিনি তাহার বিশেষ প্রতিবাদ করেন। সাধারণভাবে স্ত্রী শিক্ষায় তাঁহার উৎসাহ ছিল।

বিবাদ চিন্তামণি প্রমুখ স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থ তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তদ্ভিন্ন অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিকেও তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন অথবা মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করিতেন। নাট্য শিল্পেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। কলিকাতার উপকণ্ঠে শুঁড়া নামক স্থানে অবস্থিত তাঁহার উদ্যান বাটিকায়, শিক্ষিত সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকগণ কর্ত্তৃক নাটকাদির অভিনয় হইত।

সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট যে আবেদন প্রেরিত হয়,

তাহা অগ্রাহ্য হইলে প্রসন্নকুমার প্রমুখ সংস্কার-পন্থী হিন্দুগণ ইংলণ্ডের রাজাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে তিনি উদ্যোগী হইয়া রাজ প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিংকে (Lord Canning) রাজভক্তি জ্ঞাপন করিয়া এক অভিনন্দন প্রেরণ করেন।

১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি সি এস-আই (C. S. I.) উপাধি লাভ করেন এবং এবং তাহার পর বৎসর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। এক বৎসর পরে পুনরায় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হইবার অল্পকাল পরেই আগষ্ট মাসে (১৮৬৮ খ্রীঃ) তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মাচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করায় প্রসন্নকুমার তাঁহাকে ত্যজ্য পুত্র করেন। (জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রঃ)

প্রসন্নকুমার তর্করত্ন - হরমোহন চূড়ামণির পরে তাঁহার সহোদর ভ্রাতা মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে প্রসন্ন কুমার তর্করত্ন, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, লালমোহন বিদ্যাবাগীশ প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন প্রভৃতি নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন।

প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত, রায়বাহাদুর —ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত বেজগাঁ গ্রামে ১৮৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন। বি, এ পাশ করিয়া প্রথমে তিনি এক উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। পরে প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯০ সালে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। তিনি ন্যায়বান ও সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের নিকট চাহিয়া তাঁহাকে রোসনাবাদের জমিদারীর ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত করেন। পরে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করেন। এই কার্য্যে তিনি বিশেষ যশঃলাভ করিয়া ১৯২৩ সালে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণ, অমায়িক, আতিথেয় এবং সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন। তিনি কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (মে ১৯৩০ ইং) তিনি পরলোক গমন করেন।

প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন — নবদ্বীপের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। প্রসন্নকুমার তর্করত্ন দেখ।

প্রসন্নকুমার রায়— খ্যাতনামা বাঙ্গালী দার্শনিক পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী। তিনি ডাঃ পি-কে-রায় নামেই জন-

সাধারণে সমধিক পরিচিত ছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত শুভাঢ্যা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। অতি শৈশবেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তত্ত্বাবধানেই প্রধানতঃ লালিত পালিত হন। গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। পরে ঢাকায় থাকিয়া ক্রমান্বয়ে ছাত্রবৃত্তি, প্রবেশিকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ-এ (First Arts) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিশেষ মেধাবী ও কৃতী ছাত্ররূপে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। বি এ উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি উচ্চ শিক্ষালাভার্থ ইংলণ্ডে গমন করিবার জন্য গিলক্রাইষ্ট (Gilchrist) বৃত্তি লাভ করেন। ঐ বৃত্তির সাহায্যে তিনি পাঁচ বৎসর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তাঁহার অসাধারণ মনীষায় প্রীত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পাঁচ বৎসর পরে তাঁহাকে আরও এক বৎসর একটি বিশেষ বৃত্তি প্রদান করেন। সর্ত্ত হইয়াছিল যে, তিনি পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিতে না পারিলে, বৃত্তির সমুদয় অর্থ প্রত্যর্পণ করিবেন। সুখের বিষয় পরীক্ষায় যথাযোগ্য কৃতীত্ব প্রদর্শন করিয়া তিনি ঐ সর্ত্তের অধীনতা হইতে মুক্তি লাভ করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ডি-এস্-সি (D.Sc.) উপাধি লাভ করেন। তাহার পর পুনরায় স্কটলণ্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াও তদনুরূপ উপাধি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। লণ্ডনে অধ্যয়নকালে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ মনীষি জে-বি হালডেন (J. B. Haldane; পরে Viscount Haldane হন) তাঁহার সমপাঠী ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের সৌহার্দ্দ্য আজীবন অটুট ছিল।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি প্রথমে পাটনা কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। শিক্ষা বিভাগে তৎকালে ইংরেজ অধ্যাপকদিগের জন্য একরূপ বিশেষভাবেই নির্দ্দিষ্ট উচ্চ শ্রেণীর অধ্যাপকের পদই (I. E. S.) দেওয়া হয়। পাটনা হইতে তিনি ঢাকায় যান, পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে বদলী হন। এই খানেই তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হইবার সুযোগ ঘটে। কিছুকাল তিনি অস্থায়ীভাবে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষের পদও লাভ করেন। ভারতীয়দিগের মধ্যে তিনিই প্রথম ঐ পদ লাভ করিতে সমর্থ হন। এই সময়ের মধ্যেই কয়েক বৎসর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্ম্মসচিবের পদে (Registrar) কাজ করেন।

যথাসময়ে সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ

কলেজ সমূহের ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হন। ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইলে দেশে উহার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হয়। স্যার গুরুদাস প্রমুখ মনীষিবর্গও উহার প্রতিবাদ করেন। মনীষি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ আইনের বিরুদ্ধাচরণ নিষ্ফল বুঝিয়া উহার দ্বারাই যতটুকু উপকার সাধন করা যায়, তাহার চেষ্টা করিতে থাকেন। এই বিষয়ে আচার্য্য প্রসন্নকুমার রায় আশুতোষের মতানুগামী ও বিশেষ সহকর্ম্মী ছিলেন। মফস্বলের কলেজসমূহ পরিদর্শনকালে তিনি কলেজ পরিচালকবর্গের নানারূপ অসুবিধার সমাধান কল্পে সুপরামর্শ দান করিয়া শিক্ষাবিস্তারের অশেষ সাহায্য করেন। কর্ম্মজীবনের মধ্যে দুই বৎসরের জন্য তিনি ভারত সচিবের (Secretary of States for India) শিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ দাতার (Educational Adviser) কাজে নিযুক্ত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন।

যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলনের সংস্পর্শে আসিয়া উহার প্রভাবাধীন হন। তৎফলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃক পিতৃভবন হইতে বিতাড়িত হন। ঢাকায় অধ্যয়নকালে আরও ঘনিষ্ঠভাবে ব্রাহ্মসমাজের সহিত যুক্ত হন এবং আরও অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির সহিত কেশবচন্দ্র সেনের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। দেশহিতব্রতী দুর্গামোহন দাসের কন্যা সরলা দেবীকে, তিনি বিবাহ করেন। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র দুর্গামোহনের অপর জামাতা ছিলেন। তাঁহার এক কন্যার সহিত একজন ইংরেজ সিবিলিয়ানের (I.C.S.) বিবাহ হয়। পরবর্ত্তী জীবনে একমাত্র কৃতী পুত্রের মৃত্যুতে তিনি বিশেষ শোক পাইয়াছিলেন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু কখনও নিজের বিদ্যাবত্তা প্রদর্শনের চেষ্টা করিতেন না বলিয়া নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু অথবা ছাত্রবর্গ ব্যতীত জনসাধারণ তাঁহার মেধা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইতেন না। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সংস্রবে ধর্ম্মতত্ত্ব (Theology) আলোচনা করিবার জন্য তিনি একটি তত্ত্ববিদ্যা সভা (Theological Institution) প্রতিষ্ঠা করেন। মনীষী হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ উহার সহিত যুক্ত ছিলেন। সিটি কলেজের সহিত তিনি ঐ শ্রেণীর একটি প্রতিষ্ঠান যুক্ত করেন। বর্দ্ধমানের তদানীন্তন মহারাজা উহার জন্য যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতেন। কিছুকাল তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

১৯৩২ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে

(১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, মাঘ) হাজারিবাগ নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী—একজন খ্যাতনামা দেশহিতকারী ও শিক্ষাব্রতী। ১৮২৫ খ্রীঃ অব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে সম্ভ্রান্ত বসু বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। যুগাবতার রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমিও রাধানগর গ্রাম। এইজন্য এই গ্রামটি বিশেষ বিখ্যাত। কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন কায়স্থ বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, এই বসুবংশ তাঁহাদের অন্যতমের বংশধর। দিল্লীর বাদশাহ গিয়াসুদ্দিন বা তৎপুত্র মোহাম্মদ তোগলকের নিকট হইতে সুরেশ্বর বসু 'সর্ব্বাধিকারী' (Head of all classes) উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রসন্নকুমারদের আদি নিবাস রঘুনাথপুরে (হুগলী) ছিল। খানাকুল কৃষ্ণনগরের চৌধুরী বংশের সহিত বসু বংশের রত্নেশ্বর সর্ব্বাধিকারী বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন এবং চৌধুরীদের বিশেষ চেষ্টায় তিনি রঘুনাথপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক রাধানগরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এই বসুবংশের রামনারায়ণ মুন্সী সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ফারসী রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং ফারসী রচনায় সুখ্যাতির ফলে মুন্সী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সর্ব্বাধিকারীদের 'মুন্সীচালা' তাঁহারই কীর্ত্তি। সমাজে নিজ বংশের কৌলিন্য বর্দ্ধিত করিবার জন্য তিনি 'নবরঙ্গকুল' করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহারা 'নবরঙ্গী' নামে অভিহিত হন। খিদিরপুরের মুন্সীর বাগান তাঁহারই নামে প্রসিদ্ধ। প্রসন্নকুমার রামনারায়ণের প্রপৌত্র। প্রসন্নকুমারের পিতার নাম যদুনাথ। তিনিও একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। দেশবিখ্যাত ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রসন্নকুমারের অনুজ ছিলেন।

প্রসন্নকুমার খিদিরপুরে থাকিয়া হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা ছিল অসাধারণ। ইংরাজী, সংস্কৃত, ইতিহাস, দর্শন ও অঙ্ক শাস্ত্রে তিনি অতিশয় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। হিন্দু কলেজের শেষ পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি ও স্বর্ণ পদকসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চ্চার উপকারিতা' সম্বন্ধে Senior Scholarship পরীক্ষায় প্রবন্ধ লিখিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করেন। তিনি এক শতাব্দী পূর্ব্বে বিজ্ঞান চর্চ্চা সম্বন্ধে যে প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদিত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তাহাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বাংশে গৃহীত হইতেছে। অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি প্রথমে ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হন। তৎপরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও

পরে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। এই সম্মান তিনি ভিন্ন অন্য কোন কায়স্থের ভাগ্যে ঘটে নাই। কর্তৃপক্ষের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি একবার অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন। শিক্ষা বিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষ (Director) উড্রো সাহেবের (Henry Woodrow) চেষ্টায় তিনি আবার পূর্ব কর্মে প্রত্যাবর্তন করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার নিকট ইংরেজী শিক্ষা করিতেন এবং তিনি বিদ্যাসাগরের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। কিছুকাল তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজী ও ইতিহাসের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি ক্রমে বর্দ্ধমান বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক ও বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি যখন ঢাকা কলেজে কার্য্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার খুল্লতাত রাজা সীতানাথ সর্ব্বাধিকারী এই প্রতিভাবান্ ভ্রাতুষ্পুত্রকে মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এই কার্য্য গ্রহণ করিলে রাজোপাধি পাওয়ারও বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সহপাঠী খ্যাতনামা উকিল শ্রীনাথ দাস মহাশয় তাঁহাকে সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দেশহিতকর শিক্ষকের কার্য্যেই নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই তিনি নবাব সরকারে চাকুরী অথবা সদর দেওয়ানীতে ওকালতী কোনটাই গ্রহণ করেন নাই। রাধানগর গ্রামে তিনি 'প্রসন্নকুমার সেমিনারি' নামে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বোপার্জ্জিত অর্থের অর্দ্ধাংশই তিনি ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য ব্যয় করিতেন। ঐ বিদ্যালয়টি অনেকাংশে সংস্কৃত কলেজের আদর্শে পরিচালিত হইত। দীর্ঘ অবকাশের সময় তিনি গ্রামে যাইয়া ছাত্রগণকে পাঠ দিতেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল এবং অনেক সময়ে তিনি সাময়িক প্রধান ইংরাজ জ্যোতির্ব্বিদের গণনায় দোষ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার রচিত পাটীগণিত ও বীজগণিত অতি সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক। বর্ত্তমানেও সেই পুস্তকের যথেষ্ট আদর আছে। অঙ্কশাস্ত্রের বাঙ্গালা পরিভাষার প্রচলন তিনিই সর্ব্বপ্রথম করেন। সহৃদয়তা, সৌজন্য, পরোপকার প্রভৃতি গুণের জন্য তিনি ছাত্রগণের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। অনেক দরিদ্র ছাত্রকে তিনি খাওয়া পড়া ও শিক্ষার জন্য অর্থ দান করিতেন। চাকুরী হইতে অবসর-বৃত্তি (Pension) গ্রহণ করিবার কিছুকাল পরে ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন, শোভাবাজারের

স্বনামখ্যাত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাঁহার এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

প্রসন্ন কুমার সেন— তিনি বরিশাল জেলার অন্তর্গত কীর্ত্তিপাশার জমিদার রাজকুমার সেনের একমাত্র পুত্র। ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি পিতৃহীন হন। তাঁহার বিস্তৃত জমিদারীর পরিচালক তখন গবর্ণমেণ্ট হন। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি সাবালক হইয়া জমিদারীর ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও বদান্য ছিলেন। স্বীয় গ্রামে একটী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এতদ্ব্যতীত বহু সদনুষ্ঠানের সহিত তিনি সংযুক্ত ছিলেন। তিনি জুওলজিকেল গার্ডেন, রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী, জমিদারী পঞ্চায়ৎ, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রভৃতি সমিতির সভ্য ছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থ দর্শন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং সেই বৎসরেই পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি রোহিণী কুমার, কামিনীকুমার, রমণী কুমার ও বিনোদ কুমার নামে চারি পুত্র এবং তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে রোহিণী কুমার একজন গ্রন্থকার ছিলেন।

প্রসন্নকুমার সেন, রায় সাহেব— খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ও একনিষ্ঠ শিল্পসাধক। ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রামের অন্তর্গত নোয়াপাড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি মেধাবী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা অতিশয় অস্বচ্ছল ছিল। পাঠ্যাবস্থায় তিনি গৃহশিক্ষকের কার্য্য করিয়া নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।

১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তিনি দশম শ্রেণী হইতে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। অতঃপর কপর্দ্দকহীন অবস্থায় বহুদিন নানা স্থান ভ্রমণ করার পর একজন পরিচিত রেল কর্ম্মচারীর সাহায্যে চট্টগ্রাম রেল ষ্টেশনে পনর টাকা বেতনের এক চাকুরী প্রাপ্ত হন। এই কাজ করিবার সময়ে ঘটনাচক্রে তিনি তদানীন্তন চট্টগ্রামের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী খাঁ সাহেব আবদুর রহমান দোভাষীর সুনজরে পতিত হন। দোভাষী সাহেব তাঁহাকে পাঁচশ টাকা বেতনে নিজের কেরাণীর পদে নিযুক্ত করেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতিভা ও উদ্যমশীলতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ম্যানেজারের (Manager) পদে নিযুক্ত করেন।

কয়েক বৎসর পরে তিনি ক্রমে ক্রমে স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতি মনোযোগ দিতে লাগিলেন এবং প্রথমে একটী মনোহারী দোকান ও তৎপরে

বর্ম্মা অয়েল কম্পানীর (B. O. C.) এজেন্সীতে যোগদান করেন। ঐ সময়ে (১৯১৩ খ্রীঃ) মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি দোভাষী সাহেবের ম্যানেজার-রূপে তাঁহার উদ্যোগে ও তত্বাবধানে সহরে অনেকগুলি জাহাজ নির্ম্মাণ করান। তাহাতে ভারতীয় অন্যান্য বন্দর ও চট্টগ্রামের মধ্যে আমদানী রপ্তানি চলিত। এই প্রকারে নানাদিকে বহু দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনার ফলে তিনি নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

১৯১২ খ্রীঃ অব্দে তিনি বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে চালমুগরা তৈলের ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। অতঃপর ১৯২০ খ্রীঃ অব্দে তিনি দোভাষীর সাহেবের কার্য্য ত্যাগ করেন এবং খাঁটী সরিষার তৈল সরবরাহ করিবার জন্য ঐ বৎসরই এক বিরাট তেলের কল (Oil Mill) ও কয়েক বৎসর পর এক চালের কল (Rice Mill) স্থাপন করেন। ১৯২০ খ্রীঃ অব্দে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তিনি 'কটন জিনিং ফ্যাক্টরী' নামক এক বিরাট সূতার কারখানা স্থাপন করেন। তাঁহার চালমুগরা তৈল ও মলমাদি অধুনা বিশ্ব বিখ্যাত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিবিধ সুগন্ধ দ্রব্যাদিও তাঁহার কারখানায় প্রস্তুত হয়। ১৯৩৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার বিরাট সৌধ প্রসন্নধামের শীর্ষদেশে 'সৌর জগৎ' স্থাপন করেন শিল্প ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন ও ধর্ম্মের স্থান হিসাবে ইহা চট্টগ্রামের অন্যতম দর্শনীয় বস্তু।

এইভাবে তিনি অতি দীন অবস্থা হইতে বিপুল ধনের অধিকারী হন। দরিদ্রকে অন্নদান, বন্ধুজনকে সাহায্য এবং সকল সদনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি সৎকার্য্যের দ্বারা অনন্যসুলভ ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। চট্টগ্রামের বহু বিশিষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং চট্টগ্রামের পুরতন্ত্রের একজন সদস্য হইয়াছিলেন।

১৩৪২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে (১৯৩৫ খ্রীঃ, সেপ্টেম্বর) মাত্র একান্ন বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার পাঁচ পুত্র, এক কন্যা ও বিধবা স্ত্রী বর্ত্তমান ছিলেন।

প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন—নবদ্বীপে শ্রীরাম শিরোমণির পরে তৎপুত্র হরমোহন চূড়ামণি প্রাধান্য লাভ করেন। তাঁহার প্রাধান্যের সময়ে মাধব তর্কসিদ্ধান্ত ও প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। এই সময়ে ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (E. B. Cowell) কাউয়েল সাহেব গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া নবদ্বীপের টোল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন।

তিনি প্রসন্ন তর্করত্নের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার টোলগৃহ বাবুলাল নামক একজন লক্ষ্ণৌবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তিকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাই নবদ্বীপের পাকা টোল।

প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহামহোপাধ্যায়—ঢাকা জিলার শ্রীনগর থানার অন্তর্গত আটপাড়া গ্রামে ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দের শ্রাবণ মাসে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম স্বরূপ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। প্রথমে তিনি কিছুকাল পাঠশালায় পড়িয়া পরে টোলে সংস্কৃত কলাপব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। তৎপরে বিক্রমপুর ইছাপুরের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক কাশীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন, স্মার্ত্ত কালীকান্ত শিরোমণি প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের নিকট অধ্যয়ন করিয়া কিছুকাল ঢাকা কাছারিতে নকলনবিশের কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার মনোমত না হওয়ায়, তিনি পুনঃ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া নর্ম্মাল স্কুলে প্রবেশ করেন। নর্ম্মাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত হন শেষে তিনি ঢাকা কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই উভয় পদে তিনি দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ সমগ্র বাঙ্গালা দেশে তাঁহার নাম বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে। ঢাকা সারস্বত সমাজ প্রতিষ্ঠা তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। ইহাদ্বারা পূর্ব্ববঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চার বহুল প্রচারের সহায়তা হয়। তিনি সারস্বত সমাজের সম্পাদকরূপে পূর্ব্ববঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চার প্রসারকল্পে যথেষ্ঠ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সারস্বত নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকাও উক্ত সমাজ হইতে প্রকাশিত হইত। উক্ত পত্রিকায় বাঙ্গালা ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইত। তাঁহার যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদান দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৯১১ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে ৭২ বৎসর বয়সে তিনি একমাত্র কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

প্রসন্ন নাথ রায়—রাজসাহী জিলার অন্তর্গত দীঘাপাতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায়ের পৌত্র ও জগন্নাথ রায়ের পুত্র প্রাণনাথ রায় অপুত্রক ছিলেন। তিনি প্রসন্ননাথ রায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। প্রাণনাথ পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পোষ্যপুত্র প্রসন্ননাথ সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি প্রতিভাশালী, বুদ্ধিমান ও বদান্য ভূম্যধিকারী ছিলেন। তিনি নানাবিধ সৎকার্য্যে বহু অর্থ দান করিয়া স্বীয় উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান ও অর্থের যথার্থ সদ্ব্যয়

করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিবিধ দানের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান। দিঘাপাতিয়া হইতে রাজসাহী সদর পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত রাস্তার জন্য তিনি এককালীন পঁয়ত্রিশ হাজার ও তাহার রক্ষার জন্য কয়েক সহস্র মুদ্রা গবর্ণমেণ্ট হস্তে প্রদান করেন। দিঘাপাতিয়ার ইংরেজী বিদ্যালয়, এবং নাটোর ও রাজসাহী সদরে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া, তাহার রক্ষার্থ গবর্ণমেণ্ট হস্তে একলক্ষ টাকা প্রদান করেন। ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট এই গুণ-গ্রাহী বিদ্যোৎসাহী ও বদান্য রাজাকে 'রাজা বাহাদুর' এই উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে কিছুকাল রাজসাহীতে সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজও করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে এই দাতা পরোপকারী ও স্বদেশবৎসল রাজা পরলোক গমন করেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া প্রমথনাথ রায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী—পাবনা জিলার বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ও সাহিত্যিক। ১২৬১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি উত্তর বঙ্গের এক প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী বংশসম্ভূত ছিলেন। শৈশবেই পিতৃহীন হওয়ায় তিনি নানারূপ অসুবিধার মধ্যে থাকিয়া শিক্ষালাভ করেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি বি-এ উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংস্কৃতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া 'রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব স্বর্ণপদক' লাভ করেন। ইহার পর কিছুকাল তিনি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহকারী হইয়া প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা করেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে আইন পরীক্ষায় (B. C.) উত্তীর্ণ হইয়া পাবনাতে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পরিশ্রম ও ব্যবসায় বুদ্ধি বলে অল্পকাল মধ্যেই আইন ব্যবসায়ীদের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি পাবনার সরকারী উকীল নিযুক্ত হন এবং ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ১৯২৮ খ্রীঃ অব্দে অবসর গ্রহণ করেন।

সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার ছিল। তিনি স্বরচিত টীকাসহ গায়ত্রীর শঙ্কর ভাষ্য ও সায়ন ভাষ্য আরও দুই প্রকার ভাষ্য প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থখানি পণ্ডিত সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল।

ব্যবহার শাস্ত্রেও তাহার গভীর জ্ঞান ছিল। ঐ বিষয়ে তাঁহার Confessions and Evidence of Accomplices এবং Prosecutions in False Cases নামক পুস্তকদ্বয় বিশেষজ্ঞ

মহলে আদৃত হইয়াছিল। নিজেকে কষ্ট স্বীকার করিয়া বিদ্যার্জন করিতে হইয়াছিল বলিয়া, তিনি আজীবন বহু দরিদ্র ছাত্রকে শিক্ষা লাভের জন্য অর্থ সাহায্য করিতেন। নিজ গ্রামে তিনি একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিশেষ পরিশ্রম করেন। মাতার নামে তিনি হরসুন্দরী চতুষ্পাঠী এবং পাবনা সহরেও একটি দর্শন আলোচনার চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং উহাদের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য জীবিত-কালে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেন।

প্রত্নতত্ত্বেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। মাধাই নগরের তাম্রশাসনের তিনি যে পাঠোদ্ধার করেন, তাহাই শুদ্ধ পাঠ বলিয়া গৃহীত হয়। দেশের নানারূপ জনহিতকর কার্য্যের সহিত তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল। বহু বৎসর পাবনা পুরতন্ত্রের সভাপতি থাকিয়া নানারূপে পাবনা সহরের উন্নতি সাধন করেন।

১৩৪০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে (১৯৩৩ খ্রীঃ জুলাই) তাঁহার দেহান্ত হয়।

প্রসেনজিৎ—কোশল রাজ্যের অধি-পতি। তিনি খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মহাকোশল। প্রসেনজিতের রাজ্য বহু বিস্তৃত ছিল। কাশী তাঁহার রাজ্যান্ত-র্ভূত ছিল এবং শাক্য প্রদেশেও তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকৃত হইত। তিনি গৌতম-বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহা-দের উভয়ের একাধিকবার সাক্ষাৎ ও আলোচনার বিবরণ পালি বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে জানা যায়। শাক্য-বংশীয় মহানামার কন্যা বাসব ক্ষত্রিয়া তাঁহার অন্যতমা মহিষী ছিলেন। বাসব ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র বিড়ূঢব তাঁহার মৃত্যুর পর রাজা হন। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে প্রসেনজিৎকে উপলক্ষ করিয়া বহু মনোহর আখ্যায়িকা আছে। ঐ সকল আখ্যান হইতে তৎকালীন সামা-জিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। প্রসেন-জিতের ভগিনী কোশলাদেবীকে মগধের অধিপতি বিম্বসার বিবাহ করিয়া-ছিলেন। বিবাহের যৌতুক স্বরূপ কাশীর কিয়দংশ তিনি পাইয়াছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু স্বীয় পিতা বিম্বিসারকে বন্দী করিয়া অনাহারে হত্যা করেন। কোশল দেবী স্বামী শোকে প্রাণত্যাগ করেন। প্রসেনজিৎ সেইজন্য মগধ আক্রমণ করিয়া, স্বীয় ভাগিনেয় অজাতশত্রুকে বন্দী করেন এবং যৌতুকরূপে দত্ত কাশী রাজ্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। পরে উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয়। সন্ধির সূত্রানুসারে অজাতশত্রু স্বীয় মাতুল প্রসেনজিতের কন্যা বীরজাকে বিবাহ করেন এবং কাশী

রাজ্য পুনঃ যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন। কোশলরাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী নগরে ছিল।

প্রহ্লাদ—তিনি একজন বাস্তুশাস্ত্রকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম প্রহ্লাদতন্ত্র কিন্তু তাহার সন্ধান এখন পাওয়া যায় না।

প্রাচীন শাল—তিনি মহর্ষি উপমন্যুর পুত্র। কথিত আছে কেকয় দেশে অশ্বপতি নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তাঁহার নিকট গমন করিয়া প্রাচীন শাল, সত্যযজ্ঞ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, জন ও বুড়িল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ— একজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। তিনি 'জাতক মার্ত্তণ্ড' নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য— কলিকাতা নিবাসী প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে (ভাদ্র-১২৬৮ বঙ্গাব্দ) পাবনা নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হরেকৃষ্ণ আচার্য্য। প্রাণকৃষ্ণ শৈশবেই পিতৃহীন হন। হরেকৃষ্ণের আর্থিক অবস্থা আদৌ স্বচ্ছল ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর বিধবা পত্নী দুইটি শিশু পুত্রকে লইয়া কঠোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রাণধারণ করিতে থাকেন।

প্রাণকৃষ্ণ অধ্যয়নে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন এবং স্বভাবসিদ্ধ মেধার বলে একাধিকবার বৃত্তি পাইয়া কখনও একসঙ্গে এক শ্রেণী অতিক্রম করিয়া উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইতেন অথচ অর্থাভাবে অনেক পাঠ্য পুস্তক কিনিবার সামর্থ্য ছিল না। প্রতিবেশী সমপাঠীদের নিকট হইতে পুস্তক চাহিয়া আনিয়া পাঠ করিতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৫৲ টাকা বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা আসিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। পরবর্ত্তী এফ্-এ (First Arts) পরীক্ষাতেও কৃতীত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পঁচিশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। পরে যথাসময়ে যোগ্যতার সহিত বি-এ, পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ইংলণ্ড গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়া গিলখ্রাইষ্ট বৃত্তি'র (Gilchrist Scholarship) জন্য পরীক্ষা দেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর দুইটি ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হইত। কিন্তু সেই বৎসর মাত্র একটি ছাত্রকে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হওয়ায়, তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াও বৃত্তি লাভ করিতে পারিলেন না।

অতঃপর তিনি চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। সেইখানেও বিভিন্ন পরীক্ষাতে কৃতীত্ব প্রদর্শন করিয়া বৃত্তি ও বহু পদকাদি লাভ করেন। শেষ পরীক্ষায় বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া 'গুডিভ বৃত্তি' লাভ করেন এবং ইডেন হাস

পাতালের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে ইংরেজ অধ্যক্ষের কোনও ব্যবহারে অতিশয় অপমান বোধ করিয়া পদত্যাগ করেন। তদবধি স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন। সুচিকিৎসকরূপে তাঁহার খ্যাতি বিশেষ বিস্তার লাভ করে। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সকলেই প্রীত হইতেন। অনেক সময়ে দরিদ্র রোগীর ঔষধ কিনিবার অর্থও তিনি প্রদান করিয়া আসিতেন। শেষ জীবনে একাধিক দেশীয় রাজের গৃহ চিকিৎসক হইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন।

ছাত্রাবস্থাতেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ লাভ করেন এবং সংসারে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ঢাকা জিলার কালীনারায়ণ গুপ্তের কন্যাকে (সার কে, জি, গুপ্তের ভগিনী) তিনি বিবাহ করেন।

১৯০৫ খ্রীঃ অব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ঐ সময়ে তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গের প্রাণে উৎসাহের সঞ্চার করিত। অনেক দেশীয় যৌথ ব্যবসায়ের সহিত যুক্ত থাকিয়া স্বদেশী শিল্পের উন্নতির জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেন। এই কার্য্যে পরবর্ত্তী জীবনে লক্ষাধিক টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও কোনও দিন উহার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন না।

প্রাণকৃষ্ণ আবাল্য ধর্ম্মভীরু ছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁহার ধর্ম্মমূলক বক্তৃতা, উপাসনাদি জনগণের প্রাণে ভক্তিরসের সঞ্চার করিত। দেশীয় ও বৈদেশিক ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার জন্মিয়াছিল।

শিক্ষাবিস্তারের কার্য্যেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। হাওড়া জিলায় বাণীবন পল্লীতে অবস্থিত বালিকাদের প্রাথমিক (বর্ত্তমানে মধ্য ইংরেজি) বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তিনি প্রভূত পরিশ্রম ও অর্থ সাহায্য করেন। অনুন্নত জাতি সমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতির (Society for the Improvement of Backward Classes) কর্ম্মকর্ত্তারূপেও তিনি গুরুতর পরিশ্রম করিতেন। অথচ কখনও নিজের প্রশংসা লাভের জন্য উৎসুক ছিলেন না। সর্ব্বদাই সকলের পশ্চাতে থাকিয়া সকল প্রকার সৎকার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন।

পাঠ্যজীবনে দারিদ্র্যের সহিত কঠিন সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইয়াছিল বলিয়া, তিনি দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের পরম সহায় ছিলেন। গোপনে এই সকল ছাত্রদের যে তিনি কত সাহায্য করিতেন তাহা খুব কম লোকই জানিতে পারিত। মৃত্যুকালে দরিদ্র ছাত্রদের

অধ্যয়নে সাহায্যের জন্য অর্থদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দের জুন মাসে (১৩৪৩ আষাঢ়) কলিকাতা নগরে অল্প কয়েকদিন পীড়িত থাকিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার দুই কৃতীপুত্র ও এক (বিবাহিতা) কন্যা বর্তমান ছিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী—তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব আলীবর্দী খাঁর অন্যতম দেওয়ান রাজারাম চৌধুরীর প্রপৌত্র। তাঁহার প্রপিতামহ অতুল ঐশ্বর্য্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু পলাশী যুদ্ধের পর ক্লাইভ ও ওয়াটসন সাহেব, ফরাসাদের প্রতি আক্রোশবশতঃ চন্দননগর আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করেন। সেই সময়ে এক চৌধুরীদের বাড়ী লুণ্ঠন করিয়াই ইংরেজেরা ৬২ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। ইহার পরে তাঁহাদের অবস্থা অনেকটা হীনপ্রভ হয়। রাজারামের পুত্র রাম নারায়ণ, তৎপুত্র মধুসূদন। তাঁহার পুত্র প্রাণকৃষ্ণ। তিনি প্রতিভাবলে অবস্থার বিশেষ উন্নতিবিধান করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি কলিকাতার জের্জ্জ হেণ্ডারসন কোম্পানীর আফিসে সামান্য বেতনে কর্ম্মে নিযুক্ত হন। পরে সেই কোম্পানীর মুৎসুদ্দি পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি চন্দননগরের প্রথম বাঙ্গালী মেয়র এবং প্যারি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙ্গালী সদস্য নিযুক্ত হন। রাজারামের বংশধরেরাই চন্দন নগর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের গোষ্ঠিপতি ও সমাজপতি। প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বিদেশে উচ্চ স্থান লাভের জন্য একটী স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া তাহার নাম—"বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভার্থ প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী ফণ্ড" রাখেন। অর্থ ভাণ্ডারের সাহায্য পাইয়া প্রথম ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু আই, এম, এস (I.M.S.) বিলাত গমন করেন। ইহার একটী সর্ত্ত থাকে যে বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া অন্য একটী ছাত্রকে অনুরূপ সর্ত্তে উচ্চ শিক্ষার্থ প্রেরণ করিতে হইবে। প্রাণ কৃষ্ণ চৌধুরী যেমন বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন তেমনি সুবক্তাও ছিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস—খড়দহের জমিদার রামহরি বিশ্বাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে রামহরি বিশ্বাস, প্রাণকৃষ্ণ ও ও জগমোহনকে রাখিয়া পরলোকবাসী হন। প্রাণকৃষ্ণ কুচবিহার ও শ্রীহট্টে দেওয়ানের কাজ করেন। তিনি প্রাণতোষিণী, বৈষ্ণবামৃত, বিষ্ণুকৌমুদী, ভাষ্কৌমুদী, শব্দাম্বুধী, ক্রিয়াম্বুধী, ঔষধাবলী প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বিতরণ করেন। তিনিও তাঁহার পিতৃদেবের ন্যায়, খড়দহে চতুর্দ্দশটী দেবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। পুরুষোত্তম তীর্থের ন্যায় খড়দহে গ্রামে আর একটী

রত্নবেদী করিবার জন্য তিনি আশী হাজার শালগ্রাম শীলা ও বিশ হাজার বাণলিঙ্গ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার পুর্ব্বেই অকস্মাৎ ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ছয় পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান ছিলেন। রামহরি বিশ্বাস দেখ।

প্রাণকৃষ্ণ লাহা—খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ও বিশিষ্ট নাগরিক কলিকাতা ঠন্‌ঠনিয়ার প্রসিদ্ধ লাহাবংশের আদি নিবাস সপ্তগ্রামে ছিল। প্রাণ-কৃষ্ণের পিতা রাজীবলোচন প্রথম জীবনে পাটনায় কোন কুঠীতে কাজ করিতেন। পরে তিনি চুঁচুড়া সহরে আসিয়া বাস করেন। এখানে তিনি ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে, প্রাণকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ ও বটুকৃষ্ণ নামে তিন পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। প্রাণকৃষ্ণ কিছু ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি চুঁচুড়ার এণ্ড্রু সাহেবের পুস্তকালয়ে প্রথমে বার টাকা বেতনে কেরাণী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই পুস্তকালয়টী উঠিয়া গেলে তিনি কিছুদিন চুঁচুড়ার আদালতে কাজ করেন। এই সময়ে তিনি আইন সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। এই স্থানে তিনি সুপ্রিম কোর্টের একজন প্রধান এটর্ণি মিঃ হার্ডওয়ার্ড সাহেবের প্রধান কেরাণীর পদ লাভ করেন। এই পদে তাঁহার বেতন তিনশত টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তাহার পরে তিনি কোম্পানীর কাগজ ক্রয় বিক্রয়, এবং অহিফেন ও লবণের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইহাতে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল। তীক্ষ্ণ ব্যবসায় জ্ঞান, সাধুতা ও মিতব্যয়িতা গুণে তিনি অল্প-কাল মধ্যেই প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন। খ্যাতনামা মতিলাল শীল মহাশয় তাঁহাকে অতিশয় ভাল-বাসিতেন। তাঁহার সহায়তায় তিনি সণ্ডার কোম্পানী নামক সওদাগর অফিসে প্রধান মুৎসুদ্দির পদ লাভ করেন। ইহার পরে আরও কয়েকটী সওদাগরী আফিসে মুৎসুদ্দির পদ তিনি পাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এই প্রকারে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইয়া-ছিল। ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি নিজস্ব একটী সওদাগরী অফিস স্থাপন করেন। তৎকালে তিনি একজন বিখ্যাত সওদাগর বলিয়া দেশ বিদেশে পরিচিত ছিলেন এবং কলিকাতায়ও একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে ৬৩ বৎসর বয়সে, দুর্গাচরণ, শ্যামাচরণ ও জয়গোবিন্দ নামে তিন কৃতীপুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া, তিনি পরলোক গমন করেন। (পুত্রদের বিষয় স্ব স্ব নামে দ্রষ্টব্য)।

প্রাণধন বসু, ডাক্তার—কলিকাতার

একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে তিনি কলিকাতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। দেশের বিভিন্ন জনহিতকর কার্য্য ও প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি কলিকাতার মূকবধির বিদ্যালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ (Secretary), কলিকাতা মেডিকেল ক্লাবের অবৈতনিক কর্ম্মসচিব, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক, সেণ্টপলস কলেজ ও স্কুলের অবৈতনিক চিকিৎসক ও পরিচালক সমিতির সদস্য এবং কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের আজীবন সভ্য ছিলেন। দেশীয় ও বিদেশীয় অনেক বিখ্যাত চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রে তিনি গভীর তথ্যপূর্ণ ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিতেন। ১৯৩৯ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি পরোপকারী ও দরিদ্রেরবন্ধু ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার দুই পুত্র ও তিন কন্যা বর্ত্তমান ছিলেন।

প্রাণধর মিশ্র—একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। তিনি ১৭২২ শকের (১৮০০ খ্রীঃ) পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। 'জাতক চন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত। পরশুরাম শুক্ল কৃত ইহার টীকা আছে।

প্রাণনাথ-(১)তিনি একজন উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। তিনি খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে জীবিত ছিলেন। গুজরাটের অন্তর্গত কাঠিওয়ার তাঁহার জন্মস্থান। প্রথম জীবনে তিনি ভারতবর্ষের সমুদয় তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত পান্না রাজ্যে বাস করিতে থাকেন। বুন্দেলখণ্ডের রাজা ছত্রশাল তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং অতিশয় উদার মতাবলম্বী ছিলেন। সেজন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই তাঁহার শিষ্য ছিল। তাঁহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় 'ধামী' নামে অভিহিত হয় এবং তাঁহাদের সম্প্রদায়ের গ্রন্থের নাম 'কুলজুম'। তাঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই। হিন্দু মুসলমান একত্রে বসিয়াই ভোজন করে। তাঁহারা এক ঈশ্বরবাদী। তাঁহাদের সাধনার প্রধান অঙ্গ সুনীতি, চরিত্রের বিশুদ্ধি, মানুষের সেবা, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি। নানক, কবীর, দাদূ প্রভৃতির ন্যায় মহাত্মা প্রাণনাথও হিন্দু ও মুসলমানের মিলনাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

প্রাণনাথ—(২) তিনি একজন নাথ পন্থী যোগী। গোরক্ষনাথের পরে অনেক বড় বড় যোগী,নাথপন্থের মত ও কলেবর বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছেন। প্রাণনাথ এইরূপ একজন প্রধান সাধক

ছিলেন। তিনি সকলের সঙ্গে প্রেমে ও প্রীতিতে মিলিতে উপদেশ দিতেন।

প্রাণনাথ—(৩) একজন বায়ুর উপাসক যোগী। তিনি শঙ্করাচার্য্যের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া অদ্বৈতবাদী হইয়াছিলেন।

প্রাণনাথ—(৪) তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম রসপ্রদীপ।

প্রাণনাথ পণ্ডিত— একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী। 'দৈবজ্ঞ ভূষণ' নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত। ১৫৪০ শকের (১৬১৮ খ্রীঃ) পূর্ব্বে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

প্রাণনাথ বিদ্যাভরণ— একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। তিনি কৃষ্ণনগরের মহারাজ ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের সময়ে রাজসভার জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

প্রাণনাথ বৈদ্য—তিনি একজন বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা ও চিকিৎসক। ভৈষজ্য সারামৃত সংহিতা রসপ্রদীপ,বৈদ্যদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

প্রাণনাথ রায়—(১) তিনি দিনাজপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দিনরাজ ঘোষের (পরে রায়) পৌত্র ও শুকদেব রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। শুকদেব রায় পরলোক গমন করিলে,তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়দেব রায় রাজা হইয়া কয়েক বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। তৎপরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণনাথ রায় ১৬৮২ খ্রীঃ অব্দে রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শুকদেব রায়কে পরাস্ত করিয়া তদানীন্তন কোচবিহারপতি দিনাজপুরের কতক অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত পাঠান ও উজবেগ সর্দ্দারেরাও তাঁহার রাজ্যের কতক অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। প্রাণনাথ রায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সেই সমস্ত স্থান অধিকার করেন। বর্ত্তমান দিনাজপুর ব্যতীত রংপুর, মালদহ, বগুড়া, রাজসাহী ও পূর্ণিয়া এই পাঁচটী জেলারও কিয়দংশ তাঁহার অধিকারে ছিল। তাঁহার বার্ষিক আয় নয় লক্ষ টাকা ছিল। প্রাণনাথ, কোচবিহারপতিকে যে স্থানে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তিনি সেই স্থানের নাম বিজয় নগর রাখিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। কালে এই স্থানই দিনাজপুর নামে খ্যাত হয়। প্রকৃত দিনাজপুর বর্ত্তমান দিনাজপুর হইতে দশ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। মানসিংহের সহিত কোচবিহারের রাজার যুদ্ধকালে, প্রাণনাথ মানসিংহকে সাহায্য করিয়াছিলেন। যখন কোচবিহারের সহিত মানসিংহের সন্ধি হইয়া গেল, তখন মানসিংহ, কোচবিহার ও দিনাজপুর রাজ্যের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন করিয়া দেন। সেই মিত্রতা এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

১৭১৫ খ্রীঃ অব্দে প্রাণনাথ দিল্লীর সম্রাট ফরোক শাহের নিকট হইতে বংশানুক্রমিক রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন, দান বিতরণ প্রভৃতি সৎকার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ১৭২৩ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র রামনাথ রায় রাজা হন। দিনরাজ ঘোষ দেখ।

প্রাণনাথ রায়—(২) তিনি দিঘা-পাতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায়ের পৌত্র ও জগন্নাথ রায়ের পুত্র। তাঁহার পিতা অতি অল্পকাল রাজত্ব করিয়াই পরলোক গমন করেন। প্রাণনাথ রায় রাজা হইয়া অতি সুশৃঙ্খলার সহিত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তিনি পরিষদবর্গে পরিবৃত হইয়া বিষয়কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দর্শনে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইতেন। তিনি রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনকল্পে, স্বয়ং সকল কার্য্য অতিশয় মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি অতি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। সেই সময়ে নাটোরের মহারাজ রামকান্ত রায়ের রামদয়াল রায় নামে এক কায়স্থ জাতীয় দেওয়ান ছিলেন। তিনি প্রাণনাথ রায় হইতে ব্রাহ্মণোচিত সম্মানের দাবী করিতেন। রামদয়াল দেওয়ান দরবারে বসিলে, ব্রাহ্মণেরা হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন, মুসলমানেরা সেলাম করিতেন, বৈশ্যেরা নমস্কার ও শূদ্রেরা প্রণাম করিত। প্রাণনাথ রায় প্রথমে সেলাম করিলেন, নিষেধ করায় পরদিন নমস্কার করিলেন, ইহাতেও দেওয়ান বিরক্ত হওয়ায়, পরদিন কিছুই করিলেন না। দেওয়ানের ইচ্ছা ছিল প্রাণনাথ তাঁহাকে প্রণাম করেন। কিন্তু প্রাণনাথ তাঁহাকে ব্রাহ্মণোচিত সেই সম্মান দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। প্রাণনাথ নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া, প্রসন্ননাথকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। প্রাণনাথ রায়ের মৃত্যুর পরে তিনিই জমিদারীর মালিক হইলেন। দয়ারাম রায় দেখ।

প্রাণনাথ সিদ্ধ—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম রসদীপ।

প্রিন্সেপ, জেম্‌স (James Prinsep) —খ্যাতনামা প্রত্নতাত্ত্বিক। ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম জন (John) প্রিন্সেপ। শিক্ষা সমাপন করিয়া কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা টাঁকশালে চাকুরী পাইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। এক বছর পরেই কাশী টাকশালে উচ্চতর পদে নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর পরে আরও উচ্চ পদ লাভ করিয়া কলিকাতা টাকশালে বদলী হন এবং এই কাজে নিযুক্ত থাকিবার সময়েই

মস্তিষ্কের পীড়ায় মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

টাঁকশালের কর্ম্মচারীরূপে তিনি খ্যাতি লাভ করিলেও, প্রধানতঃ উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিকরূপে তাঁহার যশ অধিক বিস্তৃত হইয়াছিল। কাশীতে তিনি একটি নূতন টাঁকশাল স্থাপন করেন এবং পূর্ত্তবিভাগেও কাজ করিয়া সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণ করান। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান চর্চ্চার সাহায্যের জন্য তিনি একটি বিদ্বজ্জন পরিষদ্ (Literary Society) স্থাপন করেন এবং কাশীর নানারূপ বিবরণ সংযুক্ত একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কলিকাতায় বাসকালে তিনি 'বিজ্ঞান সার-সংগ্রহ' (The Gleanings of Science) নামক পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। উহাতে তাঁহার বিবিধ বিষয়ে বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। ঐ পত্রিকাখানিই পরে এসিয়াটিক সোসাইটির মুখপাত্র (Journal of the Asiatic Society of Bengal) রূপে পরিণত হয়। ১৮৩২ খ্রীঃ অব্দ হইতে ছয় বৎসরকাল তিনি উক্ত পরিষদের কর্ম্ম-সচিব ছিলেন। কলিকাতায় থাকিবার সময়ে তিনি প্রধানতঃ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত থাকেন। শিলালিপির পাঠোদ্ধার, প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বহু গবেষণা করেন। ঐ সকল বিষয়ে তাঁহার বহুমূল্য প্রবন্ধাদি বিবিধ পত্রিকাদিতে মুদ্রিত হইয়াছিল। অশোকের শিলা ও স্তম্ভ লিপির তিনিই প্রথম পাঠোদ্ধার করিয়া ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার পথ সুগম করিয়া দেন। তাঁহার এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্যই ভারতবাসী চিরকাল তাঁহার নাম কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে।

ধাতুতত্ত্ব ও আবহ বিদ্যাতেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধার জন্য পরিমাপ পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধনের জন্যও তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুদ্রার মূল্যের সমতা সাধনের জন্য তাঁহার ব্যবস্থা বিশেষ প্রশংসিত হয়। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বিদ্বজ্জন পরিষদ (Royal Society) তাঁহাকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করেন। একাধিক বৈদেশিক বিদ্বজ্জন পরিষদের তিনি সহায়ক সভ্য ছিলেন।

১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। কলিকাতার দুর্গের পশ্চিমদিকে প্রিন্সেপ ঘাট তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

প্রিয়দর্শী— অশোকের এক নাম। অশোক দেখ।

প্রিয়দেব সান্যাল—তিনি দাম-নাশের শিখিবাহন সান্যালের পুত্র। শিখিবাহন বাঙ্গালার নবাব গিয়াস-উদ্দীনের (১৩৬৭—৭২ খ্রীঃ) অন্যতম

সেনাপতি ছিলেন। শিখিবাহনের জায়গীর পদ্মা নদীর উত্তর ও চলনবিলের দক্ষিণে ছিল। শিখিবাহনের প্রথম পুত্র বলাই সাঁতোরের রাজা, দ্বিতীয় পুত্র কানাই বংশের কুলপতি, এবং তৃতীয় পুত্র প্রিয়দেব বা সত্যবান্ নবাবের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। প্রিয়দেবের পুত্র কংস। রাজা কংস, বাঙ্গালার নবাব দ্বিতীয় সামসুদ্দিনকে (১৩৮৩-৮৫ খ্রীঃ) সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়া, বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা প্রিয়দেব সান্যালের পুত্রকে কংস নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নাম গণেশ ছিল।

প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী—চব্বিশ পরগণা জিলার অন্তর্গত গোকর্ণী গ্রামে ১২৭০ বঙ্গাব্দে (১৮৬৬ খ্রীঃ) তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও মাতার নাম বরদায়িনী দেবী। তাঁহার পিতার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না বলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটে নাই। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে সামান্য লিখা পড়ার পরে স্বীয় অধ্যবসায় বলে যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার একমাত্র শিক্ষা। অল্প বয়স হইতেই শ্বাসকষ্ট রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন। ইহাও তাঁহার জ্ঞানলাভের বিশেষ অন্তরায় হইয়াছিল। তিনি আজন্ম অকৃতদার থাকিবেন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মাতার অতিশয় পীড়নে তিনি ৪৩ বৎসর বয়সে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। বিবাহের দুই বৎসর পরেই ১৩১৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি অতি সংযমী ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রহিয়াছে। তন্মধ্যে মদ খাও নিশা ছুটিবেনা, আনন্দ তুফান, জীবন পরীক্ষা, আহ্নিক ক্রিয়া, কুমার রঞ্জন, দুঃখীর ইতিহাস বা জীবন্ত পিতৃদায়, জীবন কুমার প্রভৃতি।

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়—(১) উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত রোহোরা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজে তিনি শিক্ষা লাভ করিয়া পরে সেই কলেজেরই অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ১৮৯৭ সালে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট, তৎপরে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনারের পার্শনেল এসিষ্টেণ্ট, কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল মাজিষ্ট্রেট ও পরে কলিকাতা কর্পোরেসনের সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। ১৯১২ সালে তিনি বাঙ্গালার ইনস্পেক্টার জেনেরাল অব রেজিষ্ট্রেসনের পদ লাভ করেন। ১৯১৯ সালে তিনি অবসর

গ্রহণ করেন। কিছু সময় তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যও ছিলেন। ১৯৩১ সালের নবেম্বর মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়--(২) তিনি একজন পুলিশের কর্ম্মচারী ছিলেন। দারোগার দপ্তর নামে একখানা মাসিক পত্রিকা তিনি বাব বৎসর প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তান্তিয়া ভিল, ডিটেকটিভ পুলিশ ছয় খণ্ড, ঠগি কাহিনী, বুয়ার যুদ্ধের ইতিহাস, প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম স্থান নদিয়া জিলার চুয়াডাঙ্গা সবডিবিসনে ছিল।

প্রিয় ভট্ট--রাজাবলী নামক সংস্কৃত ইতিহাস তাঁহার রচিত। জোনরাজ ও শ্রীবর পণ্ডিতও রাজাবলী নামে সংস্কৃত ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ কল্হনের পরবর্ত্তী কাশ্মীরের ইতিহাস।

প্রিয়ম্বদা দেবী—বাঙ্গালী মহিলা কবি। ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে পাবনা জিলার অন্তর্গত গুণাইগাছা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণকমল বাগচী। প্রখ্যাতনামা স্যার আশুতোষ চৌধুরী তাঁহার মাতুল ছিলেন। কৃষ্ণনগরে মাতুলালয়ে থাকিয়া তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া তিনি বৃত্তি লাভ করেন এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য কলিকাতার বেথুন কলেজে প্রবেশ করেন এবং যথাসময়ে কৃতীত্বের সহিত বি-এ উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। উহার দুই বৎসর পরে, মধ্যপ্রদেশের ব্যবহারজীবী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের মাত্র তিন বৎসর পরে, তিনি পতিহীনা হন। তাঁহার পুত্র তারাকুমার তখন মাত্র এক বৎসরের। এই একমাত্র সন্তানও তাঁহার, মাত্র দ্বাদশবর্ষ বয়সে পরলোক গমন করিলে, প্রিয়ম্বদাদেবীর সংসারের সকল বন্ধনই ছিন্ন হয়। তদবধি জীবনের অবশিষ্টকাল তিনি সাহিত্য সেবা ও জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া অতিবাহিত করেন।

নারী শিক্ষা প্রচলন ও উন্নতির জন্যও তিনি একাধিক মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘকাল কৃষ্ণভাবিনী দাস মহাশয়ার প্রতিষ্ঠিত ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের কর্ম্মাধ্যক্ষার পদে নিযুক্ত থাকিয়া উহার উন্নতির জন্য প্রভূত পরিশ্রম করেন। তদ্ভিন্ন হিরণ্ময়ী দেবীর প্রতিষ্ঠিত বিধবা শিল্পাশ্রম, গোপালদাস চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত "গোবিন্দকুমার নিকেতন" প্রভৃতি নারীমঙ্গলমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত যুক্ত থাকিয়া ও উহাদের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন।

প্রিয়ম্বদাদেবী স্বভাব কবি ছিলেন। তাঁহার মধুর রচনাবলী সংযত

পবিত্র ভাবের দ্যোতক ছিল। বেণু, পত্রলেখা ও অংশু নামে তিনখানা কবিতার পুস্তক, কথা-উপকথা, অনাথ ও পঙ্কুলাল নামে কয়েকখানি শিশুপাঠ্য পুস্তক ও ভক্তবাণী নামে একখানি ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক তিনি রচনা করেন। তাঁহার মাতা প্রসন্নময়ীও সুকবি ছিলেন।

১৩৪১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে তেষট্টি বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

প্রীতি—অতি প্রাচীনকালে আরাকানে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। খ্রীঃ সপ্তম হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় রাজগণ আরাকানে রাজত্ব করিতেন এই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় ছিলেন। তাঁহাদের নাম—রত্নাকর, ললিতাকর, শ্রীশিব, প্রীতি, প্রদ্যুম্নকর প্রভৃতি দৃষ্টে তাঁহারা যে ভারতীয় ছিলেন, তাহা বুঝা যায়। তাঁহাদের কাহারও কাহারও নামের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই সকল মুদ্রার একদিকে উপবিষ্ট বৃষমূর্ত্তি ও অপর দিকে ত্রিশূল রহিয়াছে।

প্রীতিনাথ—একজন মৈথিল কবি। মৈথিল ভাষায়, দ্বারবঙ্গের (বর্ত্তমান বাঙলা) অধিপতি নরপতি ঠাকুরের সভা পণ্ডিত লোচন কবি, 'রাগ ও রাঙ্গণী' নামে একখানি ছন্দশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে মিথিলার প্রীতিনাথ প্রভৃতি প্রায় পঞ্চাশজন কবির গ্রন্থ হইতে উদাহরণ সঙ্কলিত হইয়াছে।

প্রীতিবিমল সূরী—এই জৈন পণ্ডিত ১৫৯৭ খ্রীঃঅব্দে 'চম্পক শ্রেষ্ঠ কথা' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

প্রেমচাঁদ—কাশীনিবাসী একজন বিশিষ্ট হিন্দি সাহিত্যিক। তাঁহার প্রকৃত নাম ধনপৎ রায়; কিন্তু প্রেমচাঁদ নামেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার মাতৃভাষা উর্দ্দু হইলেও শৈশব হইতেই তাঁহার হিন্দীর প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং এই ভাষারই তিনি সাহিত্য সাধনা আরম্ভ করেন। তাঁহার এই সাধনা ফলপ্রসূ হইয়াছিল। ঔপন্যাসিক ও গল্প লেখক হিসাবে তিনি হিন্দী সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকটি রচনা বিভিন্ন ভারতীয় এবং বৈদেশিক ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছে। তিনি ছাড়া অন্য কোন হিন্দী সাহিত্যিক বোধ হয় এই সম্মান লাভের অধিকারী হইতে পারেন নাই। তিনি বিখ্যাত 'হংস' পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সাফল্যের সহিত সম্পাদনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারত হিন্দী সম্মেলনের ও বিগত লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সময়ে যে সাহিত্য সম্মিলন হয়, তাহার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। নিখিল ভারত প্রগতি লেখকসঙ্ঘের তিনি প্রথম

সভাপতি ছিলেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৬খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন) তিনি পরলোক গমন করেন।

প্রেমচাঁদ কবিরত্ন—জন্মস্থান চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কাঁচড়া পাড়া। জ্ঞানার্ণব নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ—খ্যাতনামা বাঙ্গালী পণ্ডিত। ১২১২ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮০৬) বৈশাখ মাসে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়না থানার অধীন শাকনাড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য। প্রেমচাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ "সাহিত্য দর্পণের" টীকাকার রামচরণ বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রেমচাঁদ তাঁহার পিতামহের কনিষ্ঠ সহোদর নৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের নিকট গ্রামেই সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। অল্পকাল মধ্যেই তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের মৃত্যু হইলে,তিনি মাতুলালয়ে গিয়া তথাকার সীতারাম ন্যায়বাগীশের নিকট ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। মাতুলালয়ে থাকিবার নানা প্রকার অসুবিধা হওয়ায় তিনি তথা হইতে চলিয়া আসেন এবং নিজ গ্রামের পাঁচ ক্রোশ দূরে দুয়ার গ্রামের জয়গোপাল তর্কভূষণের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। এই সময় তাঁহার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র। তখন হইতেই তিনি কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিতে প্রয়াসী হন। নানা বিষয়ে অসুবিধা সত্বেও তথাকার চতুষ্পাঠীর পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি ১৮২৬ খ্রীঃ অব্দে বিংশ বৎসর বয়সে কলিকাতায় অধ্যয়নার্থ আগমন করেন এবং সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। পাঁচ বৎসর অধ্যয়নের পর ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

তদানীন্তন সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী হোরেস হিমান উইলসন সাহেবের সুনজরে তিনি পতিত হন। সেই সময়ে নাথুরাম শাস্ত্রী নামক এক পণ্ডিত সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ১৮৩১ সালের জুলাই মাসে ছয় মাসের ছুটি গ্রহণ করেন। অচিরকাল মধ্যেই নাথুরাম শাস্ত্রী পরলোক গমন করেন। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ তাঁহারই পদে ১৮৩২ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন। ঐ পদের আরও অনেক পণ্ডিত প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু উইলসন সাহেব সকলকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকেই উক্ত পদে স্থায়ী করিলেন। ইহাতে গঙ্গাতীরবাসী

কয়েকজন সদ্‌ব্রাহ্মণ সন্তান, রাঢ়বাসী শূদ্রযাজী প্রেমচাঁদের নিকট প্রথমে অধ্যয়ন করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহারাই পরে তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

তিনি অধ্যাপক হইয়াও অধ্যয়ন হইতে বিরত হইলেন না। অতিশয় মনোযোগের সহিত ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে এডুকেশন কমিটী তাঁহাকে তর্কবাগীশ উপাধি দিলেন। তিনি সংস্কৃত পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষারও চর্চ্চা করিতেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কন চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার পরিচয় হওয়ার পর হইতেই, তিনি তাঁহার সম্পাদিত 'প্রভাকর' পত্রিকায় নিয়মিতরূপে লিখিতেন। তিনি বলিতেন—সত্যনিষ্ঠ উপযুক্ত সম্পাদক প্রকৃত সমাজ সংস্কারক ও নিপুণ উপদেষ্টা। তিনি প্রভাকর, সমাচার চন্দ্রিকা প্রভৃতি পত্রিকায়, গুরুতর বিষয়ে মর্ম্মস্পর্শী ও ওজস্বিনী ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতেন। পরে তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। তখন বাঙ্গালা দেশে মল্লিনাথের টীকা প্রচলিত হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে রামগোবিন্দ পণ্ডিত ও নাথুরাম শাস্ত্রী রঘুবংশের টীকা রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু টীকা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা পরলোকগত হইলেন। প্রেমচাঁদ সেই অসম্পূর্ণ টীকা শেষ করেন। তৎপরে তিনি পূর্ব্বনৈষধ ও রাঘব পাণ্ডবীয় নামক মহাকাব্যদ্বয়ের টীকা, কুমার সম্ভব, চাটুপুষ্পাঞ্জলী, মুকুন্দমুক্তাবলী ও সপ্তসতী নামক গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। সংস্কৃত নাটকগুলি পূর্ব্বে এদেশে মুদ্রিত ছিল না, সেজন্য পঠন ও পাঠনের খুব অসুবিধা হইত। তিনি প্রথমে এই অভাব দূরীকরণে অগ্রবর্ত্তী হন। ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে প্রথম অভিজ্ঞান শকুন্তলা মুদ্রিত হয়। পরে বঙ্গদেশ প্রচলিত ও অন্যান্য দেশ প্রচলিত কয়েকখানি আদর্শের অনুসরণ করিয়া টীকাসহ ইহার সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি, মুরারি মিশ্র প্রণীত অনর্ঘরাঘব, গৌড়দেশ প্রচলিত ভবভূতি বিরচিত উত্তর রাম চরিত, অন্যান্য দেশ প্রচলিত পাঠের সহিত মিলাইয়া টীকাসহ প্রকাশ করেন। মহাকবি দণ্ডী প্রণীত কাব্যাদর্শ নামক সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল, পশ্চিম দেশ হইতে আনীত কয়েকখানি আদর্শ অবলম্বনে তাহা সংশোধনপূর্ব্বক বিশদ টীকাসহ প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে আরও বিস্তৃত হয়। প্রাচীন গ্রন্থাদির টীকা রচনা

ব্যতীত তিনি কয়েকখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের চরিত্র অবলম্বনে পুরুষোত্তম রাজাবলী নামে এক কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তাহার মাত্র চারিসর্গ লেখা হইয়াছিল। তিনি নানার্থ সংগ্রহ নামে একখানা অভিধানও সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অকারাদি ক্রমে ম পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলেন। তিনি একখানি অলঙ্কার শাস্ত্রের গ্রন্থও রচনা করেন। ইহাতে রস ও গুণাদির নিরূপণ প্রণালী অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এদেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে যে এই সকল গ্রন্থ শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি পরলোকগত হইলেন। প্রধান প্রধান সংস্কৃত কাব্যের টীকা রচনা করিয়া তিনি প্রভূত উপকার করিয়া দেশকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। ভারতীয় টীকাকারদের মধ্যে তিনি মল্লিনাথ, জয়মঙ্গল প্রভৃতির ন্যায় একজন শ্রেষ্ঠ টীকাকার।

এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি জেমস প্রিন্সেপ মহোদয়, মগধ, পূর্ব্ব-বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত প্রকাশে উদ্যোগী হইয়া, সংস্কৃত মিশ্র পালি প্রভৃতি ভাষায় খোদিত তাম্রশাসন প্রস্তর ফলকাদির পাঠোদ্ধার করিবার জন্য প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের সহায়তা গ্রহণ করিতেন। প্রিন্সেপ ও উইলসন সাহেব স্বদেশে যাইয়াও অনেক জটিল বিষয়ের মীমাংসার জন্য সময় সময় তাঁহাকে পত্র লিখিতেন। তিনি তাঁহাদের জ্ঞাতব্য বিষয়ের উত্তর দিতেন। তাঁহার সময়ে সংস্কৃত সাহিত্য জগতে তিনি একজন মহারথী ছিলেন।

১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে পেনসন গ্রহণ করিয়া তিনি কাশীবাসী হন। ইতি-পূর্ব্বে ছয় মাসের ছুটী লইয়া তিনি গয়া কাশী, বৃন্দাবন, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। পেনসন লওয়ার পরে তিনি একপ্রকার সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। কিন্তু জ্ঞান অনুশীলন, যোগসাধন, বিদ্যাবিতরণাদি প্রভৃতি কার্য্যেই সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি লাবণ্যপূর্ণ আকৃতি ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণে, সর্ব্বোপরি তাঁহার মিষ্ট মধুর ভাষণে বহুলোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বহু ছাত্রের মধ্যে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, নেপালী, দ্রাবিড়ী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি ছিলেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে পরবর্ত্তীকালে যাহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আমরা ভারত বিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সুকবি মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সি, আই, ই, মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য এম, এ, পণ্ডিত দ্বারকানাথ

বিদ্যাভূষণ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, তারাকুমার কবিরত্ন ই, বি, কাউএল সাহেব, জয়নারায়ণ কলেজের সাংখ্যের অধ্যাপক বেচন তেওয়ারী, অলঙ্কারের অধ্যাপক শীতলপ্রসাদ তেওয়ারী প্রভৃতির নাম দেখিতে পাই। তিনি যেমন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তেমনই হৃদয়বান্, মানবহিতৈষী ও ঈশ্বর প্রেমিকও ছিলেন। বঙ্গের উজ্জল রত্ন প্রেমচাঁদ ১২৭৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (১৮৬৭ ইং কাশীতে পরলোক গমন করেন।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ—বোম্বাই প্রদেশবাসী প্রসিদ্ধ গুজরাটি ধনী ব্যবসায়ী ও জনহিতব্রতী। ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে সুরাট নগরে এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রায় চাঁদ দীপচাঁদ। তাঁহারা জৈনধর্ম্মাবলম্বী দোষা অসওরাল নামক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা শ্রমশীল, কর্ম্মকুশল এবং ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন বলিয়া খ্যাত।

প্রেমচাঁদ বাল্যকাল হইতেই বুদ্ধিমত্তা, কষ্টসহিষ্ণুতা, শ্রমশীলতা প্রভৃতি গুণের জন্য প্রশংসা লাভ করেন তাঁহার জন্মের কিছুকাল পরেই, দীপ চাঁদ আয় বৃদ্ধি করিবার মানসে সুরাট হইতে বোম্বাই গমন করেন। সেই সময়ে প্রেমচাঁদ একটী অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। কয়েক বৎসর তিনি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া কিছু ইংরেজী শিখিয়াছিলেন।

বোম্বাইতে কয়েক বৎসর থাকিবার পর দীপচাঁদ, রতনচাঁদ লালা নামক একজন ধনীব্যবসায়ীর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। দীপচাঁদ স্বয়ংও বিশেষ ব্যবসায় বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। সেইজন্য রতনচাঁদ ও দীপচাঁদের মিলিত বুদ্ধি ও পরিশ্রমে দ্রুত ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে লাগিল। এই সময়ে, ব্যবসায় সূত্রে ইংরেজ বণিকদিগের সংশ্রবে আসিতে হইত। সেইজন্য কথাবার্ত্তা চালাইবার সুবিধা হইবে মনে করিয়া, দীপচাঁদ পুত্রকে বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া নিজের সহকারী করিয়া লইলেন। তখন প্রেমচাঁদের বয়স ষোড়শ বর্ষ মাত্র। পিতাপুত্র উভয়ে রতনচাঁদের ব্যবসায়ের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী রূপে কাজ করিতে লাগিলেন। পিতার সহকারীরূপে কাজ করিয়া প্রেমচাঁদ অল্পকাল মধ্যেই ব্যবসায় বাণিজ্য বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরেই হঠাৎ রতন চাঁদের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার বিস্তৃত ব্যবসায় প্রকৃতপক্ষে দীপচাঁদ ও প্রেম চাঁদের অধিকারে আসিয়া পড়িল। তৎফলে অচিরেই তাঁহারা বিশেষ ধনশালী হইয়া উঠিলেন।

সপুত্র দীপচাঁদ বোম্বাইতে আসিবার কিছু পূর্ব্ব হইতেই বোম্বাই বন্দরের

বাণিজ্য দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছিল। তদুপরি ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দের পর হইতে তুলার ব্যবসায় ও রপ্তানীর জন্য বোম্বাই প্রদেশের বহির্বাণিজ্য অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বস্ত্র ব্যবসায়িরা আমেরিকা জাত তুলা হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিতেন। কিন্তু দাস ব্যবসায় উপলক্ষে আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মধ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, আমেরিকা হইতে তুলা রপ্তানী প্রায় বন্ধ হইয়া যাওয়াতে, ইংলণ্ডের ব্যবসায়িরা ভারতজাত তুলা ক্রয় করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। ইহাতেই বোম্বাই প্রদেশে তুলার ব্যবসায় ও তুলা উৎপাদনের চেষ্টা অতি দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই তুলার ব্যবসায়ে প্রেমচাঁদ অতি সত্বরই উচ্চ স্থান অধিকার করিলেন। এই ব্যবসায়ে তাঁহার পরামর্শ বহু মূল্যবান বিবেচিত হইতে লাগিল। শুধু রপ্তানী ব্যবসায়ে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া, প্রেম চাঁদ তুলার চাষেও অর্থনিয়োগ করিতে লাগিলেন। এইভাবে কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি বোম্বাই প্রদেশের একজন প্রধান ধনী ও ব্যবসায়ীরূপে গণ্য হইয়া উঠিলেন।

প্রেমচাঁদের ব্যবসায় বুদ্ধি কেবল একক্ষেত্রে নিবদ্ধ রহিল না। অন্যান্য ধনকুবেরদিগের সহিত মিলিত হইয়া তিনি বহু যৌথ কারবারে অর্থনিয়োগ করিতে লাগিলেন। একাধিক ব্যাঙ্ক স্থাপনেও তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। যৌথ কারবারের অংশ বিক্রয়াদির ব্যবসায়েও (Share market) তিনি একজন প্রধান ব্যবসায়ী ছিলেন। বস্তুতঃ বিভিন্ন উচ্চ শ্রেণীর ব্যবসায়ে প্রেমচাঁদের এত প্রভাব ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে, তিনি যে কারবারের সহিত যুক্ত হইতেন তাহাই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত এবং সেই ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োগ করিবার জন্য ধনী দরিদ্র সকলেই উদ্‌গ্রীব হইতেন। দীর্ঘকাল এইভাবে স্থির বুদ্ধিতে ও সততার সহিত ব্যবসায়ে নিরত থাকিয়া তিনি বোম্বাই নগরীর প্রধান বণিকদের অন্যতম হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ব্যবসায় বুদ্ধি ও সততার উপর লোকের এতদূর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল যে, সম্পূর্ণ তাঁহার ব্যক্তিগত দায়িত্বেও লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণস্বরূপ তাঁহাকে দিতে ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না।

ব্যবসায়ে উত্থান পতন কখন কি ভাবে হয়, তাহা সব সময়ে বোঝা যায় না। কয়েক বৎসর অসাধারণ সৌভাগ্য ভোগ করিবার পর ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে প্রেমচাঁদের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিল। আমেরিকার গৃহবিবাদ শান্ত হইলে তথায় পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় তুলার চাষ আরম্ভ হইল। এই ঘটনা বোম্বাইএর

ব্যবসায় মহলে মহা সর্ব্বনাশের সৃষ্টি করিল। ফলে প্রেমচাঁদ প্রমুখ বহু কোটীপতি প্রায় পথের ভিখারী হইলেন। পূর্ব্বে যে সকল ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রেমচাঁদকে, মুখের কথায় লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না তাঁহারা এখন এক কপর্দ্দকও বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে দিতে সম্মত হইলেন না। কেবল দুইটি ব্যাঙ্ক তাঁহার সততা ও ব্যবসায় বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কিছু হইল না। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহার দেনা পাওনার অবস্থা চরমে পৌছিল। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজের সমস্ত মণি-মুক্তা ও জহরতাদি গচ্ছিত রাখিয়া এক ব্যাঙ্কের নিকট পঁচিশ লক্ষ টাকা ঋণ চাহিলেন। কিন্তু এই দুর্দ্দিনে ব্যাঙ্ক বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে টাকা দিল না। ফলে কয়েক মাস পরে বাধ্য হইয়া দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় লইলেন। আদালত হইতে তাঁহার দেনা পাওনার হিসাব মিটাইবার জন্য তিনজন অছি নিযুক্ত করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার যাহা কিছু স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ছিল সব উত্তমর্ণদিগকে ঋণের অনুপাতে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল এবং অবশিষ্ট ঋণের দায় হইতে আদালত তাঁহাকে মুক্তি দিলেন

প্রেমচাঁদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ন্যায় আরও অনেক ব্যবসায়ী পথের ভিখারী হন। হিসাব করিয়া দেখা যায় আমেরিকার গৃহ যুদ্ধের পূর্ব্বে বোম্বাইএর ঘরে যে টাকা ছিল, তাহা হইতে প্রায় চৌদ্দ কোটী টাকা ক্ষতি হইয়া গেল।

এইভাবে কয়েক বৎসর যাইবার পর পুনরায় ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দ হইতে শুভ সূচনা দেখা দিল। ক্রমে আমদানী রপ্তানী বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যে তুলার ব্যবসায়ে বোম্বাই বাসীদের চৌদ্দ কোটী টাকা ক্ষতি হইয়াছিল নূতনভাবে সেই তুলার ব্যবসায়ই আবার বোম্বাই' বাসীর ধনাগমের উপায় সৃষ্টি করিল। প্রেমচাঁদও পুনরায় নূতন উদ্যমে ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হইলেন এবং ধীরে ধীরে নূতন ভাবে ব্যবসায় গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার পূর্ব্ব কর্ম্মক্ষমতা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছিল। সেজন্য আর কারবার বহুবিস্তৃত হয় নাই। পূর্ব্বের তুলনায় সামান্য কারবারেই তিনি সন্তুষ্ট রহিলেন। এইভাবে কয়েক বৎসর পরিবর্ত্তিত অবস্থার মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া ১৯১৮ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে সত্তর বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্ত হইল।

সৌভাগ্যের প্রথম পর্ব্বে শেঠ প্রেমচাঁদ যেরূপ অজস্র অর্থ উপার্জ্জন

করিয়াছিলেন, সেইরূপ অকাতরে অর্থ দানও করিয়াছিলেন। তাঁহার দানে জাতি ধর্ম্মের বিচার ছিল না। তাঁহার দানের বিবরণ আলোচনা করিলে দেখা যায় তাহাতে পশুপক্ষী, গৃহী সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ভেদ ছিল না এবং প্রাদেশিকতার লেশ মাত্র ছিল না। শিক্ষা বিস্তারে, অনাথ আশ্রম অথবা পিঞ্জরা পোল স্থাপনে, ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণে, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে আর্ত্ত নরনারীর সাহায্যে, বস্তুতঃ সকল প্রকার সৎকাজেই তিনি মুক্ত হস্তে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনে তিনি প্রায় ষাট লক্ষ টাকা সর্ব্বমোট দান করিয়া গিয়াছেন বলিয়া পরিমিত হইয়া থাকে।

সাক্ষাৎভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরোক্ষভাবে বাঙ্গালা দেশ এই মহানুভব দানবীরের সাহায্যে পুষ্ট হইয়াছে। তাঁহার প্রদত্ত দুই লক্ষ টাকার সুদ হইতে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রগণকে গবেষণ বৃত্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে। উহা তাঁহার নামানুসারে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিরূপে কথিত হয়। পূর্ব্বে সাধারণতঃ একজন ব্যক্তিকে সুদের সমুদয় অর্থ বৃত্তিস্বরূপ দেওয়া হইত। কয়েক বৎসর হইল বিশ্ববিদ্যালয়, ঐ অর্থ একাধিক ব্যক্তিকে বণ্টন করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ বৃত্তিধারীদের মধ্যে ৺আনন্দ মোহন বসু, ৺গৌরীশঙ্কর দে বিচারপতি ৺সারদাচরণ মিত্র, ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ৺রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্যার যদুনাথ সরকার, অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ৺জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম বাঙ্গালী পাঠকদের কাছে সমধিক পরিচিত। ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দ হইতে ঐ বৃত্তি দেওয়া হইতেছে এবং সর্ব্বপ্রথম যিনি ঐ বৃত্তি পান তাঁহার নাম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

প্রেমনারায়ণ রায়, রাজা—চন্দ্রদ্বীপের রাজা প্রতাপ নারায়ণ জীবন-লীলা শেষ করিলে, তদীয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র প্রেমনারায়ণ, অমাত্যগণ কর্ত্তৃক সিংহাসনে স্থাপিত হইয়াছিলেন; দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি অধিকদিন রাজ্য ভোগ করিতে পারিলেন না। যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই পরলোকে পিতৃ-সন্নিধানে গমন করিলেন। রাজা পরমানন্দ হইতে প্রেম নারায়ণ পর্য্যন্ত আট ভূপতি দনুজমর্দ্দনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

প্রেমানন্দ দাস—তিনি একজন কবি। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম "চন্দ্রচিন্তামণি"।

প্রৌঢ়নাথ—নাথপন্থী ৮৪ জন সিদ্ধ পুরুষের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। অপাণ নাথ দেখ।

ফ

ফকরউদ্দিন মবারক শাহ—তাঁহার সম্পূর্ণ নাম ফকরউদ্দিন আবুল মজঃফর মবারক শাহ। তিনি পূর্ব্ব বঙ্গের অন্তর্গত সুবর্ণ গ্রামের নবাব তাতার খাঁ বা বহরাম খাঁর বর্ম্মরক্ষক ছিলেন। তাতার খাঁর মৃত্যুর পরে ১৩৩৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি বিদ্রোহী হইয়া সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময়ে বঙ্গদেশ তিন অংশে বিভক্ত ছিল। দক্ষিণ বঙ্গে সপ্তগ্রামে ইজ্জউদ্দিন এহিয়া খাঁ এবং পশ্চিম বঙ্গে লক্ষ্মণাবতীতে কাদের খাঁ নবাব ছিলেন। ফকরউদ্দিন সুলতানের রাজত্বকালের শেষভাগে ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন গাজী শাহ নামে এক ব্যক্তি পূর্ব্ব বঙ্গের এক অংশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার নামাঙ্কিত কতকগুলি সুবর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রা সুবর্ণগ্রাম হইতে ১৩৪০—৫২ খ্রীঃ অব্দ মধ্যে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। এই মুদ্রা ব্যতীত তাঁহার অস্তিত্বের আর কোন প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ তোগলক, সুলতান ফকরউদ্দিনের সুবর্ণগ্রামের সিংহাসন অধিকারের সংবাদ শ্রবণ করিয়া, লক্ষ্মণাবতীর কাদের খাঁকে সুবর্ণ গ্রাম অধিকার করিতে আদেশ দিলেন। কাদের খাঁ সুবর্ণগ্রাম আক্রমণ করিলে সুলতান ফকরউদ্দিন পরাজিত হইয়া জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন। ইতিমধ্যে বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। কাদের খাঁ বহু সৈন্য বিদায় করিয়া দিলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্য রাজস্ব সংগ্রহে নিযুক্ত করিলেন। রাজকোষে বহু অর্থ সংগৃহীত হইলে, তাহার কতক অংশ কাদের খাঁ দিল্লীতে পাঠাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত বিবরণ ফকরউদ্দিন অবগত ছিলেন। তিনি এই সময়ে কাদের খাঁর কতকগুলি প্রধান সেনপতিকে হস্তগত করিলেন। তাঁহাদের নিকট ফকরউদ্দিন প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহারা যদি তাঁহাদের প্রভু কাদের খাঁকে নিহত করিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করেন, তবে তিনি রাজকোষের সমস্ত অর্থ তাঁহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবেন। সেনাপতিরা সম্মত হইলেন ফকরউদ্দিন অতর্কিতে কাদের খাঁকে আক্রমণ করিলেন। কাদের খাঁ যুদ্ধে নিহত হইলেন। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে ফকরউদ্দিন সেনাপতিদের মধ্যে রাজকোষের সমস্ত অর্থ বণ্টন করিয়া দিলেন। এখন তিনি সুবর্ণগ্রাম ও লক্ষ্মণাবতীর অধীশ্বর হইলেন। সমস্ত বঙ্গের অধীশ্বর হইবার অভিলাষে তিনি স্বীয় সেনাপতি মকৃলিস খাঁকে বাঙ্গালার প্রান্তবর্ত্তী অঞ্চল অধিকার করিতে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু পরলোকগত কাদের খাঁর অন্যতম সেনাপতি আলী মোবারকের হস্তে তিনি

যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। আলী মোবারক এখন সুলতান আলা-উদ্দিন আবুল মুজাফর আলীশাহ নাম গ্রহণপূর্ব্বক লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে স্বাধীন নরপতিরূপে আরোহণ করিলেন। এদিকে ফকরউদ্দিনের জামাতা জাফর খাঁ পলায়নপূর্ব্বক দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহারই অনুরোধে সম্রাট বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিলেন। সুলতান ফকরউদ্দিন যুদ্ধে পরাজিত, বন্দী ও নিহত হইলেন। এই ঘটনাটী সত্য নহে কারণ ইহা ১৩৫০ খ্রীঃ অব্দে সংঘটিত হয়। ইহার পরেও ফকরউদ্দিন জীবিত ছিলেন।

সুলতান ফকরউদ্দিন ১৩৩৮ খ্রীঃ—১৩৫২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে আফ্রিকা দেশের ভ্রমণকারী ইবন বতুতা ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি সুলতান ফকরউদ্দিন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, ফকরউদ্দিন সাধু ফকির ও দরবেশ-দিগকে অতিশয় ভক্তি ও বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানে কোন ফকীর হইতেই কর গৃহীত হইত না। এমন কি নিঃস্ব বলিয়া ফকিরদিগকে প্রত্যেক গ্রাম হইতে অর্দ্ধদিরাম করিয়া দান করিবার নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সইদা নামে একজন মুসলমান ফকিরকে সপ্তগ্রামের ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একবার সুলতান যুদ্ধার্থ অন্যত্র গমন করিলে, সইদা তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁহার একমাত্র পুত্রকে হত্যা করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সুলতান ফকরউদ্দিন এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; সইদা সোনার গায়ে পলায়ন করেন। সুলতান তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সোনার গায়ের লোকেরা ভয়ে ফকির সইদাকে ধৃত করিয়া সৈন্যদের হস্তে সমর্পণ করিল। তাঁহারা সইদাকে বধ করিয়া তাঁহার ছিন্ন মস্তক সুলতানের নিকট প্রেরণ করিল। সইদার অনুবর্ত্তী আরও অনেক ফকির সইদার কল্যাণে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

সুলতান ফকরউদ্দিনের বেগমের মৃতবৎসা দোষ ছিল। শ্রীহর্ষ সেন নামক একজন সুচিকিৎসক তাঁহাকে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করেন। সুলতান ইহাতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বীরভূমের অন্তর্গত সেনভূম পরগণার জমিদারী ও রাজা উপাধি প্রদানপূর্ব্বক সম্মানিত করিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষসেনের পুত্র বিনায়ক সেনও চিকিৎসাগুণে গৌড়ের মুসলমান রাজগণ হইতে গজ, কনকছত্র প্রভৃতি লাভ করিয়াছিলেন।

সুলতান ফকরউদ্দিনের মৃত্যুর পরে

তাঁহার পুত্র ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন আবুল মুজাফর গাজীশাহ ১৩৫৩ খ্রীঃ অব্দে সুবর্ণ গ্রামের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ফকরউদ্দিন, মালিক ওল ওমরা—তিনি দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের (১২৪৬—৮৬ খ্রীঃ) বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও সেনাপতি। তিনি বাঙ্গালার নাসিরউদ্দিন তোগরিলের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য যখন দিল্লী পরিত্যাগ করেন। তখন এই বিশ্বস্ত সেনাপতি ফকরউদ্দিনের উপরই দিল্লীর শাসনভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন।

ফকরউদ্দৌলা—তিনি দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহের সময়ে (১৭১৯ খ্রীঃ—১৭৪৮ খ্রীঃ) পাটনার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পরে উক্ত পদে বাঙ্গালার নবাব সুজাউদ্দিন নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ফকরউন্নিশা বেগম—তিনি শাহজাহান পাতশার, চারি হাজারী সেনাপতি নবাব সুজায়েত খাঁর বেগম। দিল্লীর কাশ্মীর বাজারে স্বীয় নামে তিনি ফকরুল মসজিদ নামে ১৭২৮ খ্রীঃ অব্দে উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে।

ফকির—(১) কেলগ্রামের মির নওয়াজিস আলীর কবিজন সুলভ নাম। ১৭৫৫ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১৬৭) তাঁহার মৃত্যু হয়।

ফকির—(২) দিল্লীর মির সামসউদ্দিনের কবিজন সুলভ নাম। তিনি একখানা দেওয়ান ও একখানা মসনবী লিখিয়াছেন। তিনি লক্ষ্ণৌ নগরে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

ফকিরউদ্দৌলা—তিনি বিহারের শাসনকর্ত্তা সরেফ খাঁর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি বিহারের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। তিনিই সৈয়দ আহাম্মদ খাঁর (হাজি আহম্মদের দ্বিতীয় পুত্র) কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের চতুর্থ দিনেই সেই কন্যার মৃত্যু হয়। ফকিরউদ্দিন অতিশয় দুশ্চরিত্র ও অকর্ম্মণ্য শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আলীবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে ডাকিয়া নিয়া একরকম বন্দী করেন। এই অবস্থায় কিছুদিন বন্দী থাকিয়া কৌশলে পলায়নপূর্ব্বক, তিনি আলীবর্দ্দী খাঁর শত্রু নাগপুরের জানুজী ভোস্‌লের সেনাপতি মির হবিবের সহিত মিলিত হন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বাঙ্গালী সাহিত্যিক। 'মানসী' নামক মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতৃগণের তিনি অন্যতম ছিলেন। ঐ মানসী পত্রিকার নামই পরে "মানসী ও মর্ম্মবাণী" হয়। কিছুকাল ফকিরচন্দ্র "পুষ্পপাত্র" নামক মাসিক পত্রিকারও অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। তদ্ভিন্ন একাধিক মাসিক পত্রিকায় নানা বিষয়ে তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। মৃত্যু ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে।

ফকির দাসজী—তিনি দাদুপন্থী মঠের একজন অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি জাতিতে মুসলমান ছিলেন। প্রথম প্রথম অধ্যক্ষের মৃত্যুর পরে হিন্দু মুসলমান বিচার না করিয়া যোগ্যতম ব্যক্তিকে অধ্যক্ষপদ প্রদান করা হইত। পরবর্ত্তী সময়ে তাহা রক্ষিত হয় নাই। এখন হিন্দুরাই অধ্যক্ষ পদ অধিকার করিয়াছেন।

ফকির মোহাম্মদ—চট্টগ্রামবাসী এই কবি ১২৪০ বঙ্গাব্দে ইউসুফ জেলে খাঁ নামক এক কাব্য লিখিয়াছিলেন।

ফকিররাম কবিভুষণ— একজন বাঙ্গালী কবি। সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি বাঙ্গালা ও হিন্দি মিশ্রিত ভাষায় রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ডের বিষয় পদ্যে লিখিয়াছিলেন।

ফজল আলী খাঁ—(১) একজন কবি। তিনি দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে ১৭৩২ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

ফজল আলী খাঁ—(২) উপাধিসহ তাঁহার সম্পূর্ণ নাম নবাব ইতিমদ উদ্দৌলা জয়াউল মুল্ক সৈয়দ ফজল আলী খাঁ বাহাদুর সরার জঙ্গ। ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি অযোধ্যার নবাব গাজীউদ্দীন হায়দরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

ফজলগাজী—খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ফজলগাজী ভাওয়াল পরগণার অধিপতি ছিলেন। ঢাকার উত্তর স্থিত বিস্তৃত আরণ্য ভূভাগ ভাওয়াল নামে খ্যাত। ফজল গাজীর অধিকৃত ভূভাগ বুড়িগঙ্গার উত্তর তীর হইতে গারো পাহাড়ের দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরে তাঁহার রাজ্য ছিল না।

ফজল রসুল, মৌলবী—বদায়ুনের মৌলবী আবদুল মজিদের পুত্র। তিনি একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। ১৮৭৪ সালে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

ফজল হক—ফজল ইমামের পুত্র। তিনি তাঁহার পিতারই ন্যায় একজন কবি ছিলেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে যোগ দেওয়ায় তিনি নির্ব্বাসিত হন।

ফজিলৎ, কাজী—শেরশাহ দিল্লীর সম্রাট হইয়া বাঙ্গালা দেশ শাসনের সুব্যবস্থায় মনোযোগী হন। তিনি বাঙ্গালা দেশকে কয়েকটী প্রদেশে বিভক্ত করিয়া এক একজন শাসনকর্ত্তার অধীনে রাখেন এবং বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধর্ম্মভাবের জন্য প্রসিদ্ধ কাজী ফজিলৎকে সর্ব্বোপরি পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। কাজী সাহেব বিভিন্ন শাসন কর্ত্তাদের কার্য্যের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করিয়া তাঁহাদের কার্য্য কুশলতা সম্বন্ধে শেরশাহকে জ্ঞাপন করিতেন। এই সুব্যবস্থার ফলে শেরশাহের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে শান্তি বিদ্যমান ছিল।

ফটিক দত্ত—এই কায়স্থ সন্তান পাবনা

জিলার অন্তর্গত সিন্ধুরিয়ার ব্রাহ্মণ জমিদার রাজীব রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ধোবা শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিলেন।

জাতির কর্ত্তা রাজীব রায় মুলুকের গুরু।
তাঁর হুকুম তুচ্ছ করে দত্ত হলেন ধোবা।

ফণী—অপর নাম খাজা মোহাম্মদ মৈনউদ্দিন বিন মামুদ দিদার ফণী। তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিয়া আবদুল রহিম খাঁ খান খানানের অতিশয় প্রিয়পাত্র হন। তিনি সুফী সম্প্রদায় সম্বন্ধে অনেকগুলি ভাল ভাল গ্রন্থ রচনা করেন। হপ্তদিলবার নামক গ্রন্থ তিনি সম্রাট আকবরের নামে উৎসর্গ করেন। ১৬০৭ সালে তিনি পরলোকে প্রস্থান করেন।

ফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত— প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ডি-গুপ্ত (দ্বারকানাথ গুপ্ত) কোম্পানীতে ব্যবসায় শিক্ষা করেন। ১৯০৫—৬ খ্রীঃ অব্দের স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তিনি প্রথম একটী দেশী কলম, নিব ও পেন্সিলের কারখানা স্থাপন করেন। ঐ ব্যবসায় ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিলে, তিনি উহার সহিত ফাউন্টেন পেন তৈয়ারী আরম্ভ করেন। এই বিষয়ে তিনি ভারতের পথপ্রদর্শক ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ঐ শিল্পেও তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। ১৩৪১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ফতেআলী হোসেনী—তিনি 'তজকিরাত-উস-সুয়ারাই হিন্দি' নামক জীবনী-কোষের লেখক। এই গ্রন্থে তিনি ১০৮ জন হিন্দী ও দক্ষিণী গ্রন্থকারের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ফতেউল্লা ইমাদ শাহ—তিনি বেরারের ইমাদশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইমাদ-উল-মুলক দেখ।

ফতে খাঁ—(১) বঙ্গের মুঘল রাজপ্রতিনিধি ইস্‌লাম খাঁর সময়ে (১৬০৮-১৬১৩ খ্রীঃ) ফতে খাঁ সন্দ্বীপের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। তিনি পর্ত্তুগিজ জলদস্যুদের কবল হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিয়া, একবার কতকগুলি নৌকায় ছয়শত সৈন্যসহ দক্ষিণ শাবাজপুরদ্বীপের নিকটবর্ত্তী একটী দ্বীপে তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। তাঁহার সৈন্যেরা নৌকা চালনায় দক্ষ ছিল না বলিয়া পরাজিত হইল। তিনি স্বয়ং এই যুদ্ধে নিহত হইলেন।

ফতে খাঁ—(২) তিনি বঙ্গের শেষ পাঠান সুলতান দায়ুদ খাঁর (১৫৭৩-৭৬ খ্রীঃ) অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। সম্রাট আকবর বঙ্গদেশ অধিকার করিতে মনস্থ করিয়া, সেনাপতি খাঁ আলমকে হাজীপুর দুর্গের অধ্যক্ষ ফতে খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে

ফতে খাঁ বহু পাঠান সৈন্যসহ সমর-শয্যায় শয়ন করেন। তাঁহার ছিন্ন মস্তক সম্রাট সমীপে প্রেরিত হয়।

ফতে খাঁ—(৩) তিনি আহাম্মদ নগরের দ্বিতীয় মূর্ত্তজা নিজাম শাহের সময়ে একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি ১৬৩১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার প্রভু দ্বিতীয় মূর্ত্তজা নিজাম শাহকে বধ করিয়া তাঁহার শিশু পুত্র হুসেন শাহকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। এই বিশ্বাস-ঘাতক এইখানেই ক্ষান্ত হয় নাই, অবশেষে নিজাম সাহী বংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া রাজ্যটী কতক দিল্লীর সম্রাটকে কতক বিজাপুরপতিকে দিয়া স্বয়ং ২০০০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করেন। ফতে খাঁর পিতা মালিক অম্বর, আহাম্মদ নগরের দ্বিতীয় মূর্ত্তজা নিজাম শাহের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ১৬২৬ খ্রীঃ অব্দে মালিক অম্বর পরলোক গমন করিলে, তিনি পিতার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ফতে খাঁ—(৪) তিনি দিল্লীর সম্রাট ফিরোজসাহ তোগলকের অন্যতম পুত্র। পিতার জীবিতকালেই তিনি পরলোক গমন করেন। সম্রাট ফিরোজশাহ বৃদ্ধকালে ফতে খাঁর পুত্র তোগলিককে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

ফতে খাঁ—(৫) তিনি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত আহাম্মদাবাদের অধিপতি মালিক অম্বরের পুত্র। তিনি দীর্ঘকাল নিজামশাহী বংশের উপরে আধিপত্য করিয়াছিলেন। ১৬২৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে তিনি পিতার পদেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মূর্ত্তজা নিজামশাহ, তাঁহার আধিপত্যে বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে ছলনাপূর্ব্বক খাইবার দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন। তিনি তথা হইতে পলায়ন করিয়া বিদ্রোহী হন। কিন্তু আবার ধৃত হইয়া দৌলতাবাদ দুর্গে বন্দী হন। তাঁহার ভগিনী নিজামশাহের জননী ছিলেন। তাঁহার অনুরোধে তিনি মুক্তিলাভ করিয়া সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির পদ লাভ করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে যাহাতে আর ষড়যন্ত্র না হইতে পারে সেইজন্য তিনি প্রধান পচিশজন রাজকর্ম্মচারীকে যমালয়ে পাঠাইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার প্রভু নিজামশাহকেও উন্মাদ বলিয়া প্রথমে বন্দী ও পরে ১৬২৮ খ্রীঃ অব্দে নিহত করেন। তাঁহার দশ বৎসর বয়স্ক পুত্র হোসেন শাহকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। দিল্লীর সম্রাট শাহজাহানকে নিয়মিত রাজস্ব প্রেরণ করিয়া কিছুদিন রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। ইং ১৬৩৪ সালে বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা বৃত্তি লাভ করিয়া লাহোর নগরে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। হোশেন নিজাম

শাহ গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী হইলেন। তাঁহার রাজ্য দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

ফতেগাজী—শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ শাহ জালালের তিনি একজন অনুসঙ্গী ছিলেন। তিনি আহাম্মদ গাজী প্রভৃতি দরবেশের সহিত শ্রীহট্টের অন্তর্গত ফতেপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। এই স্থানে ফতেগাজী শাহের মোকাম বর্ত্তমান আছে।

ফতেগাজী শাহ—একজন বিখ্যাত দরবেশ। তিনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ হজরত শাহ জালাল এমনির অন্যতম শিষ্য ছিলেন। শ্রীহট্টের তরফ পরগণার ফতেপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। তথায় তাঁহার সমাধি আছে এবং প্রতি বৎসর তথায় এখনও অগ্রহায়ণ মাসে একটী মেলা হইয়া থাকে।

ফতেচাঁদ জগৎ শেঠ—তিনি মুর্শিদাবাদের শেঠবংশীয় মাণিকচাঁদের ভগিনী ধনবাঈএর পুত্র সুতরাং ভাগিনেয়। প্রভূত অর্থের অধিপতি অপুত্রক মাণিক চাঁদ স্বীয় ভাগিনেয় ফতেচাঁদকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ১৭২২ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, ফতেচাঁদ সমস্ত বিষয়ের মালিক হইয়াছিলেন। তিনি ১৭২৪ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, সম্রাট তাঁহাকে জগৎ শেঠ উপাধি প্রদান করেন। তিনি ভারতবর্ষের অনেক স্থানে হুণ্ডীর কার্য্য করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেন।

কোনও সময়ে বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর উপর দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ফতেচাঁদকে বাঙ্গালার নবাবী পদ দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু উন্নতচেতা কৃতজ্ঞ ফতেচাঁদ উক্ত পদ গ্রহণে শুধু অসম্মত হইলেন এমন নহে, পরন্তু মুর্শিদ কুলী খাঁ যাহাতে বাঙ্গালায় স্থায়ী রূপে বাস করিতে পারেন তদনুরূপ আবেদন পত্র সম্রাট সমীপে প্রেরণ করিলেন। সম্রাট মোহাম্মদশাহ তাঁহার এই সজ্জনোচিত ব্যবহারে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে 'জগৎ শেঠ' নামাঙ্কিত একটী মরকত মণি উপহার দিয়াছিলেন।

১৭২৫ সালে মুর্শিদ কুলি খাঁর মৃত্যু হইলে, তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দিন খাঁ বাঙ্গালার নবাব হইয়াছিলেন। (১৭২৫-১৭৩৯ খ্রীঃ) এই সময়ে ফতেচাঁদ নবাবের চারিজন প্রধান সদস্যের অন্যতম ছিলেন। নবাব তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজ করিতেন না। নবাব সুজাউদ্দিন ১৭৩৯ সালে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার ইন্দ্রিয়পরায়ণ পুত্র সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার নবাব হইয়াছিলেন। এই হতভাগ্য নবাব ফতেচাঁদের পৌত্রবধূর অনুপম রূপ-লাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার

দর্শনের অভিলাষী হন। তৎপর একদিন বলপূর্ব্বক সেই অন্তঃপুর মহিলাকে স্বীয় ভবনে আনয়ন করিয়া দর্শনান্তে পুনঃ শেঠ ভবনে প্রেরণ করেন। এই ঘটনায় ফতেচাঁদ অতিশয় মর্ম্মপীড়িত হন এবং ইহাই সরফরাজের পতনেরও কারণ হয়। এই সব ঘটনার সুযোগ লইয়া আলীবর্দ্দী খাঁ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে পরাজয়পূর্ব্বক ১৭৪০ সালে বাঙ্গালার নবাব হন। ১৭৪২ সালে নাগপুরের ভোঁসলের সেনাপতি ভাস্কর মুর্শিদাবাদের ফতেচাঁদ জগৎ শেঠের বাড়ী লুট করিয়া, দুই কোটী টাকার উপর ধনরত্ন অপহরণ করেন। ১৭৪৪ সালে ফতেচাঁদ পরলোক গমন করেন। তাঁহার দয়াচাঁদ, আনন্দচাঁদ ও মহাচাঁদ নামে তিন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পিতার পূর্ব্বে পরলোকবাসী হন। সেইজন্য ফতেচাঁদ জীবিত থাকিতেই দয়াচাঁদের পুত্র স্বরূপচাঁদ ও আনন্দচাঁদের পুত্র মহাতাপ চাঁদকে উত্তরাধীকারী মনোনীত করেন। স্বরূপচাঁদ মহারাজ ও মহাতাপচাঁদ 'জগৎশেঠ' উপাধি প্রাপ্ত হন। মাণিক চাঁদ শেঠ দেখ।

ফতে নায়েক—তিনি মহীশূরের সুলতান হায়দর আলীর পিতা। ১৭৩৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। বাঙ্গালোরের পূর্ব্বদিকে কোলার নামক স্থানে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

ফতেপুরী মহল—তিনি দিল্লীর সম্রাট শাহজাহান পাতশাহের অন্যতমা মহিষী। দিল্লীর ফতেপুরী মস্‌জিদ তাঁহারই নির্ম্মিত।

ফতেমা বেগম—তিনি দিল্লীর সম্রাট বহলোললোদির কন্যা। বহলোললোদির ভাগিনেয় মিয়া মোহাম্মদ ফরমুলি (প্রথম কালাপাহাড়) ফতেমা বেগমকে বিবাহ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর ফতেমা বেগম প্রচুর ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন।

ফতেশাহ—বাঙ্গালার নবাব ইউছুপ শাহের (১৪৭৪-৮২ খ্রীঃ) মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেকেন্দর শাহ বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কিঞ্চিৎ উন্মাদ রোগগ্রস্ত ছিলেন। সেজন্য রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ অবিলম্বে তাঁহাকে পদচ্যুত করেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফতেশাহকে রাজপদ প্রদান করেন। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম জালালউদ্দিন আবুল মুজাফর ফতেশাহ। ফতেশাহ বিবেচক ও বুদ্ধিমান শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতানগণের পন্থানুসরণ করিয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে পদমর্য্যাদানুসারে সম্মান প্রদর্শন ও সকলের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার শাসনকালে জনসাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালা দেশে পাঁচ হাজার

পাইক সৈন্য রাজপ্রাসাদ রক্ষার্থ নিযুক্ত ছিল। ইহারা নানা দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন সময়ে রাজপ্রাসাদ রক্ষা করিত। প্রাতঃকালে সুলতান কিছু-কালের জন্য বহির্গত হইয়া, তাহাদের অভিবাদন গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদায় দিতেন। তাহার পর অন্যদল তাহাদের স্থান অধিকার করিত। পূর্ব্ববর্ত্তী নবাবদের আমলে হাবসী দাস ও খোজাদের অত্যন্ত প্রতিপত্তি ছিল। তিনি তাহাদের ক্ষমতা খর্ব করেন। সেই কারণে বারবক নামক একজন খোজা তাঁহাকে বধ করিয়া রাজপদ অধিকার করেন। বারবক শাহজাদা নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফতেশার রাজত্বকালে ১৪৮৫ খ্রীঃ অব্দে ধ্রুবানন্দ মিশ্র তাঁহার 'মহাবংশাবলী' নামক গ্রন্থরচনা করেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে কয়েকটী প্রসিদ্ধ মসজিদও নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ফতেসিংহ—(১) তিনি টিকারীর জমি-দার। বাঙ্গালার নবাব কাশিম আলী খাঁ (মীর কাশিম ১৭৬০—১৭৬৫ খ্রীঃ) রাজস্ব অনাদায় ও অন্যান্য কারণে, রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, টিকারীর রাজা ফতে সিংহ, শেখ আবদুল্লা প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত লোককে বধ করেন।

ফতেসিংহ—(২) তিনি বরদার অধি-পতি মহারাজ দমাজী গায়কোবারের দ্বিতীয় পুত্র। ১৭৬৮ খ্রীঃ অব্দে দমাজী গায়কোবার পরলোক গমন করিলে জ্যেষ্ঠ পুত্র সভাজী রাজা হন। তিনি অল্পধীসম্পন্ন রাজা ছিলেন; সেজন্য তাঁহার অনুজ ফতেসিংহ রাজ্য শাসন করেন। তিনি অতি বিচক্ষণ রাজনীতি-বিৎ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার সহিত ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি হয়। ১৭৮৯ সালে তিনি পর-লোক গমন করিলে তাঁহার অনুজ মাণিকজী মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

ফতেহ মাহমুদ, দেওয়ান—তিনি একজন বিখ্যাত পীর ছিলেন। তিনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ হজরত শাহ জালাল এমনির অন্যতম শিষ্য ছিলেন। শ্রীহট্টের তরফে তাঁহার সমাধি আছে।

ফয়জউল্লা খাঁ—রামপুরের জায়গীরদার একজন রোহিলা সর্দ্দার। তিনি আলী মোহাম্মদ খাঁ রোহিলার পুত্র। ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দের কুত্রা যুদ্ধের পর তিনি কমায়ুনে পলায়ন করেন। পরে কর্ণেল চেম্পিয়ানের সঙ্গে সন্ধি হইলে, তিনি রামপুর জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই রাজ্যের বার্ষিক আয় প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকা। ১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ আলী খাঁ রাজা হন।

ফয়জউল্লা, শেখ—গোরক্ষ বিজয় নামক কাব্য তাঁহার রচিত। তাঁহার কাব্যের ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা।

ফয়েজন্নেছা, নবাব সাহেবা—কোরেশী বংশীয় শাহজাদা জাহানুর (অন্য নাম আমির মির্জা আগোয়ান খাঁ) খাঁর পুত্র আমির মির্জা আক্র খাঁ ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত হোমনাবাদের জমিদার ছিলেন। তাঁহার বংশধর নবাব আহাম্মদআলী চৌধুরী সাহেবের কন্যা নবাব সাহেবা ফয়েজন্নেছা। তিনি পিতা, মাতা ও স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া হোমনাবাদ পরগণার বিশিষ্ট অংশের মালিক হন। নবাব সাহেবার স্বামী চৌধুরী মোহাম্মদ গাজী সাহেব প্রকৃত মিতব্যয়ী জমিদার ছিলেন। প্রচুর অর্থ নীরবে দরিদ্রকে দান করিয়াও প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। নবাব সাহেবা যেমন বিত্তশালিনী তেমন বিদুষীও ছিলেন। তিনি 'রূপজালাল' নামে একখানা উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। এই দানশীলা নবাব সাহেবা সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ বহু অর্থ দান করিয়াছেন। কুমিল্লা সহরের ফয়েজন্নেছা উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় তাঁহারই দানের পরিচয় দান করিতেছে।

ফরুকজাদ—তিনি গজনীর সুলতান মাহমুদের পৌত্র ও মসায়ুদের অন্যতম পুত্র। ইতিপূর্ব্বে তুগ্রল নামে একজন সেনাপতি বিদ্রোহী হইয়া গজনীর সুলতান আবদুর রসিদ ও চৌদ্দজন রাজকুমারকে বধ করিয়া গজনীর সিংহাসন অধিকার করেন। চল্লিশ দিন পরেই রাজ্যের প্রধান অমাত্যবর্গ তুগ্রলকে নিহত করিয়া মসায়ুদের পুত্র ফরুকজাদকে সিংহাসন প্রদান করেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ নম্রস্বভাব ভূপতি ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতানদের সময়ে প্রজাদের অতিরিক্ত কর স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি কর ভার কমাইয়া ও অনুবিধ পীড়ন হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ, ঈশ্বর ভীরু, দয়ালু, বিদ্যোৎসাহী ও সাধু চরিত্র নরপতি ছিলেন। সাত বৎসর রাজত্বের পর মাত্র চৌত্রিশ বৎসর বয়সে ১০৫৯ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা ইব্রাহিম সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ফরকুন্দ আলী খাঁ, মীর—হায়দরাবাদের নিজাম। ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতা সেকেন্দর ঝার মৃত্যুর পরে, তিনি হায়দরাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অন্য নাম নাশির উদ্দৌলা। তিনি অতিশয় দানশীল নিজাম ছিলেন। ১৮৫৭ সালে তিনি পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র আফজলউদ্দৌলা নিজামের পদে প্রতিষ্ঠিত হন

ফরুকশিয়ার—তিনি দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহের পৌত্র ও আজিম উশ্বানের পুত্র। ১৭১২ খ্রীঃ অব্দে

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র জাহান্দর শাহ দিল্লীর সম্রাট হইয়া ছিলেন। তিনি অতি অকর্ম্মণ্য নরপতি ছিলেন, এই সময়ে ফরকশিয়ার বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি বিহারের শাসনকর্ত্তা হোশেন আলী খাঁ ও এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা তাঁহার ভ্রাতা আবদুল্লা খাঁর সাহায্যে জাহান্দর শাহকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন। তিনি জাহান্দর শাহ, মন্ত্রী আসাদ খাঁ ও তাঁহার পুত্র দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা জুলফিকর খাঁকে পরলোকে প্রেরণ করিলেন। এদিকে তাঁহার সাহায্যকারী হোশেন আলী খাঁ মীর বক্সীর পদ ও তাঁহার ভ্রাতা আবদুল্লা খাঁ উজিরের পদ পাইলেন।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় এই অল্পধী সম্রাটকে হস্তগত করিয়া নিজেরাই সমস্ত রাজ-কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। মুলতান নিবাসী মীর জুম্লা বঙ্গদেশে কাজীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই ব্যক্তি এখন সম্রাট ফরক শিয়ারের একান্ত বিশ্বাসভাজন ও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। ইহা সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মনঃপূত ছিল না। সম্রাট ও সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে বড় প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। এই জন্য সৈয়দ হোশেন খাঁকে, সম্রাট যোধপুরের অধিপতি অজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে, কোনও মতে হোশেন আলী খাঁ পরাস্ত হন। আবার কোনও মতে তিনি জয়ী হন। হোশেন আলী খাঁ, রাজপুতনা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, ক্ষমতা লাভ প্রয়াসী দুই দলের মধ্যে বিবাদ ভীষণভাব ধারণ করিল। সম্রাট ইহাদের বিবাদের মূলোচ্ছেদ করিতে অভিলাষী হইয়া প্রথম দলের নায়ক হোশেন আলী খাঁকে দাক্ষিণাত্যে ও দ্বিতীয় দলের নায়ক মীর জুম্লাকে বিহারের শাসনকর্ত্তা করিয়া দূরে প্রেরণ করিলেন। জুলফিকর খাঁ পাদশাহের আদেশে নিহত হইলে, তাঁহার প্রতি-নিধি দায়ুদ খাঁ দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হন। এই দায়ুদ খাঁর সহিত হোশেন আলীর ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটন হয়। এই যুদ্ধে দায়ুদ খাঁ নিহত হন।

এই সময়ে শিখ জাতি অতিশয় প্রবল হইয়া লাহোর হইতে অম্বালা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করেন। তাঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য পাত-শাহ এক বিপুল সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। শিখেরা প্রথমে মুঘলদিগকে বিশেষ বিপন্ন করিয়াছিল কিন্তু তাঁহাদের শিবিরে খাদ্যাভাব উপস্থিত হইলে তাঁহারা বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। নিষ্ঠুর হৃদয় মুঘল সেনাপতি নৃশংসাচরণের একশেষ প্রদর্শন করিয়া দুই সহস্র শিখ সৈন্যের শিরচ্ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাদের ছিন্ন মস্তক দিল্লীতে

প্রেরণ করিলেন। ইহাই শেষ নহে শিখ গুরু বান্দাকে এক সহস্র অনুচর সহ হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করা হইল। বন্দী বীরগণ একে একে ঘাতক হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া বিধাতার অভিশাপ মুঘল সাম্রাজ্যের উপর আনয়ন করিল। গুরু বান্দা স্বীয় পুত্রকে বধ করিতে আদিষ্ট হইলেন এবং অবশেষে অতি নিষ্ঠুররূপে তাঁহাকেও বধ করা হইল। এই ঘটনার পর বৎসরই মীর জুম্লা বিহারের শাসন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। পাতশাহ তাঁহাকে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের ভয়ে তেমন আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন না। পরন্তু তাঁহাকে লাহোরের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়া তথায় প্রেরণ করিলেন।

এদিকে দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্রারা দিন দিন প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছিল। হোশেন আলী খাঁ তাঁহাদিগকে কিছুতেই দমন করিতে পারিলেন না। অবশেষে মুঘলের গৌরব নাশক এক হীন সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। এই সন্ধির ফলে শিবাজীর অধিকৃত প্রদেশে তাঁহারা স্বাধীন হইলেন। সমস্ত দাক্ষিণাত্য প্রদেশের চৌথ ও স্বরদেশমুখী (রাজস্বের চতুর্থাংশ ও দশমাংশ) তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা বার্ষিক দশলক্ষ মুদ্রা ও পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু এই অকীর্ত্তিকর সন্ধিতে সম্রাট সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের শত্রু পক্ষের পরামর্শে সম্মতি দানে অস্বীকার করিলেন। এদিকে যোধপুরের রাণা অজিৎ সিংহ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিপত্তি বিনাশ করিতে সচেষ্ট হইয়া ব্যর্থকাম হন। সৈয়দ সারদুল্লা খাঁ এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্বীয় ভ্রাতা হোশেন আলী খাঁকে অচিরে দিল্লীতে আগমন করিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। হোশেন আলী খাঁ তদনুসারে দশ সহস্র মহারাষ্ট্রা সৈন্য সহ দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। অরক্ষিত রাজপুরি অতি অল্প আয়াসেই তাঁহাদের হস্তগত হইল। তাঁহাদের কতিপয় অনুচর প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পাতশাহকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। বহু অনুসন্ধানের পর তাঁহাকে ছাদের এক কোণে লুক্কায়িত অবস্থায় পাওয়া গেল। দুর্বৃত্তেরা তাঁহাকে নানারূপে অবজ্ঞাত করিয়া টানিয়া বাহির করিল। তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী পুর মহিলাদের করুণ ক্রন্দন রোলে চতুর্দ্দিক মুখরত হইল। তাঁহারা অনুচরদের পদধারণ করিয়া বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই দুর্বৃত্তদের পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইল না। তাঁহারা সম্রাট ফরকশিয়ারকে পুরমহিলাদের মধ্য হইতে বাহিরে আনয়ন করিল। তাহার

পর তাঁহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল। খাফি খাঁ তাঁহার এই কারাগারকে তাঁহার জীবন্ত সমাধি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পাতশাহ এই কারাগারে অবস্থান করিয়াও, মুক্তিলাভ করিবার আশায় প্রহরীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা প্রকাশিত হইলে সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল, আহার্য্য বস্তুতে বিষ মিশ্রিত করিয়া তাঁহার পরলোক গমনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন। ফরকশিয়ারকে হুমায়ুনের সমাধি ভবনের এক পার্শ্বে সমাহিত করা হয়। পাতশাহের বহু দোষ ছিল সত্য কিন্তু তিনি গরীবের মা বাপ ছিলেন। তাঁহার শবাধারের অনুগমন করিয়া দুই তিন সহস্র গরীব দুঃখী ও বহু সন্ন্যাসী ফকির গমন করিয়াছিল। তাঁহাদের গগন-ভেদী আর্ত্তনাদ ও গালাগালিতে দিঙ্‌-মণ্ডল পূর্ণ হইয়াছিল। অনুগামী সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বক্‌সীর ও তাঁহার সহগামী সম্ভ্রান্ত লোকদের উপর প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রদত্ত তণ্ডুল ও মুদ্রা কোনও গরীব গ্রহণ করে নাই। তৃতীয় দিবসে এই গরীব লোকেরা তথায় উপস্থিত হইয়া অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধনপূর্ব্বক বহু গরীবকে পরি-তোষপূর্ব্বক আহার করাইয়াছিলেন। সৈয়দ যুগল ফরকশিয়ারের পিতৃব্য পুত্র রফিউদদরজাতকে রাজা করিলেন।

ফররাহী মোল্লা—তিনি দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীর বাদশার সময়ের একজন বিখ্যাত মৌলবী ছিলেন। জাহাঙ্গীর পাতশা বাল্যে লেখা পড়ায় একেবারেই মনোযোগী ছিলেন না। তাঁহার পিতা সম্রাট হুমায়ুন জাহাঙ্গীর পাতশার শিক্ষার জন্য অনেক শিক্ষিত মৌলবীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু কেহই তাঁহাকে লেখাপড়ায় অনুরাগী করিতে পারেন নাই। জাহাঙ্গীর বড়ই খেলা-প্রিয় ছিলেন। অবশেষে মৌলবী ফররাহী তাঁহাকে খেলার সঙ্গে সঙ্গেই বর্ণমালা শিখাইয়া ফেলিলেন। কিছুকাল মধ্যেই জাহাঙ্গীরের লেখাপড়ায় অনু-রাগের সঞ্চার হইল। এই কৃতকার্য্যতার জন্য সম্রাট আকবরের নিকট যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট জায়গীর ও পদোন্নতি-দ্বারা সম্মানিত করেন। জৌনপুরের উপকণ্ঠে মোল্লা ফররাহী জাহাঙ্গীর পাতশাহের নামে জাহাঙ্গীর নগর নামক একটী নগর স্থাপন করেন। তিনি দিল্লীতে পরলোক গমন করেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব আদেশ অনুসারে জৌন-পুরে তাঁহার মাদ্রাসার প্রাঙ্গনে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

ফরহাত—তাঁহার পিতার নাম শেখ আসাদ উল্লা। ফরহাত তাঁহার কবি-জন সুলভ উপাধি। তিনি উর্দ্দু ভাষায়

একখানা কাব্য লিখিয়াছেন। তিনি ১৭৭৭খ্রীঃ অব্দে মুরশিদাবাদে পরলোক গমন করেন।

ফরহাদ খাঁ বাহাদুর, নবাব—১৬৬৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। উক্ত সালে তিনি শ্রীহট্টের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত গোয়ালিছড়ার সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক মস্‌জিদ ইমারত ও সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শাহ জালালের দরগার মধ্যস্থিত বড় মস্‌জিদ ১৬৭০ খ্রীঃ অব্দে তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। তিনি অনেককে বহু ভূমি দানও করিয়াছিলেন।

ফরিদউদ্দীন—দিল্লীর সম্রাট শের-শাহশূরের পূর্ব্ব নাম শেরশাহশূর দেখ।

ফরিদউদ্দীন, শেখ—তিনি একজন বিখ্যাত মুসলমান সাধক ছিলেন। তিনি কাবুলের ফরকশাহের বংশীয় শেখ জালালউদ্দিন সুলেমানের পুত্র। তিনি খাজা কুতুবউদ্দিন বক্তিয়ার কাকির শিষ্য ও শেখ সায়েফউদ্দিন হামারিয়ার সমসাময়িক ছিলেন। ১০৭৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১২৬৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। মুলতান নগরের অন্তর্গত পাকপত্তন নামক স্থানে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

ফরিদ বোখারী, শেখ—তিনি আগ্রা নগরের রক্ষক ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া নানা প্রকারে তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তিনি মুর্ত্তজা খাঁ উপাধি পাইয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে কাজে অসমর্থ হইলে অবসর গ্রহণ করেন। ১৬১৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

ফর্দ্দৌষী কবি—তিনি তুসের শাসন কর্ত্তার উদ্যানপালকের পুত্র ছিলেন। গজনীর সুলতান মাহমুদ পারস্যের প্রাচীন রাজন্যবর্গের ইতিহাস সুললিত পদ্যে রচনা করাইতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। এই বিষয় জানিতে পারিয়া মহাকবি ফর্দ্দৌসী কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। ইতিপূর্ব্বে কোন কবিই পারস্যের রাজবংশের ইতিবৃত্ত পদ্যে রচনা করিতে সাহসী হন নাই। তিনি তাঁহার পিতার উদ্যানতলবাহিনী কলনাদিনী স্রোতস্বিনীর কূলে বসিয়া একাগ্রচিত্তে শাহনামা রচনা করিতেন। কখনও কখনও নদীর জল বৃদ্ধি পাইয়া তাহার তীরদেশ প্লাবিত করিত। তাহাতে তাঁহার কবিতা রচনায় ব্যাঘাত জন্মিত। সময়ে সময়ে ফর্দ্দৌষী কবিতা পাঠ করিয়া সুলতান মাহমুদকে শুনাইতেন। সুলতান তাঁহার কবিতা শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া প্রতি কবিতায় এক একটী সুবর্ণ মুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু ফর্দ্দৌষী যখন

অশীতি সহস্র শ্লোকে তাঁহার কাব্য শেষ করিয়া পুরস্কার প্রার্থী হইলেন। তখন অর্থ পিপাসু সুলতান স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিতে আদেশ দিলেন। কবি ফর্দ্দোসী অতিশয় ঘৃণাভরে সেই অর্থ গ্রহণ না করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। সুলতান কিছুকাল পরে স্বীয় দোষ বুঝিতে পারিয়া, লোক সমভিব্যাহারে সমস্ত স্বর্ণ মুদ্রা কবির আলয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু লোকজন অর্থ সহ এক দ্বার দিয়া তাঁহার আলয়ে প্রবেশ করিল, অন্য দ্বারদিয়া তাঁহার শবাধার গৃহ হইতে বহির্গত হইল। কবির কন্যা সেই অর্থ প্রথমে গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু সমাগত লোকদের অনুরোধে সেই অর্থ গ্রহণ করিয়া, পিতার অভিলাষ অনুযায়ী একটী পান্থশালা ও নদীর তীরে বাঁধ নির্ম্মাণ করাইয়া জলপ্লাবন হইতে সেই জনপদকে রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

ফল্গুন—তিনি কাশ্মীরের অধিপতি যশস্করের (৯৩৯-৯৪৮ খ্রীঃ অব্দ) বাল্য বন্ধু ছিলেন। তাঁহারই সঙ্গে নিঃসম্বল যশস্কর দূরদেশে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য গমন করিয়াছিলেন। তৎপরে যশস্কর সিংহাসনে আরোহণ করিলে, ফল্গুন তাঁহার মন্ত্রী হইয়াছিলেন। পরে ক্ষেমগুপ্তের সময়ে (৯৫০-৯৫৮ খ্রীঃ) অব্দে তিনি সামান্য দ্বারপালের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজা ক্ষেমগুপ্তের সহিত তিনি স্বীয় কন্যা চন্দ্রলেখার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কর্দ্দমরাজও ও রাণী দিদ্দার সময়ে (৯৮০—১০১৩খ্রীঃ অব্দে) মন্ত্রীপদ লাভ করেন। কিন্তু রাণী দিদ্দার দুর্ব্যবহারে কর্দ্দমরাজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান অমাত্যেরা বিদ্রোহী হন। রাণী অর্থদ্বারা কতকগুলি লোককে স্বপক্ষে আনয়ন করেন। অবশিষ্ট কর্দ্দমরাজ প্রভৃতি নিহত হন।

ফাল্গুনী মিত্র— অহিচ্ছত্র প্রাচীন পাঞ্চাল রাজ্যের রাজধানী। এই স্থানে অগ্নিমিত্র, ইন্দ্রমিত্র, ভানুমিত্র, ফাল্গুনী মিত্র প্রভৃতির নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের সময় এখনও নিরূপিত হয় নাই।

ফল্গু হস্তিনী—প্রাচীন কালের সংস্কৃত সাহিত্যের একজন বিদুষী মহিলা কবি। তিনি খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। বল্লভ দেব কৃত সুভাষিতাবলীতে তাঁহার দুইটী কবিতা উদ্ধৃত আছে। রাজশেখরের শার্ঙ্গধর পদ্ধতিতেও তাঁহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ হইতে প্রতিপদচন্দ্রের বর্ণনাটী এই গ্রন্থে দেওয়া গেল।

"ত্রিনয়ন জটাবল্লীপুষ্পং মনোভব
কার্য্যকার্মুকং
গ্রহকিসলয়ং সন্ধ্যানারী নিতম্বনখক্ষতং
তিমির বিদুরং ব্যোম-শৃঙ্গং নিশাবদন-
স্মিতং

প্রতিপদি নবমস্তেন্দুবিম্বং সুখোদয়ং
অস্তু বঃ।"

ফা-ইয়ং (Fa-Yong)—একজন চীন দেশীয় পরিব্রাজক। প্রসিদ্ধ-নামা ফা-হিয়েন (Fa Hien) স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার পর তাঁহার নিকট হইতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রসার ও মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আরও কতিপয় চীনা ভ্রমণকারী ভারতে আসিবার জন্য উৎসুক হন। ৪২০ খ্রীঃ অব্দে এইরূপ কতিপয় ভ্রমণকারী ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহাদের নায়কের নাম ছিল ফা-ইয়ং। তাঁহার সঙ্গে আরও চব্বিশজন ভ্রমণকারী স্থলপথে ভারতে আগমন করেন। তাঁহারা প্রথমে কাশ্মীরে উপনীত হন। তাহার পর উত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিয়া দাক্ষিণাত্যের কোনও স্থান হইতে জলপথে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহাদের ভ্রমণ কাহিনীর কোনও বিবরণ ভারতীয় কোন ভাষায় রক্ষিত হয় নাই। চীন দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রসারের ইতিহাসে এই সকল তথ্য অবগত হওয়া যায়।

ফা-হিয়েন—বিখ্যাত চীন দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক। তিনি খ্রীঃ ৩৯৯ অব্দে চীন দেশ হইতে বৌদ্ধ তীর্থস্থান সকল দর্শন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহ সংগ্রহ করিবার ইচ্ছায় স্বদেশ হইতে এই দুঃসাহসিক যাত্রা করেন। তাহার পূর্ব্বেই স্বদেশে, তিনি ভিক্ষু হইয়াছিলেন। যথাযথভাবে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপালন করিবার জন্য তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। কিন্তু তৎকালে চীন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ বিস্তৃতভাবে পাওয়া যাইত না এবং ভিক্ষুরাও শাস্ত্রের মর্ম্ম সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অনেক সময়েই স্বেচ্ছামত কাজ করিতেন। ফা-হিয়েন ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্র সকল বিশেষভাবে বিনয়পিটক অধ্যয়ন করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিতে মনস্থ করেন।

স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া গোবী মরুভূমির ভিতর দিয়া তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া প্রথমে তুর্ফান প্রদেশে উপস্থিত হন; সেইখান হইতে বণিকদলের সহায়তায় খোটানে গমন করেন। খোটানে তখন বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ বিস্তার হইয়াছিল। ফা-হিয়েন তথায় বহু সহস্র শ্রমণের সাক্ষাৎ লাভ করেন

খোটান হইতে তিনি কাশ্মীরের মধ্য দিয়া সিন্ধুনদের উপত্যকা বাহিয়া পঞ্চনদে উপনীত হন। সেই সময়ে সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য মগধের সম্রাট ছিলেন। ফা-হিয়েন সর্ব্বমোট ছয় বৎসর ভারতবর্ষে অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি পুরুষপুর, (বর্ত্তমান পেশোয়ার),

তক্ষশিলা, মথুরা, শঙ্কাশ্য, কান্যকুব্জ, কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী, বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগর সমূহ পরিদর্শন করেন। প্রায় সমুদয় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-প্রধান স্থানে তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শাস্ত্র, বিশেষভাবে বিনয়পিটক অধ্যয়ন করেন। সুদীর্ঘ ছয় বৎসরকাল উত্তর ভারতের প্রায় সমুদয় বিখ্যাত স্থান সমূহ পরিদর্শন করিয়া এবং আবশ্যকানুযায়ী বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারে বাস করিয়া শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন পূর্ব্বক তিনি বঙ্গদেশের অন্তর্গত তাম্রলিপ্তি হইতে পোতারোহণে সিংহলে গমন করেন। তথায়ও কতিপয় বর্ষ অবস্থান পূর্ব্বক শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া প্রায় পনের বৎসর পরে তিনি স্বদেশ যাত্রা করেন। পথে তিনি যবদ্বীপে পাঁচ মাস অবস্থান করেন। এইভাবে নানারূপ অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া তিনি ৪১৪ খ্রীঃ অব্দে স্বদেশে উপনীত হন। চীন সম্রাট তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি রাজানুগ্রহে, ন্নানকিং সহরেই বাস করেন। এই তীর্থ ভ্রমণে তিনি যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি ধর্ম্মের উন্নতি ও সংস্কার কার্য্যে নিয়োগ করেন।

ভারতবর্ষ ও সিংহল হইতে তিনি অনেক পুঁথি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকখানি তিনি চীন ভাষায় অনুবাদও করেন।

ফা-হিয়েন ভারতের বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়া যাহা কিছু দেখিয়াছিলেন বা শুনিয়াছিলেন সে সমুদয়ের বিস্তৃত বিবরণসহ নিজের ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। ঐ যুগে, ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনার পক্ষে পুস্তকখানি অপরিহার্য্য। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায় যে তখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই প্রায় বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব ছিল। ধরিতে গেলে বৌদ্ধধর্ম্মই তখন ভারতের প্রধান ধর্ম্ম হইয়াছিল। ফা-হিয়েন তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে গুপ্ত-রাজদিগের শাসন প্রণালীর সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে গুপ্তরাজগণ বৈষ্ণব মতাবলম্বী হইলেও বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার করিতেন না।

তাঁহার সময়ে মগধদেশের নগরগুলি উত্তরাপথের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম ছিল। তিনি বৈশালী পাটলীপুত্র, রাজগৃহ, গয়া প্রভৃতি প্রধান বৌদ্ধতীর্থ সমূহ দর্শন করিয়াছিলেন। রাজধানী পাটলীপুত্র নগরের ঐশ্বর্য্যদর্শনে তিনি বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গুরুভার বৃহদাকার পাষাণখণ্ড নির্ম্মিত মৌর্য্য সম্রাট অশোকের প্রাসাদ তখনও ধ্বংস হয় নাই। সেই পাষাণখণ্ড সমূহ যোজন ও যথাস্থানে সংস্থাপন তৎকালে

মানবের অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। খ্রীঃ চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর মগধবাসীগণ অশোকের প্রাসাদ ও চৈত্যসমূহ দানবগণকর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করিতেন। তখন পাটলীপুত্রে হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু সঙ্ঘরাম সমূহে বাস করিতেন। মঞ্জুশ্রী নামক ব্রাহ্মণ জাতীয় উপাধ্যায়কে উভয় সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণ অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। পাটলীপুত্র নগরে বৎসরের দ্বিতীয় মাসের অষ্টম দিবসে দেবগণের রথযাত্রা দেখিয়া শ্রমণ ফা-হিয়ান আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তখন নগরে বহু চিকিৎসালয় ছিল। আতুর, রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ অর্থব্যয় না করিয়া তথায় ঔষধ ও পথ্য পাইতেন।

ফিতরত—মির ময়জউদ্দিন মোহাম্মদ মুসবিল্লার কবিজনসুলভ নাম। ১৬৪০ খ্রীঃ অব্দে পারস্য দেশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজীবের সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন। এবং কবি বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তিনি কিছুকাল বিহার প্রদেশে শাসনকর্ত্তা ছিলেন। 'গুলশান-ই-ফিতরত' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত। ১৬৯০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ফিরঙ্গজী নরশাল—তিনি শিবাজী ছত্রপতির কোন দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন। মুঘল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, তিনি দীর্ঘকাল সেই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে দুর্গ রক্ষা করা অসম্ভব দেখিয়া মুঘল সেনাপতি শায়েস্তা খাঁর সঙ্গে সন্ধি করিয়া, দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবাজীর কাছে প্রত্যাগত হন। শিবাজী তখন তাঁহাকে ভূপালগড় দুর্গের অধ্যক্ষ পদ প্রদান করেন। শিবাজীর পুত্র শম্ভুজী পিতৃপক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মুঘল পক্ষে যোগ দেন। আওরঙ্গজীব তাঁহাকে উচ্চ সম্মান প্রদানপূর্ব্বক ভূপালগড় আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। তিনি ভূপালগড় আক্রমণ করিলে, ফিরঙ্গজী বিষম সমস্যায় পড়িলেন; তিনি অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারীর উপর দুর্গ রক্ষার ভার দিয়া পলায়নপূর্ব্বক শিবাজীর নিকট গমন করিলেন। বলা বাহুল্য দুর্গ মুঘল হস্তে পতিত হইল। এইজন্য শিবাজী অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরঙ্গজী নরশালকে তোপের মুখে স্থাপনপূর্ব্বক বধ করেন।

ফিরোজ মোল্লা—তিনি জর্জনামা নামে একখানা ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। ইহাতে ১৪৯৮ খ্রীঃ অব্দে ভাস্কোডি গামার ভারতবর্ষে আগমনের সময় হইতে ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজ কর্ত্তৃক পুনানগর অধিকার করার সময় পর্য্যন্ত কালের ইতিহাস বর্ণিত আছে।

ফিরোজশা মেরওয়াঞ্জি মেহ তা স্যার—বোম্বাই প্রদেশের সুবিখ্যাত

পার্শী ব্যবহারজীবী, রাজনীতিবিদ্ ও জনহিতব্রতী। ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে বোম্বাই নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা বোম্বাই'র একটি সুবৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রধান অংশীদার ছিলেন। ইংলণ্ডে ও চীন দেশে তাঁহাদের ব্যবসায় চলিত। ব্যবসায়ী হইলেও ফিরোজশা মেহ্তার পিতা পুত্রকে সুশিক্ষা দিতে অবহেলা করেন নাই। সেই সময়ে ভালরূপ ইংরেজি শিক্ষার সুবিধা ছিল না। তাহা হইলেও ফিরোজশা'র পিতা তাঁহাকে উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য যতদূর সম্ভব ভাল ব্যবস্থা করেন। ১৮৬৪খ্রীঃ অব্দে ফিরোজশা বি-এ উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং মাত্র ছয়মাস পরে কৃতীত্বের সহিত এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পার্শী যুবকদের মধ্যে তিনিই প্রথম এম্-এ। অতঃপর তিনি রুস্তমজী জামশেঠজী জিজিভয় প্রদত্ত বৃত্তি লইয়া আইন অধ্যয়নের জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে রুস্তমজীর ব্যবসায়ে গুরুতর ক্ষতি হওয়ায় ফিরোজশা বৃত্তির টাকা সম্পূর্ণ-রূপে পান নাই।

১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডে আইন. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (Barriester) হইয়া তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং বোম্বাই হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও অধ্যবসায়ের বলে, অল্পকাল মধ্যেই তিনি ব্যবহারজীবী-দের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করেন।

ফিরোজশা'র অসাধারণ কর্ম্মক্ষমতা হাইকোর্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সকল প্রকার জনহিতকর কার্য্যের সহিত তাঁহার যোগ ছিল এবং সকল স্থলেই তাঁহার অনন্যসুলভ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়া তিনি অল্পকালের মধ্যে অন্যতম জননায়করূপে পরিচিত হইলেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি বোম্বাই পুরতন্ত্রের একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং সুদীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে উহার সকল প্রকার কার্য্যের সহিত যুক্ত থাকিয়া বোম্বাই পুরতন্ত্রের নানা-বিধ উন্নতি সাধনের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করেন। তিন বৎসর তিনি উহার 'প্রধান' (President) নির্ব্বাচিত হইয়া-ছিলেন। বস্তুতঃ পুরতন্ত্রের সকল কাজে তাঁহার মত অধিক সময় দিতে বা তাঁহার জন্য পরিশ্রম করিতে সে সময়ে কাহাকেও দেখা যাইত না।

রাজনীতিক আন্দোলন ব্যাপক ও ও শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনার সুবিধার জন্য, ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে তিনি আরও কয়েকজন ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া বোম্বাই প্রাদেশিক সঙ্ঘ (Bombay Presidency Association) স্থাপন করেন। কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান

এসোসিয়েশনের ন্যায়, উহা তৎকালে ইংরেজি শিক্ষিত, উন্নতিপন্থী ব্যক্তিদের রাজনীতি আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল। সেই বৎসরই বোম্বাই নগরে, ৺উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার (Indian National Congress) প্রথম অধিবেশন হয়। সেই সময় হইতেই তিনি ভারতের সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্টভাবে যুক্ত হইয়া আসিতেছেন। ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা নগরে যখন জাতীয় মহা সমিতির অধিবেশন হয়, তখন তিনি উহার সভাপতি হইয়াছিলেন।

১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ঐ পদে বহুবৎসর তিনি আসীন ছিলেন। ব্যবস্থাপক সভার সমুদয় কার্য্যে তিনি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত যোগ দিতেন। বিতর্ককালে তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা সকলের নিকটই প্রশংসা লাভ করিত। পূর্ব্বাপরই তিনি বিশেষ স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। বাৎসরিক আয় ব্যয় (Budget) আলোচনার সময়ে তাঁহার মতামত বিশেষ সমাদৃত হইত।

কয়েক বৎসর পরে তিনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। সেইখানেও তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিচার ক্ষমতা, বাগ্মিতা প্রভৃতির জন্য অচির কাল মধ্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য থাকাকালে তিনি যে প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এই স্থলে তাহার বিন্দুমাত্র ন্যূনতা হয় নাই।

দীর্ঘকাল তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য (Fellow) ছিলেন। এই স্থানেও তিনি নানা বিষয়ে নিজের কর্ম্মক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেন। ১৯১৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সর্ব্বাধিকারী' (Vice-Chanceller) নিযুক্ত হন। ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে তদানীন্তন ইংলণ্ডের যুবরাজ (যিনি পরে সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ হইয়াছিলেন) ভারতে আগমন করেন। সেই সময়ে সার ফিরোজ শা বোম্বাই পুরতন্ত্রের সভাপতিরূপে তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। পুনরায় ১৯১২ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখনও তিনি, সম্রাটের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল দেশের সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যের সহিত আন্তরিক যোগ রক্ষা করিয়া যে সকল প্রথিতনামা ভারতবাসী ভারতের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, সার ফিরোজ শা তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান ছিলেন। তাঁহার

কর্ম্মক্ষেত্র প্রধানতঃ বোম্বাই প্রদেশে নিবদ্ধ থাকিলেও সমগ্র ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার মতামত বিশেষ সম্মানের সহিত গৃহীত হইত। নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, তেজস্বী, নির্ভিক নেতারূপে তিনি জীবতকালে মহান সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন।

১৯১৫ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে, (১৩২২ বঙ্গাব্দ, কার্ত্তিক) বোম্বাই নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ফিরোজ শাহ তোগলক—তিনি দিল্লীর তোগলক বংশীয় নরপতি গিয়াস উদ্দিনের ভ্রাতা সিপাহীসলার রজবের পুত্র। ১৩০৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। রজব আবুহর নগরের ভট্টি রাজপুত রণমল্লের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ফিরোজের জন্ম হয়। ফিরোজের পিতৃব্য পুত্র মোহাম্মদ ১৩২১—১৩৫১ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া অপুত্রক পরলোক গমন করেন। মোহাম্মদ রাজ্য লাভ করিয়া, ফিরোজ শাহের প্রতি খুব ভাল ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি ফিরোজকে উচ্চপদে স্থাপন করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি সম্রাটের যথেষ্ট বিশ্বাসও ছিল। তিনি মোহাম্মদের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, ইহাও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল।

১৩৫১ সালে মোহাম্মদ তোগলক তাত্তানগরের নিকটে সিন্ধুদেশে পরলোক গমন করেন। তাঁহার সেনাপতিরা অপুত্রক মোহাম্মদের পরিত্যক্ত সিংহাসনে ফিরোজকে মনোনীত করিলেন। ফিরোজ রাজ্য শাসনের গুরুভার গ্রহণ করিতে প্রথমে সম্মত হইলেন না। কিন্তু সেনাপতিরা তাঁহাকেই সম্রাটের পদ গ্রহণ করিতে বার বার বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—'আমি ঈশ্বর আরাধনা করিয়া আসি।' এই বলিয়া তিনি উপাসনা সমাপনান্তে প্রার্থনা করিলেন—'প্রভো! রাজ্যের স্থায়িত্ব, শান্তি ও শৃঙ্খলা মানুষের উপর নির্ভর করে না। তোমার অনুগ্রহেই রাজ্য স্থায়িত্ব লাভ করিয়া থাকে। হে ঈশ্বর তুমিই আমার আশ্রয়স্থল ও বলবিধান কর্ত্তা।' সেনাপতি তাতার খাঁ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট অর্পণ করিলেন। তাঁহার রাজ্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। ফিরোজ শাহ দিল্লীতে উপনীত হইয়াই, মোহাম্মদ শাহের কোনও উত্তরাধিকারী আছেন কিনা, তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। বিশেষ অনুসন্ধানেও তাঁহার কোন উত্তরাধিকারীর সংবাদ পাইলেন না। খাজা জাহান নামে একজন সেনাপতি সম্রাট মোহাম্মদ শাহের পুত্র বলিয়া অন্য একজনকে সিংহাসনে স্থাপন

করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই উদ্যম ব্যর্থ হয় এবং তিনি নিহত হন। ফিরোজ অতিশয় গোঁড়া মুসলমান ছিলেন বলিয়া, অন্যধর্ম্মাবলম্বী-দের প্রতি সুবিচার করিতে পারিতেন না। তারিখ-ই-ফিরোজ সাহী গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, একজন ব্রাহ্মণ কোনও মুসলমানকে ইসলাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বলায়, তাহাকে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত মিরাত-ই-ফিরোজ শাহী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি উড়িষ্যার জগন্নাথের মূর্ত্তি অতিশয় ঘৃণাভরে নষ্ট করেন। প্রতিপদে ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থানুযায়ী চলিতে যাইয়া, তাঁহার স্বীয় স্বাধীন চিন্তার বিকাশ হয় নাই। অন্যপক্ষে তিনি স্বীয় স্বধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি খুব সদয় ছিলেন। মাদ্রাসা ও মক্তবের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে ত্রুটি করিতেন না। কোন হিন্দু মুসলমান হইলেই জিজিয়া কর হইতে একেবারে অব্যাহতি পাইতেন। নানাপ্রকারে বিধর্ম্মীদিগকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করিতে উৎসাহিত করিতেন। মোহাম্মদ তোগলকের মৃত্যুর পরে প্রান্তবর্ত্তী শাসনকর্ত্তারা স্ব স্ব প্রধান হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা সামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৩৯—৫৮ খ্রীঃ) অন্যতম। ফিরোজ শাহ তাঁহাকে দমন করিবার জন্য এক দল সৈন্যসহ গৌড়ের রাজধানী পাণ্ডুয়া আক্রমণ করেন। ইলিয়াস শাহ উপায়ান্তর না দেখিয়া, একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইলিয়াস শাহের সৈন্য দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া পাতশাহের সৈন্যকে আক্রমণ করিত, কিন্তু প্রতিবারেই পরাস্ত হইয়া দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিত। ফিরোজ শাহ অবশেষে দুর্গ বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। ফিরোজ শাহ ইলিয়াস শাহের সহিত সন্ধি করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই যুদ্ধে বহু সৈন্য নিহত হয়। তাহাদের আর্ত্তনাদে কাতর হইয়া ফিরোজ শাহ সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন।

১৩৫৮ সালে সামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৩৫৯ সালে পূর্ব্ববঙ্গের শাসনকর্ত্তা মবারক শাহের পুত্র জাফর খাঁ দিল্লীর পাত শাহের নিকট গমন করিয়া, সিকন্দর শাহের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। ইহার প্রতীকার কল্পে দ্বিতীয়বার ফিরোজ শাহ বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। সিকন্দর উপায়ান্তর না দেখিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। জাফর খাঁকে সুবর্ণ গ্রামের সিংহাসন প্রদান করিতে এবং দিল্লীতে ৪০টী

হস্তী ও বহু মূল্য উপহার প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু জাফর খাঁ আর বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং সিকন্দরই সুবর্ণ গ্রামের অধীশ্বর রহিলেন।

দ্বিতীয়বার বঙ্গ অভিযানের পরেই তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। সেই সময়ে গঙ্গাবংশীয় তৃতীয় ভানুদেব (১৩৫২—৭৯ খ্রীঃ) উড়িষ্যার রাজা ছিলেন। তিনি ফিরোজ শাহের অভি-যানের খবর পাইয়াই প্রথমে পলায়ন করেন। ফিরোজ শাহ জগন্নাথের মন্দির অপবিত্র করিয়া, জগন্নাথের মূর্ত্তি সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করেন। পরে রাজা প্রতি বৎসর কর স্বরূপ কতক-গুলি হস্তী দিতে সম্মত হইয়া পাত-শাহের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। এই সময়ে বঙ্গের আরও কয়েকটী রাজার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ফিরোজ শাহ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাট মোহাম্মদ তোগলক নগর কোটের দুর্গ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই দুর্গাধিপতি স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। ফিরোজ শাহ এক্ষণ দুর্গ আক্রমণ করিয়া (১৩৬০—৬১ খ্রীঃ) অধিকার করিলেন। নগর কোটে জ্বালামুখী তীর্থ অবস্থিত। এই তীর্থ দর্শনে হাজার হাজার যাত্রী প্রতি বৎসর আগমন করিয়া থাকে। এই জন্যও ইহার ধ্বংস সাধন প্রয়োজন। অতিশয় গোঁড়া মুসলমান ফিরোজ শাহ ইহার ধ্বংস সাধন অতি পুণ্য কার্য্য বলিয়া মনে করিলেন। ছয় মাস দুর্গ অবরোধের পর উভয় পক্ষ খুব অবসন্ন হইলেন। ফিরোজ শাহ দুর্গাধিপতিকে ক্ষমা করিলেন। দুর্গপতি দিল্লীর সম্রাটের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। ফিরোজ শাহ তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ভূতপূর্ব্ব পাতশাহের উপর দুর্ব্ব্যব-হারের প্রতিশোধ লইবার জন্য ফিরোজ শাহ ১৩৬২ সালে তাত্তা অভিযান আরম্ভ করেন। এই বিপুল বাহিনীতে ৯০ হাজার অশ্বারোহী ও চারি লক্ষ পদাতিক, ৪৮০টী হস্তী ও পাঁচ হাজার নৌকা ছিল। সিন্ধুদেশবাসী জাম ববিনিয়া নামক সেনাপতি বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী ও চারি লক্ষ পদাতিক সহ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু এমন সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হইয়া এক চতুর্থাংশ সৈন্য ক্ষয় হইল। এই উৎসাহহীন অবশিষ্ট সৈন্যেরা আক্র-মণ করিয়া শত্রু সৈন্যকে দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিল। ফিরোজ শাহ আর যুদ্ধে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি গুজরাটে গমন করিয়া নূতন সৈন্য সংগ্রহের অভিলাষী হইলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনকালে একজন পথ পরিদর্শকের প্রতারনায় তাঁহারা কচ্ছ

দেশের মরুভূমিতে উপনীত হইলেন। ছয় মাসকাল বহু যাতনা ভোগ করিয়া অবশেষে তাহারা দিল্লীতে উপনীত হইল। ইহার কিছুকাল পরে, সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ফিরোজ শাহ আবার তাত্তা নগর আক্রমণ করেন। কিন্তু সিন্ধু দেশবাসীরা প্রাণপণে বাধা দিল। অবশেষে তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

ফিরোজ শাহ একবারেই বিলাসী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাতে সৌন্দর্য্যানুভূতির অভাব ছিল না। সুন্দর প্রাসাদ শ্রেণী ও উদ্যান মালার নির্ম্মাণে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি বহু সংখ্যক মনোরম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটগণের বহু পুরাতন সমাধি মন্দিরের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। পুরাতন দিল্লীর মসজিদ-ই-জামির পুন সংস্কার করিয়াছিলেন। বহু সংখ্যক জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করিয়াছিলেন। দিল্লী নগরী প্রাসাদ, উপাসনা মন্দির ও সরোবরাদিতে সুসজ্জিত হইয়াছিল। ফিরোজ শাহের মৃগয়ার প্রতিও প্রবল আশক্তি ছিল। তিনি সহচরবৃন্দে পরিবৃত হইয়া মৃগয়ায়লিপ্ত হইতেন।

কোরাণ অনুযায়ী লোকহিত সাধনই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। তাঁহার অধীনে বহু সংখ্যক বৃদ্ধ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহারা অনেকেই বার্দ্ধক্য বশতঃ স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ হইয়াছিলেন। দেওয়ান মালিক ইশাখ তাহাদিগকে অপসারিত করিবার জন্য সম্রাটকে উপদেশ দিতেন। সম্রাট তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়াছিলেন—'সর্ব্বশক্তিমান বিধাতা বৃদ্ধ বলিয়া কাহাকেও অন্নদানে বিরত নহেন। আমি তাঁহার শ্রেষ্ঠ জীব হইয়া কি প্রকারে আমার বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত কর্ম্মচারীগণকে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারি?' তাঁহার সহৃদয়তার আর একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। মোহাম্মদ তোগলকের খেয়াল অনুসারে দিল্লী হইতে দৌলতাবাদে আবার তথা হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য বহুলোক রাজকোষ হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফিরোজ শাহ সেই ঋণ ক্ষমা করিয়াছিলেন। মোহাম্মদ শাহ বহু লোকের নাসাকর্ণ ছেদন করিয়াছিলেন। ফিরোজ শাহ তাহাদিগকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে ক্ষমা পত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সকল ক্ষমাপত্র একটী পাত্রে স্থাপন করিয়া তিনি মোহাম্মদ তোগলকের সমাধির শির্ষদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশে যে, ঈশ্বর ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন। রাজ্যের সুব্যবস্থার জন্য তিনি কয়েকটী নিয়ম প্রচলিত করেন।

মোহাম্মদ তোগলক সৈন্যদিগকে জায়গীর না দিয়া অর্থ প্রদান করিতেন। কিন্তু ফিরোজ শাহ, জায়গীর দিবার প্রথা পুন প্রচলন করেন। কোন সেনাপতির মৃত্যু হইলে, তৎপদে তাঁহার পুত্র অথবা নিকট আত্মীয় নিযুক্ত হইতেন। তদভাবে তাঁহার গোলাম, যদি তাহাও না থাকিত তবে তাঁহার স্ত্রীকে উক্ত পদ প্রদান করা হইত। একটী দাতব্য বিভাগ স্থাপন করিয়া কন্যাদায়গ্রস্ত অথবা অন্যবিধ অভাবগ্রস্তকে সাহায্য দান করা হইত। মুসলমান শাস্ত্রানুসারে কোন কোন অপরাধের জন্য নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দেওয়া হইত। তিনি এই প্রথা রহিত করেন। মুসলমান শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া ১৪ প্রকার কর রহিত করিয়া দেন। হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করেন। কিন্তু মুসলমান হইলে তাঁহাকে আর সেই কর দিতে হইত না। এই কর হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যও অনেকে মুসলমান হইয়াছিল। পূর্ব্বে লুণ্ঠিত দ্রব্যের চারি পঞ্চম অংশ রাজ কোষে জমা হইত। কিন্তু ইহা মুসলমান শাস্ত্রানুমোদিত নহে বলিয়া, তিনি এক পঞ্চমাংশ রাজকোষে গ্রহণ করিয়া, চারি পঞ্চমাংশ লুণ্ঠনকারীকে প্রদান করিতেন। বলাবাহুল্য ইহাতে লুণ্ঠনের প্রশ্রয় দেওয়া হইত। তিনি রাজ্যের নানা স্থানে ন্যূনাধিক একশতটী চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া, তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রচুর ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই সকল চিকিৎসালয় হইতে রোগীরা ঔষধ ও পথ্য বিনা মূল্যে পাইত। এই প্রজাহিতৈষী নরপতি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য রাজ্যের নানাস্থানে সরাই বিদ্যালয়, মসজিদ, সেতু, স্নানাগার, উদ্যান, কূপ, বাঁধ, সরোবর ও পয় প্রণালী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ফিরোজ শাহ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পূর্ত্তকার্য্যের ভগ্নাবশেষ এখনও নানা স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যমুনা যে স্থানে পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া সমতল ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছে, সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া কারনালের মধ্যদিয়া হানসী ও হিসার জিলা পর্য্যন্ত, বিস্তৃত সুদীর্ঘ পয়প্রণালী (খাল) তাঁহার আর এক কীর্ত্তি। শতদ্রু ও ঘরঘরা নদীর সহিতও ইহার সংযোগ ছিল। ফলতঃ ইহার দ্বারা বহু স্থান শস্য শ্যামল হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বেরও আয় বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে দেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। তাঁহার সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ব্যাপী রাজত্বকালে দেশে একবারও দুর্ভিক্ষ হয় নাই। প্রজাপুঞ্জ পরম সুখে বাস করিত। দেশের সর্ব্বত্রই জীবন ধারণের উপযোগী সামগ্রীসমূহের প্রাচুর্য্য ছিল, সুতরাং খুব সুলভও ছিল। তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে প্রচুর বেতন দিতেন।

তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বার্ষিক ১৩ লক্ষ টাকা বেতন পাইতেন। মন্ত্রীর পুত্র, আত্মীয়স্বজন ও অনুচরগণের পৃথক বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল। অন্যান্য আমীর ও ওমরাহগণের বৃত্তির পরিমাণও তদনুরূপ ছিল। কাহারও ৪ লক্ষ টাকার কম বৃত্তি ছিল না।

এই প্রকার ন্যায়দর্শী, জনহিতৈষী ও প্রজারঞ্জক নরপতিও ধর্ম্মান্ধতার জন্য প্রজা পীড়নে বিমুখ ছিলেন না; তিনি সুন্নিমতাবলম্বী ছিলেন। সে জন্য সিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা হিন্দুদের ন্যায় উৎপীড়িত হইতেন। তিনি একবার তাঁহাদিগকে নির্য্যাতিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের কতকগুলি গ্রন্থ নষ্ট করিয়াছিলেন। আহাম্মদ বহারী নামক একজন বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ মৌলবী একটী অভিনব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ফিরোজ শাহ তাঁহাকে ধৃত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তাঁহার অনুচরদিগকে দূরদেশে নির্ব্বাসিত করেন। রোকনউদ্দিন ও মারু নামে দুইজন ধর্ম্ম প্রচারককেও তিনি যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। একজন ব্রাহ্মণ দিল্লী নগরের প্রকাশ্য স্থানে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা অর্চ্চনা করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠায় আকৃষ্ট হইয়া বহু লোক তথায় আগমন করিত। কোন কোন মুসলমান রমণীও পারত্রিক মঙ্গল কামনায় তথায় আগমন করিত। ইহা শ্রবণ করিয়া ফিরোজ শাহ তাঁহাকে ধৃত করিয়া কাজীর হস্তে বিচারার্থ সমর্পণ করেন। কাজী তাঁহাকে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জীবন রক্ষা করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি কাজীর অনুরোধ ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করেন। সুতরাং কাজীর বিচারে তিনি জীবন্ত দগ্ধ হইবার দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ অপেক্ষা প্রজ্বলিত অনলে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া শ্রেয় মনে করিলেন। পাতশাহ তাঁহাকে প্রজ্বলিত অনলে দগ্ধ করিয়া বধ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতানেরা ব্রাহ্মণদিগকে জিজিয়া কর হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণেরাই পৌত্তলিকতার মূল মনে করিয়া, তাঁহাদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করেন। বহু দেবালয় ধ্বংস করিয়া তৎস্থানে মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে, এইরূপ বিবরণ তাঁহার স্বরচিত জীবন চরিতে অনেক আছে।

বৃদ্ধ বয়সে ফিরোজ শাহ রাজকার্য্য পরিচালনে অসমর্থ হইয়াছিলেন। মন্ত্রী খান-ই-জাহান রাজকার্য্য পরিচালনে সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়াছিলেন। মন্ত্রী স্বীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, ভাবী উত্তরাধিকারী রাজকুমার মোহাম্মদকে কারারুদ্ধ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। সেইজন্য তিনি রাজকুমারকে সম্রাটের নিকট রাজদ্রোহী বলিয়া

প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান হন। ফিরোজ শাহ মন্ত্রী বাক্যে আশ্বাস স্থাপন করিয়া রাজকুমারকে ধৃত করিবার আদেশ প্রদান করেন। রাজকুমার পূর্ব্বেই ইহা জানিতে পারিয়া কতকগুলি সুশিক্ষিত সৈন্যদ্বারা স্বীয় আবাসস্থল সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। এইভাবে কিছুকাল অতীত হইলে, রাজকুমার স্বীয় মহিষীকে রাজ অন্তঃপুরে পাঠাইবার অনুমতি পাইলেন। একদিন রজনী-যোগে তিনি পত্নীর পরিবর্ত্তে ঘেরা পাল্কীতে রাজঅন্তঃপুরে গমন করেন। পাল্কী হইতে রাজকুমার বাহির হওয়া মাত্র, পুরমহিলারা ভয়ে পাতশাহের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজকুমারও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাতশাহের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। রাজকুমার বলিলেন—'পিতঃ, আপনি যে আমাকে সন্দেহ করিতেছেন, ইহাই আমার পক্ষে মৃত্যু যন্ত্রণাপেক্ষা অধিক আমি আমার জীবন আপনার পদে সমর্পণ করিলাম। আমি নির্দ্দোষ, মন্ত্রী রাজসিংহাসনের অভিলাষী হইয়া, আমাকে আপনার নিকট রাজ-দ্রোহী বলিয়া প্রমাণ করিতে চায়।' তিনি পুত্রের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং মন্ত্রীকে ধৃত করিয়া প্রতিশোধ লইতে আদেশ দিলেন। রাজকুমার অবিলম্বে সসৈন্যে মন্ত্রীর ভবন আক্রমণ করিলেন। মন্ত্রী ভয়ে পলায়ন করিলেন। কিন্তু একজন সেনাপতি তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া, তাঁহার ছিন্ন মস্তক রাজকুমারকে আনিয়া উপহার দিলেন। বৃদ্ধ সুলতান মোহাম্মদের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ-পূর্ব্বক, অবসর গ্রহণ করিলেন। মোহাম্মদ নাশিরউদ্দিন নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজ কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিলাসিতায় মগ্ন হওয়াতে রাজ কার্য্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। তখন দিল্লী ও ফিরোজাবাদে এক লক্ষ ক্রীতদাস ছিল। তাহারা নাশিরউদ্দিনকে পরিত্যাগ করিয়া মন্দ লোকের পরামর্শে বৃদ্ধ সুলতানের আশ্রয় গ্রহণ করিল; নাশির উদ্দিন ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। দুইদিন রক্ত স্রোতে রাজপথ রঞ্জিত হইল। তৃতীয় দিনে ক্রীতদাসেরা ফিরোজ শাহকে সৈন্যাবাসের সম্মুখে আনিয়া স্থাপন করিল। নাশিরউদ্দিনের পক্ষীয় সৈন্যেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, ফিরোজ শাহের পক্ষ অবলম্বন করিল (১৩৮৫ খ্রীঃ)। নাশিরউদ্দিন উপায় না দেখিয়া, শতদ্রুর উৎপত্তি স্থলের নিকটে শিরমুর পর্ব্বতে পলায়ন করেন। ফিরোজ শাহ স্বীয় পৌত্র (মৃত পুত্র ফতে খাঁর পুত্র) তোগলিককে (২য় গিয়াসউদ্দিন) সিংহাসন প্রদান করেন। ইহার পরেই সম্রাট ফিরোজ শাহ ১৩৮৮ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমনকরেন।

ফিরোজশাহ বাহমনী—তিনি আলা-উদ্দিন হোসেনশাহ বাহমনির পৌত্র দাউদর্খার পুত্র। ১৩৯৭ খ্রীঃ অব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তিনি সামসউদ্দিন শাহকে কারারুদ্ধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রসিদ্ধ বুরহান-ই-মাসির গ্রন্থের মতে ফিরোজশাহ একজন ন্যায়বান, প্রজারঞ্জক, ও ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। তিনি স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ নকল করিয়া বিক্রয় করিতেন। তদনুরূপ অন্তঃপুর মহিলাদিগকেও বস্ত্রে সূচীকার্য্য করিয়া, নিজ নিজ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত।

১৩৯৮ খ্রীঃ অব্দে বিজয় নগরের রাজা দ্বিতীয় হরিহর প্রবল একদল সৈন্যসহ রায়চুর দোয়াবের অন্তর্গত মুদ্গল দুর্গ আক্রমণ করিলেন। ফিরোজশাহ বাধা দিবার জন্য একদল সৈন্যসহ অগ্রসর হইলেন। বিজয় নগরের সৈন্য সংখ্যা অধিক দেখিয়া কৌশলে তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। বিজয় নগরপতির পুত্র অতিশয় নৃত্যগীতানু-রাগী ছিলেন। কতকগুলি সৈনিক নর্ত্তকীর ছদ্মবেশে সেই রাজকুমারের নর্ত্তকীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া রাজ-কুমারকে হত্যা করেন। এই গোল-মালে বিজয়নগর সৈন্যদের মধ্যে বিশৃ-ঙ্খলা উপস্থিত হয়। সুতরাং বিজয় নগরপতি পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। ১৪০৬ খ্রীঃ অব্দে বিজয় নগরের রাজার সহিত তাঁহার আরও ঘোরতর যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। কত তুচ্ছ কারণে কত বড় ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়, এই যুদ্ধ তাহার একটি দৃষ্টান্ত। বিজয়নগর রাজ্যে একটী অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী কন্যাকে এক ব্রাহ্মণ শিক্ষা দিতেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে তাঁহার বিষয়, সেই ব্রাহ্মণ রাজ-গোচরে আনয়ন করিলেন। রাজা তাহার প্রণয়প্রার্থী হইলেন। কিন্তু সেই রূপসী কন্যা তাহা প্রত্যাখ্যান করিল। রাজা তাহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণে অভিলাষী হইলেন। কন্যার পিতা রাজ-ভয়ে গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহমনি রাজ্যে পলায়ন করিলেন। বিজয়নগর সৈন্য সেই রাজ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক গ্রাম ধ্বংস করিল। কিন্তু সেই কন্যার কোন সন্ধান পাইল না।

ফিরোজশাহ ইহাতে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বিজয় নগরের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর বিজয় নগরপতি পরাস্ত হইয়া, অতিশয় ক্ষতি-পূরণ দিতে বাধ্য হইলেন। ফেরিস্তার মতে বিজয়নগরপতি স্বীয় কন্যাকে ফিরোজের সহিত বিবাহ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু বুরহান-ই-মাসির গ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

১৪২০ খ্রীঃ অব্দে ফিরোজসাহ বিনা কারণে বিজয় নগরের রাজার

অধিকৃত পঙ্গল দুর্গ আক্রমণ করেন কিন্তু দুই বৎসরকাল বহু চেষ্টা করিয়াও দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে ফিরোজশাহের সৈন্য দলে মহামারী দেখা দিল। এই সময়ে বিজয়নগরের সৈন্য প্রবল বিক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। যুদ্ধে ফিরোজশাহের সেনাপতি মির ফয়েজ-উল্লা নিহত হইলেন। স্বয়ং ফিরোজশাহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিলেন। বহু মুসলমান সৈন্য নিহত হইল। বিজয় নগর সৈন্য বহু স্থান ধ্বংস স্তূপে পরিণত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যিনি এ পর্য্যন্ত কেবল জয়-লাভই করিয়াছেন, আজ তাহার এই পরাজয় বড়ই পীড়াদায়ক হইল। তিনি রাজকার্য্যের ভার বিশ্বস্ত কর্ম্ম-চারী ও ক্রীতদাস হুশিয়ার আইন-উল-মুল্ক ও নিজাম উল-মুল্কের উপর সমর্পণ করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আহাম্মদ শাহ, ফিরোজ শাহকে হত্যা করিবার জন্য রাজধানী আক্রমণ করিলেন। রুগ্ন ফিরোজশাহ বুঝিতে পারিলেন তাঁহার পুত্র হাসনের সিংহাসন লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। সেজন্য তিনি আহাম্মদকেই সিংহাসন প্রদান করি-লেন। হাশনকে তাঁহার হস্তেই সমর্পণ করিলেন। আহাম্মদ, হাশনকে ফিরোজাবাদে একটী জায়গীর প্রদান করিয়াছিলেন। ফিরোজশাহ বাহমনি ১৪২২ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

ফুরসি—হোশেন আলী সাহের কবি-জনসুলভ নাম। তিনি গোলকুণ্ডার কুতবশাহীবংশের একখানা ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম—'নিশবৎ নামা শাহ রাইয়ারি।'

ফুসী, মৌলানা—মুর্শিদাবাদ জিলায় তালিবপুর একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামের দানশীল জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা ফুসী সাহেব পশ্চিম দেশ হইতে আগমন করিয়া এখানে বাস করিতে থাকেন। তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় এবং মুসলমান ধর্ম্ম-শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিয়া দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীর সাহের নিকট হইতে লাখেরাজ সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। মৌলানা সাহেব শিক্ষা দান কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিয়া ৮০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার বিদ্বান পুত্র মৌলবী দীন মোহাম্মদও পিতার ন্যায় সৎকর্ম্মানুরাগী ছিলেন। টেয়া গ্রাম হইতে বাবলা নদী পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ বাঁধ তাঁহার এক বিশেষ কীর্ত্তি। ইহা দ্বারা সেই অঞ্চল প্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তাঁহার পুত্র পীর মোহাম্মদও সৎকর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তিনিও পিতার ন্যায় আর একটী বাঁধদ্বারা প্লাবন হইতে দেশরক্ষার সুব্যবস্থা করেন। পীর মোহাম্মদের অন্যতম পুত্র গোলাম রসুল আরবী ও ফারসী ভাষায় বিশেষ

বু্যৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌলানা গোলামবাতুল সদর দেওয়ানী আদালতের প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মৌলবী গোলাম সরদারও সদর দেওয়ানী আদালতের উকিল ছিলেন।

ফেদাই খাঁ—তিনি বাঙ্গালার (১৬২৭—২৮ খ্রীঃ অব্দে) সুবেদার ছিলেন। খানজঙ্গ খাঁর পরে ১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে মোকরম খাঁ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পদে সম্রাট জাহানগীর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন কিন্তু তিনি নিয়োগপত্র গ্রহণ করিতে আসিবার কালে সবান্ধবে জল মগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তখন দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহ সেই পদে ফেদাই খাঁকে নিযুক্ত করিয়া আদেশ দেন যে, অন্যান্য উপহার সামগ্রী ব্যতীত তাঁহাকে প্রতি বৎসর পাঁচ লক্ষ টাকা সম্রাটের জন্য ও পাঁচলক্ষ টাকা সাম্রাজ্ঞী নুরজাহানের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে। ফেদাই খাঁ বাঙ্গালায় আগমন করিবার কতিপয় মাস পরেই সম্রাট পরলোক গমন করেন এবং রাজকুমার খুরম, শাহজাহান নাম গ্রহণ পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। সম্রাট স্বীয় প্রিয়পাত্র কাশেম খাঁকে ১৬২৮ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন।

ফেদাই খাঁ আজিম—তিনি দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজীবের ধাত্রী ভাই। সম্রাট শায়েস্তা খাঁকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়া তৎপদে ফেদাই খাঁকে আজিম খাঁ উপাধি প্রদানপূর্ব্বক, বাঙ্গালা দেশের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। ফেদাই খাঁ পর বৎসরেই পরলোক গমন করেন। তাঁহার সময়ে ইংরাজেরা বাঙ্গালা দেশে বাণিজ্য করিতেন। ফেদাই খাঁর মৃত্যুর পরে দিল্লীর সম্রাট তাঁহার তৃতীয় পুত্র বিহারের শাসনকর্ত্তা সুলতান মোহাম্মদ আজিমকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন।

ফেয়ার, স্যার আর্থার পারবেজ—(Sir Arthur Purves Phayre)—১৮১২ সালের ৭ই মে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রিচার্ড ফেয়ার। শ্রুজবারিতে শিক্ষালাভ করিয়া ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালার সৈন্য শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। ১৮৩৪—৪৮ সাল বর্ম্মাদেশে ও ১৮৪৮—৪৯ সাল পাঞ্জাবে, আরাকানের কমিশনার ১৮৪৯ সাল, পেগুর কমিশনার ১৮৫২ এবং ১৮৫৪ সালে বড়লাটের নিকট প্রেরিত বর্ম্মার রাজার দৌত্যকার্য্যে দ্বিভাষীর কাজ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৬২ হইতে ৬৭ সাল ব্রিটিশ বর্ম্মার প্রথম চিফ কমিশনার ছিলেন। ১৮৭৪—৭৮ সাল পর্য্যন্ত মরিসস দ্বীপের গবর্ণর ছিলেন। তিনি বর্ম্মাদেশের একখানা ইতিহাসও লিখিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত নানা তথ্যপূর্ণ বহু প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকাদিতেও লিখিয়াছিলেন। ১৮৮৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন।

ফেরিস্তা—মুসলমান রাজত্বের সময়ের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক পণ্ডিত। ফেরিস্তা তাঁহার নাম নহে, ইহা তাঁহার উপাধি। তাঁহার নাম মোহাম্মদ কাজিম হিন্দুশাহ। তাঁহার পিতা গোলাম আলী হিন্দুশাহ একজন মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। ফেরিস্তার জন্মস্থান কাস্পীয়ান সাগরের উপকূলবর্ত্তী অস্ত্রাবাদ নগর। সম্ভবতঃ তিনি ১৫৫০ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গোলাম আলী হিন্দুশাহ ভাগ্যান্বেষণে শিশুপুত্র ফেরিস্তাকে সঙ্গে করিয়া ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক, দাক্ষিণাত্যের মুর্ত্তজা নিজাম শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি রাজকুমার মিরণ শাহের ফারসী ভাষার শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু কতিপয় বৎসর পরেই তিনি পরলোক গমন করেন। ফেরিস্তা পিতৃহীন হইয়া বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়েন। তাঁহার পিতা পাণ্ডিত্যের জন্য নিজামশাহী দরবারে অল্পকাল মধ্যেই বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বালক ফেরিস্তা, তাঁহার পিতার গুণমুগ্ধ নিজাম শাহের অনুগ্রহে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন।

ফেরিস্তা প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া মুর্ত্তজা নিজাম শাহের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং অচিরেই বিশিষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ১৫৮৬ খ্রীঃ অব্দে মুর্ত্তজার পুত্র মিরণ শাহ পিতার বিরুদ্ধে উত্থিত হইলেন। তিনি পিতাকে অপসৃত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। এই ঘটনার সময়ে ফেরিস্তা মুর্ত্তজা শাহের শরীররক্ষী সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন। শত্রুপক্ষীয়েরা মুর্ত্তজার অনুচরদিগকে অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু মিরণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করেন। মিরণ বেশীদিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। এক বৎসর পরেই তিনি নিহত হন।

সেই সময়ে আহাম্মদ নগরের নিজাম শাহের দরবারে সুন্নি মতের প্রাধান্য ছিল। ফেরিস্তা সিয়া মতাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মমত তাঁহার উন্নতি লাভের অন্তরায় ছিল। সেইজন্য তিনি ১৫৮৯ খ্রীঃ অব্দে আহাম্মদ নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজাপুরে গমন করেন। সেই স্থানে তিনি রাজপ্রতিনিধি দেলওয়ার খাঁ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হন। এবং তাঁহারই অনুগ্রহে ফেরিস্তা, বিজাপুরপতি এব্রাহিম আদিল শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হন। এই সাক্ষাতে ফেরিস্তা রাজানুগ্রহলাভে সমর্থ হন নাই। ইহার চারি বৎসর

পরে দেলওয়ার খাঁ রাজার বিষ দৃষ্টিতে পতিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তখন সিরাজনগর বাসী এনায়াত খাঁর প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়। এই এনায়াত খাঁর সহায়তায় তিনি আবার রাজসাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন। এবার তিনি রাজার সুনজরে পতিত হন। এব্রাহিম শাহ তাঁহাকে 'রৌজাতুক সফা' নামক গ্রন্থের একখণ্ড উপহার প্রদান করিয়া, ভারতবর্ষের মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস সঙ্কলনের আদেশ প্রদান করেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দেন যে, ইহা যেন তোষামোদ বাক্যে ও অত্যুক্তিতে কলুষিত না হয়। ইহার পর হইতেই ফেরিস্তা ইতিহাস সঙ্কলন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অবশিষ্ট জীবন অতি সম্মান ও গৌরবের সহিত যাপন করেন। মধ্যে একবার তিনি দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আকবর শাহের মৃত্যুর পরেই জাহাঙ্গীর শাহের দরবারে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহ গ্রীষ্মকাল কাশ্মীরে যাপন করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। ফেরিস্তা পথিমধ্যে লাহোর নগরে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাত করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহাকে অতি সমাদরে গ্রহণ করেন। লাহোর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া, জ্ঞান সঞ্চয় করেন

ফেরিস্তার স্বপ্রণীত ইতিহাসের নাম 'গোলমন-ই-এব্রাহিমি' বা 'নৌরস নামা' রাখিয়াছিলেন। তিনি বিজাপুরের অধিপতি এব্রাহিম শাহের নামে গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার নামের অনুকরণেই স্বীয় গ্রন্থের নাম 'গোলমন-ই-ইব্রাহিমি' নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। এব্রাহিম শাহ ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দে নৌরস নামে এক নূতন রাজধানীর পত্তন করেন। ফেরিস্তা আপন অভিভাবকের প্রীতিসাধনার্থ স্বীয় গ্রন্থের নাম 'নৌরস নামা' রাখিয়াছিলেন।

ফেরিস্তার গ্রন্থ উপক্রমণিকা, উপসংহারসহ চতুর্দ্দশ ভাগে বিভক্ত। প্রথম উপক্রমণিকা অংশে হিন্দুরাজত্ব ও প্রাচীন মুসলমান জাতির ভারতে আগমনের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু রাজন্যবর্গের বিবরণ নানা অলৌকিক ও অদ্ভুত বিবরণে পূর্ণ। মূল গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে গজনী ও লাহোরের নরপতিগণের বিবরণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে দিল্লীর সুলতানগণের বিবরণ, তৃতীয় অধ্যায়ে দাক্ষিণাত্যের বিবরণ। কিন্তু ইহা আবার ছয় অংশে বিভক্ত কুলবর্গ, বিজাপুর, তেলিঙ্গা, বেরার, আমেদ নগর ও বিদার। চতুর্থ অধ্যায়ে গুজরাটের নরপতিগণের, পঞ্চম অধ্যায়ে মালবের নরপতিগণের, ষষ্ঠ অধ্যায়ে খান্দেশের নরপতিগণের, সপ্তম অধ্যায়ে বঙ্গদেশ ও বিহারের নরপতিগণের,

অষ্টম অধ্যায়ে মুলতানের শাসনকর্ত্তাগণের, নবম অধ্যায়ে সিন্ধুদেশের নরপতিগণের, দশম অধ্যায়ে কাশ্মীরের নরপতিগণের একাদশ অধ্যায়ে মালবের রাজাদের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভারতবর্ষের সাধুদের বিবরণ বর্ণিত আছে। উপসংহারে ভারতবর্ষের ভৌগলিক ও জলবায়ুর বিবরণ আছে। তাঁহার গ্রন্থ ভারতবর্ষের মুসলমান রাজত্বের একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

তাঁহার মৃত্যু সময় এখনও অবধারিত হয় নাই। সম্ভবতঃ তিনি ১৬২৫ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

ফেলুওস্তাগার—তিনি ২৪ পরগণার অধিবাসী। তিনি ১২০৭ বঙ্গাব্দে 'আজায়েব চার ইয়ার' নামে একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

ফৈজী—তাঁহার সম্পূর্ণ নাম আবদুল ফৈজ। তিনি নাগোরের শেখ মোবারিকের পুত্র তাঁহারা আরবের অন্তর্গত ইমান দেশের এক ফকিরের বংশধর। মোবারিকের পিতা একজন বিখ্যাত বিদ্বান্ ব্যক্তি ছিলেন। মুসলমান শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ছিল বলিয়া তিনি খুব উদার মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার উদার ধর্ম্ম মত পুত্রেও সঞ্চারিত হইয়াছিল। তিনি নাগোর নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র মোবারিক নাগোরের শেখ নামে খ্যাত। এই মোবারিকের পুত্র শেখ ফৈজী পিতৃপ্রাপ্ত উদার ধর্ম্মমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া, ধর্ম্মান্ধ মুসলমানগণ তাঁহাকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। এজন্য তিনি নানা গুণের অধিকারী হইয়াও প্রতিপত্তি লাভ করিতে প্রথমে পারেন নাই। চিতোরে অবস্থানকালে একখণ্ড ভূমির জন্য তিনি আবেদনপত্র লইয়া, দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হন। আবেদন গ্রহণকারী একজন ধর্ম্মান্ধ মুসলমান ছিলেন। তিনি তাঁহার আবেদন পত্র পাঠ করিয়া, তাহা ত গ্রহণ করিলেনই না, অপরন্তু ফৈজীকে অবমাননা করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। ইহার অনতিকাল পরেই আকবর শাহ ফৈজীকে রাজদরবারে আহ্বান করিলেন। ধর্ম্মান্ধ মুসলমানেরা মনে করিলেন, এবার ফৈজীর অমুসলমান মত পোষণের জন্য রাজদরবারে শাস্তি হইবে. এমন কি তাঁহারা আগ্রার ফৌজদারকে খবর দিলেন যে, ফৈজী যাহাতে পলায়ন না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা তিনি যেন করেন। এদিকে ফৈজী আগ্রায় উপস্থিত হইলেই, তাঁহার বাসস্থান রাজসৈন্য বেষ্টন করিল। তাঁহাকে না পাইয়া তাঁহার পিতা শেখ মোবারিককে অপমান করিল। কিছুক্ষণ পরে ফৈজী গৃহে উপস্থিত হইলে,

তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাজদরবারে উপস্থিত করিল। সম্রাট আকবর শাহ তাঁহাকে অতিশয় সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। শত্রুপক্ষীয়েরা ইহাতে যে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। শীঘ্রই ফৈজী সম্রাটের অতি প্রিয়পাত্র হইলেন। এই পরিচয়ের ছয় বৎসর পরে তাঁহার অনুজ ভ্রাতা আবুল ফজল সম্রাটের সহিত পরিচিত হন ১৫৭২ খ্রীঃ অব্দে রাজকবি গজ্জালীর মৃত্যু হইলে সম্রাট ফৈজীকে, তাঁহার পদে নিযুক্ত করেন এবং 'মালিক-উস্-সুয়ারা' উপাধিদ্বারা সম্মানিত করেন। ফৈজী ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র ছন্দোবন্দে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী নামক সংস্কৃত বীজগণিত ফারসীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। হিন্দুদর্শন ও বিজ্ঞান পাঠের ফলে, ধর্ম্মমতে তিনি অতিশয় উদার ছিলেন। আরবী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় কোরাণের ভাষ্যে। এই ভাষ্য তিনি আরবী অক্ষরে বিন্দু বর্জ্জিত ১৩টী অক্ষরের সাহায্যে রচনা করেন। তিনি একশত একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার স্বকীয় গ্রন্থাগারে সার্দ্ধচারি সহস্রাধিক হস্তলিখিত গ্রন্থ ছিল। প্রসিদ্ধ আকবরনামা গ্রন্থ তাঁহার রচিত। তাঁহার জন্ম ১৫৪৭ খ্রীঃ অব্দে। মৃত্যু ১৫৯৫ খ্রীঃ অব্দে ৪৮ বৎসর বয়সে আগ্রা নগরে সংঘটিত হয়।

ফৈজুল্লা আঞ্জমীর--তিনি দাক্ষিণাত্যের সুলতান মাহামুদ বামনীর রাজত্বকালে (১৩৭৮—৯৭ খ্রীঃ অব্দ) একজন কাজী ছিলেন। একবার এক কবিতা লিখিয়া তিনি সুলতানের নিকট এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

ফৈজুল্লা খাঁ—রামপুরের জায়গীরদার একজন রোহিলা সর্দ্দার। তিনি আলী মোহাম্মদ খাঁ রোহিলার পুত্র ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দের কুত্রা যুদ্ধের পর কমায়ুনে তিনি পলায়ন করেন। পরে কর্ণেল চেম্পিয়নের সঙ্গে সন্ধি হইলে, তিনি রামপুর নামক স্থান জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই রাজ্যের আয় বার্ষিক ১৪ লক্ষ টাকা। তিনি কুড়ি বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৭৯৪ সালে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ আলীখাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার কনিষ্ঠ গোলাম মোহাম্মদ তাঁহাকে বধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। ইংরেজ সরকার মৃত রাজার পুত্র আহাম্মদ আলীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া গোলাম মোহাম্মদকে বিঠোরে বন্দী করিয়া রাখেন। তিনি মক্কা যাইবার ছলে কাবুল নগরে গমন করেন। নবাব

আহাম্মদ আলী খাঁ ১৮৩৯ সালে পরলোক গমন করিলে, মোহাম্মদ সৈয়দ খাঁ সিংহাসন লাভ করেন।

ফোফাই সেনাপতি—আসাম প্রদেশের আহম বংশীয় রাজা কমলেশ্বর সিংহের সময়ে (১৭৯৫—১৮১০ খ্রীঃ অব্দে) দফলারা বিদ্রোহী হয়। ফোফাই সেনাপতি সেই বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন। রাজ সৈন্য হস্তে পরাজিত হইয়া তিনি নিহত হন।

ফ্রেনসিস, স্যার ফিলিপ—(Sir Philip Francis) তিনি ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দের ২২শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রেভাঃ ফিলিপ ফ্রেনসিস। তিনি ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া স্বদেশে নানা বিভাগে নানা কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। পরে ১৭৭৩ খ্রীঃ অব্দে ভারতের রেগুলেটিং একট পাশ হইলে, তিনি বড় লাটের মন্ত্রণা সভার অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। সেই সময়ে তিনি তাঁহার অন্যতম সহকর্ম্মী ক্লেবারিং (Clavering) ও মনসন (Monson) সহ ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দের ১৯শে অক্টোবর কলিকাতায় আগমন করেন। বারওয়েল অন্যতম সদস্য ছিলেন। প্রথমোক্ত তিনজন হেষ্টিংসের অতিশয় বিরোধী ছিলেন। ইতিমধ্যে ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দের ৫ই আগষ্ট দেওয়ান নন্দকুমারের জালিয়াতির জন্য ফাঁসি হয়। পর বৎসর ১৭৭৬ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর মনসন সাহেব পরলোক গমন করেন। ১৭৮০ সালে বারওয়েল সাহেব বিলাত গমন করেন। এই সময়ে হেষ্টিংস ও ফ্রেনসিসের বিবাদ চরমে উপস্থিত হয়। উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। ফ্রেনসিস আহত হন। ইহার পরে ১৭৮০ খ্রীঃ অব্দে তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করেন। স্বদেশে তাঁহার বিরুদ্ধে এক ব্যভিচারের মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। সেই মোকদ্দমায় তিনি ব্যভিচারলিপ্ত প্রণয়িনীর স্বামীকে ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হন। এদেশ হইতে তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে গমন করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ সালে তিনি পার্লিয়ামেন্টের সভ্য হন। দীর্ঘকাল উক্ত মহাসভার সভ্য ছিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিত হইলে, তিনি বার্ককে এ বিষয়ে খুব সাহায্য করেন। এক সময়ে তিনি ভারতের বড়লাটের পদ পাইবারও আশা করিয়াছিলেন। প্রধান মন্ত্রী ফক্সের সহিত বিবাদ হওয়ায় তাহা পাইলেন না। ১৮১৮ সালের ২২শে ডিসেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি পরিশ্রমী, সাহসী, নির্ভিক ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। হেষ্টিংস দেখ।

ব

বংশমণি—নেপালের রাজা প্রতাপ মল্লের (১৬৩৯-১৬৮৯খ্রীঃ) রাজ সভার পণ্ডিত কবি বংশমণি ১৬৫৫ খ্রীঃ অব্দে, বাঙ্গালার কবি জয়দেবের অনুকরণে, 'গীতদিগম্বর' নামে এক নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

বংশীধর—তিনি একজন চিকিৎসা শাস্ত্র বেত্তা পণ্ডিত 'বৈদ্যকুতুহল' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

বংশীধর দত্ত—ঢাকা জিলার অন্তঃপাতি দাশোড়া সমাজের দত্তবংশীয় বৈদ্যগণ লক্ষ্মণসেনের সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্তের বংশধর। এই বংশীয় ভানুদত্তের পুত্র বংশীধর দত্ত বঙ্গের নবাব সরকারের সেনাপতির কাজ করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলে, নবাব তাঁহাকে কর্ণ খাঁ উপাধি দান করেন। ঢাকার সাভারের অন্তর্গত ধলেশ্বরীর উত্তর তীরে এখনও কর্ণখাঁর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। বংশীধরের পুত্র পৌত্রেরাও নবাবের সেনাপতি ছিলেন।

বংশীধর দ্বিবেদী—তিনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। কর্ম্মমঞ্জরী নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

বংশীবদন দাস—একজন বৈষ্ণব কবি। তাঁহার পিতার নাম ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভাগ্যবতী। তাঁহার জন্মস্থান নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুলিয়া পাহাড়। ১৪১৬ শকে (১৯৯৪ খ্রীঃ অব্দে) বাসন্তী পূর্ণিমায় তাঁহার জন্ম হয়। উক্ত গ্রামে প্রাণবল্লভ নামে এক বিগ্রহ তিনি স্থাপন করেন। পরে তিনি বিল্ব গ্রামে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। বিল্বগ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাঁহারই জ্ঞাতি। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পর, তিনি নবদ্বীপে গিয়া কিছুদিন গৌরাঙ্গের বাটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতা অতি মধুর, এখানে মাত্র তিনটী লাইন উদ্ধৃত হইল।

হেন রূপ কভু নাহি দেখি।
যে অঙ্গে নয়ন থুই, সেই অঙ্গ হতে মুই
ফিরাইয়া আনিতে নারি আঁখি।

বক—তিনি কাশ্মীরের অত্যাচারী রাজা মিহির কুলের পুত্র। তিনি খ্রীঃ পূঃ ৬৩৪-৫৭১ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি অতি সুশীল প্রজারঞ্জক নৃপতি ছিলেন। তিনি অতুল সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বক নামক উচ্চ স্থানে লবণোৎস নামে একটী নগর স্থাপন করিয়া ভগবান বকেশ্বর নামে এক শিবের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথায় বকবতী নামে এক কৃত্রিম নদী প্রবাহিত করেন। একদিন বট্টানামে এক যোগিনী অনুপম রমনীয় মূর্ত্তিতে অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া রাজাকে যাগোৎসব দর্শন করিতে নিমন্ত্রণ করিল। পর দিন প্রাতে রাজা পুত্র-পৌত্রাদি পরিবৃত হইয়া তথায় গমন

করিলেন। সেই যোগিনী সিদ্ধিলাভ কামনায় রাজাকে সবংশে নিহত করিল। রাজার ক্ষিতিনন্দ নামে একটী পুত্র জীবিত ছিলেন। তিনিই তৎপরে রাজা হইয়াছিলেন।

বক বক, মালিক—দিল্লীর সম্রাট গিয়াসউদ্দিন বলবন অতিশয় ন্যায় পরায়ণ ভূপতি ছিলেন। পুত্র অথবা ভ্রাতা, সহচর অথবা পরিচারক কাহারও অন্যায় করিয়া নিস্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। ক্রীত দাস মালিক বক বক রাজদরবারের একজন অনুগ্রহ ভাজন পরিচারক ছিলেন। তিনি চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। বদায়ুনে তাঁহার জায়গীর ছিল। তথায় অবস্থান কালে একদিন সুরাপানে মত্ত হইয়া তিনি এক ভৃত্যের প্রাণ সংহার করেন। সম্রাট বদায়ুনে গমন করিলে, তাঁহার পত্নী সম্রাটের নিকট বিচার প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট বকবককে তাঁহার সম্মুখে তৎক্ষণাৎ বধ করিবার আদেশ দিলেন। কেবল তাহাই নহে, যে সমস্ত গুপ্তচর বদায়ুনে ছিল, তাঁহারাও, যথা সময়ে এই সংবাদ সম্রাটকে না দিবার জন্য, ফাসি কাষ্ঠে লম্বিত হইল।

বকাই মোল্লা—মুঘল সম্রাট বাবরের সময়ের একজন কবি। তিনি তাঁহার রচিত 'মসনবি' বাবর শাহের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

বকির খাঁ নজমশানো—তিনি ১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে জাহাঙ্গীর বাদশাহকর্ত্তৃক উড়িষ্যার সুবেদার পদে নিযুক্ত হন। পরে শাজাহান সম্রাট হইয়াও তাঁহাকে উক্ত পদে বহাল রাখেন। মোকরাম খাঁর পরে মোঘলেরা আর উড়িষ্যার রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু বকির খাঁ খুব অত্যাচার করিয়া রাজস্ব আদায় করিতেছেন বলিয়া দিল্লীর দরবারে অভিযুক্ত হন। বকির খাঁ উড়িষ্যার জমিদারদিগকে আহ্বান করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। সাতশত বন্দীকে হত্যা করেন কেবল একজন পলায়নপূর্ব্বক দিল্লীর সম্রাট সমীপে উপস্থিত হন। তিনি একদিন সম্রাট সমীপে উপস্থিত করিয়া প্রদর্শন করেন যে, বকির খাঁ এ পর্য্যন্ত চল্লিশ লক্ষ মুদ্রা আদায় করিয়াছেন। সম্রাট তাঁহাকে দিল্লীতে আনয়নপূর্ব্বক, হিসাব দিতে তাঁহাকে বাধ্য করিলেন। তৎপদে মুতাকাদ খাঁ (মির্জ্জা সফি) ১৬৩২ খ্রীঃ অব্দে নিযুক্ত হইলেন।

বকুল কায়স্থ—১৪৩৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি "কিতাবত মঞ্জুরী" নামে আসামী ভাষায় পাটীগণিত, জরিপ পরিমিতি ও হিসাব রক্ষা সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন।

বক্কা—বিজয় নগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হরিহর দেবের সহোদর ভ্রাতা সাধারণতঃ বক্কা নামে পরিচিত ছিলেন।

হরিহর দেবের মৃত্যুর পর ১৩৪৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রায় ৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহারই রাজত্ব কালে বাহামনী বংশের স্থাপন হয়। বক্কার রাজত্বকালে বিজয়নগরের নানা দিকে গৌরব বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বিজয়নগরের এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন। গোয়ার সমুদ্র বন্দর, বেল-গাঁওএর দুর্গ এবং মালাবারকূলের তুল-ঘাট প্রদেশ বিজয়নগর রাজ্যের অধীন; তাঁহার রাজ্যে অনেক লোকের বসতি। মালাবার, সিংহল দ্বীপ এবং অন্যান্য অনেক দ্বীপ ও দেশ সকলের রাজারা তাঁহার সভায় নিজ নিজ দূত রাখিয়া থাকেন এবং তাঁহাকে প্রতি বৎসর উপঢৌকন প্রেরণ করেন।

১৩৭৯ খ্রীঃ অব্দে বক্কার মৃত্যু হইলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র হরিহর রাজা হন।

বক্ষঃস্থলাচার্য্য—ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত আচার্য্য অপ্পয় দীক্ষিতের ইনি পিতামহ। সুতরাং তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি বিজয়নগরপতি কৃষ্ণদেবের সমসাময়িক; তাঁহার পুত্র আচার্য্য রঙ্গ রাজাধ্বরী অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তৎ-কৃত 'অদ্বৈত বিদ্যামুকুর' 'বিবরণ দর্পণ' প্রভৃতি অতি প্রামাণিক। রঙ্গরাজা-ধ্বরীর অপ্পয় দীক্ষিত ও অচ্চন দীক্ষিত নামে দুই পুত্র ছিল।

বক্স আলী—এই কবির জন্মস্থান চট্টগ্রামের আনোয়ারার অন্তর্গত ভিঙ্গ-রোল গ্রাম। তিনি কবি হারিপণ্ডিতের পুত্র। তিনি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক অনেক পদ, রচনা করিয়াছেন।

বক্সু—তিনি একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীত বিদ্যা বিশারদ ছিলেন। প্রথমে তিনি রাজা বিক্রমজিৎ মনসুরের রাজসভার একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। তাঁহার প্রভু রাজ্যভ্রষ্ট হইলে, তিনি কালিঞ্জরের রাজা কিরাতের রাজসভায় স্থান লাভ করেন। কিছুকাল পরে ১৫২৬ খ্রীঃ অব্দে গুজরাটের সুলতান বাহাদুর খাঁর নিকট গমন করেন। এই স্থানেই তিনি অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন।

বখ্‌তিয়ার খল্‌জি—তাঁহার সম্পূর্ণ নাম ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খল্‌জি। মোহাম্মদ বখ্‌-তিয়ার ঘোর প্রদেশের শ্রেষ্ঠ খল্‌জজাতি সম্ভূত ছিলেন। তিনি প্রথমে গজনীর অধিপতি মইজউদ্দিন মোহাম্মদ শাহা-বুদ্দিন ঘোরীর নিকট উপস্থিত হন। দৃঢ়কায়, সাহসী এবং সমরনিপুণ হইয়াও শ্রীহীন ছিলেন বলিয়া, তিনি যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইলেন না। সুলতানের নিকট যৎসামান্য অর্থব্যতীত আর কিছুই না পাইয়া, বিমর্ষচিত্তে সুলতানের সহিত ভারতবর্ষে আগমন করেন। দিল্লীতেও তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলনা। তখন বখ্‌তিয়ার বদায়ুনে গমন করিয়া

তথাকার সিপাহ্‌সলার হজাবর উদ্দিনের অধীনে একটী কর্ম্মে নিযুক্ত হন। বখ্‌তিয়ারের পিতৃব্য মোহাম্মদ-ই মামুদ নাগাওরের শাসনকর্ত্তা আলী নাগাওরীর অধীনে কষ্টমণ্ডীর জায়গীরদার ছিলেন। পিতৃব্যের মৃত্যুর পরে তিনি সেই জায়গীর প্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি অযোধ্যার মালিক হুসামউদ্দিন আগুল বকের নিকট গমন করিয়া দুইখানি গ্রাম জায়গীর প্রাপ্ত হন। এই স্থান হইতে বখ্‌তিয়ার মনের ও বিহার প্রদেশ লুণ্ঠন করিতেন। লুণ্ঠন লব্ধ অর্থে অশ্ব ও অস্ত্র ক্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে তিনি শক্তিশালী হইয়া উঠেন। তাঁহার বীরত্বের খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়। তাঁহার স্বজাতি খল্‌জ বংশীয় আফগানগণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া তাঁহার সৈন্যদল বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। দিল্লীর রাজ প্রতিনিধি মালিক কুতুবউদ্দিন তাঁহার ধন সম্পদের কথা শুনিয়া তাঁহাকে একটী খিলাত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সেই সময়ে বোধ হয় গোবিন্দলাল মগধের পূর্ব্বভাগে উদণ্ডপুর, নালন্দা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি কয়েকটী ক্ষুদ্র নগরের অধিপতি ছিলেন। মগধের লুণ্ঠন সময়ে গোবিন্দপালের এমন শক্তি ছিল না যে, বখ্‌তিয়ার খলজিকে বাধা প্রদান করেন। বখ্‌তিয়ার খিলিজি যখন সৈন্যদল লইয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন তিনি উদ্দণ্ডপুর সঙ্ঘারামে মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও সেই সময়ে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্য কোনও রাজা তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন না। গোবিন্দ পাল এই যুদ্ধে নিহত হইলেন, উদ্দণ্ডপুর ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। বিজেতার আদেশে উদ্দণ্ডপুর ও বিক্রমশিলার বিহারে শত শত বর্ষের সঞ্চিত গ্রন্থরাশি অগ্নি সংযোগে ভস্মে পরিণত হইল। মুসলমানদের অত্যাচার ভয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণ তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ সহ দলে দলে নেপাল ও অন্যান্য হিন্দু রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

বিহার বিজয়ের পর বখ্‌তিয়ার খলজি দিল্লীতে কুতুবউদ্দিন আইবকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। কুতুবউদ্দিন তাঁহাকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিহার বিজয়ের পর বৎসরই তিনি নবদ্বীপ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১১৭০ খ্রীঃ অব্দের পরে ও ১২০০ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে লক্ষ্মণ সেনের মাধব সেন, বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন নামক তিন পুত্র গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্তা মিন্‌হাজের মতে সপ্তদশ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বখ্‌তিয়ার নবদ্বীপ আক্রমণ করিয়া জয় করেন। রাজা লক্ষ্মণ সেন পলায়ন করেন। কিন্তু

ইহার বহু পূর্ব্বে লক্ষ্মণ সেন পরলোক গমন করিয়াছিলেন। বঙ্গ বিজয়ের বিশ্বাস যোগ্য বিবরণ আজ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। তবে বঙ্গদেশ বিজিত হইয়াছিল ইহা সত্য নবদ্বীপ বা নোদিয়া ধ্বংস করিয়া বখ্‌তিয়ার লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়ে স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণাবতী বিজয়ের পর বখ্‌তিয়ার ১২ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ তিব্বত বিজয়ে বহির্গত হন। ইতিপূর্ব্বে বখ্‌তিয়ার একজন মেচ জাতির নায়ককে ধৃত করিয়া তাহার নাম আলী রাখিয়াছিলেন। এই আলীমেচ তাঁহার তিব্বত অভিযানের পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। আলীমেচ তাঁহাকে বর্দ্ধনকোটে আনিয়া উপস্থিত করেন। বর্দ্ধনকোট বগুড়া জিলায়। এখানে একটী বৃহৎ নদী বখ্‌তিয়ার খল্‌জি প্রাপ্ত হন। এই নদীর কুল অবলম্বন করিয়া তিনি দশদিন গমন করিবার পরে, বিংশতি খিলান যুক্ত একটী প্রাচীন পাষাণ নির্ম্মিত সেতু দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি একজন তুর্কি ও একজন খলজী আমীরকে সেতুরক্ষার্থ স্থাপন করিয়া, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পনর দিন পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া, তিনি একটী উপত্যকা ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানের একটী দুর্গ অধিকার করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, পঁচিশ মাইল দূরে আর একটী দুর্গে পঞ্চাশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সজ্জিত আছে। এই সংবাদ শুনিয়া আর অগ্রসর হওয়া, তিনি সমুচিত বলিয়া মনে করিলেন না। ফিরিবার পথে তাঁহার অশ্ব ও মনুষ্যের আহারের অভাবে অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। সৈন্যেরা অশ্ব বধ করিয়া আহার করিতে লাগিল। এইরূপে অতিকষ্টে তিনি কামরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন নদীর উপরিস্থিত খিলান ভগ্ন। তাঁহার নিযুক্ত আমীরেরা পরস্পর বিবাদ করিয়া, প্রস্থান করিয়াছেন। নদী পার হইতে যাইয়া, বখ্‌তিয়ারের বহু সৈন্য জল নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। সামান্য কয়েকজন সৈন্যসহ তিনি বর্দ্ধনকোটে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি অসুস্থ হইয়া ১২০৬ খ্রীঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন। অন্যমতে সেনাপতি আলীমর্দ্দন খিলজি তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন।

বখ্‌তিয়ার খাঁ—সম্রাট জাহাঙ্গীরের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। দিল্লীর নিকটবর্ত্তী বক্তিয়ার নগরের সুন্দর ভজনালয়টী তাঁহারই দ্বারা নির্ম্মিত। তিনি মিরাত উল-আলম নামে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের এক ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহা সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই তিনি ১৬৮৪ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

বখ্‌তিয়ার মৈসুর—কথিত আছে বারজন আওলিয়া বাঙ্গালার দক্ষিণ পূর্ব্ব অঞ্চলে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারার্থ আগমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বখ্‌তিয়ার মৈসুর সন্দ্বীপে ত্রয়োদশ খ্রীঃ শতাব্দীতে বাস করিতেন। সন্দ্বীপের রোহিণী নামক স্থানে এই ফকিরের আস্তানা আছে। মুসলমানেরা এই আস্তানার বিশেষ সম্মান করে।

বঙ্ক—আকবর শাহের একজন চার-শতী সেনাপতি ছিলেন। আকবরের রাজত্বের ষড়বিংশ বর্ষে তিনি সহকারী সেনাপতিরূপে কাবুলে গমন করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বাঙ্গালী সাহিত্যরথী। ১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ় (১৮৩৮ খ্রীঃ, ২৭শে জুন) চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কাঁঠাল পাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনি লর্ড হার্ডিংএর শাসনকালে ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন। ইহাঁর চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ, মধ্যম সঞ্জীবচন্দ্র, তৃতীয় বঙ্কিমচন্দ্র ও কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র। শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিম বাবুর পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ ফুলিয়া কুলীন কুলোদ্ভব অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টো-পাধ্যায় হুগলী জিলার অন্তর্গত দেশমুঙ্গে নামক গ্রামে বাস করিতেন। অনুমান ১৭৫০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার অধস্তন ৪র্থ পুরুষ রামজীবন কাঁঠালপাড়া নিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যাকে বিবাহ করেন। রঘুদেব নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে রামজীবনের পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন এবং পৈতৃক বাস পরিত্যাগ করিয়া কাঁঠালপাড়ায় বাস স্থাপন করেন। রামহরির পৌত্র যাদবচন্দ্র। তিনি সরকারী চাকুরী করিয়া উপার্জ্জনের উদ্বৃত্ত অর্থ পূজা, প্রতিষ্ঠা ও দানাদি বিবিধ সৎকর্ম্মে ব্যয় করিতেন। একবার তিনি উড়িষ্যাঞ্চলে তাঁহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তথায় সঙ্কটাপন্ন পীড়িত হন; ক্রমে তাঁহার দেহ হইতে জীবনের যাবতীয় লক্ষণ অপসৃত হইলে সৎকারার্থ তাঁহার শবদেহ শ্মশানে নীত হয়। এই সময় একজন সন্ন্যাসী নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া 'যাদবচন্দ্র মৃত নহে—জীবিত, এই বলিয়া তাঁহার দেহে কর সঞ্চালন করিলেন। দেখিতে দেখিতে যাদবচন্দ্রের অসার দেহে প্রাণ সঞ্চার হইলে তিনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সন্ন্যাসীর চরণতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন। এই সন্ন্যাসী প্রতিশ্রুতিমত যাদবচন্দ্রকে তাঁহার অন্তিমকালে দর্শন দিয়াছিলেন। যাদবচন্দ্রের উপর এই সন্ন্যাসীর অলৌকিক প্রভাব তাঁহার পুত্রের জীবনেও কিয়ৎ পরিমাণে শক্তির সঞ্চার

হইয়াছিল। পঞ্চমবর্ষ বয়সে কুলপুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্যের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের ‘হাতে খড়ি’ হয়। একদিনেই সমস্ত বাঙ্গালা বর্ণমালা আয়ত্ব করিয়া তিনি গুরুজনদিগের বিস্ময় উৎপাদন করেন। পাঠশালায় অধ্যয়নকালেও তাঁহার অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও স্মরণশক্তির পরিচয় পাইয়া গুরুমহাশয় চমৎকৃত হইতেন। কয়েকমাস কাঁটালপাড়ার পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়া ইং ১৮৪৪ সালে তিনি মেদিনীপুরে পিতার নিকট গমন করেন এবং তথাকার ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। সেই বিদ্যালয়ের ছাত্ররূপেও তাঁহার মেধা ও স্মরণ শক্তি শিক্ষকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিত।

পাঁচ বৎসর পরে যাদবচন্দ্র মেদিনীপুর হইতে চব্বিশ পরগণায় বদলী হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় কাঁঠালপাড়ায় ফিরিয়া আসিলেন। তথা হইতে তিনি হুগলী কলেজে পড়িতে যাইতেন। ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে হুগলী কলেজে ভর্ত্তি হন। তখন তাঁহার বয়স বার বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। প্রায় সাত বৎসর ঐ কলেজে অধ্যয়নের পর ইং ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে চলিয়া যান

সেই সময়ে শিক্ষায়তনগুলির কার্য্য কাল অক্টোবর মাসে আরম্ভ হইয়া পরবর্ত্তী সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত চলিত। হুগলী কলেজের সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষা (School) বিভাগে দুইটী মান ছিল। উচ্চমানে (Senior Division) তিনটি শ্রেণী এবং নিম্নমানে (Junior Division) চারিটি শ্রেণী ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিম্নমানের প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। সেই সময়ে নবীনচন্দ্র দাস নামক হুগলী কলেজেরই একজন কৃতী ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন। সেই কালে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক বিভাগ (Section) এক একজন শিক্ষকের অধীনে থাকিত। তিনিই বাঙ্গালা ভিন্ন আর সকল বিষয়ই শিক্ষা দিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলী কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন ঈশানচন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতৃযুগল ভিন্ন একাধিক ইংরেজ শিক্ষকও স্কুল বিভাগে পড়াইতেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতি বাৎসরিক পরীক্ষায় কৃতীত্ব প্রদর্শন করিয়া, উত্তীর্ণ হইতেন। বহুবার তিনি প্রতিযোগীতায় পুরস্কারাদিও পাইয়াছিলেন। ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে নিম্নমানের বৃত্তি পরীক্ষায় (Junior Scholarship Examination) তিনি বিশেষ কৃতীত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। সাতটি পঠিতব্য বিষয়ের মধ্যে তিনি ছয়টিতেই প্রথম স্থান অধিকার করেন। ঐ পরীক্ষায় সর্ব্বমোট সাতজন বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তন্মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বয়সে সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার বয়স তখন ষোল বৎসরও পূর্ণ

হয় নাই। অতঃপর মাসিক আট টাকা বৃত্তি পাইয়া তিনি উচ্চতর(College) বিভাগের চতুর্থ শ্রেণীতে (বর্ত্তমানে যাহাকে প্রথম বার্ষিক শ্রেণী বলে) ভর্ত্তি হন। এক বৎসর পরে পুনরায় একটি পরীক্ষা (Senior Scholarship Examination) দিয়া আবার এক বৎসরের জন্য মাসিক আট টাকা বৃত্তি পাইলেন। পরবর্ত্তী বৎসরও (১৮৫৬ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে) পরীক্ষা দিয়া তেরজন প্রতিযোগীর মধ্যে তিনিই একেলা সাফল্য লাভ করিয়া দুই বৎসরের জন্য মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া বৃত্তির অধিকারী হন। সেই বৎসরের পরীক্ষাতে হুগলী কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তিনিই কেবল সকল বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল করিতে সমর্থ হন। কলেজ বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে (বর্ত্তমান ব্যবস্থার তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী) অধ্যয়ন করিবার সময়েই (১৮৫৬ খ্রীঃ, জুন) তিনি হুগলী হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হন। বোধ হয় কলেজের অন্যান্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে আইন বিভাগেও পড়া চলিতে পারিবে, এই আশায় তিনি হুগলী কলেজ পরিত্যাগ করেন।

হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র প্রখ্যাতনামা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কবিতা লিখিতে থাকেন। সেই সময়েনাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র:ও দ্বারকানাথ অধিকারী নামক এক ব্যক্তিও প্রভাকরে কবিতা লিখিতেন। তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর আলাপ ছিল না এবং সাক্ষাতেরও কোনও সম্ভাবনা ছিল না। দীনবন্ধু তখন কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু প্রভাকরের মধ্যস্থতায় তাঁহারা পরস্পরের প্রতি অনুরাগী হইয়া উঠেন। হুগলী কলেজে পড়িবার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাকরের কবিতা প্রতিযোগীতায় যোগদান করিয়া 'কামিনীর প্রতি উক্তি' শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করেন এবং উহার জন্য কুড়ি টাকা পুরস্কার লাভ করেন। রঙ্গপুর জিলার তুষভাণ্ডারের জমিদার রমণীমোহন রায়চৌধুরী ও কুণ্ডার জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী ঐ টাকা প্রদান করেন। সংবাদ প্রভাকরে বঙ্কিম, দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথের যে সকল কবিতা প্রকাশিত হইত সেইগুলিই সাধারণতঃ রচনা প্রতিযোগীতা অথবা 'কালেজিয় কবিতা যুদ্ধ' নামে সাহিত্যে পরিচিত। সংবাদ প্রভাকরে বঙ্কিমের কিছু গদ্য রচনাও প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং এই সময়ের মধ্যেই তাঁহার প্রথম কবিতা গ্রন্থ 'ললিতা' প্রকাশিত হয়। প্রভাকরে তিনি সকল সময়ে স্বনামে কবিতা লিখিতেন না। কখনও বা নামের আদ্যক্ষর মাত্র (যেমন শ্রীব, চ, চ) দিতেন কখনও একার্থ বোধক ভিন্ন বাক্য সংবলিত

নাম (যেমন শ্রীঅষ্টম অবতার চট্টোপাধ্যায় অথবা শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়) স্বাক্ষর করিয়া রচনা প্রকাশিত করিতেন। সেই সঙ্গে কখনও কখনও তিনি যে হুগলী কলেজের ছাত্র তাহাও উল্লেখ থাকিত। সংবাদ প্রভাকরে তাঁহার বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় পনেরটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল।

হুগলী কলেজ হইতে তিনি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হন, তখনও (১৮৫৬ খ্রীঃ, জুলাই) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। পর বৎসর এপ্রিল মাসে বিশ্ববিদ্যালয়াধীনে প্রথম 'প্রবেশিকা (Entrance) পরীক্ষা গৃহীত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র, কবি হেমচন্দ্র, পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ঐ বৎসর পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন। পর বৎসর এপ্রিল মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি-এ, উপাধি পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তৎপূর্ব্বে হুগলী কলেজে প্রায় দুই বৎসর কলেজ পাঠোপযোগী গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্সীতে তিনি বিশেষভাবে আইন অধ্যয়নের জন্যই ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। তাহা সত্বেও তিনি যথাসাধ্য তৈয়ারী হইয়া বি-এ উপাধি পরীক্ষা প্রদান করেন। সেই বৎসর দশজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে তিনি এবং যদুনাথ বসু মাত্র উত্তীর্ণ হন।

বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও তিনি কয়েক মাস আইন অধ্যয়ন ত্যাগ করেন নাই। সেই বৎসরই (১৮৫৮) আগষ্ট মাসে বাঙ্গালা দেশের ছোট লাটের Lieutenant Governor) আদেশে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টারের পদ লাভ করেন। তাঁহার প্রথম চাকুরী জীবন যশোহরে আরম্ভ হয়। তারপর তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে নাগোয়া (মেদিনীপুর), খুলনা, বারুইপুর, ডায়মণ্ড হারবার, বহরমপুর, বারাসত, মালদহ, হুগলী, হাওড়া, আলিপুর, জাজপুর (কটক) প্রভৃতি বহু স্থানে গমন করিতে হয়। সর্ব্বত্রই সুদক্ষ শাসকরূপে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা হয়। সমস্ত কাজের মধ্যেই তাঁহার তেজস্বীতার ও নির্ভিকতার পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি যখন খুলনা অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে নীলকরগণের অত্যাচারে খুলনা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসীগণ একেবারে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র দর্পণে পুর্ব্ব হইতে দীনবন্ধু মিত্রের নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়াছিলেন, এখন তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া বজ্রকঠোর হস্তে ভীষণ অত্যাচারী নীলকরগণের দমনে প্রবৃত্ত হইলেন। নীলকর সাহেবগণ তাঁহার ভয়ে পলাইয়াও নিস্তার পাইল না। মরেল, হিলি প্রভৃতি অত্যাচারী সাহেবগণ স্বদল বলসহ ধৃত ও দণ্ডিত

হইলে ঐ অঞ্চলে নীলকরগণের অত্যাচার কমিয়া আসিল। সেই সময়ে খুলনা অঞ্চলে জলদস্যুগণেরও অত্যন্ত অত্যাচার ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কঠোর শাসনে সেই অত্যাচারও প্রায় সম্পূর্ণরূপে দমিত হয়। যশোহর হইতে তিনি চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরে বদলী হন। এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের আমলাগণের বেতন হার বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে Salary Commission নামে একটী কমিশন গঠিত হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন জজ প্রিন্সেপ সাহেব উহার সম্পাদক হন। পরে তিনি বিলাত গমন করিলে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুদিনের জন্য সেই পদে নিযুক্ত হন। যুবক বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে যে ইহা অতিশয় গৌরবজনক তাহা বলাই বাহুল্য এই সময়েই তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসেন। বৎসর পরে (১৮৭১ খ্রীঃ) তাঁহার পদোন্নতি ঘটে। তিনি বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনারের প্রধান সহকারীর (Personal Assistant) পদ লাভ করেন। তাহার পর, সরকারী কাজের নিয়মানুযায়ী বহু স্থানে তাঁহাকে গমন :করিতে হয়। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে দুশ্চিকিৎস্য হাঁপানী রোগে তিনি বিশেষ কষ্ট পান। ঐ অসুখের মধ্যে স্বাস্থ্য আরও ভগ্ন হয়। তাহা সত্বেও আরও কয়েক বৎসর চাকুরী করিয়া ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করেন।

হুগলী কলেজে ছাত্রাবস্থায় তিনি সংবাদ প্রভাকরে যে কবিতা লিখিতেন সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এ সকল ভিন্ন, পরিণত বয়সে বঙ্কিমের সাহিত্য চর্চ্চার তিনটি দিক আছে—১ম উপন্যাস রচনা। ২য় বঙ্গদর্শন। ৩য় সমালোচনা সাহিত্য ও ধর্ম্মসাহিত্য রচনা।

উপন্যাস রচনা

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থের শেষ অংশ যখন রচিত হয়, তখন তিনি বারুইপুরের ভারপ্রাপ্ত হাকিম ছিলেন। সার্কুলার রোডের বিদ্যারত্ন যন্ত্রে ইহা মুদ্রিত হয়। এই সময়ের মধ্যেই কপালকুণ্ডলা মৃণালিনী রচিত হয়। মেদিনীপুরের নাগোঁয়াতে অবস্থানকালে এক কাপালিক সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। খুব সম্ভব সেই ঘটনাই কপাল কুণ্ডলা রচনায় তাঁহাকে প্রেরণা দান করে। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে কপাল কুণ্ডলা এবং উহার তিন বৎসর পরে মৃণালিনী প্রকাশিত হয়। বহরমপুরে অবস্থানকালে (১৮৭৩ খ্রীঃ) ইন্দিরা ও বিষবৃক্ষ প্রকাশিত হয়। উহার দুই

বৎসর পরে তিনি যখন নয় মাসকাল ছুটীতে ছিলেন, তাহার মধ্যে ক্রমে যুগলাঙ্গুরীয়, লোকরহস্য, বিজ্ঞান রহস্য চন্দ্রশেখর, রাধারাণী ও কমলাকান্তের দপ্তর মুদ্রিত হয়। ইহার পর বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'রজনী' উপন্যাস প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। (১৮৮১—৮২ বঙ্গাব্দ।) তাহার পর যথাক্রমে রাধারাণী ও কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্গদর্শনেই প্রথমে ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হইয়া পরে পৃথক পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। এই সময়ে (১৮৭৭—১৮৭৯ খ্রীঃ) তিনি চুঁচুড়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। উক্ত উপন্যাস গুলি ভিন্ন তাঁহার 'কবিতা পুস্তক' ও 'প্রবন্ধ পুস্তক'ও এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে 'রাজসিংহ' ও 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয়। দেবীচৌধুরাণী প্রথমে বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছিল। বঙ্গদর্শন বন্ধ হইয়া যাইবার ফলে উহা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইতে পারে নাই। তাঁহার শেষ উপন্যাস সীতারাম তাঁহারই জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'প্রচার' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইতে থাকে। পরে ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে উহা পৃথকভাবে মুদ্রিত হয়। 'এই সকল উপন্যাসের মধ্যে বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, রাধারাণী, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল ও আনন্দ মঠ সম্পূর্ণভাবে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়া পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল'।

বঙ্গদর্শন

১৮৬৯ হইতে ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ছিলেন, সেই সময় মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র, রামগতি ন্যায়রত্ন, লালবিহারী দে, ঐতিহাসিক রামদাস সেন, জননায়ক বৈকুণ্ঠনাথ সেন, মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়, লোহারাম শিরোরত্ন, গঙ্গাচরণ সরকার ও তৎপুত্র অক্ষয় চন্দ্র সরকার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ বহরমপুরে ছিলেন। এতগুলি সাহিত্যরসিক ব্যক্তির সমাবেশে সাহিত্য চর্চ্চার যে একটি বৃহৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহাঁদের সহিত বঙ্কিমচন্দ্র ও পরে রমেশচন্দ্র দত্ত মিলিত হওয়াতে মণিকাঞ্চন সংযোগ হইল। এই বহরমপুরে থাকিতেই ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল (১২৭৯ বঙ্গাব্দ বৈশাখ) মাস হইতে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতার উপকণ্ঠে ভবানীপুরের পিপুল-পটি লেনে অবস্থিত এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের মুদ্রাযন্ত্রে উহার প্রথম মুদ্রণ হয়। পর বৎসর বৈশাখ মাস হইতে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠাল পাড়ায় বঙ্গদর্শন মুদ্রিত করিবার জন্য মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন এবং সেই থান হইতেই বঙ্গদর্শন মুদ্রিত হইয়া

প্রকাশিত হইতে থাকে। তাঁহার পিতা যাদবচন্দ্র ও অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র উহার তত্ত্বাবধান করিতেন। ১২৮২ বঙ্গাব্দের চৈত্র পর্য্যন্ত (১৮৭৬, খ্রীঃ মার্চ্চ, বঙ্গদর্শন নিয়মিত প্রকাশিত হইয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়। অনুমিত হয় যে বৈষয়িক কারণে পারিবারিক অশান্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতেই বঙ্কিম কতকটা বাধ্য হইয়া বঙ্গদর্শনের প্রকাশ বন্ধ করেন। এই সময়েই তিনি কাঁঠালপাড়ার বাস পরিত্যাগ করিয়া চুচুঁড়ায় বাটী ভাড়া করিয়া বাস করিতে থাকেন। এক বৎসর পরে, বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনের স্বত্ব সঞ্জীবচন্দ্রকে প্রদান করিলে, তাঁহার সম্পাদনায় উহা পুনরায় (১২৮৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে) প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু উহার আর পূর্ব্বের ন্যায় সমাদর রহিল না। সঞ্জীবচন্দ্র নানারূপ অসুবিধার মধ্যেও ১২৮৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র (১৮৮৩ খ্রীঃ, মার্চ্চ) পর্য্যন্ত উহা প্রকাশ করিয়া পুনরায় বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। বঙ্গদর্শনের তিরোভাব বহু সাহিত্যিকেরই বিশেষ মনোকষ্টের কারণ হওয়ায়, সুলেখক চন্দ্রনাথ বসুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের উৎসাহে ও চেষ্টায় পরবর্ত্তী বৎসর (১২৯০) কার্ত্তিক মাস হইতে পুনরায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু মাত্র চারি মাস প্রকাশিত হইবার পর, বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দ্দেশেই উহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিতে হইল। বঙ্গদর্শন বন্ধ হইবার কয়েকমাস পরে বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্রের সম্পাদনায় 'প্রচার' নামে একখানি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। খুব সম্ভবতঃ তিনি স্বয়ং অন্তরালে থাকিয়া উহা প্রকাশ করিতে থাকেন। 'প্রচার' বাহির হইবার অল্প কিছুকাল আগে, সুলেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় 'নবজীবন' পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। 'প্রচার' পত্রিকা ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাস (১২৯৪ বঙ্গাব্দ, চৈত্র) পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল।

অন্যান্য গ্রন্থাদি

পূর্ব্বে উল্লিখিত উপন্যাসাদি ভিন্ন বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ নিম্নলিখিত সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। (১) লোকরহস্য। ইহার প্রবন্ধাদি প্রথমে বঙ্গদর্শনে ও প্রচারে মুদ্রিত হয়। পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। উহা খুব সম্ভব ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়। প্রায় চৌদ্দ বৎসর পরে উহার সম্পূর্ণ সংশোধিত, পরিমার্জ্জিত পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। (২) বিজ্ঞান রহস্য। ইহাতেও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সমূহ পুনর্মুদ্রিত হয়। পরবর্ত্তী সংস্করণে (১২৯১ বঙ্গাব্দ) উহার অনেকাংশ পরিবর্ত্তিত হয়। (৩) কমলাকান্তের দপ্তর। বঙ্গদর্শনে ঐ নামে প্রকাশিত নিবন্ধগুলি

একত্রিত করিয়া ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এবং প্রায় দশ বৎসর পরে উহার দ্বিতীয় পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'চন্দ্রালোকে' এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত "স্ত্রীলোকের রূপ" নামক দুইটি নিবন্ধও সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর জীবিতকালেই উহার আর একটি সংস্করণ হইয়াছিল। তাহাতে "ঢেঁকী" নামে আরও একটি নিবন্ধ সংযোজিত হয়। (৪)বিবিধ সমালোচনা। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশ করেন তাহাদের মধ্যে কয়েকটীর অংশ বিশেষমাত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট ছিল। (৫) বিবিধ প্রবন্ধ। পূর্ব্বোক্ত 'বিবিধ সমালোচনা' এবং "প্রবন্ধ পুস্তক" নামে আর একখানি পুস্তক একত্র করিয়া "বিবিধ প্রবন্ধ" নামে একখানি পুস্তক ১২৯৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে অন্তর্ভূত নিবন্ধ সকল পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত হইয়াছিল। (৬) আনুমানিক ১২৯৯ বঙ্গাব্দে উহার দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হয়। উহার নিবন্ধগুলি বঙ্গদর্শন ও প্রচার হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। (৭) ধর্ম্মতত্ত্ব (প্রথম ভাগ)। "নবজীবন" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলি ইহাতে অন্তর্ভূত ছিল। নবজীবনে প্রকাশিত বঙ্কিমের ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে পরিণত বয়সের মতামত সমন্বিত প্রবন্ধগুলি তৎকালে সাহিত্য সমাজে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। তাঁহার মতামতের সমালোচনা করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে রচনা প্রকাশিত হইত। খুব সম্ভব ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৺রাজনারায়ণ বসু, ৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি তত্ত্ববোধিনীর লেখক বৃন্দের অন্তর্ভূত ছিলেন। (৮) প্রচার পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের গীতাব্যাখ্যার যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের অ-মুদ্রিত অংশ যোগ করিয়া, তাঁহার মৃত্যুর পর উহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে প্রকাশ করা হয়। (৯) মুচীরাম গুড়ের জীবন চরিত প্রথমে বঙ্গদর্শনে, পরে ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। (১০) কৃষ্ণচরিত্র। ইহাও "প্রচার" পত্রিকায় মুদ্রিত হইবার পর স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৮৮৬)। প্রায় ছয় বৎসর পরে উহা পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয়। (১১) কবিতা পুস্তক। কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি। ইহাদের অধিকাংশ গুলিই বঙ্গদর্শন ও অন্যান্য পত্রিকায় পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে উহাতে কয়েকটি গদ্য প্রবন্ধ ও "পুষ্প নাটক" নামে একটি নাটকও অন্তর্ভূত হয়। সেই কারণে পুস্তকের নামও পরিবর্ত্তিত হইয়া 'গদ্য পদ্য' হয়। (১২) ইংরেজিতে 'রাজমোহনের পত্নী

(Rajmohan's Wife) এই নামে একখানি উপন্যাস ইণ্ডিয়ান ফিল্ড (The (Indian Field) নামক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (১৮৬৪ খ্রীঃ)। বঙ্কিমচন্দ্র উহার কয়েকটি অধ্যায় পরে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। (ইংরেজি পুস্তক খানি ১৯৩৫ খ্রীঃ অব্দে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন)।

এই সকল ভিন্ন তিনি কয়েকটী ছাত্র পাঠ্য পুস্তকও রচনা বা সংকলন করেন। দীনবন্ধু মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র ও স্বীয় অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাবলী হইতে চয়ন ও তৎসহ তাঁহাদের জীবনী বা রচনার সমালোচনা করিয়া কয়েকখানি পুস্তকও তিনি সম্পাদন করেন।

এই সকল ভিন্ন তাঁহার বহু ইংরেজি ও বাঙ্গালা প্রবন্ধ একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা রচনা গুলি বঙ্গদর্শন, সাধারণী, ভ্রমর, নবজীবন প্রভৃতি পত্রিকায় ও ইংরেজি রচনাগুলি The Calcutta Review, Mookerjee's Magazine, The Calcutta University Magazine, প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অনেক মূল্যবান অপ্রকাশিত রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

বন্দেমাতরং

বঙ্কিমচন্দ্রের অমর জাতীয় সঙ্গীত "বন্দেমাতরং" আনন্দমঠের অন্তর্ভূক্ত। তাঁহার জীবদ্দশায় ঐ সঙ্গীতটি তাদৃশ লোকপ্রিয় হইতে পারে নাই এবং 'বন্দেমাতরং' ধ্বনীদ্বারা দেশমাতৃকাকে বন্দনার রীতিও বিস্তার লাভ করে নাই। ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনই প্রথমে ঐ সঙ্গীত ও ধ্বনীকে জনসমাজে প্রথম প্রতিষ্ঠা দান করে। তখন হইতেই প্রথমে বাঙ্গালী ও পরে সমগ্র ভারত ঐ গান গাহিয়া ও 'বন্দেমাতরং' ধ্বনী করিয়া দেশমাতার বন্দনা আরম্ভ করিল। তাহার পর হইতে বহু বৎসর ধরিয়া সকল প্রকার জাতীয় আন্দোলনে 'বন্দেমাতরং' সঙ্গীত ও ধ্বনী অপরিহার্য্য হইয়াছিল। পরে উহার স্থান বিশেষ অ-হিন্দুর ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বিরোধী এই অজুহাতে জাতীয় মহাসমিতি হইতে নির্দ্ধারণ দেওয়া হয় যে ঐ সঙ্গীতটির মাত্র কয়েকটি ছত্র জাতীয় অনুষ্ঠানে গীত হইবে। ইহার বিরুদ্ধে বাঙ্গালা দেশ হইতেই প্রধানতঃ তুমুল প্রতিবাদ উত্থিত হয়। অন্যান্য প্রদেশ হইতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এমন কি কোনও কোনও মুসলমান জননেতাও ঐ নির্দ্ধারণের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই।

উপসংহার

বিদ্যালয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজিতে

পারদর্শিতা লাভ করিলেও সংস্কৃত শিক্ষা তাঁহার প্রধানতঃ বাড়ীতেই সংস্কৃত পণ্ডিতের নিকট হয়। কাঁঠাল পাড়া হইতে যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইতে থাকে তখন তাঁহার অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র 'ভ্রমর' নামে একটি ক্ষুদ্র মাসিক পত্র প্রকাশিত করিতে থাকেন। উহাও বঙ্গদর্শন মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইত। 'ভ্রমরে'ও বঙ্কিমের কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

কর্ম্মজীবনের মধ্যে কিছুকাল তিনি কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দের প্রথমভাগে তিনি পটলডাঙ্গায় (বর্ত্তমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সম্মুখ ভাগে) প্রতাপ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীটে একটি বসত বাটী ক্রয় করিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য (Fellow) হন। ১৯৯২ খ্রীঃ অব্দে তিনি রায়বাহাদুর ও তাহার ঠিক দুই বৎসর পরে সি-আই-ই (C. I. E.) উপাধি প্রাপ্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের উপযোগী একটি বাঙ্গালা রচনা সংগ্রহ প্রকাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহে যাহাতে বাঙ্গালাও একটি শিক্ষণীয় বিষয়রূপে গণ্য হয়, সেজন্যও তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে ধর্ম্মাচার্য্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ মনস্বীগণের চেষ্টায় কলিকাতায় Society for Higher Training of Youngmen নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। (উহারই বর্ত্তমান নাম Calcutta University Institute) প্রতিষ্ঠা বৎসরে বঙ্কিমচন্দ্র উহার সাহিত্য বিভাগের সভাপতি হইয়াছিলেন। উহার অধিবেশন গুলিতে উপস্থিত থাকিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে বক্তৃতাদিও দিতেন। বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার দুইটি বক্তৃতা উক্ত প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৯১ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তদবধি তিনি কলিকাতাতেই অবস্থান করিতে থাকেন। এই সময়ের মধ্যেই তাঁহার কঠিন বহুমূত্র রোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ দুরারোগ্য ব্যাধিতেই ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬শে চৈত্র (১৮৯৪ খ্রীঃ এপ্রিল) তাঁহার দেহান্ত হয়।

তাঁহার কোনও পুত্র সন্তান জন্মে নাই। তিনটি কন্যা মাত্র জন্মিয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী রাজলক্ষ্মী দেবী তাঁহার মৃত্যুর পরেও বহুকাল জীবিত ছিলেন।

জীবিত কালেই, তাঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ একাধিক দেশী ও বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়। কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশ-

নন্দিনী, বিষবৃক্ষ ইংরেজিতে ; কপাল কুণ্ডলা জার্ম্মাণ ভাষায় ; দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, দেবীচৌধুরাণী, হিন্দুস্থানীতে ; যুগলাঙ্গুরীয় ও দুর্গেশনন্দিনী হিন্দিতে ; দুর্গেশনন্দিনী কানাড়ী ভাষাতে অনূদিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর বৎসরে বিষবৃক্ষ সুয়েডিশ ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছিল। কিন্তু উহা মৃত্যুর পূর্ব্বে না পরে সঠিক জানা যায় নাই। ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও একজন খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মাচার্য্য দুর্গেশনন্দিনী রোমান অক্ষরে মুদ্রিত করেন। তাঁহার প্রায় সমুদয় উপন্যাসগুলি নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া দীর্ঘকাল অভিনীত হইয়া নাট্যামোদীগণকে আনন্দ দান করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র— প্রসিদ্ধ দীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র। ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দের আশ্বিন মাসে (১২৬৭ সাল) তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বাল্যকালে কৃষ্ণনগর কলেজ সংলগ্ন স্কুলে অধ্যয়ন করেন। তৎপরে কলিকাতা মেট্রপলিটান স্কুল হইতে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মেট্রপলিটান কলেজ হইতে (বর্ত্তমান নাম বিদ্যাসাগর কলেজ) এফ, এ, পরীক্ষায়ও বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হন। ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম-এ এবং ১৮৮২ সালে বি-এল পাশ করেন। ১৮৮৭ সালে মুন্সেফী চাকুরী গ্রহণ করিয়া, বাঙ্গালা ও বিহারের নানা স্থানে অতিবাহিত করেন। ১৯০৮ সালে সবজজের পদে উন্নাত হন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম অকিঞ্চন ও চীবর।

বঙ্গদেব চান্দেল্ল—জেজাক ভুক্তির (বর্ত্তমান বুন্দেল খণ্ড) চান্দেল্লবংশীয় যশোবর্ম্মার পুত্র বঙ্গদেব কর্ত্তৃক অঙ্গ (বর্ত্তমান দক্ষিণ পূর্ব্ব বিহার প্রদেশ) ও রাঢ়দেশ (পশ্চিম বাঙ্গলা) খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিজিত হইয়াছিল।

বঙ্গসেন—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম চিকিৎসা মহার্ণব, বঙ্গদত্ত বৈদ্যক ও সুবর্ণসার প্রভৃতি। সম্ভবতঃ তিনি পঞ্চদশ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক।

বঙ্গাল—বাঙ্গালার নবাব নাসিরউদ্দিন হুমায়ুন ১৫৩২ খ্রীঃ অব্দে আসাম আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরাজিত হইয়াছিলেন। পর বৎসর ১৫৩৩ সালে মুঘল নৌবহর আসামীদের হস্তে বিশেষ রূপে পরাজিত হইয়াছিল। মুসলমান সেনাপতি বঙ্গাল ও তাজু (বোধ হয় তাজউদ্দিন) এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। বাইশখানা জাহাজ ও বহু কামান আসামীদের হস্তগত হয়।

বচেরা তাকি—তিনি একজন তক্ষক জাতীয় রাজপুত বীর। মোহাম্মদ কাশিম আলোর ও ব্রাহ্মণাবাদ অধি-

কার করিয়া গোলকুণ্ডা নামক স্থান আক্রমণ করেন। এই স্থান বচেরা তাকি কাশিমকে সহজে অধিকার করিতে দেন নাই। এই স্থানে সতর দিন ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে অনেক মুসলমান সেনাপতি সমর শয্যায় শয়ন করিলেন। চারি হাজারের উপর কাশিমের সৈন্য হত হইল। অবশেষে এই স্থানের দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া বচেরা তাকি মুলতানে গমন করেন। কাশিম এখানেও তাঁহাকে আক্রমণ করেন। দুই মাসকাল অনবরত যুদ্ধ করিয়া বচেরা পরলোক গমন করেন। বচেরা তাকির প্রকৃত নাম বৎসরাজ তক্ষক।

বচ্ছ গোত্ত—(বৎস্য গোত্র) পালি মজ্‌ঝিম নিকায় গ্রন্থে লিখিত আছে যে এক সময়ে বচ্ছগোত্ত মহাত্মা বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া নির্ব্বাণ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, কেবল ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণই নির্ব্বাণের অধিকারী এমন নহে, গৃহীরাও নির্ব্বাণের অধিকারী।

বছনাগরজী—তিনি একজন দাদুপন্থী ভক্ত। তাঁহার রচিত অনেক পদ পাওয়া গিয়াছে। দাদুপন্থী 'ভক্তবাণী' সংগ্রহ গ্রন্থে তাহা সংগৃহীত আছে।

বজ বাহাদুর—তাঁহার প্রকৃত নাম মালিক বায়াজিদ। ১৫৫৪ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৬২) তাঁহার পিতা সুজা খাঁর মৃত্যুর পরে তিনি মালবের শাসন কর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন এবং পরে সুলতান বজ বাহাদুর উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বাধীনতা অবলম্ব করেন।

বজ খাঁ—সম্রাট প্রথম বাহাদুরের একজন কর্ম্মচারী। তিনি ১৭০৭ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১১৮) আজিম শাহের সহিত যুদ্ধে নিহত হন।

বজিরা—কোশল দেশের রাজা প্রসেনজিতের তিনি কন্যা ছিলেন। প্রসেনজিতের ভাগিনেয়, মগধের রাজা বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু স্বীয় মাতুল কন্যা বজিরাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্র শৌর্য্যশালী উদয়ী।

বজ্র—বুদ্ধের নির্ব্বাণের পরে শক্রাদিত্য, বুদ্ধগুপ্ত, তথাগত গুপ্ত, বালাদিত্য ও বজ্র নামক পাঁচজন ভূপতি নালন্দাতে পাঁচটী সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে পরবর্ত্তী অনেক ভূপতি দ্বারা ইহার আকার ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

বজ্রগর্ভা ভৈরবী—বর্দ্ধমান জেলার পাণ্ডুয়া রেল ষ্টেশনের অদূরে যে পেঁড়োর মন্দির রহিয়াছে ঐখানে এক সময়ে পাণ্ডুভূমি বিহার ছিল। সেই বিহারে বহু বিদ্বান্ ও বিদুষী বৌদ্ধ বাস করিতেন। বজ্রগর্ভা ভৈরবী তাঁহাদের অন্যতমা। তাঁহার উপাধি ছিল বোধিসত্ত্বদশ ভূমীশ্বরী।

বজ্রঘণ্টা—একজন বৌদ্ধ সঙ্গীত রচয়িত্রী ভিক্ষুণী। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

বজ্রদত্ত—আসামের অধিপতি নরকের পৌত্র ও ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্ত। (অন্যমতে ভগদত্তের ভ্রাতা) তিনি অতিশয় পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। এই বংশীয় উনিশজন নরপতি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রাজত্ব করেন। সর্ব্বশেষ নরপতি সুবাহু, পুত্র সুপর্ণের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিয়া হিমালয়ে গমন করেন।

বজ্রদমন—খ্রীঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে কচ্ছপঘাত (কচ্ছহওয়া) বংশীয় মহাসামন্ত বজ্রদমন কান্যকুব্জের প্রতীহার রাজকে পরাভূত করিয়া গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি একটি রাজবংশেরও প্রতিষ্ঠাতা। তিনিও চন্দেল্ল রাজের মিত্র নৃপতি হইয়াছিলেন।

বজ্রদেব—আসামের (কামরূপের) শালস্তম্ভবংশীয় নৃপতি। তিনি অনুমান খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কুমার। বজ্রদেবের পরে ইতিহাস বিখ্যাত শ্রীহর্ষবর্ম্মাদেব রাজা হন।

বজ্রপাণি বৈদ্য—তিনি বঙ্গের পালবংশীয় নরপতি নয়পালদেরের অন্যতম অমাত্য ছিলেন। গদাধর মন্দিরের প্রশস্তি এই বজ্রপাণিরই রচিত। নয়পাল ১০৪৫ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

বজ্রবর্ম্মা—যাদব জাতির প্রাচীন রাজধানী পঞ্চনদ প্রদেশের সিংহপুরে ছিল। এই যাদব বংশজাত বজ্রবর্ম্মা নামক জনৈক সেনাপতি উত্তরা পথের পশ্চিমার্দ্ধ হইতে পূর্ব্বার্দ্ধে আসিয়া একটী নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। বজ্রবর্ম্মা বোধ হয় হরিকেল বা চন্দ্রদ্বীপ (বর্ত্তমান বরিশাল জিলা) অধিকার করিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপুত্র জাতবর্ম্মা বঙ্গে যাদব প্রতিভার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

বজ্র বারাহী—তিনি একজন বৌদ্ধ সাধিকা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'মহামুদ্রাভিগীতি'।

বজ্রহস্ত (প্রথম)—তিনি উড়িষ্যার গঙ্গা বংশীয় নরপতি বীরসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র। বোধ হয় তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কামার্ণব প্রথম দেখ।

বজ্রহস্ত (দ্বিতীয়)—তিনি উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নরপতি রণার্ণবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি কতকাল রাজত্ব করেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তৃতীয় কামার্ণব রাজা হন। কামার্ণব প্রথম দেখ।

(তৃতীয়)—তিনি উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নরপতি চতুর্থ কামার্ণবের

পুত্র। তিনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার তনয় পঞ্চম কামার্ণব রাজা হন। কামার্ণব প্রথম দেখ।

বজ্রহস্ত (চতুর্থ)—তিনি উড়িষ্যার গঙ্গা বংশীয় নরপতি ষষ্ঠ কামার্ণবের পুত্র। তিনি ৩০ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র প্রথম রাজরাজ রাজা হন। প্রথম কামার্ণব দেখ। তিনি ৯৬০ শকাব্দের ২৬শে চৈত্র রবিবার (৯ই এপ্রিল-১০৩৮ খ্রীঃ অব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১০০৮ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার স্ত্রী নঙ্গমা রাজরাজকে প্রসব করেন।

বজ্রাদিত্য—তিনি কাশ্মীরের দিগ্বিজয়ী নরপতি ললিতাদিত্যের অন্যতমা মহিষী চক্রমর্দ্দিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ললিতাদিত্যের পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুবলয়াদিত্য রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তুপরে তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহার কনিষ্ঠ বজ্রাদিত্য পরে রাজা হইলেন। তিনি অতি লম্পট ছিলেন। নৃশংস ম্লেচ্ছদিগকে, ধনের লোভে, তিনি অনেক মানুষ বিক্রয় করিয়াছিলেন। এই পাপিষ্ঠ ৭৩৭—৭৪৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত সাত বৎসর রাজত্ব করিয়া, অতিশয় স্ত্রীসম্ভোগ জনিত ক্ষয় রোগে পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার মহিষী মঞ্জরিকাদেবীর গর্ভজাত প্রজানাশক প্রথম পৃথিব্যাপীর রাজা হইয়াছিলেন।

বজ্রায়ুধ—তিনি কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন। কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

বটকৃষ্ণ পাল—বিখ্যাত বাঙ্গালী ব্যবসায়ী। ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে হাবড়ার নিকট শিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকালে মাতৃপিতৃহীন হওয়ায় কলিকাতায় বেনিয়াটোলায় মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে মাতুলের মসলার দোকানে কাজ শিখিতে প্রবিষ্ট হন। তৎপরে কিছুদিন পাটের ব্যবসা করিয়া ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে খেঙ্গরাপটিতে সামান্য একখানি মসলার দোকান ক্রয় করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য আরম্ভ করেন। অর্থাভাব ঘটায় মাধবচন্দ্র দাঁকে অংশীদার গ্রহণ করেন। পরে এই দোকানেই সামান্য সামান্য বিলাতী ঔষধ বিক্রয় আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ ইহার উন্নতি করিয়া ঔষধ ব্যবসায়ীদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। কপর্দ্দকশূন্য অবস্থা হইতে পরিশ্রম ও উদ্যমের বলে এতাদৃশ উন্নতি লাভের ইনি একটি দৃষ্টান্তস্থল। বহু নরনারীকে তিনি গোপনে অর্থ সাহায্য করিতেন। তিনি শিবপুরে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, বেনিয়াটোলায় দুইটী নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া-

ছেন। ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে তিনি পুত্রদের হস্তে ব্যবসায় পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়া কাশীবাসী হন এবং তথায় ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার তিন পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন।

বটু দাস—তিনি বঙ্গের স্বাধীন রাজা লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিখ্যাত 'সদুক্তিকর্ণামৃত' প্রণেতা শ্রীধর দাস।

বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়—ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগের একজন নাট্যকার। 'হিন্দুমহিলা নাটক' নামক তাঁহার গ্রন্থখানি ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে (ভাদ্র, ১২৭৬ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়। ঐ সময়েই ঐ নামে আর একখানি নাটকও মুদ্রিত হয়। সেইখানির রচয়িতা বিপিনমোহন সেন। যোড়াসাঁকো নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষগণ হিন্দু মহিলাদের দুরবস্থা বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের রচয়িতাকে দুইশত টাকা পুরস্কার দিবেন ঘোষণা করায়, এই দুই ব্যক্তি স্ব স্ব গ্রন্থ রচনা করেন। প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারী ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয়ের বিচারে বিপিন-মোহনের গ্রন্থই পুরস্কার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল।

বটু মিত্র—তাঁহার কন্যা লক্ষ্মণাকে বঙ্গের নরপতি বল্লাল সেন বিবাহ করিয়াছিলেন। মহারাজ বল্লাল সেন দূত পাঠাইয়া কন্যাসহ বটুমিত্রকে নিজ আবাসে আনাইয়া সেই কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য বটুমিত্রের আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বটুমিত্র বল্লাল কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মগধেশ্বর হইয়া-ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে, এই বটুমিত্রের বংশধরগণ আবার রাঢ়দেশে ফিরিয়া আসিয়া ধনবলে উত্তর রাঢ়ীয় সমাজে মিলিত হইয়াছিল।

বটেশ্বর— তিনি একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার। ৮২১ শকে (৮৯৯ খ্রীঃ অব্দে) তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন কাশ্মীরবাসী চিত্তেশ্বর ও এই বটেশ্বর একই ব্যক্তি।

বট্টা—একটা দুষ্ট প্রকৃতি যোগিনী। সে অতি জঘন্য প্রতারণা পূর্ব্বক কাশ্মীরের রাজা বককে এক যাগোৎসবে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করে। রাজা পুত্র পৌত্রাদি সহ তথায় উপস্থিত হইলে, যোগিনী কৌশল ক্রমে তাঁহাদের সকলকে বলিদান করিয়া তথা হইতে পলায়ন করে। রাজার একমাত্র জীবিত পুত্র ক্ষিতিনন্দ তৎপরে রাজা হইয়া-ছিলেন। বক দেখ।

বড় খাঁ গাজী—১২৯৮ খ্রীঃ অব্দে পীর জাফর খাঁ গাজী ত্রিবেণী অঞ্চলে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিয়া-ছিলেন। তিনি উক্ত সালে তথায় একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

তাঁহারই পুত্র বড় খাঁ গাজী। সেই সময়ে প্রভাকরের পুত্র দক্ষিণ রায়, বর্ত্তমান ডায়মণ্ড হাড়বার অঞ্চলে বন জঙ্গল পরিস্কার করিয়া আঠার ভাটিতে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক রাজত্ব করিতেছিলেন। বড় খাঁ গাজীর সহিত তাঁহার প্রথমে বিবাদ পরে সদ্ভাব স্থাপিত হয়। মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারার্থ তাঁহারা যে হিন্দুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের গাজী উপাধি হইতে উপলব্ধি হয়। ১৩১৬ খ্রীঃ অব্দে রহিম খাঁ গাজী ও করিম খাঁ গাজী নামক দুই পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া, বড় খাঁ গাজী পরলোক গমন করেন।

বড় গোঁসাঞি (প্রথম)—আসামের অন্তর্গত জয়ন্তিয়ার স্বাধীন নরপতি। তিনি খুব ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। জয়ন্তিয়ার মহাপীঠ তাঁহার সময়ে আবিষ্কৃত হয়। তাঁহার গুরু রূপনাথ যে শিবলিঙ্গের আবিস্কার করেন, তাহা রূপনাথ ভৈরব নামে খ্যাত হয়।

বড় গোঁসাঞি (দ্বিতীয়)— আসামের অন্তর্গত জয়ন্তিয়ার রাজা। ১৭৩১ খ্রীঃ অব্দে জয়নারায়ণ সিংহের মৃত্যুর পরে তিনি রাজা হন এবং ১৭৭০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তাঁহার ভগিনী গৌরী কুমারীকে এক খাসিয়া সর্দ্দার অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। চেরাপুঞ্জির রাজা অমরসিংহের সহায়তায় তিনি তাঁহাকে উদ্ধার করেন। এই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ অমর সিংহ দুইখানা গ্রাম উপহার প্রাপ্ত হন। তাঁহার বংশধরেরা আঙ্গাজোর ও ফতেপুর নামক গ্রামদ্বয় এখনও লাখেরাজ ভোগ করিতেছেন। বড় গোঁসাই ও তাঁহার রাণী কাশাসতী, হরেকৃষ্ণ উপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণ হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে উভয়ে ৯০ হাল ভূমি দান করেন। তিনি এক কালী মন্দির স্থাপন করিয় লীলাপুরী নামক সন্ন্যাসীকে অর্চ্চনার জন্য নিযুক্ত করেন। অবশেষে লীলাপুরী হইতে তিনি সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নাম হয় রাজপুরী। রাজপুরীর শিষ্য আত্মাপুরী। বড় গোঁসাঞি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে,ছত্রসিংহ জয়ন্তিয়ার রাজা হন। তিনি ১৭৭০—১৭৮০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

বড়ু পণ্ডিত—ঝড়ু পণ্ডিত ও বড়ু পণ্ডিত তাঁহাদের নাম হইতে তাঁহারা দুই সহোদর ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহাদের কবিত্বের খ্যাতি বগুড়া অঞ্চলে সুপরিচিত, কিন্তু তাঁহাদের রচিত কোন গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিস্কৃত হয় নাই।

বড্ডিগ (তৃতীয় অমোঘ বর্ষ)—তিনি রাষ্ট্রকূট বংশীয় জগতুঙ্গের কনিষ্ঠ পুত্র।

বৎস দেবী—(১) মগধের গুপ্তবংশীয় নরপতি আদিত্য সেনের দৌহিত্রী

বৎস দেবীকে নেপালের লিচ্ছবিবংশীয় শিবদেব বিবাহ করিয়াছিলেন। বৎস দেবী মৌখরীরাজ ভোগবর্ম্মার কন্যা ছিলেন।

বৎস দেবী—(২) তিনি মগধের নরপতি পুর গুপ্তের মহিষী। বৎস দেবী নরসিংহ গুপ্তকে প্রসব করেন।

বৎসপাল স্বামী—মগধের গুপ্তবংশীয় নরপতি গোপচন্দ্রের সময়ে বৎসপাল স্বামী বারুকমণ্ডলে শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

বৎসরাজ— খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে গুজরাটে বর্ত্তমান ভরোচের নিকটে (প্রাচীন ভৃগুকচ্ছ বা ভরুকচ্ছ) একটী ক্ষুদ্র গুর্জ্জর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নন্দোর (বর্ত্তমান রাজপিপলা রাজ্যের রাজধানী নন্দোভ) তাঁহার রাজধানী ছিল। এই বংশের প্রথম রাজা প্রথম দদ্দ ও ষষ্ঠ সংখ্যক রাজা জয় ভট। পরে এই বংশে দেবশক্তি নামে এক রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহারই পুত্র বৎসরাজ। তিনি কান্যকুব্জের রাজগণকে পরাস্ত করিয়া উক্ত রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি ৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে জীবিত ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশও জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় নাগভট। কিন্তু এই উত্তরাপথ বিজয়ী বৎসরাজ রাষ্ট্রকূট পতি ধ্রুব ধারাবর্ষ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মরুভূমিতে পলায়ণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বৎসরাচার্য্য— রাজসাহী বিভাগের পুঁটিয়ার বিখ্যাত ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও সিদ্ধ পুরুষ। তিনি পুঁটিয়ার একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া সাত্বিকভাবে ভগবদুপাসনা করিতেন। তদানীন্তন বাঙ্গালার মুসলমান রাজস্ব সংগ্রাহকগণ দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ না করায়,সম্রাট তাঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য একজন মুসলমান সেনাপতিকে মুঘল সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। ঐ মুসলমান সেনাপতি বাঙ্গালায় আসিয়া বৎসরাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি তাঁহাদের কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ তিনি পদ্মা নদীর তীরবর্ত্তী লস্করপুর পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হন। তিনি সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন, কাজেই জমিদারীরও বিশেষ তত্ত্বাবধান করিতেন না। তাঁহার অনেকগুলি পুত্রসন্তান হইয়াছিল। তন্মধ্যে চতুর্থ পুত্র পীতাম্বর রায় মুঘল সম্রাটের নিকট হইতে 'রায়' উপাধিসহ পৈতৃক জমিদারী লস্করপুর পরগণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বদনচন্দ্র বড়ফুকন—তিনি আসামের আহম বংশীয় নরপতি চন্দ্রকান্ত সিংহের (১৮১০—১৮ খ্রীঃ অব্দ) রাজত্বকালে তাঁহার বড় ফুকন ছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার পুত্রদের দুর্বিনীত ব্যবহারে আপামর সকলে অতিশয় উত্তেজিত

হইয়াছিল। বুড়াগোহাই পূর্ণিমা তাঁহাকে বধ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে তিনি ইহা জানিতে পারিয়া বঙ্গদেশে পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করেন। এই দেশদ্রোহী বর্ম্মারাজার কলিকাস্থ এজেন্টের সহায়তায় বর্ম্মারাজাকে আসাম প্রদেশ আক্রমণ করিতে প্রলোভিত করেন। বর্ম্মাসেনাপতি আসাম প্রদেশ আক্রমণ করিয়া আহমপতি চন্দ্রকান্তকে পরাস্ত করেন। চন্দ্রকান্ত সিংহ উপায়ান্তর না দেখিয়া বদনচন্দ্রকে পূর্ব্বপদে নিযুক্ত করিয়া বর্ম্মাদের সহিত সন্ধি করিয়া জোর হাটে পুনঃ আগমন করেন। বর্ম্মারা ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। ইহার কিছুকাল পরেই বড় বড়ুয়া এই স্বদেশদ্রোহী বদনচন্দ্রকে নিহত করেন।

বদনসিংহ জিৎ—তিনি ভরতপুরের রাজা চুড়ামন জিতের পুত্র। তিনিই ডিগের প্রসিদ্ধ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৭৩৯ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১৫২) নাদির শাহের ভারত আক্রমণকালে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র সুরজমল জিৎ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বদরউদ্দিন তায়েবজী—বোম্বাই প্রদেশের খ্যাতনামা মুসলমান জননায়ক। ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা তায়েবজী ভাই মিঞা সাহেব বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন। শৈশবে বদরুদ্দিন প্রথমে উর্দ্দু ও ফার্সী শিক্ষা করেন। পরে কয়েক বৎসর এলফিনষ্টোন ইনষ্টিটিউশনে (Elphinstone Institution) পাঠ করিয়া ষোল বৎসর বয়সে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। প্রথমে চারি বৎসর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিবার পর স্বাস্থ্য হানীবশতঃ দেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। একবৎসর পরে পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তিন বৎসর আইন অধ্যয়ন করেন। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে আইনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং দেশে ফিরিয়া আসিয়া, সেই বৎসরই ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

সেই সময়ে ভারতবাসীরা ইংলণ্ডের আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিলেও ইংরেজ ব্যবহারজীবিদের ন্যায় সম্মান বা বিশ্বাসভাজন হইতে পারিতেন না। তাহা সত্বেও, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, বাক্‌পটুতা, অধ্যবসায় ও সততার গুণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ব্যবহারজীবিদের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান লাভ করিলেন। কর্ম্মজীবনের প্রথম দশ বৎসর, তিনি, বাহিরের অন্য কোনও কাজে মনোযোগ না দিয়া আইন ব্যবসায়ে উন্নতি লাভের জন্যই সমুদয় শক্তি নিয়োগ করেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে

তিনি প্রথম জনসেবার কার্য্যে ব্রতী হন। সেই বৎসর, ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে ভারতে আনীত দ্রব্যের শুল্ক হ্রাস করার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ হয়, তিনি তাহাতে যোগ দিয়া প্রথম যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতেই তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়। কয়েক বৎসর পর তিনি বোম্বাই প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার একজন সভ্য মনোনীত হন। সেই বৎসরই লর্ড রিপণ কর্ত্তৃক স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ণের ব্যবস্থা করেন। সেই সংস্রবে বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনা ও বিতর্কের সময়ে তাঁহার যুক্তিপূর্ণ, ওজস্বিনী বক্তৃতা সকল সম্প্রদায়েরই প্রশংসা লাভ করে। বস্তুতঃ সেই সময় হইতে তিনি বোম্বাই প্রদেশে একজন প্রধান বক্তারূপে পরিগণিত হন।

জাতীয় মহাসমিতি কার্য্যের সহিতও তিনি প্রথমাবধি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলে। ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে মাদ্রাজ নগরে অনুষ্ঠিত সমিতির অধিবেশনে তিনি যে অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহার যশ আরও বিস্তৃত হয়।

স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি প্রভূত চেষ্টা করেন। এই উপলক্ষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকিয়া তিনি বিশেষ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করেন। এই কার্য্যে তিনি অন্যতম পথপ্রদর্শক ছিলেন, বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

বদরউদ্দিন শাহ—একজন প্রসিদ্ধ আওলিয়া। চট্টগ্রাম তাঁহার সমাধি আছে।

বদরউন্নিসা বেগম—সম্রাট আলমগীরের কন্যা। ১৬৭০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বদর মোহাম্মদ—একজন মুসলমান আভিধানিক। তিনি দিল্লীর অধিবাসী ছিলেন। ১৪১৯ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৮২২) তিনি 'আদাব-উল ফুজালা' নামক একখানি প্রসিদ্ধ ফারসী অভিধান রচনা করেন এবং কাদের খাঁ বিন দেলওয়ার খাঁর নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন

বদরশাহ— তিনি একজন প্রসিদ্ধ দরবেশ। শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরফের প্রথম মুসলমান শাসনকর্ত্তা নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে তিনি আসিয়াছিলেন। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে বদরপুর জংশনের অতি নিকটে তাঁহার দরগা বর্ত্তমান আছে।

বদায়ুনী—তিনি একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক পণ্ডিত। ১৫৪০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম আবদুল কাদের। তাঁহার জন্মস্থান বদায়ুন নগর বলিয়া তিনি বদায়ুনী নামে সাধারণতঃ পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতা শেখ মুলুকশাহ, সম্বলের পীড় বেচুর শিষ্য ছিলেন। তিনি ১৫৬২

খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। বদায়ুনী তৎকালের খ্যাতনামা কয়েক-জন ধার্ম্মিক লোকের নিকট নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থে তাঁহার শিক্ষকদের বিবরণ দিয়াছেন। তিনি ইতিহাস, জ্যোতিষ ও সঙ্গীতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই তিনি সম্রাট আকবর শাহের সহিত পরিচিত হন। তিনি দীর্ঘকাল শেখ মবারিক এবং তাঁহার পুত্র শেখ ফৈজী ও আবুল ফজলের সহিত একসঙ্গে বাস করিয়াও, তাঁহাদের সঙ্গে প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন নাই। কারণ তিনি ছিলেন গোঁড়া মুসলমান আর তাঁহারা ছিলেন উদার মতাবলম্বী। বদায়ুনী তাঁহাদিগকে ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া মনে করিতেন। তিনি ১৬১৫ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। বদায়ুনী নানা বিদ্যা বিশারদ ছিলেন। তিনি সম্রাট আকবর শাহের আদেশে সংস্কৃত রামায়ণ প্রভৃতি এবং আরবী জমি উর-রসিদি প্রভৃতি গ্রন্থ ফারসীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই সকল কাজের জন্য তিনি যথেষ্ঠ অর্থ প্রাপ্ত হইতেন। একবার কোনও কাজের জন্য দেড়শত স্বর্ণ মুদ্রা, দশ সহস্র রৌপ্যমুদ্রা ও নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ফলত আকবরশাহ তাঁহার প্রতি যথেষ্ঠ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু তিনি সম্রাটের উদার ধর্ম্মমতের জন্য, তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন।

বদায়ুনী হদিস্ সম্বন্ধে 'বহর-উল-অসমার' এবং নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ে 'নজাত-উর রসিদ' নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি কাশ্মীরের ইতিহাসের একটী সংক্ষিপ্ত সংস্করণ এবং মহাভারতের দুই পর্ব্বের ফারসীতে অনুবাদ করেন। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকখানি গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মুঘল রাজত্বের ইতিহাস—মুন্তাখব-উত-তোয়ারিখ। এই নামে আরও কয়েকখানা গ্রন্থ আছে বলিয়া তাঁহার গ্রন্থ তারিখই বদায়ুনী নামে পরিচিত। বদায়ুনীর ইতিহাস চারি ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে গজনীর রাজবংশের বিবরণ, দ্বিতীয় অংশে দিল্লীর পাঠানবংশীয় রাজগণের, তৃতীয় অংশে বাবর ও হুমায়ুনের এবং চতুর্থ অংশে আকবর শাহের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের শেষ ভাগে সম্রাট আকবরের সমসাময়িক ধার্ম্মিক, দার্শনিক, চিকিৎসক ও কবি প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বিখ্যাত লোকদের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সম্রাট আকবরের রাজত্বের বিবরণের জন্যই বদায়ুনীর গ্রন্থের সমাদর। আকবর নামা প্রভৃতি গ্রন্থ সম্রাট আকবরের প্রশংসায় পরিপূর্ণ। আর বদায়ুনির গ্রন্থ আকবর শাহের নিন্দায় পরিপূর্ণ। কিন্তু তাঁহার নিন্দা ও গ্লানির ভিতর

দিয়াও আকবর শাহের মহত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বদায়ুনী গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। সেজন্য সম্রাট আকবর ও তাঁহার অমাত্যবর্গের প্রতি তিনি সন্তুষ্টচিত্ত ছিলেন না। আকবর শাহ তাঁহার অমাত্যগণের সহায়তায় এক নূতন ধর্ম্মমত প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ইহা বদায়ুনীর অসহনীয় ছিল। তাঁহার ইহাও বিশ্বাস ছিল যে, সম্রাট তাঁহার গুণের যথেষ্ট সমাদর করেন না বরং অন্যান্য অমাত্যেরা যথেষ্ট অনুগ্রহ পাইয়া থাকে। বদায়ুনীর গ্রন্থে সম্রাট আকবরের রাজত্বের চল্লিশ বৎসরের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থ তাঁহার জীবিতকালে প্রচারিত হয় নাই। সম্রাট জাহাঙ্গীরের দশ বৎসর রাজত্বের পরে ইহার বিষয় লোকে জানিতে পারে। তাঁহার রচনা প্রণালী প্রাঞ্জল ও কবিত্বময় অলঙ্কার বর্জ্জিত।

বদিউদ্দিন কাজী—একজন প্রাচীন বাঙ্গালী মুসলমান কবি। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'চিশু ইমাল'।

বদিওজমান খাঁ—বীরভূমের অধিপতি। ১৭১৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতা আসাদুল্লা খাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তিনি বীরভূমের অধীশ্বর হন। তিনি মুর্শিদ কুলি খাঁর নিকট হইতে 'রাজা' উপাধি ও একখানি সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা আজিম খাঁকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু মুসলমান সকল প্রজাকেই সমভাবে দেখিতেন এবং তাহাদিগকে অনেক নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। সহসা তাঁহার রাজ্য মধ্যে এক বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, তিনি রাজস্ব সচিব হেতম খাঁকে বিদ্রোহ দমনার্থ প্রেরণ করেন। হেতম খাঁ ঐ বিদ্রোহ দমন করিয়া, বদিওজ্জমান খাঁ কর্ত্তৃক রাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব সুজাদ্দৌলার সময়ে বীরভূমরাজ যথা সময় রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হওয়ায়, নবাব কর্ত্তৃক তিনি বিশেষভাবে উৎপীড়িত হন। পরিশেষে উত্তেজিত হইয়া তিনি ১৭৩৪ খ্রীঃ অব্দে নবাবের অধীনতা ছিন্ন করিয়া নিজেকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু পরে নবাবকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিন লক্ষ টাকা প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে রাজ্য মধ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। সেই সময় তাঁহার চতুর্থ পুত্র আসাদওজমান খাঁ ১৭৫১ খ্রীঃ অব্দে মুর্শিদাবাদের নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর নিকট রাজ্যের বিশৃঙ্খলার কথা জ্ঞাপন করিয়া, সিংহাসন লাভের সনন্দ প্রাপ্ত হন। জীবনের অবশিষ্টকাল ধর্ম্মালোচনায়

নিরত থাকিয়া ১৭৫১ খ্রীঃ অব্দে বৃদ্ধ রাজা পরলোক গমন করেন।

বদ্রীদাস, রায় বাহাদুর— কলিকাতার একজন সুপ্রসিদ্ধ জহরত ব্যবসায়ী। ১৮৩২ খ্রীঃ অব্দে লক্ষ্মৌ নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম লালা কালকা দাসজী। ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে বদ্রীদাস কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক বসবাস করেন এবং জহুরির ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সরলতা ও সত্যনিষ্ঠার বলে ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিয়া কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মণিকার বলিয়া পরিগণিত হন। ভূতপূর্ব্ব সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যখন যুবরাজ রূপে কলিকাতায় আগমন করেন, সেই সময় তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে তিনি লাট ভবনে হীরা জহরতের সমাবেশ করেন। ১৮৭৩—৭৪ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীতে (International Exhibition) তিনি একটী প্রদর্শনী খুলেন। তথায় তিনি প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র লাভ করেন। লর্ড মেয়ো কর্ত্তৃক তিনি মুকিম্ উপাধি প্রাপ্ত হন এবং লর্ড নর্থব্রুক্ মুকিম্ ও রাজকীয় মণিকার বলিয়া অভিহিত করেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর দরবারে লর্ড লিটন্ কর্ত্তৃক তিনি 'রায় বাহাদুর' উপাধি এবং এম্প্রেস্ অব ইণ্ডিয়া পদক প্রাপ্ত হন। তিনি করোনেশন দরবারে প্রদর্শনী খুলিয়াও উচ্চ শ্রেণীর প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় পিঁজরাপোলের কথা তিনি প্রথম উদ্ভাবন করেন এবং তিনিই স্থাপন করেন। তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এবং ন্যাসন্যাল চেম্বার অব কমার্সের সদস্য ছিলেন। ভারতের জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। ১৯০৩ খ্রীঃ অব্দে বোম্বাই প্রদেশে জৈন সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। মাণিকতলার জৈন মন্দির নামে খ্যাত শ্রীশ্রীশীতলানাথজীর মনোহর মন্দির ও উদ্যান (পরেশনাথ মন্দির) তিনিই বহু অর্থ ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। উহা কলিকাতার একটী অন্যতম দর্শনীয় বস্তু। কলিকাতার পরেশনাথের মন্দির সংলগ্ন বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট নামক রাস্তাটী তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

বধুল বেঙ্কট গুরু—তিনি একজন দার্শনিক পণ্ডিত। অন্নম ভট্ট বিরচিত (১৬২৩ খ্রীঃ অব্দে) তর্ক সংগ্রহ গ্রন্থের তিনি 'তত্ত্ববার্ত্তা দীপিকা' নামে এক উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছেন।

বনঙ্গপাল নিম্বলকার—অপর নাম জগপৎ রাও। বর্ত্তমান ফুলতান নামক স্থানের অধিপতির পূর্ব্বপুরুষ। ছত্রপতি শিবাজীর পিতামহ ও খুল্লপিতামহ মালজী ভোশলে ও বিথোজী ভোশলে

বনঙ্গপালের অধীনে প্রথমে সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন। পরে ইহার ভগিনী দ্বীপাবাঈকে মাধজী ভোঁসলে বিবাহ করিয়াছিলেন।

বনচারী—নদীয়া জিলায় বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব। হরিগুরু, বনচারী, সেবকমলিনা ও অখিলচাঁদ এই চারিজন এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

বনদুর্ল্লভ বা বলদুর্ল্লভ— একজন বাঙ্গালী কবি। তাঁহার নিবাস অনুমান চট্টগ্রাম। 'দুর্গাবিজয়' নামক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি সৃষ্টির পর গৌরীর জন্ম হইতে গণেশের জন্ম পর্য্যন্ত দুর্গা চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি শিক্ষিত ছিলেন। অনুমান অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

বনপাল—বঙ্গের পালবংশীয় একজন নরপতি। সম্ভবতঃ ৮৩৭—৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে মধ্যে তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৯৯১ খ্রীঃ অব্দে প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতশ্রীধর তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বনমালী কর্পূর, রাজা—পঞ্জাবের এক ক্ষত্রিয় বংশে ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দের ১১ই নবেম্বর তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের ২১শে আগষ্ট বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাব চাঁদের তৃতীয় ভ্রাতা বনমালী কর্পূরকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি বর্দ্ধমান রাজকাউন্সিল (Burdwan Raj Council) নামক সমিতির সহ-সভাপতি (Vice President) পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং সেই বৎসরই বর্দ্ধমান রাজ্যের জয়েণ্ট ম্যানেজার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইংরেজ সরকারকর্ত্তৃক ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী তিনি 'রাজা' এবং ১৯০৩ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী সি-এস-আই (C. S. I.) উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে পুনরায় তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। মহাতাপ চাঁদের দত্তক পুত্র আফতাব চাঁদের ভগিনীকে তিনি বিবাহ করেন। বর্দ্ধমানাধিপতি বিজয়চাঁদ মহাতাব তাঁহারই পুত্র। বিজয় চাঁদের নাবালক অবস্থায় তিনি অভিভাবকরূপে তাঁহার বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। ১৩৩১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে (জুন ১৯২৪ খ্রীঃ) তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার কার্য্য কুশলতার ফলে বর্দ্ধমান রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

বনবীর—(১) রাণা রায় মল্লের পুত্র পৃথ্বীরাজের শীতলসেনী নামে এক উপপত্নী ছিল। তাহার গর্ভে বনবীর নামে এক পুত্র জন্মে। সংগ্রাম সিংহের মৃত্যুর পরে প্রথমে রাণা পাঁচ বৎসর

রাজত্ব করেন। বিক্রমজিৎ তৎপরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অতি অযোগ্য ছিলেন বলিয়া সর্দ্দারেরা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শীতলসেনীর গর্ভজাত বনবীরকেই সিংহাসন প্রদান করেন। বনবীর প্রথমে সিংহাসনে আরোহণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। পরে সর্দ্দারদের অনুরোধে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে বসিয়াই বিক্রমজিৎকে সংহার করেন। পরে সংগ্রামসিংহের শিশুপুত্র উদয়সিংহকেও সংহার করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু ধাত্রীপান্নার কৌশলে ও পান্নার নিজপুত্রের জীবনদানে উদয়সিংহ রক্ষা পান। বনবীরের উদ্ধত ব্যবহারে সর্দ্দারেরা অল্পকাল মধ্যেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। জয়সিংহ বয়প্রাপ্ত হওয়া মাত্র সর্দ্দারেরা মিলিত হইয়া কমলমীর দুর্গে তাঁহাকে চিতোরের রাণা বলিয়া অভিষেক করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই চিতোরও উদয়ের হস্তগত হইল। তাঁহারা বনবীরের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিলেন না। বনবীর আপন ধন সম্পত্তি ও পরিবার লইয়া দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নাগপুরের ভোঁসলারা তাঁহারই বংশধর।

বনবীর—(২) মালব দেবের পুত্র ও চিতোরপতি হামিরের শ্যালক। তিনি দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ খিলিজির পক্ষে তাঁহার পিতার ন্যায় ছিলেন। পরে মোহাম্মদ খিলিজির পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক হামিরের আনুগত্য স্বীকার করেন।

বনমাল—তিনি আসামের পরাক্রান্ত নরপতি হর্জ্জরের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম তারাদেবী। তিনি অতিশয় বলশালী নরপতি ছিলেন। দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র জয়মাল রাজা হন। তাঁহার রাজ্য বহু বিস্তৃত ছিল। খুব সম্ভব ৮০ খ্রীঃ অব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

বনমাল দেব—আসামের ভগদত্ত বংশীয় রাজা হজ্জরের পুত্র। তাঁহার পুত্র বীরবাহু। বীরবাহুর পুত্র বলবর্ম্মা।

বনমালী— এই জ্যোতিষী পণ্ডিত 'ভাস্বতীতত্ত্ব প্রকাশিকা' নামক একখানা করণ গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি ১৫৪০ শকে (১৬১৮ খ্রীঃ অব্দে) 'স্ফুটচন্দ্রার্কী' নামে একখানা করণ গ্রন্থ রচনা করেন।

বনমালী আচার্য্য—তিনি 'রহস্যার্ণব' নামক তান্ত্রিক নিবন্ধ গ্রন্থ ত্রিগর্ত্তের রাজার আদেশে রচনা করিয়াছিলেন।

বনমালী ওঝা—বাঙ্গালা রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পিতার নাম বনমালী ওঝা ও মাতার নাম মালিনী।

বনমালীকর— শ্রীহট্টের অন্তর্গত ভাটেরা নামক স্থানের প্রাচীনকালের চন্দ্রবংশীয় নরপতি ঈশানদেবের তিনি মন্ত্রী ছিলেন।

বনমালী ঠাকুর—ত্রিপুরাধিপতি উদয় মাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র বনমালী ঠাকুরকে লক্ষ্মণমাণিক্য উপাধি প্রদানপূর্ব্বক, সমসের গাজী উদয়পুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণমাণিক্য দেখ।

বনমালী মিশ্র—একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। ১৫৪৯ শকে (১৬২৭ খ্রীঃ অব্দ) তিনি "জ্যোতিষসার মঞ্জুরী" নামক জাতক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বনমালী রায়—পাবনা জেলার তরাশের একজন খ্যাতনামা ও দানশীল জমিদার। ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জমিদার বনওয়ারীলালের প্রথমা স্ত্রী কৃষ্ণপ্যারী বনমালী রায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। বনমালী রায় পাবনা জেলা স্কুলে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎপর ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে বনওয়ারীলালের মৃত্যুর পর তিনি বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। স্বীয় প্রতিভা বলে অচিরকাল মধ্যেই তিনি জমিদারীর সুব্যবস্থা করিয়া আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে ও প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। পাবনার এডওয়ার্ড কলেজ, টমসন হল, ইলিয়ট শিল্প বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জের বি-এল স্কুল গৃহ, দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার, শ্যামসুন্দর পঙ্কোদ্ধার, জগন্নাথ দেবের মন্দির সংস্কার এবং অন্যান্য সাধারণ হিতকর কার্য্যেও তিনি বহু অর্থ দান করিতেন। এতদ্ব্যতীত বিদ্যালয়ে, সংস্কৃত চতুষ্পাঠিতে, দাতব্য হাসপাতালে বার্ষিক ও মাসিক সাহায্য করিতেন। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে এই সব মহৎ কার্য্যের প্রশংসা স্বরূপ সরকার কর্ত্তৃক তিনি 'রায়বাহাদুর' উপাধি ভূষিত হন। তিনি গৌরাঙ্গদেবের ভক্ত ছিলেন এবং নবদ্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহাকে 'রাজর্ষি' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দ হইতে তিনি মথুরার অন্তর্গত রাধাকুণ্ড নামক স্থানে যাইয়া বাস করেন এবং তথায় একটী বৃহৎ বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শেষ জীবন তিনি বৃন্দাবন ধামে ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও অতিথি সেবায় অতিবাহিত করেন। ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দের ২৩শে নবেম্বর এই সুপ্রসিদ্ধ দানশীল জমিদার বৃন্দাবনধামে পরলোক গমন করেন। ১৯১২ খ্রীঃ অব্দে তিনি পাবনার এডওয়ার্ড কলেজে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন। বার্ষিক প্রায় ষাট হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি কুলদেবতার সেবার জন্য দেবোত্তর বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি পাবনা জেলার একজন শ্রেষ্ঠ জমিদার ও বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের জননায়ক ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশভূষণ রায় ও শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় নামে দুই পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া গিয়াছিলেন।

বনমালী সরকার—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। তাঁহাদের আদি নিবাস হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বরে ছিল। তাঁহার পিতা আত্মারাম সরকার ভদ্রেশ্বর হইতে কলিকাতার কুমারটুলিতে আসিয়া বাস করেন। আত্মারামের রাধাকৃষ্ণ ও হরেকৃষ্ণ নামে আরও দুই পুত্র ছিলেন। বনমালী পাটনার কমার্শিয়াল রেসিডেণ্টের দেওয়ান এবং কিছুকাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতার ডেপুটি ট্রেডার (Deputy Trader) ছিলেন। ব্যবসায়াদি কার্যো তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার কুমারটুলির বাড়ী সেকালে কলিকাতার একটী দর্শনীয় বস্তু ছিল। উহা ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা আক্রমণের অনেক পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বনলতা দেবী—একজন বাঙ্গালী সাহিত্যিক, কবি ও 'অন্তঃপুর' নামক তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা। তিনি কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী বরাহনগর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা। ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ৬ই পৌষ (২০শে ডিসেম্বর, ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দ) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারই সুযোগ্য ভ্রাতা স্যার আলবিয়ন রাজকুমার বানার্জ্জি। বনলতা দেবী বাড়ীতে বি-এ ক্লাশের পাঠোপযোগী ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বেই তিনি 'সুমতি সমিতি' নামে একটী প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতৃদেব প্রতিষ্ঠিত 'বিধবা আশ্রম' এবং বালিকা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। ষোল বৎসর অতিক্রম করিবার পর সতর বৎসর বয়সে ত্রিপুরা জেলার বিদ্যাকুট নিবাসী সম্ভ্রান্ত বশিষ্ঠ বংশজ এবং এই গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের সহিত তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় এণ্ট্রান্স পাশ করিবার পর কলেজে অধ্যয়ন করিবার জন্য কলিকাতা আগমন করেন। সেই সময়েই বিবাহ হয়। সমাজ সংস্কার, দেশে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি কার্যো বিদ্যালঙ্কার মহাশয় পাঠ্যাবস্থা হইতেই বিশেষ অনুরাগী। বিবাহের পর হইতেই বনলতা দেবী তাঁহার সকল কার্য্যের সহায়তা করিতে লাগিলেন। তৎপর তাঁহারা পরামর্শ করিয়া 'অন্তঃপুর' নামে একটী মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকার বিশেষত্ব এই ছিল যে, সম্পাদিকা যেমন মহিলা ইহার লেখকাও সকলেই মহিলা ছিলেন। কেবল মহিলাগণের লেখাই ইহাতে প্রকাশিত হইত। বঙ্গদেশে কেবল মহিলাগণ দ্বারা লিখিত পত্রিকা

ইতিপূর্ব্বে আর কখনও বাহির হয় নাই, বর্ত্তমানেও নাই। ইহার প্রত্যেক সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায়ই তাঁহার রচিত চারি লাইনের একটী কবিতা থাকিত। ঐ সকল কবিতা পাঠে তাঁহার উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যাইত।

ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের রাজ্যাভিষেক উৎসবে তিনি মনোরম এবং ভাবব্যঞ্জক একটী কবিতা রচনা করিয়া মহারাজকে উপহার দিয়াছিলেন। ঐ কবিতাটি তৎকালীন 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আর একবার 'ত্রিপুরা হিতসাধনী সভার' বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সম্পাদক মহাশয় একটী সঙ্গীত রচনা করিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তখন তিনি নিম্ন লিখিত সঙ্গীতটী রচনা করিয়া পাঠাইয়া দেন।

কথাতে শুধু হবে না।
চাই আত্ম বলিদান চাই সাধনা।
জীবন লভিতে চাও জীবন আহুতি দাও।
জাগিবে ভারতে তবে নব চেতনা।
হৃদয় শোণিত আর পুত অশ্রুধার।
ভাইরে মায়ের পদপূজা উপচার।
আপনি কাঁদিতে হবে, জগৎ কাঁদিবে তবে
মুছাতে মায়ের অশ্রু যদি বাসনা।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত 'বনজ' নামক কবিতা পুস্তক ও অন্যান্য আরও বহু খণ্ড কবিতা রহিয়াছে। অন্তঃপুর পত্রিকা যখন ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল, তখনই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। তৃতীয় বর্ষের শেষদিকেই ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ১৮ই কার্ত্তিক (৩রা নভেম্বর, ১৯০০ খ্রীঃ অব্দ) মধুপুরে মাত্র ২০ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার সাধের কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন; ভগবান তাঁহাকে সম্যক প্রতিভা বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই ইহজগৎ হইতে লইয়া গেলেন।

এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নানাভাবে উন্নত আদর্শের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বিবাহের কিছুকাল পরে দেশ হইতে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় তাঁহার কলিকাতার বাসায় আগমন করেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ব্রাহ্ম ছিলেন বলিয়া, তাঁহার জেঠামহাশয় পৃথক রান্না করিয়া আহার করিতেন। কিন্তু ঘর নিকান, বাসনপত্র ধোয়া প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য বনলতা দেবী স্বয়ং করিতেন, ঝি চাকরকে তাঁহার কোন কাজই করিতে দিতেন না। জেঠামহাশয়ের আহার না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি নিজেও কিছু খাইতেন না। তাঁহার সেবাপরায়ণতায় জেঠামহাশয় এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অবশেষে তাঁহাকে রন্ধনাদি কার্য্য করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তান

বাৎসল্য, পিতৃভক্তি, বন্ধুপ্রীতি ও স্বামী সেবার দৃষ্টান্ত আজকালকার দিনে দুর্লভ। বনলতা দেবী তৎকালীন নারী সমাজের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। অন্তঃপুর পত্রিকা তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। ইহা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

বনস্পর—মথুরার একজন শক ক্ষত্রপ। তাঁহার পিতার নাম খুব সম্ভব খরপল্লান। তাঁহারা মথুরার ক্ষত্রোপবংশোদ্ভব ছিলেন। একটী প্রাচীন খুদিত লিপি হইতে জানা যায় যে মহাক্ষত্রপ, খরপল্লান এবং বনস্পরকর্ত্তৃক ভিক্ষুবল ও পোষ্যবুদ্ধি নামক দুই বৌদ্ধ বোধিসত্ব মূর্ত্তি বারাণসীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বনাচার্য্য—তিনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। চন্দ্রাভরণ নামক জাতক গ্রন্থ তাঁহার রচিত একটী টীকা।

বনাট—তিনি মিথিলার (বর্ত্তমান দ্বারবঙ্গ) অন্ধ্রবংশীয় শেষ নরপতি। মধুবাণী মহকুমার বনাটপুর নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। অনুমান ৯০ খ্রীঃ অব্দে কুষানবংশীয় বীরহবিষ্কের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল।

বনারসি দাস—একজন হিন্দী কবি। তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। তিনি দিল্লীর সম্রাট শাহজাহান পাতশাহের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

বনিজ মোহাম্মদ—একজন প্রাচীন বাঙ্গালী মুসলমান কবি। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'ইমাম সাগর'।

বনোয়ারী দাস— দাদূপন্থীর অন্তর্গত 'উত্রাদীশ' নামে একটী শাখা সম্প্রদায় আছে। পঞ্জাববাসী বনোয়ারী দাস তাহার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহাদের অনেকে বড় বড় পণ্ডিত এবং কেহ কেহ চিকিৎসা ব্যবসায়ও করেন। কিন্তু সকলেই সন্ন্যাসী।

বনোয়ারীলাল গোস্বামী—পাবনা জিলার হাপাসিয়া গ্রামের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি মোক্তারী পরীক্ষা পাশ করিয়া আইনের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে 'সাধক চিন্তামৃত' ও 'নরোত্তম আশ্রয় নির্ণয়' উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল এবং সে বিষয়ে তাঁহার বহু প্রবন্ধ বিবিধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী বন্ধু লইয়া, তিনি একটি সাহিত্য সমিতি ও সাংবাদিক সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল মুর্শিদাবাদ জিলার বহরমপুর সহরে। 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকাল হইতে সুদীর্ঘ ৪৫ বৎসর তিনি তাঁহার একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন।

বহরমপুরের বহু জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত তিনি সংযুক্ত ছিলেন।

তিনি ২১ বৎসর বহরমপুর পুরতন্ত্রের সদস্য ছিলেন। কবি বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতা লিখিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার রচিত কয়েকখানি কবিতা গ্রন্থ আছে।

তিনি ৩৬ বৎসর বয়সে বিপত্নীক হন এবং পরে আর বিবাহ করেন নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৮ বৎসর বয়স হইয়াছিল। পুত্র, পৌত্র ও পৌত্রীদিগকে রাখিয়া তিনি ১৩৪৫ সালের বৈশাখ মাসে পরলোকবাসী হইয়াছেন।

বনোয়ারীলাল চৌধুরী—ময়মনসিংহ জেলার সেরপুরের অন্যতম ভূস্বামী ও প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পরিষদের প্রতি তাঁহার এমন প্রবল অনুরাগ ছিল যে, শত প্রয়োজনীয় কার্য্য স্থগিত রাখিয়াও তিনি সাহিত্য পরিষদের প্রত্যেক সভায় উপস্থিত থাকিতেন। তিনি সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি এবং 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। তিনি এমন অমায়িক, নিরহঙ্কার এবং সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন যে, তিনি যে এত বড় বিলাত প্রত্যাগত পণ্ডিত, বড় জমিদার এবং উচ্চ শ্রেণীর বিজ্ঞানবিদ্ ছিলেন, তাঁহার ব্যবহারে তাহা জানা যাইত না। ১৯৩১ খ্রীঃ ৪ঠা মার্চ্চ কলিকাতা বালিগঞ্জস্থিত নিজ বাসভবনে সহসা হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি পরলোক গমন করেন।

বন্দীমিশ্র— একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত। তাঁহার পিতার নাম জগদীশ মিশ্র। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—'যোগসুধানিধি'; তাঁহার গ্রন্থের মাত্র পশু চিকিৎসা প্রকরণটী পাওয়া গিয়াছে।

বন্ধুবর্ম্মা— পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরবর্ম্মার পৌত্র বিশ্ববর্ম্মার পুত্র বন্ধুবর্ম্মা ৪৯৩ বিক্রমাব্দে (৪৩৭ খ্রীঃ অব্দ) মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমার গুপ্তের রাজ্যকালে মালব দেশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। সেই সময়ে পৃথিবীসেন কুমার গুপ্তের মন্ত্রী, পরে প্রধান সেনাপতি ছিলেন। বন্ধুবর্ম্মা ৪৩৬—৪৭২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

বন্ধু মিত্র—তিনি একজন বিশিষ্ট সার্থবাহ (বণিক) ছিলেন। ৪৪৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। সেই সময়ে কুমার গুপ্তের রাজত্বকাল।

বন্ধুল—বৌদ্ধ যুগের মল্লদেশের একজন ক্ষত্রিয় বীর। তিনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের সমসাময়িক ছিলেন এবং উভয়ে একই সময়ে তক্ষশিলায় শিক্ষা লাভ করেন। প্রথমে তিনি প্রসেনজিতের সেনাপতি হইয়াছিলেন পরে তাঁহার বিবিধ সদ্গুণের পরিচয় পাইয়া রাজা তাঁহাকে রাজ্যের প্রধান ধর্ম্মাধিকরণ নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুকাল

পরে শত্রু পক্ষীয়দের পরামর্শে রাজা কৌশলে বন্ধুল ও তাঁহার পুত্রগণের প্রাণ সংহার করেন

বপ্প—বুদ্ধদেবের প্রথম শিষ্যবর্গের অন্যতম। বুদ্ধ দেখ।

বপ্‌পট—তিনি কাশ্মীররাজ কলসের (১০৭৩—৮৯ খ্রীঃঅব্দ) একজন বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। সামন্ত নরপতি রাজপুরীর অধিপতি সংগ্রাম পাল, তাঁহার পিতৃব্য মদন পাল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, রাজা কলস এই সামন্তরাজের সহায়তার জন্য বপ্‌পট সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। তিনি যুদ্ধে মদনপালকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বপ্‌পটা দেবী—তিনি কাশ্মীরের রাজা নির্জ্জিতবর্ম্মার (৯২০—১২১ খ্রীঃ অব্দ) অন্যতমা মহিষী। তাঁহারই গর্ভজাত পুত্র রাজা চক্রবর্ম্মা সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

বপ্পভট্টি—একজন জৈন কবি। তিনি খ্রীঃ ৭ম—৮ম শতকে জীবিত ছিলেন। তিনি 'সরস্বতী স্তোত্র' এবং চতুর্ব্বিংশতি জিন স্তুতি' নামক পুস্তক রচনা করেন শেষোক্তখানি সংস্কৃতে লিখিত।

বপ্পিকা দেবী—কাশ্মীরের অধিপতি কলসের (১০৭৩—৮৯ খ্রীঃ) অন্যতমা মহিষী। তাঁহার গর্ভজাত পুত্র হর্ষ পরে রাজা হইয়াছিলেন। হর্ষ দেখ।

বপ্যট—তিনি বঙ্গের পালবংশের স্থাপনকর্ত্তা গোপাল দেবের পিতা। তিনি অতিশয় রণনীতি কুশল ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি গুপ্ত বংশীয় মগধের রাজাদের সামন্ত নরপতি ছিলেন।

বয়ান—আগ্রার খাজা আসানউল্লা খাঁর কবিজন সুলভ উপাধি। ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১৬৪) তিনি দিল্লী নগরে বর্ত্তমান ছিলেন।

বয়েজিদ সুলতান—চট্টগ্রামের একজন মুসলমান সাধক। যে সমুদয় মুসলমান সাধক ধর্ম্ম প্রচারার্থে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। কথিত আছে তিনি খোরাসানের অন্তর্গত বোস্তাম নামক স্থানের রাজার পুত্র ছিলেন। রাজপদ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন এবং ক্রমে চট্টগ্রামে আগমন করেন। তিনি একটী মৃৎপাত্রে প্রদীপ জ্বালিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া রাখিতেন। চট্টগ্রামে মৃতপাত্রকে চাট বলে। কথিত আছে যে এই চাট শব্দ হইতেই চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

বরকতউল্লা সৈয়দ—তিনি সৈয়দ ওয়ারিসের পুত্র, মির আবদুল জলিলের পৌত্র ও বেলগ্রামের মির আবদুল ওয়াহিদ সহিদির প্রপৌত্র। তাঁহার কবিজন সুলভ নাম ইস্কি। আগ্রা জিলার মাহারা গ্রামে তাঁহার পিতামহের সমাধি ছিল। এই স্থানেই তিনি

জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করেন এবং ১৭১৯ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১৪২) তিনি পরলোক গমন করেন।

বরদগুরু আচার্য্য—খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি দেশিকের পুত্র নরনারায়নাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। তিনি অতিশয় তার্কিক ছিলেন বলিয়া তাঁহার অপর একটী নাম ছিল—প্রতিবাদী ভয়ঙ্করম্ অন্নন্। তিনি সত্তরটী শ্লোকে স্বীয় গুরুর পিতা দেশিকের প্রশংসাসূচক 'সপ্ততিরত্নমালিকা' নামক প্রশস্তি কাব্য রচনা করেন। তাঁহার রচিত 'তত্ত্বত্রয় চুলুক সংগ্রহ' নামক গ্রন্থ বেনারস সংস্কৃত সিরিজে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি স্বীয় গ্রন্থে রামানুজাচার্য্যের দার্শনিক মত সমর্থন করিয়াছেন।

বরদনায়ক সূরী—তিনি খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'চিদচিদীশ্বর তত্ত্ব-নিরূপণম'। তিনি স্বীয় গ্রন্থে রামানুজাচার্য্যের মতানুরূপ জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই।

বরদরাজ বা বরদাচার্য্য—(১) তিনি খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম বামদেব মিশ্র। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—'ন্যায় দীপিকা', 'তার্কিকরক্ষা' এবং ন্যায় কুসুমাঞ্জলীর 'বোধিনী' নাম্নী টীকা। তার্কিক রক্ষার উপর মল্লিনাথ 'নিষ্কণ্টক' নামে এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার সমুদয় অংশ এখন পাওয়া যায় না। বরদাচার্য্যের 'বসন্ততিলক' নামে একখানা ভাণ গ্রন্থও আছে।

বরদরাজ—একজন সংস্কৃত বৈয়াকরণ। তিনি ভট্টোজি দীক্ষিতের ছাত্র ছিলেন। সিদ্ধান্ত কৌমুদীকে অবলম্বন করিয়া তিনটি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ রচনা করেন। তাহাদের নাম লঘুকৌমুদী, মধ্যকৌমুদী ও সার কৌমুদী। প্রথমখানি নিতান্ত প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী। অপর দুইটি ক্রমান্বয়ে উচ্চতর শ্রেণীর পাঠোপযোগী।

বরদরাজ মিশ্র—তিনি উদয়নাচার্য্য। বিরচিত 'কুসুমাঞ্জলি বোধিনী' নামে এক টীকা রচনা করিয়াছেন।

বরদাকান্ত লাহিড়ী—পঞ্জাব প্রবাসী একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী। তিনি বাঁকুড়ানিবাসী ছিলেন। তিনি পঞ্জাবের নানাস্থানে বিশেষতঃ লাহোর প্রধান আদালতে (Chief Court) ও লুধিয়ানার জেলা আদালতে ব্যবহারজীবের কার্য্যে যশোলাভ করিয়াছিলেন তৎপর তিনি পঞ্জাবের অন্তর্গত ফরীদকোট শিখরাজ্যের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে তিনি স্বীয় কার্য্য-কুশলতা ও প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া অনন্যসাধারণ সম্মান ও গৌরবের

অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ, বিজ্ঞ ও বুদ্ধিসম্পন্ন, রাজনীতিজ্ঞ এবং ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি অধুনা বিরল। বার্দ্ধক্যেও তিনি অধিকাংশ সময়ই জ্ঞান চর্চ্চায় নিমগ্ন থাকিতেন। মন্ত্রীপদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তিনি বারাণসীধামে যাইয়া বাস করেন এবং তথায় ধর্ম্ম ও শাস্ত্রালোচনায় অতিবাহিত করেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ ব্যপদেশে তিনি পশ্চিমোত্তর প্রদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবের প্রধান প্রধান জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি পঞ্জাব থিওসফিকেল সোসাটির প্রাদেশিক সম্পাদক (Provincial Secretary) এবং ভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। খালসা কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে ফরীদকোটের রাজা পাঁচশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিদ্যোৎসাহী দেওয়ান বরদাকান্তের পরামর্শে তিনি পরে ঐ দান দেড় লক্ষ টাকায় পরিণত করিয়াছিলেন। বরদাকান্ত আজীবন পরহিতব্রতে প্রস্তুত ও মুক্তহস্ত ছিলেন। বার্দ্ধক্য বয়সে তিনি যেরূপ উৎসাহের সহিত সাহিত্য সেবা ও সনাতনধর্ম্ম সংরক্ষণে পরিশ্রম করিতেন তাহা সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিত।

বরদাচার্য্য--(১) একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। গ্রহরত্নমালিকা নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

বরদাচার্য্য—(২) তাঁহার অন্য নাম কার্পাসরাম। তাঁহার গৃহের পার্শ্বে কয়েকটী কার্পাস বৃক্ষ ছিল বলিয়া লোকে উপহাস করিয়া তাঁহাকে কার্পাসরাম বলিত। রামানুজের শিষ্য বরদাচার্য্য ও যজ্ঞেশ এক গ্রামবাসী ছিলেন। যজ্ঞেশ ধনী ও বরদাচার্য্য অতি গরীব ছিলেন। একবার রামানুজ শ্রীশৈলে যাইবার পথে অষ্ট সহস্র গ্রামে এই শিষ্যদ্বয়কে দেখিতে অভিলাষী হইলেন। প্রথমে যজ্ঞেশের বাড়ীতে সংবাদ দিতে দুইটী বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিলেন। যজ্ঞেশ প্রেরিত বৈষ্ণব দুইটীর প্রতি উচিতমত সমাদর না করায়,তিনি নিঃস্ব শিষ্য বরদাচার্য্যের আলয়েই উপস্থিত হইলেন। বরদাচার্য্য সেই সময় ভিক্ষা করিতে বাহিরে গিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী স্নানান্তে একখণ্ড ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া স্বীয় বস্ত্র রৌদ্রে শুষ্ক করিবার জন্য দিয়াছিলেন। রামানুজ অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা জানাইলে আচার্য্য পত্নী হাততালি দিয়া উত্তর দিয়াছিলেন। রামানুজ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া স্বীয় উত্তরীয় গৃহে ফেলিয়া দিলেন। আচার্য্য পত্নী লক্ষ্মী দেবী সেই বস্ত্র পরিধান করিয়া গুরুকে আসিয়া প্রণাম করিলেন এবং উপদেশন

করিতে আসন দিলেন। গৃহে কিছুমাত্র তণ্ডুল নাই, কি করিয়া গুরুর পরিচর্য্যা করিবেন। অবশেষে এক উপায় স্থির করিলেন। অতিশয় সুন্দরী ছিলেন বলিয়া প্রতিবেশী এক ধনাঢ্য বণিক তাঁহাকে হস্তগত করিবার জন্য বার বার চেষ্টা করিয়াও বিফলকাম হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া তদর্থে গুরু পরিচর্য্যা করিতে অভিলাষী হইলেন। তিনি বণিক ভবনে গমনপূর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবামাত্র, পাষণ্ড বণিক অতিমাত্র উৎফুল্ল হইয়া প্রচুর খাদ্য দ্রব্যাদি আচার্য্য ভবনে প্রেরণ করিলেন। লক্ষ্মী দেবী তদ্দ্বারা নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত করিলেন। ইতিমধ্যে বরদাচার্য্য ভিক্ষা করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। গৃহিণী যে উপায়ে গুরু সেবা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন লক্ষ্মীদেবী আদ্যোপান্ত সকল বিষয় স্বামীকে বলিলেন। স্বামী শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। গুরুর আহারাদির পর লক্ষ্মীদেবী প্রসাদ লইয়া বণিক ভবনে গমন করিলেন। ইতিমধ্যে বণিকের মনে এই ঘৃণিত ব্যবহারের কথা উদয় হইয়া অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। লক্ষ্মীদেবী গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার পদতলে পড়িয়া পূর্ব্বকৃত ঘৃণিত প্রস্তাবের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাঁহাকে মাতা বলিয়া পরে তাঁহাদের শিষ্য হইয়াছিলেন

বরদাচার্য্য বা নড়াডুরম্মল – খ্রীষ্ট ত্রয়োদশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্টা দ্বৈতবাদী ও ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণেতা। এই বরদাচার্য্য, সুদর্শনাচার্য্যের গুরু এবং রামানুজাচার্য্যের ভাগিনেয় ও শিষ্য বরদাচার্য্যের (বরদগুরুর) পৌত্র ও শিষ্য। বরদাচার্য্য স্বীয় গ্রন্থদ্বয়ের সমাপ্তিতে আপনাকে রামানুজাচার্য্যের ভাগিনেয় পৌত্র অর্থাৎ বরদগুরুর পৌত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'তত্ত্বসার' ও 'সারার্থচতুষ্টয়ম্' গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। তত্ত্বসার পদ্যে লিখিত। এই গ্রন্থে উপনিষদের ধর্ম্ম ও দার্শনিক মতের সারাংশ প্রদত্ত হইয়াছে। সারার্থচতুষ্টয় বিশিষ্টা দ্বৈতবাদের গ্রন্থ। ইহাতে চারিটী পরিচ্ছেদ এবং চারিটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে স্বরূপ জ্ঞান, দ্বিতীয়—বিরোধীজ্ঞান, তৃতীয়—শেষত্বজ্ঞান এবং চতুর্থ—ফলজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে। তিনি রামানুজের ন্যায় জ্ঞানের সবিকল্পত্ব স্বীকার করিয়াছেন; নির্ব্বিকল্পজ্ঞান স্বীকার করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থদ্বয় এখনও বোধ হয় অপ্রকাশিত রহিয়াছে।

বরদাদাস মিত্র—কাশীবাসী একজন খ্যাতনামা ও দানশীল বাঙ্গালী জমিদার। তিনি কলিকাতার কুমারটুলির মিত্রবংশোদ্ভব। তাঁহার পিতামহ আনন্দময় মিত্র পারিবারিক অশান্তি হেতু কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া

কাশীবাসী হন এবং কাশীর চৌখাম্বা নামক স্থানে স্থায়ী বাস স্থাপন করেন। বরদাদাসের পিতা রাজেন্দ্রনাথ মিত্র অতিশয় মহানুভব ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বদান্যতার জন্য রাজা বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। গুরুদাস মিত্র ও বরদাদাস মিত্র তাঁহারা দুই সহোদর ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকারকে প্রভূত সাহায্য করিয়া স্বতন্ত্র খিলাৎ প্রাপ্ত হন।

বরদাদাস মিত্র কাশীর অন্ধ ও কুষ্ঠাশ্রমের লোকদিগের বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব মোচনার্থ একটী কূপ খননের জন্য ছয় হাজার টাকা, বারাণসী চক্ষু চিকিৎসালয়ের সংরক্ষনার্থ পাঁচ হাজার টাকা এবং স্থানীয় য়ুরোপীয়দিগের জন্য হাঁসপাতাল স্থাপনার্থে তিন হাজার ছয় শত টাকা, দান করেন। এতদ্ব্যতীত উভয় ভ্রাতাই এলাহাবাদ কলেজের জন্য সহস্র টাকা প্রিন্স অব-ওয়েলসএর ভারতাগমনের স্মারক অনুষ্ঠানের জন্য ছয় হাজার টাকা ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দের মন্বন্তরে রাজসাহী দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে পাঁচশত টাকা, ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দের দারিদ্র ভাণ্ডারে এক হাজার টাকা এবং আরও অন্যান্য বহু অনুষ্ঠানে অনেক অর্থ দান করিয়াছিলেন। বঙ্গের রাজসাহী জিলায় এবং পশ্চিমের বারাণসী জেলায় তাঁহাদের বিস্তৃত জমিদারী আছে। বরদাদাস মিত্রের পুত্র রায় প্রমদাদাস মিত্র বাহাদুরও একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন।

বরদাপ্রসন্ন সোম—একজন সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী। ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে হুগলী চুঁচুড়ার জমিদার বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা দুর্গাচরণ একজন রাজকর্ম্মচারী ছিলেন এবং দানধর্ম্মে অর্থাদি ব্যয় করিতেন।

প্রথমত হুগলী কলেজে বরদাপ্রসন্নের বিদ্যারম্ভ হয়। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তৎপর কলিকাতা ফ্রীচার্চ্চ ইনষ্টিটিউশন (Free Church Institution) হইতে ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে বি এ এবং ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি সরকারী কার্য্যে মুন্সেফ পদে নিযুক্ত হন। তিনি যখন কুমিল্লার প্রথম মুন্সেফরূপে কার্য্য করিতেছিলেন, তখন সরকারী কোন কার্য্যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি উদ্যমশীল ও স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। ক্রমে সবজজ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই পদে কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়া ১৯০১ খ্রীঃ অব্দে মেদিনীপুর হইতে তিনি অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। তিনি সাহিত্যানুরাগীও ছিলেন। 'গয়া ও গয়ালী' নামক একখানি বাংলা গ্রন্থ

এবং রিলিফ এ্যাক্ট (Realief Act) নামক একখানি ইংরেজি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তাঁহার রিলিফ এক্ট গ্রন্থখানার সমালোচনা করিয়া তৎকালীন হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৯০৩ খ্রীঃঅব্দে ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিনি একখানি সম্মানপত্র (Certificate) প্রাপ্ত হন। তিনি পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে ভট্টপল্লী গ্রামে একটী পাকা বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ একটী ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি পত্নীর স্মৃতি রক্ষার্থে চুচুঁড়ার ইমামবারা হাসপাতালে পাঁচশত টাকা দান করেন। ঐ টাকাদ্বারা সাধারণ রোগীদের জন্য ইমামবারা হাসপাতালে একটী নূতন বিভাগ নির্ম্মিত হইয়াছে। তিনি আরও ২৫০ টাকা হাসপাতালে নূতন অস্ত্র চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য দান করিয়াছিলেন। এই সকল সৎকার্য্যাদির জন্য তিনি ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে সরকারকর্ত্তৃক 'রায় বাহাদুর' উপাধি ভূষিত হন। ১৯১২ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না।

বরদেব—ইনি পুঞ্জের পুত্র এবং পদারতের পৌত্র। ইহাঁর অগ্রজ ভ্রাতা বৃত্তিস্বরূপ ইহাকে বারাণসীতে ৩৮৪খানি গ্রাম অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে মনোযোগ না করিয়া কীর্ত্তি স্থাপনের জন্য পারুকপুর নামে একটী নগর স্থাপন করেন। বরদেবের বংশধরগণ পারুক কামধ্বজ নামে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

বররঙ্গ—খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের শ্রীরঙ্গম মঠে যমুনাচার্য্য নামে একজন পরম জ্ঞানী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ভক্ত ছিলেন বররঙ্গ, মহাপূর্ণ, কাঞ্চীপূর্ণ, গোষ্ঠিপূর্ণ ও মালাধর নামে তাঁহার প্রধান পাঁচজন শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের সকলকেই রামানুজাচার্য্যকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। "গন্থত্রয়" নামক মহাগ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

বররুচি—(১) একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার। বরাহ মিহির কৃত বৃহৎ সংহিতার টীকা উৎপল ভট্ট করিয়াছেন। সেই টীকায় তিনি বররুচির শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। ভার্গব মুহূর্ত্ত নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত। তিনি ১৪১৩ শকে (১৪৯১ খ্রীঃ অব্দে) বাক্যগণিত করণগ্রন্থ রচনা করেন।

বররুচি—(২) কাতন্ত্রের প্রথম টীকাকার। উহার নাম দুর্ঘট বৃত্তি। কবিরাজের মতে কাত্যায়ণ ও বররুচী অভিন্ন।

বরাহ মিহির—(১) উজ্জয়িনী নগরের অধিপতি মহারাজ শকারি বিক্রমাদিত্যের সভায় খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে প্রথম বরাহ মিহির বর্তমান ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম বরাহ। তিনিই বৃহৎ সংহিতা প্রণয়ন করেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম খনা বলিয়া বঙ্গদেশে প্রবাদ আছে। কিন্তু ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

বরাহ মিহির—(২) প্রথম খ্রীঃ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বর্তমান ছিলেন। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামক প্রাচীন গ্রন্থের তিনি একটী সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহার বিষয়ে আর অধিক কিছু জানা যায় না।

বরাহ মিহির—(৩) তিনি খ্রীঃ তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। তিনি বৃহৎ সংহিতার সংস্কার সাধন করেন। এতদ্ব্যতীত ইহার আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

বরাহ মিহির—(৪) তিনি মগধের কাম্পিল্ল নগরে (বর্তমান জলৌন জিলার কাম্পী নগর) ৫০৫ খ্রীঃ অব্দে (১২৭ শক) জন্মগ্রহণ করেন। ৫৮৭ খ্রীঃ অব্দে (৫০৯ শক) ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পিতা আদিত্য দাসও একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। বরাহ মিহির স্বীয় পিতার নিকটেই জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হুণরাজ তোরামাণের পুত্র মিহিরকুলকে, যশোধর্ম্মা ৫২৮ খ্রীঃ অব্দে পরাজয় করিয়া উজ্জয়িনী নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার কিছুকাল পরেই বরাহ মিহির উজ্জয়িনী নগরে গমন করেন। তিনি অবন্তীপতি যশোধর্ম্মা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন। তিনি আর্য্যভটের কিছু পরেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। আর্য্যভট উদ্ভাবয়িতা ও তিনি সঙ্কলয়িতা ছিলেন। কিন্তু এই সঙ্কলন কার্য্যেও, তিনি যে জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার রচিত প্রধান গ্রন্থ 'বৃহজ্জাতক'। তিনি ব্রাহ্ম, বশিষ্ঠ, রোমক, পৌলিশ ও সৌর এই পাঁচখানি সংহিতা হইতে তাঁহার 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন এতদ্ব্যতীত লঘু সংহিতা (সমাস সংহিতা) বৃহৎ সংহিতা, লঘুজাতক নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলিও তাঁহার রচিত। ৫৭৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি যোগযাত্রা ও বিবাহ পটল নামক হোরা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পুত্র পৃথুযশাও একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত 'ষট পঞ্চাশিকা' প্রশ্ন গনণা বিষয়ক ফল গ্রন্থ।

বরুণ বিষ্ণু—তিনি মালব দেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ইন্দ্রবিষ্ণু ও পুত্রের নাম হরিবিষ্ণু। তিনি খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাবে বর্তমান ছিলেন।

বরুণ ভট্ট—তিনি একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। তিনি ব্রহ্মগুপ্তের খণ্ড খাদ্যের একখানা অতি উৎকৃষ্ট টীকা লিখিয়াছেন। তিনি ১০৪০ খ্রীঃ অব্দে উত্তর গুর্জ্জর প্রদেশের রাজধানী ভিলমল নগরে বর্ত্তমান ছিলেন। বরুণের আর কোন গ্রন্থের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বরেন্দ্রনাথ দত্ত—বিদেশ প্রবাসী একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী শিক্ষাব্রতী। তিনি কর্ম্মোপলক্ষে মুঙ্গের, দ্বারভাঙ্গা, এলাহাবাদ, নেপাল, মধ্যপ্রদেশস্থ সাগর প্রভৃতি নানা স্থান প্রবাসী হইলেও যে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহার সুনাম তাহা তিনি আগ্রাতেই অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বালীর বিখ্যাত দত্তবংশে ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সেই পিতার সহিত মুঙ্গের ও আগ্রা প্রবাসী হন। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি আগ্রা কলেজে ভর্ত্তি হন এবং এখানেই এম্-এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। সকল পরীক্ষায়ই তিনি অতিশয় কৃতীত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া এম্-এ পরীক্ষায় প্রথমবার অকৃতকার্য্য হন। দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া ঐ বিষয়েই তিনি পরীক্ষা দিয়া পুনরায় এম্-এ পাশ করেন। তিনি অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির সভ্য ও সোসাইটি অব লিটেরেচার সভার সদস্য মনোনীত হন। শেষোক্ত সভায় জগতের সাহিত্য-ধুরন্ধরগণের মধ্যে বিশিষ্টগণই স্থানলাভ করেন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে তাঁহার পূর্ব্বে স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত ব্যতীত আর কেহই এই সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই।

এলাহাবাদে অবস্থানকালে ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে প্লেগ রোগে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বরেন্দ্র সেন—বঙ্গের অন্যতম স্বাধীন ক্ষত্রিয় সেন বংশীয় নরপতি শুকদেব সেনের পুত্র প্রদ্যুম্ন সেন ও বরেন্দ্র সেন। তাঁহারা আদিশূরের দৌহিত্র ছিলেন। এই বরেন্দ্র সেনের নাম অনুসারেই বরেন্দ্র ভূমির নাম হইয়াছে।

বর্ণট—কাশ্মীরের শৌণ্ডিকবংশীয় রাজা শঙ্করবর্ম্মার প্রধান মন্ত্রীর কোষাধ্যক্ষ প্রভাকর দেবের বামদেব নামে এক পিতৃব্য ছিলেন। বর্ণট সেই বামদেবের পুত্র। প্রভাকর দেবের পুত্র যশস্কর মৃত্যুর পূর্ব্বে এই বর্ণটকে রাজপদ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ছয়দিন রাজত্ব করিয়াই তিনি রাজ্যচ্যুত হন।

বর্দ্ধন— বঙ্গের সেনবংশীয় নরপতি বিজয় সেন, কামরূপ ও কলিঙ্গ বিজয়ের পরে নান্য, বীর, রাঘব ও বর্দ্ধন নামে নরপতিদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বর্দ্ধন কোন্ দেশের রাজা তাহা এখনও নির্ণিত হয় নাই।

বৰ্দ্ধমান—(১) শেষ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের প্রকৃত নাম বর্দ্ধমান। মহাবীর দেখ।

বৰ্দ্ধমান—(২) একজন জৈন গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত 'আচার দিনকর' জৈনদের 'নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি' শ্রেণীর গ্রন্থ।

বৰ্দ্ধমান—(৩) তিনি একজন দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি ন্যায় সূত্রের 'ন্যায়নিবন্ধ প্রকাশ' নামে এক টীকা রচনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ খ্রীঃ পঞ্চদশ শতকে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

বৰ্দ্ধমান উপাধ্যায়—(১) মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পুত্র। তিনি খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর একজন বড় দার্শনিক পণ্ডিত। নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করে (১) তত্ত্ব চিন্তামণির 'তত্ত্বচিন্তামণি প্রকাশ' নামক টীকা। (২) ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধির 'ন্যায়নিবন্ধ প্রকাশ' নামক টীকা। (৩) উদয়নাচার্য্যের ন্যায় পরিশিষ্টের 'ন্যায় পরিশিষ্ট প্রকাশ' নামক টীকা। (৪) প্রমেয় নিবন্ধ প্রকাশ। (৫) কিরণাবলীর টীকা 'কিরণাবলী প্রকাশ'। (৬) কুসুমাঞ্জলীর টীকা ন্যায় কুসুমাঞ্জলী প্রকাশ। (৭) ন্যায় লীলাবতী প্রকাশ। (৮) খণ্ডন খণ্ড প্রকাশ। মাধবাচার্য্য তাঁহার সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের নাম অতি শ্রদ্ধা সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন। 'দণ্ড বিবেক' নামে একখানা স্মৃতি শাস্ত্রের গ্রন্থও তাঁহার রচিত। ইহা বরদা নগর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

বৰ্দ্ধমান উপাধ্যায়—(২) তিনি ১১৪০ খ্রীঃ অব্দে 'গনরত্ন মহোদধি' নামক ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বৰ্দ্ধমান ভট্টারক—একজন জৈন দার্শনিক আচার্য্য। তাঁহার শিষ্য ধর্ম্ম ভূষণ খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

বৰ্দ্ধমান সূরী—(১) একজন জৈন আচার্য্য। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'আচার দিনকর'।

বৰ্দ্ধমান সূরী—(২) অভয় দেব সূরীর শিষ্য বর্দ্ধমান সূরী শকুন রত্নাবলী নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

বর্ষপণ্ডিত—একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ। সুপ্রসিদ্ধ পাণিনি তাঁহারই নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

বল—তিনি মারবার রাজা রণমল্লের চতুর্বিংশতি পুত্রের অন্যতম। তিনি ধুনার নামক স্থান ভূমি বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা বলাবৎ গোত্রীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

বলগুপ্তা—উরুবিল্ব গ্রামবাসিনা জনৈকা মহিলা। বুদ্ধের ষড় বর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যার সময়ে বলগুপ্তা, গ্রামের অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন এবং কিছু খাদ্যদ্রব্য দিতেন।

বলতি—তাঁহার অন্য নাম যোধাবাঈ। তিনি রাজা উদয়সিংহ রাঠোরের কন্যা। দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহারই গর্ভে সম্রাট শাহজাহান জন্মগ্রহণ করেন। ১৬১৯ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০২৮) তাঁহার মৃত্যু হয়।

বলদেব পালিত—বাঙ্গালী কবি। তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ পালিত ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দে, আফগান যুদ্ধে কর্ম্মচারীরূপে গমন করেন। সেই যুদ্ধেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় রাজসরকার হইতে নাবালক বলদেবের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। দানাপুরের ইংরেজি বিদ্যালয়েই প্রধানতঃ তাঁহার শিক্ষা লাভ হয়। পাঠ্যজীবন সমাপন করিয়া তিনি দানাপুরেই সরকারী আপিসে (Pension Pay Office) চাকুরী পান। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে যে সকল সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বৃত্তি রহিত হয়, বলদেব অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের অনেকের বৃত্তি পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

বিদ্যালয়ে বলদেব যে সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি গভীর অধ্যবসায়ের সহিত ইংরেজি সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে ঐ সকল বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করেন।

কাব্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং পত্রিকাদিতে প্রকাশিত কবিতার মারফত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, সুপণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত তাঁহার বন্ধুতা স্থাপিত হয়। তিনি ভর্ত্তৃহরি কাব্য, কর্ণার্জ্জুন কাব্য, কাব্য মঞ্জরী প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচনার বিশেষত্ব ছিল এই যে তিনি বাংলা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কর্ণার্জ্জুন কাব্য কিছুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ উপাধি পরীক্ষায় মহিলা শিক্ষার্থিনীদের অন্যতম পাঠ্য ছিল। স্ব-রচিত গ্রন্থগুলির ভূমিকা পাঠে তাঁহার নানাবিষয়ে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

শেষ জীবনে তিনি বাঁকীপুরে অবস্থান করিতেন। বিহারের নানা স্থানে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনে তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাটনা প্রবাসী বাঙ্গালী জনহিতব্রতী গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের সহযোগীতায় তিনি নানা জনহিতকর কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

নিরহঙ্কার, দানশীল, পূতচরিত্র কবি বলদেব ১৯০০ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে (পৌষ ১৩০৭ বঙ্গাব্দ) পয়ষটি বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

বলদেব বিদ্যাভূষণ—বিখ্যাত বৈষ্ণব দার্শনিক পণ্ডিত। জয়পুর ও কেরৌলী রাজ্যের কুলদেবতার মন্দিরের গোস্বামী বংশানুক্রমে বাঙ্গালীরাই হইয়া থাকেন। ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া শঙ্কর সম্প্রদায়ের

সন্ন্যাসীগণ জয়পুরপতিকে বলেন যে শঙ্করের শারীরিক ভাষ্য ব্যতীত রামানুজ মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণু স্বামী ও নিম্বাদিত্য এই সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের চারিখানি বেদান্ত ভাষ্য আছে। কিন্তু চৈতন্য সম্প্রদায়ের তাহা নাই। সুতরাং চৈতন্যদেবের মত অসম্প্রদায়ী। সেই হেতু অসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ গোবিন্দজীর সেবাধিকারী হইতে পারে না। জয়পুরপতি এই অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণয়ার্থ এক মহাসভার আয়োজন করেন সেই সভায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে বৈষ্ণব দর্শন ও ভক্তিশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলদেব বিদ্যাভূষণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সহিত বিচারে প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। তখন তাঁহারা বলদেব বিদ্যাভূষণকে পরাজয় স্বীকার করাইবার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা বলদেবকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভাষ্য দেখাইতে বলিলেন। বলদেব তাহাতে সম্মত হইয়া অসাধারণ প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের বলে সম্পূর্ণ নূতন ভাষ্য সত্বর রচনা করিয়া যথাসময়ে প্রকাশ্য সভায় জয়পুরাধিপতি ও পণ্ডিত মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করেন।

বলন্ধ—তিনি পাঞ্জাবের অধিপতি রাজা শালিবাহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শালিবাহন বলন্ধকে গজনি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে বলন্ধ স্বীয় পাঞ্জাব রাজ্যে আগমনপূর্ব্বক নিজ পৌত্র চাকিতকে গজনীর সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছিলেন। বলন্ধের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ভট্টি শালিবাহনপুরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

বলবন্ত সিংহ—মধ্য ভারতবর্ষে ভরতপুর নামে একটী ছোট রাজ্য আছে। জাঠবংশীয় ভরতপুরের রাজা বলদেব সিংহের মৃত্যুর পরে, তাঁহার নাবালক পুত্র বলবন্তসিংহ রাজপদ লাভ করেন। কিন্তু বলদেব সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র দুর্জ্জনশাল বলপূর্ব্বক বলবন্ত সিংহকে অপসারিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে একবার ভরতপুর দুর্গ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিতে পারেন নাই এবং হতমান হন। এইবার সেই প্রতিপত্তি উদ্ধার করিবার সুযোগ উপস্থিত হওয়ায়, ইংরেজ সরকার বলবন্ত সিংহের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ভরতপুর আক্রমণ করিয়া জয় করেন। দুর্জ্জনশাল বিতাড়িত হন। বলবন্ত সিংহ পুন সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন।

বলবর্ম্মা—(১) তিনি আসামের নরপতি বীরবাহুর (অন্য নাম জয়মাল বর্ম্মা) পুত্র। তাঁহার মাতার নাম অম্বা। তাঁহার প্রদত্ত একখানা তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি ৮৮৪খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। এক শতাব্দীরও অধিক কাল পরে ত্যাগ সিংহ নামে

এই বংশের একজন নরপতি অনপত্যাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে, জনসাধারণ পালবংশীয় ব্রহ্মপালকে তাঁহাদের রাজা বলিয়া বরণ করিয়া লয়। ত্যাগ সিংহ সম্ভবতঃ ৯৯০ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

বলবর্ম্মা—(২) তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরের অধিপতি শ্রীহর্ষ বর্ম্মার পুত্র। সম্ভবতঃ তিনি ৭৫০—৭৮৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। শালবর্ম্মা দেখ।

বলবর্ম্মা—(৩) প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের নরপতি পুষ্যবর্ম্মারবংশীয় সমুদ্রবর্ম্মার পুত্র পিতার মৃত্যুর পরে বলবর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার মহিষীর নাম রত্নবতী দেবী। তাঁহার পরে তৎপুত্র কল্যাণবর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন। পুষ্যবর্ম্মা দেখ।

বলবাদর—তিনি রাজপুতানার অন্তর্গত খীচি নামক স্থানের অধিপতি। কোটা রাজ্যের অধীশ্বর দুর্জ্জনশাল একবার খীচি আক্রমণ করিয়া ব্যর্থকাম হন। শিবপুর ও বুন্দির সর্দ্দারগণের সহিত পরে মিলিত হইয়া, বলবাদর দুর্জ্জনশালের রাজ্য আক্রমণ করেন। হারবীর উমেদসিংহ এই সময়ে দুর্জ্জনশালকে সাহায্য না করিলে কোটা বলবাদরের হস্তগত হইত।

বলবীর সেন, রাজা—পঞ্জাবের সিমলা সহরের নিকটবর্ত্তী কিওন্দুল নামক একটী দেশীয় রাজ্যের রাজা। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৮২ সালে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অতি প্রাচীন রাজপুত বংশীয়। তাঁহাদের উপাধি রাণা ছিল। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে রাণা সংসের সেন ইংরেজ সরকারকে যথেষ্ট সাহায্য করেন, তদবধি তাঁহাদের উপাধি রাজা হইয়াছে। তাঁহার অধীনে আরও ছয়টী সামন্ত রাজ্য আছে। রাজ্যের পরিমাণ ফল ১১২ বর্গমাইল, লোক সংখ্যা প্রায় ৩২ হাজার। প্রায় সকলেই হিন্দু।

বলভদ্র—(১) তিনি একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার। বরাহ স্বীয় রচিত বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে, বলভদ্রের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। বৃহৎ সংহিতার টীকাকার উৎপল ভট্টও স্বীয় টীকায় বলভদ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। বলভদ্র ভট্ট ব্রহ্ম গুপ্তের উপর এক টীকা লিখিয়াছেন। বরাহের বৃহজ্জাতকের উপর বলভদ্রের টীকা আছে।

বলভদ্র—(২) দামোদরের পুত্র বলভদ্র (১৫৭৭ শক, ১৬৫৫ খ্রীঃ) হোরারত্ন নামে এক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বলভদ্র—(৩) অপর এক বলভদ্র ১৩৩০ শকে শতানন্দকৃত ভাস্বতীর উপর বাল বোধিনী নামে এক টীকা রচনা করেন।

বলভদ্র—(৪) তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত। 'নবরত্ন বিবাদ','বৃন্দ সংগ্রহবোধ' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

বলভদ্র—(৫) যোগশতক নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ বলভদ্র বিরচিত।

বলভদ্র—(৬) এক বলভদ্র জাতক চন্দ্রিকা গ্রন্থের প্রণেতা।

বলভদ্র—(৭) তিনি অম্বরপতি পৃথ্বী-রাজের দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম। তিনি জয়পুর রাজ্যের অন্যতম প্রধান সর্দ্দার ছিলেন। তাহা হইতে বলভদ্রোট নামক বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহার জায়গীর এচারোল নামক স্থান।

বলভদ্র দেব গজপতি—তিনি উড়িষ্যার অন্তর্গত খুর্দ্দার রাজা পুরুষোত্তম দেব গজপতির পুত্র ও নরসিংহ দেবের ভ্রাতা। তিনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র গঙ্গাধরকে বধ করিয়া ১৬৫৩ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসন অধিকার করেন। ১৬৫৪—১৬৯৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। পুরুষোত্তম গজপতি দেখ।

বলভদ্র মহাপাত্র—তিনি হিজলীর মণ্ডলাধিকারী ছিলেন। তাঁহার কন্যা ইছাই দেবীকে বৈষ্ণব কুলতিলক রসিকানন্দ বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি মালজেটিয়াদন্ত পাটের অধিপতি গোপীনাথ পট্টনায়কের বংশধর। তাঁহারই বংশে তেজখাঁ মসনদ-ই-আলার প্রধান সচীব ভীম সেন মহাপাত্র জন্মগ্রহণ করেন। বলভদ্র মহাপাত্রের পরেই এই বংশের প্রাধান্য লোপ পায়।

বলভদ্‌ মিশ্র—তাঁহার জন্মস্থান রাজমহল নগর। (১৫৬৪ শকে), ১৬৪২ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'হায়ণরত্ন' নামক বর্ষফল গণনোপযোগী এক তাজক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা ফল ব্যবসায়ী জ্যোতিষী পণ্ডিতের নিকট খুবই পরিচিত।

বলভদ্‌ সিংহ—মিথিলা দেশে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে বলভদ্র সিংহ নামে এক রাজা ছিলেন। সেই সময়ে শ্রীহট্ট দেশে আদিধর্ম্মপা কোনও যজ্ঞকার্য্য সম্পাদনার্থ, মিথিলাপতি বলভদ্র সিংহের নিকট প্রার্থনা করিয়া, তদ্দেশ হইতে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ণ পূর্ব্বক যজ্ঞ সম্পাদন করেন। আদি ধর্ম্মপা দেখ।

বলভদ্র সোম—হুগলী চুচুঁড়ার জমিদার বংশের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহাদের আদি নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত বাগাটী নামক গ্রামে ছিল। বলভদ্র সোম গৌড়ের রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গৌড়ের ঘোরীবংশীয় রাজার প্রধান কর্ম্মচারী গোপী বসুর (পুরন্দর খাঁ) কন্যাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। যশোহর জঙ্গলের পুরাতন রাস্তাটি তিনিই প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে নৃসিংহ সোম বাগাটী ত্যাগ করিয়া চন্দননগরে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বলভুতি—মথুরার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে গ্রীক ও শকরাজগণের মুদ্রার সহিত বহু প্রাচীন তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

সেই সকল মুদ্রায় বলভূতি, ভবদত্ত প্রভৃতি রাজগণের নাম পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা কোন্ সময়ে বা কোথায় রাজত্ব করিতেন তাহা নির্ণিত হয় নাই।

বল্লয়াচার্য্য—শ্রীবরাচার্য্যের পুত্র বল্লয়াচার্য্য স্বীয় পিতার ন্যায় অসাধারণ গণিতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্তের উপর 'কল্পবল্লী' নামে এক উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছেন।

বলরাও ইঙ্গলিয়া—তিনি দৌলতরাও সিন্ধিয়ার (১৭৯৪—১৮২৪ খ্রীঃ অব্দ) অন্যতম সেনাপতি। তিনি জয়পুর রাজ্যে অতিশয় অত্যাচার করিয়াছিলেন। এই মহারাট্টা সেনাপতি অবশেষে জয়পুররাজ জগৎসিংহকর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছিলেন। পরে বহু অর্থের বিনিময়ে মুক্তি লাভ করেন।

বলরাম—কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ। তিনি প্রয়োগ রত্নমালা, মুক্তি চিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা প্রসিদ্ধ পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশের পুত্র। বলরাম 'প্রবোধ প্রকাশ' নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বলরাম কবিকঙ্কণ—একজন বাঙ্গালী কবি। তিনি চণ্ডীর উপাখ্যান রচনা করেন। মেদিনীপুর অঞ্চলে তাঁহার রচিত চণ্ডী কাব্য প্রচলিত আছে। তিনি মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের শিক্ষাগুরু বলিয়া ঐ অঞ্চলের লোকে বলে।

বলরাম ঘোষ বিশ্বাস—তিনি ত্রিপুরার রাজা রামগঙ্গা মাণিক্যের মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। ১৮০৪ খ্রীঃ অব্দে মহারাজ রাজধর মাণিক্যের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগঙ্গা মাণিক্য রাজা হইয়াছিলেন। যুবরাজ দুর্গামাণিক্যকর্ত্তৃক ছয় বৎসর পরে তিনি রাজ্যচ্যুত হন। বলরাম ঘোষ মহারাজ দুর্গামাণিক্যের শিক্ষক ছিলেন।

বলরাম চক্রবর্ত্তী, কবিশেখর—একজন প্রাচীন বাঙ্গালী পদকর্ত্তা। তিনি 'কালিকা মঙ্গল' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহা প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান। দিক্ বন্দনায় পুস্তকে বাঙ্গালা দেশের নানা দেবী মন্দিরের উল্লেখ আছে। তাঁহার পিতার নাম দেবীদাস। বলরামের গ্রন্থের ভাষা ও উপাখ্যানাংশ আলোচনা করিয়া বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাকে রামপ্রসাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান করেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ও বলরামের বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে সব বিষয়ে অনেক পার্থক্য আছে। ভাষা অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত। কালিকা দেবীর নিজ পূজা প্রচার করিবার প্রবল আগ্রহই ইহাতে বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

বলরাম দাস—(১) খ্রীঃ ষোড়শ শতকে উৎকল ও দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেব তথায় বহু বৌদ্ধ দর্শন করেন। সেই সময়ে উৎকল-

বাসী বৌদ্ধদের উপর নানাভাবে অত্যাচার হইতে থাকায় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। বৈষ্ণবাচার্য্য সনাতন গোস্বামী এইরূপ অনেক বৌদ্ধকে বৈষ্ণব করেন। তাঁহাদের মধ্যে অচ্যুতানন্দ, অনন্ত, জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস ও যশোবন্ত দাস পরে বৈষ্ণব সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হন।

বলরাম দাস—(২) একজন গ্রন্থকার। 'বৈষ্ণব বিধান' গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

বলরাম দাস—(৩) একজন গ্রন্থকার। 'সারাবলী' নামক সংগ্রহ গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

বলরাম দাস—(৪) একজন পদকর্ত্তা। তিনি পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীহট্ট জিলার অধিবাসী ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার পর তিনি পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের অধীন দোগাছিয়া গ্রামে বাসস্থাপন করেন। তাঁহার পিতার নাম সত্যভানু উপাধ্যায়। তিনি সঙ্গীত প্রবণ ছিলেন এবং দিবানিশি গৌর গুণ গানে মত্ত থাকিতেন। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় শিরোভূষণ পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করেন। ঐ শিরোভূষণ দোগাছিয়া গ্রামে তাঁহার বংশধরগণ এখনও পরম সমাদরে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপাল মূর্ত্তি এখনও বিরাজমান রহিয়াছে। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে ঐ গ্রামে একটি উৎসব হইয়া থাকে।

বলরাম দাস—(৫) সুবিখ্যাত পদকর্ত্তা ও কবি। ১৫৩৭ খ্রীঃ অব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজকুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আত্মারাম দাসও একজন কবি ছিলেন।

বলরাম দাস শৈশবাবস্থায় পিতৃমাতৃহীন হন। তৎপরে তিনি জাহ্নবী দেবীর নিকট আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং বিবাহ করিয়া সন্তানাদি লাভ করেন। বলরাম দাস নরোত্তম ঠাকুরের খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। বলরাম দাসের গুরুদত্ত নাম 'নিত্যানন্দ দাস'। তিনি 'প্রেম বিলাস', 'গৌরাঙ্গাষ্টক', 'বীরচন্দ্র চরিত', 'রসকল্পসার', 'কৃষ্ণলীলামৃত', 'হাট বন্দনা ও 'কুঞ্জভঙ্গের একুশ পদ' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি রচনা করেন। তিনি সুবিখ্যাত গ্রন্থ প্রেমবিলাস তাঁহার গুরুপ্রদত্ত নামেই (নিত্যানন্দ দাস) রচনা করেন। প্রেমবিলাস গ্রন্থখানি বিংশ বিলাস বা অধ্যায়ে বিভক্ত।

ইহাতে প্রধানতঃ শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীমৎ শ্যামানন্দের (দুঃখী কৃষ্ণদাস) বিষয় বর্ণিত আছে। তিনি একজন শক্তিসম্পন্ন কবি ছিলেন। নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত কুঞ্জভঙ্গের 'বলি বলি-জাত ললিতা আলি। শ্যাম গৌরী মুখ-মণ্ডল বালকই, ছবি উঠত অতি ভালি।' ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদটী অবলম্বন করিয়া তিনি আলস বিষয়ক একুশটী পদ রচনা করেন।

বলরাম দাস—(৬) একজন পদকর্ত্তা। দীনবলরাম নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েকটী পদ পাওয়া গিয়াছে। তিনি খুব সম্ভব গদাধর শাখাযুক্ত ছিলেন।

বলরাম দেব—একজন গ্রন্থকার। তিনি চট্টগ্রামের অন্তর্গত নবগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কমলাপতি। 'স্বপ্ন অধ্যায়' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত। কৈলাস নাথ বক্তা এবং ভবানী শ্রোতা, এই-ভাবে গ্রন্থকার স্বপ্নের ফলাফল বর্ণন করিয়াছেন।

বলরাম দ্বিজ—মনসার গীতি লেখক।

বলরাম বর্ম্মণ—ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত বিষ্ণাকুট গ্রামে বলরাম বর্ম্মণ নামে পরাক্রান্ত এক তালুকদার ছিলেন। সাধারণতঃ তিনি বলরাম দেওয়ান নামে খ্যাত ছিলেম। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে রোসনাবাদের মহারাজের অধীনস্থ যে সমুদয় তালুকদার, মহারাজার জমিদারী হইতে খারিজ হইবার জন্য প্রয়াসী ছিলেন, তন্মধ্যে রামমোহন দাস ও বলরাম বর্ম্মণ অগ্রণী ছিলেন। তাঁহারা মোকদ্দমা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে, মহারাজ রাজধর মাণিক্যের ক্রোধ তাঁহাদের উপর পড়ে। মহারাজা বলরামের তালুকের খাজানা বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া মোকদ্দমা করেন। বলরামের মৃত্যুর পরে রঘুনাথ, বিশ্বনাথ ও রাজকৃষ্ণ নামক তাঁহার তিন পুত্র তাহা পরিচালনা করেন। কিন্তু পৌত্রের সময়ে ৩২ বৎসর পরে তাহার নিষ্পত্তি (১৮১৭খ্রীঃ ১৮ই এপ্রিল) হয়।

বলরাম বর্ম্মা, মহারাজা স্যার—ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ত্রিবাঙ্কুরের প্রকৃত নাম—তিরুবাঙ্কুড়্। এই বংশ ৩৫২ খ্রীঃ অব্দ হইতে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মধ্যে একবার টিপু সুলতান তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহিত বাধ্যতা মূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হইয়া ছিলেন।

বলরাম রায়—পাবনা জেলার তারাশের একজন জমিদার। তাঁহার পিতার নাম জয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী। তিনি

ঢাকার নবাব সরকারে কার্য্য করিয়া 'রায় চৌধুরী' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তারাশ জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাসুদেব তালুকদার তাঁহার পিতামহ ছিলেন।

বলরাম রায় বাঙ্গালার সুবাদার আজিম ওসমানের দেওয়ানের কার্য্য করিতেন এবং এই কার্য্যে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ধনশালী হইয়াছিলেন। তিনি হুশেনসাহীর অংশ বড়বাজু পরগণা ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পুরাতন কুঞ্জবন নামক সরোবর খনন করাইয়াছিলেন এবং কাশী, গয়া ও বৃন্দাবনে সত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নিজ বাসভবনে রসিক রায় নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৭১৮ খ্রীঃ অব্দে উক্ত বিগ্রহের জন্য দ্বিতল দোলমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৭২২ খ্রীঃ অব্দে তিনি কপিলেশ্বরের মন্দির সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন। ১৭৩৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। রঘুরাম, হরিনাথ ও জগন্নাথ রায় নামে তাঁহার তিন পুত্র ছিল। বাসুদেব তালুকদার দেখ।

বলরাম সিংহ—(১) রাজপুতনার অন্তর্গত বল্লমগড়ের তিনি অধিপতি ছিলেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা তবতিয়া গোত্রীয় গোপাল সিংহ বর্ত্তমান বল্লমগড়ের তিন মাইল উত্তরে সিহি নামক গ্রামে অবস্থান করিতেন। মথুরা হইতে দিল্লী যাইবার পথে দস্যুবৃত্তি করিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী গ্রামের রাজপুত জাতীয় চৌধুরীদিগকে বধ করিয়া বহু অর্থ তিনি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী ফরিদাবাদের মুঘল রাজকর্ম্মচারী মুর্ত্তজা খাঁ, তাঁহাকে কিছুমাত্র শাসন না করিয়া, ফরিদাবাদের রাজস্ব আদায়ের কাজে ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। গোপাল সিংহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র চরণ দাস উক্ত পদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মুর্ত্তজা খাঁকে অগ্রাহ্য করায় তৎকর্ত্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। চরণদাসের পুত্র বলরাম সিংহের কৌশলে চরণদাস কারামুক্ত হন। তৎপর উভয়ে ভরতপুর গমন করিয়া তথাকার সুরজমলের সাহায্যে মুর্ত্তজা খাঁকে বধ করেন। এই সকল অন্যায় কাজ করিয়াও তাঁহারা ১৭৪৭ সাল পর্য্যন্ত অক্ষত দেহে দিন যাপন করিয়াছিলেন। তারপরে দিল্লীর সৈন্যের সহিত বলরামের যুদ্ধের উপক্রম হয়, কিন্তু মুঘল সেনাপতি ভয় পাইয়া বলরাম ও ভরতপুরের সুরজমলের সহিত সন্ধি করেন। তদবধি বলরাম আমরণ দিল্লীর সম্রাটের অনুগত ছিলেন, আর কখনও বিরুদ্ধে যান নাই।

বলরাম সিংহ—(২) তিনি ভরতপুরের সুরজমল সিংহের শ্যালক। দিল্লীর সম্রাট আহম্মদ শাহের সময়ে সুরজমলের সহিত মুঘল সেনাপতি আকিবৎ মোহাম্মদের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বলরাম নিহত হন। কিন্তু যুদ্ধে মুঘল বাহিনী পরাজিত হয়। এই আকিবৎ মোহাম্মদ ফরিদাবাদের মুঘল শাসনকর্ত্তা মুর্ত্তজা খাঁর পুত্র। বলরামের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র কিষণ সিংহ ও বিষনসিংহ বল্লমগড়ের দুর্গাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন।

বলরাম রায়—(১) তিনি ভুলুয়ার (বর্ত্তমান নোয়াখালী জিলা) রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি রাজা হইয়াছিলেন। এই ভুলুয়াপতি ত্রিপুরার সামন্ত রাজাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ত্রিপুরাধিপতি প্রথম সিংহাসনে আরোহণ করিবার কালে, ভুলুয়ারাজ তাঁহার ললাটে রাজ টীকা প্রদান করিতেন। বলরাম রায়ের সময়ে অমর মাণিক্য ১৫৯৭ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বল গর্বিত বলরাম নজর ও রাজটীকা দিতে অসম্মত হইলেন। ইহাতে অমর মাণিক্য তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন।

বলরাম হাড়ী—এই ব্যক্তি 'বলরাম ভজা' নামে একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দে বলরাম নদীয়া জিলার মেহেরপুর গ্রামের মালোপাড়ায় এক হাড়ীবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যাবধি সত্যনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে স্থানীয় জমিদার মল্লিক বাবুদের বাড়ীতে চৌকিদারী কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এই সময়ে জমিদারদের গৃহ বিগ্রহের কতকগুলি অলঙ্কার অপহৃত হয়। জমিদার বাবুরা বলরামকেই অপহর্ত্তা সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে কিছু শাসন করেন। এই ঘটনায় বলরাম মর্ম্মাহত হইয়া উদাসীন হন এবং পরে যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হন। তৎপরে তাঁহার একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায় গঠিত হয়। তাঁহার বহু শিষ্য সংগ্রহ হয়। তাঁহারা তাঁহাকে রামচন্দ্রের অবতার বলিত। বলরাম দোলাদি উৎসবে স্বয়ং বিগ্রহ সাজিয়া শিষ্যদের পূজা গ্রহণ করিতেন। ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দে অগ্রহায়ণ (১২৫৭ সাল) বলরাম দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুস্থানে ভৈরব নদের তটে একটী মঠবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার কোন কোন শিষ্য স্মৃতিরক্ষা করিতেছেন। অপর শিষ্যেরা ইহা বলরামের মতবিরুদ্ধ বলিয়া সেই স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বিমুখ। বলরামের এক শিষ্য নদীর অপর তটে একটী আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন।

বলরামের শিষ্যেরা বলরামেরই ন্যায় উদার ভাবাপন্ন। ইহারা অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং নিম্নশ্রেণীর লোক।

ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই। সকলেই সকলের অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকে। পীড়িত হইলে ইহারা প্রায়ই ঔষধ গ্রহণ না করিয়া বলরামের নামে পড়িয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে গৃহী ও ভিক্ষোপজীবী দুই শ্রেণী আছে। গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইয়া ইহারা একবার মাত্র ভিক্ষা চায়, না পাইলে অমনি চলিয়া যায়। 'জয় বলরাম' ইহাদের ধর্ম্মোক্তি।

বলাই বৈষ্ণব—একজন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। হুগলী জেলার অন্তর্গত পিয়াসপাড়া গ্রামে সদ্গোপ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামকমল। তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালা বংশীবদন তাঁহার প্রপিতামহ ছিলেন। তাঁহাদের বংশগত উপাধি ছিল সরকার। তাঁহার প্রপিতামহ বংশীবদন কবিওয়ালা দেশ বিদেশে মান, মাথুর, গোষ্ঠ প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের লীলা গাহিয়া বেড়াইতেন; এজন্য তিনি বৈরাগী বা বৈষ্ণব আখ্যায় অভিহিত হইতেন এবং ইহা হইতেই তাঁহার বংশধরেরা বৈষ্ণব আখ্যায় অভিহিত হন। বংশীবদন সম্বন্ধে এখনও রাঢ় অঞ্চলে প্রবাদ আছে যে—"ছবিতে উমাচরণ, কবিতে বংশীবদন।"

বলাই বৈষ্ণব, ভোলা ময়রা প্রভৃতি কবিওয়ালাদিগের সমসাময়িক ছিলেন। কবির গানে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কবিগানে ভোলা ময়রা প্রভৃতি কবিওয়ালাদের সহিত তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। অনুমান ১২০১ বঙ্গাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

বলাই সান্যাল, রাজা—তিনি দামনাশের শিখিবাহন সান্যালের অন্যতম পুত্র। শিখাই বা শিখিবাহন সান্যাল বঙ্গের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা সামসুদ্দিন হাজী ইলিয়াস (১৩৩৯—১৩৫৯ খ্রীঃ অব্দ) শাহের সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া খাঁ উপাধি ও চলনবিলের দক্ষিণে একটী প্রকাণ্ড জায়গীর প্রাপ্ত হন। সাঁতোড় নগর তাহার রাজধানী হইল। শিখিবাহনের জ্যেষ্ঠপুত্র বলাই সান্যাল তথায় রাজা হইলেন। দ্বিতীয় পুত্র কানাই কুলপতি, তৃতীয় পুত্র সত্যবান বা প্রিয়দেব ফৌজদার হইয়াছিলেন। শিখিবাহন দেখ।

বলি— অশোকের পরে মিথিলায় (বর্ত্তমান দ্বারবঙ্গে) বলি নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেন। বর্ত্তমান রাজনগর ষ্টেশন হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে 'বলিরাজপুর' নামক স্থানে তাঁহার বিশাল দুর্গের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজা বলির পরে অন্ধ্রগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বলিত নারায়ণ—কোচবিহার অধিপতি নরনারায়ণের ভ্রাতা শুক্লধ্বজ বা চিলারায় একজন দিগ্বিজয়ী সেনাপতি

ছিলেন। রাজা নর নারায়ণ তাঁহাকে কামরূপ রাজ্য প্রদান করেন। চিলা রায় বিজনী নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র রঘুরায় ১৫৯৩ খ্রীঃ অব্দে বিজনীর রাজা হন। রঘুরায়ের পরীক্ষিৎ ও বলিতনারায়ণ নামে দুই পুত্র ছিল। সেই সময়ে রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হয়। পশ্চিমে সোণকোষ হইতে পূর্ব্বে মনাস নদী পর্য্যন্ত ভূভাগে পরীক্ষিৎ পুত্র বিজিত নারায়ণ এবং মনাস হইতে দিক্রাই নদী পর্য্যন্ত বলিত নারায়ণ প্রাপ্ত হইলেন। এই বলিতনারায়ণই বর্ত্তমান দরঙ্গ রাজ-বংশের আদি পুরুষ। রাজা বলিত নারায়ণ, তাঁহার পিতামহ শুক্লধ্বজের ন্যায় অতিশয় বীর্য্যবান্ ছিলেন। ১৬১৪ খ্রীঃ অব্দে ঢাকার নবাব কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু বলিত নারায়ণ তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দেন। দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহ এই সংবাদ শ্রবণে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া ১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার বিরুদ্ধে এক-দল সৈন্য প্রেরণ করেন। এবারেও বলিত নারায়ণের হস্তে মুঘল সৈন্য পরাজিত হইয়াছিল।

রাজা বলিত নারায়ণ যেমন পরাক্রম শালী তেমনি বুদ্ধিমান ও রাজনীতি কুশল ছিলেন। আসামের পূর্ব্ব প্রান্তে আহম বংশীয় রাজারা তখন প্রবল ছিলেন। বলিত নারায়ণ আহমরাজ স্বর্গ নারায়ণের হস্তে স্বীয় কন্যা মঙ্গল দইকে (মঙ্গলা দেবী) সম্প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা বৃদ্ধি করিয়া-ছিলেন। ১৬৩৪ সালে বলিত নারায়ণ পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র নারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন।

বলিভদ্রাচার্য্য—এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র-বিদ পণ্ডিত মাধবকর রচিত নিদান গ্রন্থের এক টীকা রচনা করিয়াছেন।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—একজন কবি, সাহিত্যিক ও নানা বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচয়িতা। কলিকাতা যোড়া-সাঁকোর সুবিখ্যাত ঠাকুরবংশে ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ২১শে কার্ত্তিক তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। 'চিত্র ও কাব্য', 'মাধবিকা', 'শ্রাবণী' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত। এতদ্ব্যতীত ভারতী প্রভৃতি মাসিক পত্রেও নানা বিষয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। তিনি অতি অল্প বয়সেই পরলোক গমন করেন। তিনি অতি অল্প বয়সেই পর-লোক গমন করেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সাহিত্যে গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনায় আপনার বিশেষত্ব ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গদ্য রচনাও কবিত্ব সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল। তাঁহার চিত্র ও কাব্য পুস্তক খানিতে সাহিত্য ও ললিতকলা বিষয়ক

সমালোচনাযুক্ত প্রবন্ধাবলী একত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ মধ্যে তিনি কালিদাস, ভবভূতি, জয়দেব প্রভৃতি কবিগণের কাব্যাদির সমালোচনা এবং ললিতকলা বিষয়ক প্রবন্ধ মধ্যে ভাস্কর্য্য ও চিত্রবিদ্যার আলোচনা করিয়াছেন। এই সকল প্রবন্ধ এবং ভারতী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলির দ্বারা তাঁহার চিন্তাশীলতা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'মাধবিকা', ও 'শ্রাবণী' তাঁহার কবিতা পুস্তক। তিনি পঞ্জাব আর্য্য সমাজের সহিত বঙ্গের ব্রাহ্ম সমাজের মিলন সাধনের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। এতদুপলক্ষে পঞ্জাব যাত্রার পরিশ্রমে তিনি রুগ্ন হইয়া পড়েন এবং অচিরেই ১৩০৬ বঙ্গাব্দে ৩রা ভাদ্র মাত্র ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

বলোজী—জয়পুরের রাজা উদয়কর্ণের তৃতীয় পুত্র। পৃথ্বীরাজের পুত্রগণের মধ্যে কুশাবহ সামন্তভূমি বহুভাগে বিভক্ত হইবার বহু পূর্ব্বে, কুশাবহ রাজকুমার বলোজী পিতৃরাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া শেখাবতী নামক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অমৃতসর রাজ্যেরই অন্তর্ভূত। তিনি একজন বিখ্যাত বীরপুরুষ ছিলেন।

বল্ল—চিতোরের মহারাণা খোমানের আহ্বানে যে সকল স্বদেশ প্রেমিক বীর স্বদেশ শত্রু মুসলমানদিগকে তাড়াইবার জন্য খোমানের পতাকা তলে সম্মিলিত হইয়াছিলেন ছুটিয়ালার অধিপতি বল্ল তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। খোমান দেখ।

বল্লকেশী বল্লভ— প্রাচীনকালে অযোধ্যা প্রদেশ হইতে বিজয়াদিত্য নামে এক রাজা দাক্ষিণাত্য প্রদেশ জয় করিতে আসেন। পল্লববংশীয় রাজা ত্রিলোচনের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন। তাঁহার গর্ভবতী মহিষী বিষ্ণুবর্দ্ধন নামে এক পুত্র প্রসব করেন। এই বিষ্ণু বর্দ্ধনের পল্লবংশীয়া মহিষী বিজয়াদিত্য নামে এক পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারই পুত্র বল্লকেশী বল্লভ। বল্লকেশী বল্লভের পুত্র কীর্ত্তিবর্ম্মা।

বল্লভ—একজন প্রাচীন বাঙ্গালী কুলপঞ্জিকাকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'গ্রামভাব নির্ণয়'।

বল্লভ—তাঁহার অন্য নাম অনুপ। ইনি অনুপ, রূপ ও সনাতন গোস্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। এই অনুপেরই পুত্র জীব গোস্বামী।

বল্লভ ঠাকুর—তাঁহারই কন্যা লক্ষ্মী প্রিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রথমা স্ত্রী ছিলেন। শ্রীচৈতন্য দেখ।

বল্লভ দাস—একজন পদকর্ত্তা ও গ্রন্থকার। তিনি কুলিয়া গ্রাম নিবাসী

বংশীবদন ঠাকুরের প্রপৌত্র ও শচীনন্দন দাসের মধ্যম পুত্র। বংশীবদন ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। বল্লভ দাস 'বংশীলীলা' ও 'রসকদম্ব' নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বংশীলীলা গ্রন্থে তাঁহার প্রপিতামহ বংশীবদন ঠাকুরের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি নরোত্তম ঠাকুরের সমসাময়িক ছিলেন।

বল্লভদেব—একজন গ্রন্থকার। 'পাণ্ডব বিজয়' (সংক্ষিপ্ত ভারত প্রসঙ্গ) নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

বল্লভ ভট্ট—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তিনি শার্ঙ্গধর কৃত ত্রিশতী নামক গ্রন্থের 'বৈদ্য বল্লভা' নামে এক টীকা রচনা করিয়াছেন।

বল্লভরাজ—তিনি রাষ্ট্রকূট বংশীয় নরপতি শর্ব্ব বা অমোঘবর্ষের পুত্র। তিনি চেদীবংশীয় প্রথম কোকল্লদেবের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি গুর্জ্জরপতি দ্বিতীয় ভোজদেবকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই বল্লভ রাজের অন্য নাম দ্বিতীয় কৃষ্ণ। তাঁহার পুত্রের নাম জগতুঙ্গ।

বল্লভ সেন—গজনীর সুলতান মাহামুদকর্ত্তৃক পত্তনাধিপতি চামুণ্ড রায় ১০১১ খ্রীঃ অব্দে পদচ্যুত হইলে, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বল্লভ সেন অনহলবারার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু ছয় মাস রাজত্ব করিয়া বসন্ত রোগে তিনি পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্লভ সেন সিংহাসনে উপবেশন করেন।

বল্লভাচার্য্য—(১) খুব সম্ভব এই মৈথিল দার্শনিক পণ্ডিত খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ন্যায়লীলাবতী'। ইহা বৈশেষিক দর্শনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এই প্রামাণ্য গ্রন্থের বহু টীকা টীপ্পনী রচিত হইয়াছে।

বল্লভাচার্য্য—(২) প্রসিদ্ধ অনুভাষ্যকার ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। তিনি ত্রৈলিঙ্গ দেশীয় লক্ষ্মণ ভট্টের পুত্র। বারাণসীর নিকটবর্ত্তী চম্পারণ্য নগরে তাঁহার জন্ম হয় (১৫শ—১৬শ খ্রীঃ অব্দ)। তিনি নারায়ণ ভট্ট ও ত্রিলোচনের শিষ্য হইয়া শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বিষ্ণুস্বামীর সম্প্রদায়ভুক্ত হন। শ্রীশ্রী৺বালকৃষ্ণই তাঁহার উপাস্য দেবতা। বৃন্দাবনে তিনি শ্রীনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রথমে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করেন। শাস্ত্রানুসারে ইহা অত্যন্ত দোষণীয়। মধ্বাচার্য্য মতে প্রভাবিত হইয়া তিনি সুপ্রসিদ্ধ 'বেদান্তের অনুভাষ্য' রচনা করেন। তাঁহার মতে উপাসনার জন্য উপবাস, কায়ক্লেশ বা বিলাস বর্জ্জন করিবার কোনও আবশ্যক হয় না। এবিষয়ে তাঁহার মতাবলম্বীগণ ও মধ্বমতাবলম্বীগণের প্রভেদ

রহিয়াছে। তিনি শ্রীচৈতন্যদেব ও রঘুনাথ শিরোমণির সমসাময়িক ছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্য দেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বেদান্তের অনুভাষ্য ব্যতীত তিনি আরও অনেকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ভগবদ্গীতার উপর 'সুবোধিনী' নাম্নী টীকা, জৈমিনী সূত্রভাষ্য, পূর্ব্বমীমাংসাকারিকা ও ভাগবত-তত্ত্বদীপ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১৫৩১ খ্রীঃ অব্দে বোম্বাই প্রদেশে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

বল্লভানন্দ শ্রেষ্ঠী—তিনি সুবর্ণ বণিক জাতীয় একজন শ্রেষ্ঠ ধনী। বঙ্গের সেনবংশীয় নরপতি বল্লাল সেনের সমসাময়িক। তিনি ও তাঁহার ভাগিনেয় মণিদত্তের অপরাধে সমস্ত সুবর্ণ বণিক জাতি বল্লাল সেনকর্তৃক নির্য্যাতীত হইতেছিলেন। বল্লভানন্দের কন্যা পদ্মিনীর চক্রান্তে বল্লাল সেনও নির্য্যাতীত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মণিদত্ত দেখ।

বল্লভেন্দ্র—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত। 'বৈদ্য চিন্তামণি' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

বল্লল—ফরিদকোট রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহারা যদুবংশীয় জিত জাতি। যশল্মীর নগর ও রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাণা যশলের অধস্তন সপ্তদশ পুরুষ রাণা বরার। এই বরারের পুত্র বল্লল। এই বল্লল মুঘল সম্রাট আকবর শাহের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, ফরিদকোট নগরের ৬ মাইল পশ্চিম উত্তরে কূটকপুরে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। বল্ললের বংশধর হামীর সিংহ ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে ফরিদকোটের স্বাধীন নরপতি হইয়াছিলেন। ১৮০৮ খ্রীঃ অব্দে ফরিদকোটাধিপতি, পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ফরিদকোট রাজ্য রণজিৎসিংহের সেনাপতি মোকমচাঁদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব সন্ধির সর্ত্তানুসারে শতদ্রুর বাম তীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ প্রত্যর্পণের দাবী করেন। তদনুসারে নিতান্ত অনিচ্ছাবশত রণজিৎ সিংহ ফরিদকুট পূর্ব্ব অধিকারীকে প্রত্যর্পণ করেন। ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে ফরিদকোটের রাজা পাহার সিংহ প্রথম শিখ যুদ্ধে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়া, রাজা উপাধি ও নাভা রাজ্যের কতক অংশ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পাহার সিংহ দেখ।

বল্লাল—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বিশারদ। 'যোগ মুক্তাবলী' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

বল্লাল দৈবজ্ঞ—বল্লালের আদি বাসস্থান এলদপুর সমদেশে পয়োষতী নদীর তটে বিদর্ভ দেশের (বর্ত্তমান নাগপুর

প্রদেশ) অন্তর্গত দধি গ্রামে ছিল। তিনি একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বীয় বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে বাস করেন। তদবধি তাঁহার বংশধরেরা কাশীবাসী হইয়াছেন। তিনি দেবরাত গোত্রীয় যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বল্লালের পাঁচ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে দ্বিতীয় কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ, দিল্লীর মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর পাতশাহের প্রধান জ্যোতিষী ছিলেন। বল্লালের চতুর্থ পুত্র রঙ্গনাথ সূর্য্য-সিদ্ধান্তের টীকাকার। রঙ্গনাথের পুত্র মুনীশ্বর (বিশ্বরূপ) সিদ্ধান্ত সার্ব্বভৌম নামক জ্যোতিষ সিদ্ধান্তের রচয়িতা।

বল্লালের বংশাবলী।

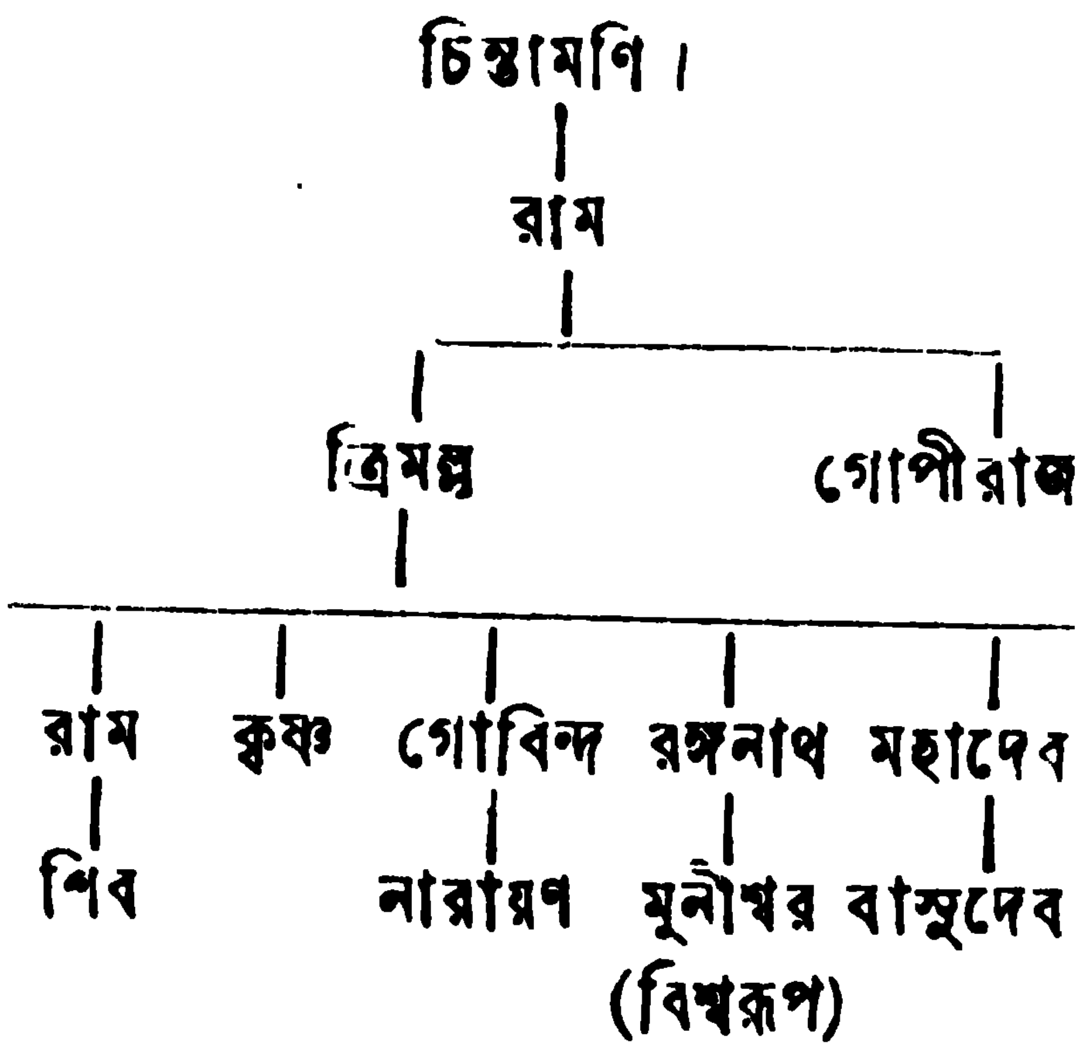

বল্লাল পণ্ডিত—তিনি ভোজপ্রবন্ধের রচয়িতা।

বল্লাল সেন—প্রসিদ্ধনামা হিন্দু নরপতি। তিনি রাঢ়ের সেনবংশীয় প্রথম নরপতি সামন্তসেনের প্রপৌত্র, হেমন্ত সেনের পুত্র। তাঁহার মাতা ? দেবী শূরবংশীয়া ছিলেন। খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তিনি রাজত্ব করেন। ১১১৮ অথবা ১১১৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার রাজত্ব কালের কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। হরিঘোষ তাঁহার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। বল্লাল সেনের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন রাজা হন। লক্ষ্মণ সেনের মাতা রামদেবী চালুক্যবংশীয়া ছিলেন।

বল্লাল সেন স্বয়ং বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। দানসাগর নামক স্মৃতির নিবন্ধ এবং 'অদ্ভুতসাগর' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া কথিত হয়। কাহারও কাহারও মতে উক্ত গ্রন্থদ্বয় তিনি সমাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। অদ্ভুত সাগর তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেনকর্ত্তৃক এবং দানসাগর তাঁহার গুরুকর্ত্তৃক সমাপ্ত হয়। সেনবংশীয়দের রাজত্বকালে বৈদ্যজাতীর সমধিক উন্নতি দেখা যায় ঐ সময়ে চিকিৎসা শাস্ত্র ও অলঙ্কারাদি গ্রন্থ প্রণেতাদের মধ্যে বৈদ্যজাতীয় ব্যক্তিদের বাহুল্য দেখা যায়।

বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথার প্রবর্ত্তক এইরূপ একটি মত বাঙ্গালা দেশে বহু বিস্তৃত। কৌলশাস্ত্র সমূহই কেবল এই মতের পরিপোষক। কিন্তু অনেক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ঐ মত অমূলক বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন মহারাজ বল্লাল সেন যদি কৌলিন্য

প্রথার সৃষ্টিকর্ত্তা হইতেন তবে তাঁহার নিজের অথবা তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন এবং পৌত্র কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন সমূহে ঐ নবপ্রচলিত আভিজাত্য বিধির কোনও না কোনও রূপ উল্লেখ থাকিত। বল্লাল সেনও তদ্বংশীয়দের রাজ্যকালে শাসনগ্রহীতি ব্রাহ্মণগণের নামোল্লেখকালে কোথাও তাঁহাদের নূতন পদমর্য্যাদার উল্লেখ হয় নাই। অথচ ঐরূপ উল্লেখ খুবই স্বাভাবিক হইত।

অনেকে বল্লাল সেনকে কায়স্থ বংশোদ্ভব বলিয়াও মনে করেন। কিন্তু ঐরূপ মনে করিবার বিশেষ কোনও কারণ নাই।

বশিষ্ঠ—(১) বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত তাঁহার রচিত।

বশিষ্ঠ—(২) তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকার।

বশিষ্ঠ—(৩) তিনি একজন বাস্তু শিল্প শাস্ত্র প্রণেতা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—জ্ঞান সাগর বাশিষ্ঠতন্ত্র।

বশিষ্ঠ—(৪) ধর্ম্মসূত্রকার এক বশিষ্ঠ ছিলেন।

বসন্তকুমারী দেবী, রাণী—তিনি বর্দ্ধমানের রাজা তেজ চন্দ্রের অন্যতমা মহিষী। তেজচন্দ্রের মৃত্যুর পরে বিধবা রাণী, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে পুন বিবাহ করেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় দেখ।

বসন্তকুমারী রায়—বরিশাল জিলার অন্তর্গত রায়ের কাটী গ্রামের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার নরনারায়ণ রায়ের বিদুষী পত্নী। তিনি স্বামীর ন্যায় অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'কবিতা মঞ্জরী', 'রোগাতুরা', 'বসন্তকুমারী', 'বাসন্তিকা', 'বালিকা বিনোদ', 'যোষিদ্বিজ্ঞান' প্রভৃতি প্রধান। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তিনি অকালে পরলোক গমন করেন।

বসন্ত চন্দ্র দাস, রায় সাহেব—একজন শিক্ষাব্রতী। ১২৮০ বঙ্গাব্দে (১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা জিলার মানিকগঞ্জ মহকুমার অধিবাসী ছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ শিক্ষক ছিলেন। ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল তিনি বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসে (Bengal Education Service) কাজ করিয়াছিলেন। কলিকাতা হেয়ার স্কুল এবং বাঙ্গালার আরও অন্যান্য বহু স্কুলে তিনি বিশেষ সুনামের সহিত প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯২৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি নিখিল বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট স্কুল শিক্ষক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, সেই সময় তিনি তাঁহার অভিভাষণে বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে শিক্ষার বাহন হয় তাহার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি অমায়িক ও আদর্শ চরিত্রের লোক ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দের ৩০শে

ডিসেম্বর (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) তেষট্টি বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

বসন্ত পাল—তিনি বঙ্গের পালবংশীয় নরপতি প্রথম মহীপালের তৃতীয় পুত্র। বসন্ত পাল ও তাঁহার অগ্রজ স্থিরপাল বারাণসীতে ধর্ম্মরাজিকা ও সাঙ্গ ধর্ম্ম চক্রের জীর্ণ সংস্কার এবং অষ্ট মহাস্থান শৈল বিনির্ম্মিত গন্ধকুটী নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

বসন্ত ভট্ট—একজন জ্যোতিষী। ১০৯০ শকের (১১৬৮ খ্রীঃ) পূর্ব্বে তিনি 'বসন্ত-রাজ বা শকুনার্ণব' গ্রন্থ রচনা করেন।

বসন্ত রায়—(১) একজন পদকর্ত্তা। তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও কায়স্থকুলোদ্ভব নরোত্তম ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি বৃন্দাবনধামে বাস করিতেন। বৈষ্ণব সমাজে তিনি অতিশয় সম্মান প্রাপ্ত হইতেন।

বসন্ত রায়—(২) একজন কবি ও পদকর্ত্তা। ১৪৩৩ খ্রীঃ অব্দে ভুরসুট পরগণার মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। স্বনামখ্যাত ভবানন্দ মজুমদার (রায়) তাঁহার পিতা। 'বসন্তকুমার' নামক কাব্য গ্রন্থ তাঁহার রচিত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত অনেক পদও আছে। ১৪৮১ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

বসন্ত রায়, রাজা—(১) রাজা লক্ষ্মণ সেনের গুরু অনন্তরাম ওঝা সিন্দুরী ও শাখিনী গ্রাম গুরু দক্ষিণা পাইয়াছিলেন। তাঁহারই বংশধর বসন্ত রায় আট পরগণার মালিক ছিলেন। তাঁহার পুত্র রাজাব রায় অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন ছিলেন।

বসন্ত রায়, রাজা—(২) যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য। তাঁহার প্রকৃত নাম জানকীবল্লভ, বসন্ত রায় উপাধি। প্রতাপাদিত্য দেখ।

বসন্তলাল মিত্র—চন্দননগরের একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ। সঙ্গীত শাস্ত্রের লুপ্ত-প্রায় গ্রন্থ সকলের অনুসন্ধান ও উদ্ধার-কল্পে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি মাদ্রাজ হইতে 'সঙ্গীত পারিজাত' ও কাশ্মীর হইতে 'রত্নাকর' নামক দুইখানি সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া কালীচরণ বেদান্তবাগীশ ও সারদাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের সাহায্যে ঐগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি 'গন্ধর্ব্ব সংহিতা' নামক আর একখানি সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং উহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত 'নর্ত্তক নির্ণয়' নামক একখানা দেব-নাগরি পুঁথির বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উহা সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় চন্দননগরে একটী সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর

শেষভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

বসন্ত লেখা—তিনি কাশ্মীরপতি হর্ষদেবের (১০৮৯—১১০২ খ্রীঃ) অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তিনি মঠ, অগ্রহার প্রভৃতি স্থাপন করিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন। রাজার জ্ঞাতি উচ্চল বিদ্রোহী হইয়া রাজধানী আক্রমণ করিলে, বসন্ত লেখা প্রমুখ সপ্তদশ রাজমহিষী, পুত্রবধূদিগের সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

বসী বাই—তিনি প্রসিদ্ধ ভক্ত দাদুর জননী। দাদু দেখ।

বসুকুল—তিনি কাশ্মীরপতি হিরণ্যকুলের পুত্র। তিনি ১৬৪—১০৪ খ্রীঃ পূর্ব্ব অব্দ পর্য্যন্ত ৬০ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র মিহিরকুল রাজা হইয়াছিলেন।

বসুগুপ্ত আচার্য্য—শিবসূত্র প্রণেতা। তিনি কাশ্মীরে শিবসূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বসুদেব—শুঙ্গবংশের শেষ নরপতি দেবভূতিকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বসুদেব মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ কাণ্বংশ নামে খ্যাত। এই বংশের চারিজন নরপতি ৭৩—২৮ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত, মাত্র ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের বিবরণ যদিও পরে আর জ্ঞাত হওয়া যায় না। তবু তাঁহারা একেবারে লুপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবত মগধ সাম্রাজ্যের বাহিরে কোথাও ক্ষীণভাবে বিদ্যমান ছিলেন।

বসুদেব নারায়ণ—তিনি চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় পুত্র ও বঙ্গের গৌরব নরপতি প্রতাপাদিত্যের অন্যতম দৌহিত্র। রাজা রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ মুসলমান নবাবের চক্রান্তে মুসলমান হইলে, তাঁহার অনুজ সহোদর বসুদেব নারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠের ন্যায় বীর ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার রাজধানীতে নানা শাস্ত্র শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। নানা দেশাগত বহু পণ্ডিত তাঁহার নিকট বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নলচিড়া, উজিরপুর, কোটালিপাড়া প্রভৃতি স্থানের কোন কোন পণ্ডিত বংশ এখনও সেই বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। রাজা বসুদেব নারায়ণ পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র প্রতাপনারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন।

বসুনন্দ—তিনি কাশ্মীরপতি ক্ষিতিনন্দের পুত্র। তিনি কামশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া, বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ৫২ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৪৮৯ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় নর রাজা হইয়াছিলেন।

বসুবন্ধু—মধ্যযুগের খ্যাতনামা বৌদ্ধ দার্শনিক ও বিবিধ গ্রন্থ রচয়িতা। বর্ত্ত-

মান পেশোয়ারের প্রাচীন নাম ছিল পুরুষপুর। তথায় এক কৌশিক গোত্রজ ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহারা তিন ভাই ছিলেন। খ্যাত-নামা মহাযান-মতাবলম্বী দার্শনিক অসঙ্গ তাঁহারই অপর সহোদর।

বসুবন্ধু কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, তাহা লইয়া বিশেষজ্ঞদিগের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কাহারও মতে খ্রীঃ ৪র্থ শতাব্দীতে, আবার মতান্তরে ৫ম শতাব্দীতে তিনি জীবিত ছিলেন। বৌদ্ধ পণ্ডিত পরমার্থ, বসুবন্ধু ও তাঁহার ভ্রাতা অসঙ্গের একখানি জীবন চরিত রচনা করেন (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী)। পরমার্থ গ্রন্থখানি মগধ হইতে চীনদেশে লইয়া যান। তথায় উহা চীন ভাষায় অনূদিত হয়।

বসুবন্ধু প্রথমে সর্ব্বাস্তিবাদ মতানু-সারী ছিলেন এবং বুদ্ধভদ্র নামক এক-জন আচার্য্যের নিকট সমগ্র সর্ব্বাস্তি-বাদী ত্রিপিটক অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি সৌত্রান্তিক মতও অধ্যয়ন করেন। বৈভাষিক দর্শনেও তাঁহার বিশেষ অধি-কার ছিল। সৌত্রান্তিক ও সর্ব্বাস্তিবাদ এই দুইটি মতের সমন্বয় সাধন করিয়া একটি নূতন মত প্রচার করিবার ইচ্ছা হওয়ায়, তিনি সৌত্রান্তিক মত উত্তম-রূপে শিক্ষা করিবার জন্য উক্ত মতের কেন্দ্রভূমি কাশ্মীরে গমন করেন এবং ছদ্মনামে সঙ্ঘভদ্র নামে একজন আচার্য্যের নিকট সৌত্রান্তিক মত অধ্য-য়ন করিতে থাকেন। অধ্যয়নকালে তিনি ক্রমাগত প্রশ্ন করিয়া সৌত্রান্তিক মত খণ্ডণ করিতে থাকেন। ইহাতে প্রধান আচার্য্য স্কন্ধিলের সন্দেহ হয় এবং তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে শিক্ষার্থী বসুবন্ধু ভিন্ন আর কেহই নহেন। পরিচয় অবগত হইলে বিরুদ্ধবাদীরা তাঁহার প্রাণনাশ করিতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া স্কন্ধিল বসুবন্ধুকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দিলেন। গুরুর আদেশে বসুবন্ধু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ৬০০ শ্লোকে অভিধর্ম্ম কোষ নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া কাশ্মীরে গুরুর নিকট প্রেরণ করেন। পরে পুনরায় গুরুর আদেশে সেই ৬০০ শ্লোকের গদ্য ব্যাখ্যাসহ 'অভিধর্ম্ম-কোষ শাস্ত্র' নামে আর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বসুবন্ধুর 'অভিধর্ম্ম-কোষ' বহু দিন যাবৎ বৌদ্ধ দর্শনের একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া আদৃত ছিল। উহাতে পূর্ব্বাচার্য্যদের বহু মত উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে। প্রধানতঃ সর্ব্বাস্তিবাদমূলক হইলেও, উহাতে অন্যান্য মতসমূহও এরূপ বিস্তৃত ভাবে ও নিপুণতার সহিত আলোচিত হইয়াছে যে তৎকালীন প্রচলিত বিভিন্ন বৌদ্ধমত সমূহের সারার্থ ঐ এক গ্রন্থ হইতেই পাওয়া যাইত। অভিধর্ম্ম কোষ ধাতু, ইন্দ্রিয়, লোক, কর্ম্ম, অনুশয়,

আর্য্য-পুদগল, জ্ঞান ও সমাধি, এই আটটি নির্দ্দেশ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। নবম নির্দ্দেশে সাংখ্য, বৈশেষিক ও বাৎসপুত্রিয় দর্শনের আলোচনা আছে। মূল গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। উহা এক্ষণে পাওয়া যায় না। 'অভিধর্ম্ম-কোষ ব্যাখ্যা' নামে উহার একখানি টীকা যশোমিত্রকর্ত্তৃক রচিত হয়। মূল গ্রন্থখানি খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে পরমার্থকর্ত্তৃক চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। পরবর্ত্তী শতাব্দীতে ইউয়ান চ্যাঙ্‌ও উহার একখানি অনুবাদ করেন।

মধ্যবয়সে বসুবন্ধু, অসঙ্গের নিকট মহাযান মতে দীক্ষিত হন এবং প্রধানত যোগাচার মত অনুসরণ করিতে থাকেন। পূর্ব্বে মহাযান-মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বহু মহাযান-মতমূলক গ্রন্থের ভাষ্য প্রভৃতি রচনা করেন। এই সকল ভাষ্যের মধ্যে সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরিক, মহানির্ব্বাণ সূত্র, বজ্রচ্ছেদিক প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি প্রধান।

বিন্ধ্যবাস নামক একজন সাংখ্যপণ্ডিতের নিকট বিচারে পরাজিত হইয়া, বসুবন্ধু, সাংখ্যসপ্ততির অনুকরণে পরমার্থ সপ্ততি নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে তিনি সাংখ্য মত তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ ও খণ্ডন করেন। (জাপানী পণ্ডিত তাকাকাসুর মতে বিন্ধ্যবাস ঈশ্বরকৃষ্ণেরই নামান্তর)। বসুবন্ধু রচিত মহাপরিনির্ব্বানসূত্রের টীকার একখানি অনুটীকা ধর্ম্মবোধি রচনা করেন। তাঁহার বিংশতিকা (নামান্তর বিজ্ঞপ্তিমাত্রা সিদ্ধি) ও ত্রিংশত্রিকা নামক গ্রন্থদ্বয়ের দুইটি টীকা রচিত হয়। প্রথমটি বসুবন্ধু স্বয়ং এবং দ্বিতীয়টি স্থিরমতি রচনা করেন। প্রজ্ঞাপারমিতারও তিনি একটি টীকা রচনা করেন। মূল গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য। চীন ও তিব্বতী ভাষায় উহার অনুবাদ আছে মাত্র। যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান গ্রন্থেরও তিনি কতকগুলি টীকা রচনা করেন। বিজ্ঞানবাদ উপলক্ষ করিয়া একখানি মৌলিক গ্রন্থও তাঁহার রচিত। অন্যান্য গ্রন্থের নাম- ত্রিপুর সূত্রোপদেশ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন সূত্রোপদেশ ; কর্ম্মসিদ্ধ; প্রকরণ শাস্ত্র ; রত্নচূড় সূত্র ; চতুধর্ম্মোপদেশ ; পঞ্চস্কন্ধ প্রকরণ ; ব্যাখ্যাযুক্তি ; প্রতীত্যসমুৎপাদ সূত্রের টীকা ; মধ্যান্ত বিভাগ এবং মৈত্রেয় রচিত মহাযান সূত্রালঙ্কারের টীকা।

শেষ জীবনে তিনি প্রধানতঃ অযোধ্যা নগরীতে বাস করিতেন এবং সেইখানেই আশী বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। বৈভাষিক সম্প্রদায়ের আচার্য্য মনোরথ ও সঙ্ঘভদ্র তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি, বসুবন্ধুর মত খণ্ডনে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

বসুমিত্র—(১) একজন বৌদ্ধ শ্রমণ। সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের মহাবিভাষা নামে অভিধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি সাহায্য করেন। তিনি কাশ্মীরের অনুষ্ঠিত এক বৌদ্ধ সঙ্গীতির সভাপতি ছিলেন।

বসুমিত্র—(২) বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। তিনি (চীন পরিব্রাজক ইউয়ান চ্যাংএর মতে) 'জ্ঞান প্রস্থান' গ্রন্থের দ্বিতীয় পাদ রচনা করেন। ঐ দ্বিতীয় পাদের নাম 'প্রকরণ পাদ'। পুষ্কলাবতীর বৌদ্ধ বিহারে অবস্থানকালে তিনি ঐ গ্রন্থ রচনা করেন।

বসুমিত্র—(৩) 'অষ্টাদশ নিকায় সূত্র' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাস শ্রেণীর পুস্তক। মূল গ্রন্থখানি লুপ্ত হইয়াছে। চীন ভাষায় উহার তিনটি অনুবাদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ঐ অনুবাদত্রয়ের মধ্যে একখানি শ্রমণ পরমার্থের আর একখানি পরিব্রাজক ইউয়ান চ্যাংএর।

বসু মিত্র—(৪) জলন্ধর সহরে নরপতি কণিষ্কের আদেশে, বসুমিত্র ও পার্শ্বকের (পূর্ণমের) তত্ত্বাবধানে একটী বৌদ্ধ মহাসভা হইয়াছিল।

বস্‌সকার (বর্ষকার)— মগধরাজ অজাতশত্রুর একজন প্রধান অমাত্য। তাঁহারই পরামর্শে অজাতশত্রু, বৃজিরাজ্য আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিতে পারিবেন কিনা তাহা জানিবার জন্য বুদ্ধদেবের নিকট গমন করেন। বুদ্ধদেব বলেন যে, যুদ্ধে অজাতশত্রুরই পরাজয়ের সম্ভাবনা অধিক। তখন রাজার পরামর্শে বস্‌সকার বৃজিরাজ্যে গমন করেন এবং মিথ্যা বাক্যদ্বারা তাঁহাদের বিশ্বাস উৎপাদনপূর্ব্বক তাহাদের রাজনীতিক পরামর্শদাতারূপে তথায় বাস করিতে থাকেন। ক্রমে কূটনীতির সাহায্যে তিনি বৃজিগণের মধ্যে অন্তর্ব্বিবাদ সৃষ্টি করেন এবং কৌশলে মগধে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক অজাতশত্রুকে বৃজিরাজ্য আক্রমণ করিতে প্ররোচিত করেন। তখন অজাতশত্রু তাঁহার ব্যবস্থামত অভিযান করিয়া বৃজিগণকে পরাজয়পূর্ব্বক তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করেন।

বহুরবানু—সম্রাট জাহাঙ্গীরের অন্যতমা কন্যা। রাজকুমার দানিয়ালের পুত্র যুবরাজ শাহ মুরাদের সঙ্গে বাল্যকালেই তাঁহার বিবাহ হয়।

বহরম—তিনি সেনাপতি সামশির পুত্র ও খান-ই-আজম মিরজা কোকার পৌত্র। দিল্লীর সম্রাট শাহজাহান তাঁহাকে এক হাজার সৈন্যের অধিনায়ক পদে নিযুক্ত করেন। ১৬৪৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

বহরম খাঁ, নবাব বাহাদুর—১৭৪৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি শ্রীহট্টের ফৌজদার ছিলেন।

বহরম বেগ—তিনি দিল্লীর সম্রাট শাহজাহানের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। তিনি সম্রাট কর্ত্তৃক কিছুদিন

বিহার প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন।

বহলোল লোদী—বহলোল, লোদী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। লোদীরা আফগান জাতীয় ও বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহারা প্রধানতঃ ভারতবর্ষ ও পারস্যের মধ্যেই বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিতেন। ফিরোজশাহ তোগলকের রাজত্বকালে বহলোলের পিতামহ ইব্রাহিম ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি খুব ধনশালী ছিলেন বলিয়া সহজেই রাজ পরিষদে স্থান প্রাপ্ত হন। অচিরেই সম্রাটের শুভদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল এবং তিনি মুলতানের শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হইলেন। ইব্রাহিমের সুলতান, কালা, ফিরোজ, মোহাম্মদ ও খাজে নামক পাঁচ পুত্র ছিল। ইব্রাহিমের মৃত্যুর পরে তাঁহারা মুলতানেই অবস্থান করেন। মুলতানের শাসনকর্ত্তা সৈয়দবংশীয় খিজির খাঁর সময়ে ইব্রাহিমের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান সেনাপতির পদ লাভ করেন। এই সময়ে একবাল দিল্লীর সম্রাটের মন্ত্রীপদ লাভ করিয়া সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়াছিলেন খিজির খাঁ তাঁহার ক্ষমতা বিলোপ করিবার জন্য, তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। একবাল যুদ্ধে নিহত হন। সুলতান, যুদ্ধকালে ফিরোজের সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁহার হস্তেই একবালের জীবন শেষ হয়। ইহার পুরস্কার স্বরূপ খিজির খাঁ তাঁহাকে সরহন্দের শাসনকর্ত্তার পদ প্রদান করেন। সুলতান এই পদ লাভ করিয়াই কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালাকে একটী ক্ষুদ্র পদে নিযুক্ত করেন। এই কালাই বহলোলের পিতা। বহলোলের মাতা গৃহ চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেই সময়ে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। কালা খাঁ স্ত্রীর মৃত্যুর পর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, উদর বিদীর্ণ করিয়া, সন্তানটীকে বাহির করেন। এই সন্তানই বহলোল লোদী ইহার অল্পকাল পরেই কালা খাঁ পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠতাত সুলতান তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। বহলোল রণকুশল ও নানা গুণে বিভূষিত ছিলেন। এই কারণে সুলতান তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহাকে তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। বহলোল সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরের পদ প্রাপ্ত হইয়া শরহন্দের শাসনকর্ত্তা হইলেন। ইহার পরে তিনি স্বীয় ক্ষমতাবলে লাহোর, দিবালপুর প্রভৃতি অধিকার করেন। পঞ্জাবের ন্যায় বিস্তীর্ণ প্রদেশের আধিপত্য লাভ করিয়াও তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন না। দিল্লীর সিংহাসন লাভের প্রয়াসী হইলেন।

এই সময়ে সৈয়দ বংশীয় অকর্ম্মণ্য, বিলাসী আলাউদ্দিন দিল্লীর অধিপতি ছিলেন। ১৪৪৬ খ্রীঃ অব্দে, একবার

আলাউদ্দিন বদায়ুনে গমন করেন। তথাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তিনি বদায়ুনে রাজধানী করিতে অভিলাষী হন। কিন্তু মন্ত্রী হামিদ খাঁ ইহার অপকারিতা প্রদর্শন করিলেন। সুলতান আলাউদ্দিন ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। সুলতানের দুইজন শ্যালক ছিলেন। তিনি একজনকে দিল্লীর শাসনকর্ত্তার পদ ও অপরকে আমীর উপাধি প্রদান করেন। তাঁহারা দুই ভ্রাতা পরস্পর বিবাদ করিয়া একজন সমরক্ষেত্রেই শয়ন করেন। অপর হামিদ খাঁর প্ররোচনায় নিহত হন। ইহাতে সুলতান আলাউদ্দিন মন্দ লোকের প্ররোচনায় হামিদ খাঁকে হত্যা করিবার আদেশ দেন। হামিদ খাঁ উপায়ান্তর না দেখিয়া লাহোরের বহলোল লোদীকে দিল্লী অধিকার করিতে আহ্বান করেন। বহলোল রাজ্যলাভের এই সুবর্ণ সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি সসৈন্যে দিল্লীতে উপস্থিত হইলে হামিদ খাঁ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

এই সময়ে সুলতান আলাউদ্দিন বদায়ুনে অবস্থান করিতেছিলেন। বহলোল দিল্লী অধিকার করিয়াই সুলতানকে লিখিয়া পাঠাইলেন—'আমি জাঁহাপনার মঙ্গলার্থই বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি, আমি আজ্ঞাবহ ভৃত্য।' তাঁহার উত্তরে নিরুপায় সুলতান আলাউদ্দিন লিখিলেন—'আমার পিতা আপনাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আপনাকে বাধা দিবার ক্ষমতা আমার নাই। আমি রাজপদ আপনাকে দিয়া, মাত্র বদায়ুনের অধিকার লইয়াই সন্তুষ্ট রহিলাম।' বলাবাহুল্য এই স্থানেই তিনি ১৪৭৮ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

বহলোল এখন নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের নামে খোৎবা পাঠের অনুমতি দিলেন। নিজের ক্ষমতা অব্যাহত রাখিবার জন্য তিনি একটী ঘোরতর পাপ কার্য্যে লিপ্ত হইলেন। যে হামিদ খাঁ তাঁহাকে দিল্লী অধিকার করিতে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহাকেই তিনি প্রতারণাপূর্ব্বক হত্যা করিয়াছিলেন। তিনি নিজের নামে খোতবা পাঠের অনুমতি দিলেন, এমন কতকগুলি লোক ছিল, যাঁহারা ইহার বিরোধী ছিল। অর্থাৎ তাঁহারা বহলোলকে দিল্লীর সম্রাট বলিয়া মান্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহারা জৌনপুরের অধিপতি মোহাম্মদ শাহ সারকিকে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে আমন্ত্রণ করিলেন। মোহাম্মদ শাহ সারকি, দিল্লীর ভূতপূর্ব্ব সম্রাট আলাউদ্দিনের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই সম্রাট কন্যা তাঁহার স্বামীকে যুদ্ধার্থ খুব উত্তেজিত করিয়াছিলেন। এমন কি

মোহাম্মদ শাহ যুদ্ধার্থ গমন না করিলে; তিনি স্বয়ংই রণক্ষেত্রে গমন করিবেন, এমন আভাসও দিয়াছিলেন। এই সময়ে বহলোল শরহিন্দে ছিলেন। মোহাম্মদ শাহ দিল্লী আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তিনি দিল্লী অভিমুখে রওনা হইলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যবল প্রতি পক্ষ অপেক্ষা অনেক কম ছিল। সুতরাং বহলোলের যুদ্ধে জয়লাভ করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল। কিন্তু এই মোহাম্মদের সৈন্যদলের মধ্যে আফগাণেরা স্বজাতি প্রীতি নিবন্ধন মোহাম্মদকে পরিত্যাগ করিয়া বহলোলের পক্ষ অবলম্বন করিল। ইহাতেই তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। এই জয়লাভের ফলে তাঁহার বিরোধী পক্ষের লোকেরা সাহস হারাইল। প্রান্তবর্ত্তী শাসনকর্ত্তারা খুব সতর্ক হইলেন। জৌনপুরের মোহাম্মদআলী সারকি এই পরাজয়েও দমিয়া গেলেন না। তিনি আবার দিল্লী আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু সেনাপতি কুতব খাঁ ও প্রতাপ সিংহের পরামর্শে উভয়ের মধ্যে সন্ধি সাক্ষরিত হইয়া প্রত্যেকে স্ব স্ব রাজ্যের মালিক রহিলেন। কিন্তু এই সন্ধি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে দোয়াবের অন্তর্গত শামসাবাদ অধিকার করিতে বহলোল অগ্রসর হইলেন। কিন্তু জৌনপুরপতি মোহাম্মদ শাহ ইহাতে বাধা দিলেন। কেবল তাহাই নহে, বহলোলের সেনাপতি কুতব খাঁ বন্দী হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মোহাম্মদ শাহ পরলোক গমনের আহ্বান প্রাপ্ত হইলেন। যুদ্ধের বিরাম হইল। কিন্তু কুতব খাঁ মুক্তি পাইলেন না। সুতরাং আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এবার জৌনপুর সেনাপতি জালাল খাঁ বন্দী হইলেন। এই সময়ে জৌনপুরে হোশেন খাঁ বিদ্রোহী হইয়া জৌনপুরের সিংহাসন অধিকার করিলেন। তখন দিল্লী ও জৌনপুরের মধ্যে সন্ধি সাক্ষরিত হইল। কিন্তু এই সন্ধি মাত্র চারি বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। বহলোল লোদী মুলতানের শাসনকার্য্য পরিদর্শন করিতে গমন করিলে, হোশেন খাঁ দিল্লী রাজ্য আক্রমণ করিলেন। একটী যুদ্ধে দিল্লী সৈন্য পরাজিত হইল। বহলোলের বিখ্যাত সেনাপতি আহম্মদ খাঁ মেওয়াতি ও বিয়ানার শাসনকর্ত্তা ঈশা খাঁ পরস্পর বিবাদ করিয়া হোশেন খাঁর বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। এমন সময়ে বহলোল, মুলতান হইতে এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। হোশেন খাঁ তখন সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু হোশেন নিশ্চেষ্ট থাকিবার পাত্র ছিলেন না। এই সময়ে বদায়ুনে ভূতপূর্ব্ব দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন পরলোক

গমন করিলেন। এই সংবাদ পাইয়াই হোশেন খাঁ তাঁহার কোন কোন স্থান অধিকার করিয়া দিল্লীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। হোশেন খাঁর স্বীয় সৈন্যবল সম্বন্ধে অতিরিক্ত ধারণা ছিল। এই যুদ্ধেও তিনি পরাজিত হইয়া, রসদ-পত্র ও মালামাল পরিত্যাগপূর্ব্বক জৌনপুরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। সন্ধির সর্ত্তানুসারে গঙ্গা নদী উভয় রাজ্যের সীমা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল।

এই সকল সন্ধি মাত্র দুই এক দিনের জন্য। কারণ প্রত্যেকেই সুবিধা পাইলেই পরস্পরকে আক্রমণ করিতে বিরত হইতেন না। বহলোল জৌনপুর সৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তন সময়েই তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এমন কি হোশেন খাঁর বেগম মালিকা জাহান তাঁহার হস্তে বন্দী হইলেন। বহলোল লোদী এই সম্মানিত বন্দী বেগমের প্রতি যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত রক্ষকসহ তিনি বেগমকে জৌনপুরে প্রেরণ করিলেন। জৌনপুর রাজ্যের নানাস্থানে লুণ্ঠনাদি চলিতে লাগিল। অবশেষে সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হইল। হোশেন খাঁ এবার সন্ধি ভঙ্গ করিয়া আক্রমণ করিলেন কিন্তু পরাজিত হইয়া রেবারি নামক স্থানে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। এস্থান হইতে যমুনা পার হইয়া গোয়ালিয়ার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মথজান-ই-আফগান গ্রন্থের মতে যমুনা পার হইবার সময়ে তাঁহার মহিষী ও সন্তানেরা জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। গোয়া-লিয়ারের রাজা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিয়া কাল্পী পর্য্যন্ত পহুঁছাইয়া দেন। বহলোল এটোয়া অধিকার করিয়া দ্রুত গতিতে কাল্পীতে উপস্থিত হইলেন। কালী নদীর তীরে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হইল কিন্তু হোশেন খাঁ পরাজিত হই-লেন। বহলোল জৌনপুরে উপস্থিত হইয়া তাহা অধিকার করিলেন। মুবারক খাঁ লোহানীকে তাহার শাসন কর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। কুতব খাঁ লোদী ও অন্যান্য আফগান প্রধানেরা নিকটবর্ত্তী স্থানের জায়গীরদার হইলেন। এই সময়ে কুতব খাঁ লোদী পরলোক গমন করেন। মবারক খাঁ দিল্লীর অধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার প্রয়াসী হন। এই সময়ে হোশেন খাঁ আবার দিল্লীর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া জৌনপুর হইতে নির্ব্বাসিত হন। এই সময়ে বহলোল আফগান সেনাপতিদের ব্যবহারে সন্দি-হান হইয়া তাঁহাদিগকে উচ্চপদে রাখা উচিত বলিয়া মনে করিলেন না। স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বারবক শাহকে জৌন-পুরের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। কাল্পী, বারি, ঢোলপুর, শালাপুর প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্ত্তারা বশ্যতা

স্বীকার করিল। গোয়ালিয়ারপতি পরাজিত হইয়া অশীতি লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতে বাধ্য হইলেন। ক্রমাগত রাজ্যের পর রাজ্য আক্রমণ ও জয় করিয়া এই অসাধারণ বীর সম্রাট ভগ্ন স্বাস্থ্য হইলেন। সামান্য অসুখেই বহলোল ১৪৮৮ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

দিল্লীর প্রণষ্ট গৌরবের উদ্ধারকর্ত্তা ও লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা বহলোল একজন বিখ্যাত সম্রাট ছিলেন। অনবরত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া রাজ্যের আভ্যন্তরীন উন্নতির দিকে তিনি দৃষ্টি দিতে পারেন নাই. ব্যক্তিগতভাগে তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটদের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বহলোল লোদী সাহসী, উদার, দয়ালু ও ন্যায়বান ভূপতি ছিলেন। তিনি জাকজমক প্রিয় একবারেই ছিলেন না। তিনি সিংহাসনে বসিয়া অনুগত সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে কখনও অন্যান্য পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটদের ন্যায় দণ্ডায়মান করিয়া রাখিতেন না। সকলের সঙ্গে এক গালিচায় উপবেশন করিতেন। দরিদ্রের প্রতি অতিশয় দয়ালু ছিলেন। কখনও কোন প্রার্থী তাঁহার দ্বার হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই। তিনি নিজে বিদ্বান্ ছিলেন না। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহার নিকট অতিশয় সমাদর প্রাপ্ত হইতেন। তিনি প্রজাদের অভিযোগ স্বয়ং শুনিয়া প্রতীকার করিতেন। তিনি ১৪৫১ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৪৮৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র সেকেন্দর লোদী সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বহমতি মিত্র—যুক্ত প্রদেশে এলাহাবাদ জিলায় পভোসা গ্রামের (প্রাচীন প্রভাস) নিকট প্রভাস পর্ব্বতে একটী গুহার মধ্যে শিলালিপিতে রাজা গোপালিপুত্র বহমতি মিত্রের উল্লেখ আছে। বোধ হয় তাঁহারা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের রাজা ছিলেন।

বহদর জী—দাদূপন্থী সাধকদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের লোকই আছেন। বহদর জী একজন মুসলমান সমাজের দাদূপন্থী সাধক। তিনি নিজেকে 'দরবেশ' বলিয়া পরিচয় দিতেন।

বহুমিত্র— একজন বৌদ্ধ স্থবির। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা মানবের কল্যাণ সাধনে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

বহো—পৃথ্বীরাজের সহিত সাহেবউদ্দীন ঘোরীর যুদ্ধকালে, পৃথ্বীরাজের অন্যতম সেনাপতি গিহ্লোটবংশীয় পূজা তাঁহার অনুচর কেহড়া, শালা, বহো, বাচু ও নরসিংহ নামক পঞ্চ ভ্রাতা, অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশপূর্ব্বক, বহু মুসলমান সৈন্য নিহত করিয়া সমর শয্যায় শয়ন করেন।

বাঈ—সিন্ধুদেশের রাজা দাহিরের অন্যতমা মহিষী। ৭১২ খ্রীঃ অব্দে মোহাম্মদ-বিন-কাশিম সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন। রাজা দাহির প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া সমরে শয়ন করিলেন। কিন্তু দাহিরের বীর্য্যবতী মহিষী স্বামীর নিধনেও হতাশ না হইয়া, প্রাণপণে স্বদেশ রক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এমন সময়ে দুর্গাভ্যন্তরে খাদ্যাভাব উপস্থিত হয়। সুতরাং আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। রাণী বাঈ আত্মসমর্পণ না করিয়া, সমস্ত মহিলাগণ সহ অনলে আত্মাহুতি দিলেন। সৈনিকেরা যুদ্ধ করিতে করিতেই সমরক্ষেত্রে শয়ন করিলেন।

বাঈজী বাঈ—তিনি শুরজীরাও রাঠোরের কন্যা। গোয়ালিয়রের অধিপতি দৌলত রাও সিন্ধিয়ার মহিষী। সিন্ধিয়ার মন্ত্রী অম্বজী,মিবার রাজ্যের সর্ব্বনাশ সাধনে সঙ্কল্পারূঢ় হইয়াছিলেন। কিন্তু মহিয়সী মহিষীর বুদ্ধি কৌশলে মিবারের সর্দ্দারেরা পরস্পর বিবাদ ভুলিয়া,অম্বজীর ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়াছিলেন। এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী মহিষী তাঁহার পোষ্য পুত্র জনকজীর বিবাহে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। রাণী, দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রাজাদের মধ্যে পরস্পর সখ্য স্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন।

বাউক—তিনি কান্যকুব্জের গুর্জ্জর প্রতীহারবংশীয় ককের পুত্র। তিনি ৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন এবং বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন।

বাক্‌পতি—কবি বাক্‌পতিরাজ, কান্যকুব্জের অধিপতি যশোবর্ম্মা দেবের রাজসভার অন্যতম কবি ছিলেন। তিনি কবি ভবভূতির ছাত্র ছিলেন। সম্ভবতঃ ৬৮০—৭২০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবিত কাল। তাঁহার রচিত কাব্যের নাম—গৌড়বহ (গৌড়বধ)।

বাক্‌পাল—বঙ্গের পালবংশীয় নরপতি প্রথম গোপাল দেবের কনিষ্ঠ পুত্র ও ধর্ম্মপাল দেবের অনুজ। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মপাল দেবের শাসনে অবস্থিত থাকিয়া একচ্ছত্র শাসন সংস্থিত দশদিক্ শত্রু পতাকিনী শূন্য করিয়াছিলেন। বাক্‌পালের পুত্র জয়পাল। জয়পালের পুত্র বিগ্রহপাল (প্রথম) বা শূরপাল একজন দিগ্বিজয়ী রাজা ছিলেন।

বাক্‌পুষ্টা—তিনি কাশ্মীরের অধিপতি তুঞ্জিনের (১১৩—৭৭ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ) প্রধানা মহিষী ছিলেন। রাজা যেমন ধার্ম্মিক ছিলেন, তিনিও রাজার তেমনি উপযুক্তা মহিষী ছিলেন। এই নানা গুণালঙ্কৃতা মহিষী রাজার মৃত্যুর পরে স্বামীর চিতায় আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুগামিনী হইয়াছিলেন। এই সুচরিত্রা মহিষী যে স্থানে মৃত স্বামীর অনুগমন করিয়াছিলেন, সেই স্থানকে লোকে

'বাক্‌পুষ্টাটবী' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। তিনি পথিকদিগের জন্ম নানা স্থানে ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছিলেন।

বাকর খাঁ, মির্জ্জা—তিনি বাঙ্গালার নবাব সরফরাজ খাঁর ভাগিনেয়ীকে (উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা মুর্শিদ কুলিখাঁর কন্যা) বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি পারস্যের রাজবংশ সম্ভূত ছিলেন। তিনি উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা ও বাঙ্গালার নবাব সুজাউদ্দিনের জামাতা মুর্শিদ কুলিখাঁর কন্যাকে বিবাহ করিয়া স্বীয় শ্বশুরের অন্যতম সেনাপতিরূপে কাজ করিতেছিলেন। আলীবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালা অধিকার করিয়া উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে মুর্শিদ কুলী খাঁ পরাজিত হইয়া মান্দ্রাজ পলায়ন করেন। বাকর খাঁও সেই সঙ্গে পলায়ন করেন।

বাকলি—(১) একজন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্য। মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি চৌরাশী-জন সিদ্ধাচার্য্যের অন্যতম।

বাকলি—(২) একজন চর্য্যাপদ রচয়িতা।

বাকি খাঁ—সম্রাট শাহজাহানকর্ত্তৃক তিনি প্রথমে আগ্রার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। পরে দুই হাজারী সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন।

বাকির—মোহাম্মদ বাকির আলী খাঁর কবিজন সুলভ উপাধি। ১৭২৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে একখানা কাব্য রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত আরও কয়েকখানা গ্রন্থ আছে।

বাকির খাঁ—(১) তিনি দিল্লীর সম্রাট শাহজাহানের একজন সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। এক সময়ে তিনি এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৬৩৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

বাকির খাঁ—(২) তাঁহার উপাধি নজম শানী ছিল। তিনি দিল্লীর সম্রাট শাহজাহানের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। তিনি একজন কবি ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার রচিত একখানা দেওয়ানও রহিয়াছে। ১৬৪০ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

বাঁকুড়া রায়—তিনি মেদিনীপুর জেলার ব্রাহ্মণভূমির অন্তর্গত আভবভা গ্রামের জমিদার ছিলেন। সাধারণের নিকট তিনি রাজা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। রাজমিশ্র নামক এক ব্যক্তি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ। বাঁকুড়া রায়ের পিতার নাম বীরমাধব রায়। এই বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়েই কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। কবি প্রথমে রাজার পুত্র রঘুনাথ রায়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রঘুনাথ ১৫৭৩—১৬০৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এখন রঘুনাথের বংশধরেরা মেদিনীপুর জেলার সেনাপতি গ্রামে সামান্য অবস্থায় দিন যাপন করিতেছেন।

বাগদার আলী শাহ—একজন

প্রসিদ্ধ দরবেশ। তিনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ হজরত শাহ জালাল এমনির অনুগত অন্যতম শিষ্য ছিলেন। শ্রীহট্ট সহরের বাক্তখানা মহল্লায় এখনও তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে।

বাগ্ভট—(১) জৈন গ্রন্থকার। তিনি পঞ্চদশ সর্গে তীর্থঙ্কর নেমিনাথের একখানা জীবনী রচনা করিয়াছিলেন। উহার নাম 'নেমী নির্ব্বাণ'। বাগ্ভট গুর্জ্জরপতি জয়সিংহের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। বাগ্ভটালঙ্কার নামক গ্রন্থও তাঁহার রচিত।

বাগভট্—(২) একজন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার প্রণীত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের নাম 'রত্নসমুচ্চয়'।

বাগভট্—(৩) একজন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। 'অষ্টাঙ্গহৃদয়' নামক আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

বাগরাজ—মেদিনীপুর জিলার কেশিয়াড়ি গগণেশ্বর প্রভৃতি পরগণা প্রাচীন কাগজ পত্রে 'বাগভূম' নামে পরিচিত। প্রবাদ এই যে, এইস্থানে প্রাচীনকালে বাগরাজ নামক জনৈক অনার্য্য নরপতি রাজত্ব করিতেন।

বাগশ্রীজ গোস্বামী—তিনি একজন সাধুপুরুষ ছিলেন। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে মেদিনীপুর জিলার পাথরবেড়া গ্রামে রঘুনাথজিউ নামক বিগ্রহ তিনি স্থাপন করেন।

বাঘজি—তিনি রাণা উদোর পৌত্র ও সূর্য্যমল্লের পুত্র। গুর্জ্জরপতি সুলতান বাহাদুর যখন চিতোর আক্রমণ করেন তখন তিনি চিতোর রক্ষার্থ বিশেষ ভাবে যুদ্ধ করিয়া সমরশায়ী হন। তাঁহার পুত্র সিংহ রাও। রাণা উদয় সিংহকে তিনি আশ্রয় দিতে সাহস পান নাই।

বাঘল্ল দেবী—তিনি উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নরপতি প্রথম অনঙ্গ ভীমের মহিষী ও তৃতীয় রাজরাজের মাতা। প্রথম অনঙ্গ ভীম দেখ।

বাঙ্কাজী সখাদেব—১৭৯৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন। নাগপুরের অধিপতি দ্বিতীয় রঘুজী ভোসলেকর্ত্তৃক তিনি নিহত হন এবং বালাজী বর্ণিহার তাঁহার মৃত্যুর পরে ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে উক্ত পদ প্রাপ্ত হন।

বাঙ্গন—আসাম প্রদেশের আহমবংশীয় নরপতি লক্ষ্মী সিংহের রাজত্বকালে (১৭৬৯—১৭৮০ খ্রীঃ অব্দ) মোয়ামারিয়ারা বিদ্রোহী হয়। তিনি মোয়ামারিয়া গোহাইএর পুত্র। বিদ্রোহীরা বাঙ্গনকেই রাজা করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁহার পিতা ইহাতে সম্মত হন নাই। তিনি নাহুরের পুত্র রামকান্তকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু সকলেই রাজা লক্ষ্মীসিংহকর্ত্তৃক পরে নিহত হন। লক্ষ্মীসিংহ দেখ।

বাচ—তিনি আজমীরের চৌহানবংশীয় নরপতি। তাঁহারই পুত্র গোগা, গজনীর অধিপতি সুলতান মামুদের প্রচণ্ড

আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন।

বাচস্পতি—(১) স্মার্ত্ত চিন্তামণিকার বাচস্পতি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাঁহাকে সকলেই অভিনব বাচস্পতি মিশ্র বলিয়া থাকেন। তিনি ১৫—১৬ খ্রীষ্ট শতাব্দীতে মিথিলাধিপতি হরিনারায়ণের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। তাঁহার 'বিবাদ চিন্তামণি' একখানি উৎকৃষ্ট ব্যবহারিক গ্রন্থ।

বাচস্পতি—(২) মহিম্নস্তবের একজন টীকাকার।

বাচস্পতি ঘটক—একজন প্রাচীন কুলপঞ্জিকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'কুলপঞ্জিকা'।

বাচস্পতি বৈদ্য—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকার। রুগবিনিশ্চয় গ্রন্থের আতঙ্কদর্পন নামক টীকা তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন।

বাচস্পতি মিশ্র—(১) প্রাচীন ন্যায়-শাস্ত্রেরটীকাকার। টীকার নাম ভামহ। তিনি চারিটি প্রমাণ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বাচস্পতি মিশ্র—(২) একজন প্রাচীন কুলপঞ্জিকাকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—'কুলরাম'।

বাচস্পতি মিশ্র—(৩) উড়িষ্যার রাজা হরিবর্ম্মা দেবের একজন অমাত্য।

বাচা—বুন্দির রাজা বীরসিংহের বীরু, জবদু ও নিম নামে তিন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জবদুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাচা। বাচার পুত্র শিবজি ও শিরাজি। তাঁহাদের নামীয় গোত্র শাবন্ত।

বাচস্পতি মিশ্র—(৪) খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদী, সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ও ষড়দর্শনের টীকাকার। তাঁহার অবস্থিতিকাল সম্বন্ধে নানারূপ মত আছে। কিন্তু অনেকের মতে ৮ম—৯ম শতাব্দীর প্রথম ভাগই তাঁহার অবস্থিতিকাল। তিনি 'ন্যায়সূচী নিবন্ধে' এবং ভামতীর সমাপ্তি শ্লোকে স্বীয় স্থিতিকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার স্থিতিকাল ৮ম হইতে হইতে নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগ এবং তিনি গৌড়ের রাজা ধর্ম্মপালের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। ধর্ম্মপালের রাজত্বকাল ৯ম শতাব্দীর প্রথম ভাগ। বাচস্পতি মিশ্র ধর্ম্মপালের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। কীম্বদন্তি আছে বাচস্পতির আর্থিক অভাব পূর্ণ করিবার জন্য রাজা সর্ব্বদাই অর্থ সাহায্য করিতেন সেই সাহায্যের ফলেই সাংসারিক চিন্তা বিরহিত হইয়া তিনি ষড়দর্শনের টীকা প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বাচস্পতির জন্মস্থান মিথিলায় বলিয়াই প্রতিভাত হয়। তাঁহার স্ত্রীর নাম ভামতী। তিনি বেদান্তে 'ভামতী' ব্রহ্মসিদ্ধির টীকা 'ব্রহ্মতত্ত্ব সমীক্ষা', সাংখ্য

কারিকার টীকা 'তত্ত্বকৌমুদী', পাতঞ্জল দর্শনের টীকা 'তত্ত্ববৈশারদী', ন্যায়-দর্শনের টীকা 'ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্য' ও "ন্যায়সূচী নিবন্ধ", পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে ভাট্টমতে "তত্ত্ববিন্দু" ও মণ্ডনামিশ্রের বিধিবিবেকের টীকা "ন্যায় কর্ণিকা" প্রণয়ন করেন। শাস্ত্রচর্চ্চায় তাঁহার তন্ময়ত্ব সম্বন্ধে ঐতিহ্য আছে। তিনি যখন শারীরিক ভাষ্যের টীকা রচনা করিতেছিলেন, তখন একদিন স্বীয় স্ত্রীকেই চিনিতে পারেন নাই। একদা রাত্রিতে কোন কারণে প্রদীপ নিবিয়া যায়। তাঁহার স্ত্রী তখন গৃহান্তর হইতে আসিয়া প্রদীপ প্রজ্জলিত করিয়া দেন এবং কিছু বলিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি স্ত্রীকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? স্ত্রী উত্তরে বলিলেন আমি আপনার দাসী। তখন তিনি বলিলেন আমার নিকট তোমার কি কিছু প্রার্থনীয় আছে? তদুত্তরে স্ত্রী বলিলেন "হিন্দু ললনার পক্ষে পতি সেবাই পরমধর্ম্ম। আপনার শ্রীচরণ সেবা করিতে পারিয়া আমার জীবন ধন্য হইয়াছে। আমার আর কোন প্রার্থনা নাই, আমি যেন আপনার শ্রীচরণে মস্তক রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারি ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।" তখন তিনি স্ত্রীকে বলিলেন 'তুমি হিন্দু রমণীকুলের আদর্শস্থানীয়া; কিন্তু দেহত ক্ষণভঙ্গুর। এদেহের নাশত হইবেই। আচ্ছা আমি তোমাকে অমর করিয়া যাইব। আমার এই টীকার নাম তোমার নামানুসারে "ভামতী" থাকিবে।" যথার্থই এই টীকাদ্বারা ভামতীর নাম অক্ষয় ও অমর হইয়া রহিয়াছে। তিনি যে তন্ময়ভাবে সংসার চিন্তা বিরহিত হইয়া টীকা প্রণয়ণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থরাজী পর্য্যবেক্ষণ করিলেই প্রতীত হয়। তাঁহার ন্যায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য বিরল। বিচারের তীক্ষ্ণতায় ভাবার অবাধিত গতিতে, যুক্তির কৌশলে তিনি যে দর্শন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে সেই দর্শনেই অতিমানুষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বিদ্যাবত্তার জন্য রাজসম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মধ্যে অন্যতম প্রধান আচার্য্য। তাঁহার বাক্য প্রমাণরূপে পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ অনেকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কেবল মগধের নহে ভারতের অলঙ্কার। তিনি একাধারে সাধক ও বিদ্বান্ ছিলেন। শাঙ্কর মত যথাযথ প্রপঞ্চিত করাই তাঁহার সাধনা। শ্রুতি ও যুক্তিবলে অদ্বৈত স্থাপনেই তাঁহার মনীষা প্রকাশিত। ভামতী টীকা দর্শন রাজ্যের এক অপূর্ব্ব বস্তু। ভামতীর প্রত্যেক শব্দে, প্রত্যেক বাক্যে তাঁহার প্রতিভা পরিস্ফুট।

ভামতী বেদান্ত দর্শনের মুকুট ভূষণ। ভামতী তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

বাছেরা—তিনি যশল্মীরের রাজা মুণ্ডের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পরে ১০০৯ খ্রীঃ অব্দে বাছেরা সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বাছেরার পুত্র দুশজ অতিশয় পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন।

বাজসি—তাঁহার প্রকৃত নাম আবদুল শুকুর। তিনি খরকের অধিবাসী। কিছুকাল সিরাজ নগরে ছিলেন, পরে দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে গুজরাটে আগমন করেন। এই সময়েই ১৬১৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পদ্মাবৎ কাব্য লিখিত হয়। সম্রাট শাহজাহানের সময়ে তিনি দিল্লীতে বিদ্যমান ছিলেন।

বাজী ঘোর পাদে—তিনি বিজাপুরের নবাবের অধীনে মুধল দুর্গের অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নবাব মোহাম্মদ আদিল শাহ, শাহজীকে বন্দী করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি শাহজীকে স্বীয় আবাসে আহারে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বন্দী করেন। বলা বাহুল্য এই কার্য্যের জন্য তিনি পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। যদিও শাহজী দীর্ঘকাল পরে এই অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিন্তু বাজী ঘোর পাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারেন নাই। শাহজী স্বীয় পুত্র শিবাজীকে ইহার প্রতিশোধ লইতে লিখিলেন। শিবাজী ইহার পরেই ১৬৬২ খ্রীঃ অব্দে মুধল দুর্গ আক্রমণ করিয়া বাজী ঘোরপাদকে সবংশে নিপাত করিয়াছিলেন। শিবাজী দেখ।

বাজী ফসলকার—তিনি মুখে উপত্যকার দেশমুখের পুত্র। দাদাজী কুণ্ডদেব তাঁহাকে ছত্রপতি শিবাজীর বাল্য সহচর করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি শিবাজীর একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন। তুনর দুর্গ অধিকার করিবার সময়ে তিনি শিবাজীর সঙ্গে ছিলেন। তিনি শাবন্তকয়ার সহিত যুদ্ধে নিহত হন।

বাজীরাও (প্রথম)—ইতিহাস বিশ্রুত মারাঠা রাজনীতিবিদ। তাঁহার পিতা বালাজি বিশ্বনাথ অতি সামান্য অবস্থা হইতে পেশোয়ার পদ লাভ করেন। (বালাজি বিশ্বনাথ দ্রষ্টব্য)। ১৫২০ খ্রীঃ অব্দে বালাজি বিশ্বনাথের মৃত্যু হইলে, মহারাজ সাহুকর্তৃক বাজীরাও পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত হন। তখন তাঁহার বয়স একুশ বৎসর মাত্র। বাল্যকাল হইতেই পিতার সহিত প্রায় সকল অভিযানেই উপস্থিত থাকিয়া তিনি সমর বিদ্যায় যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, সকল প্রকার রাজ কার্য্যে পিতার নিকটে উপস্থিত থাকিবার সুযোগ পাওয়াতে তিনি সেইরূপ রাজনীতি বিশারদ ও কার্য্যকুশল হইতে পারিয়াছিলেন। এই কারণেই মহারাজ সাহু তাঁহাকে

পেশোয়ার পদের সম্পূর্ণ যোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। (বালাজি বিশ্বনাথ এই নামের সহিত পেশোয়া পদের ইতিহাস দ্রষ্টব্য)। বাজীরাও পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার উপর প্রধানতঃ পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়গুলির ব্যবস্থা করিবার ভার প্রদত্ত হয়। তাঁহার অনুজ চিমণাজী রাজ সন্নিধানে উপস্থিত থাকিয়া অন্যান্য রাজ কার্য্য সমুদয় সম্পাদন করিতেন।

বাজীরাও যখন পেশোয়ার পদ লাভ করেন, সেই সময়ে দিল্লীর বাদশাহের ক্ষমতা অতিশয় হ্রাস পাইয়াছিল। সৈয়দ ভ্রাতৃযুগলই প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন (মহম্মদ শাহ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু চিন কিলিচ খাঁ (নামান্তর নিজাম-উল-মুল্ক) সৈয়দ ভ্রাতৃযুগলের বিশেষ বিরোধী ছিলেন। উত্তর ভারতে নিজ ক্ষমতা বিস্তারের সুযোগ না পাইয়া তিনি দক্ষিণ ভারতে ক্ষমতা বিস্তারপূর্ব্বক আপনার বলবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে থাকেন। এই নিজাম-উল-মুল্ক বাজীরাওএর একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দী ছিলেন (চিনকিলিচ খাঁ দ্রষ্টব্য)। এই সময়ের মধ্যে পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ ফরাসী ও ইংরেজ বণিকেরা দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতে ছিলেন।

বাজীরাও-এর পিতার আমলেই মহারাজা সাহু বালাজি বিশ্বনাথকে খান্দেশ ও বালাঘাট অঞ্চলের শাসন ভার প্রদান করিয়াছিলেন। নিজাম-উল্-মুল্কের প্ররোচনায় ঐ সকল স্থানের অধিবাসীরা দেয় রাজস্ব প্রদান করিতে শৈথিল্য করাতে, বাজীরাও বলপ্রয়োগে রাজস্ব আদায় করিবার জন্য একজন সেনাপতিকে তথায় প্রেরণ করেন। তাঁহার পরাক্রমে বিদ্রোহী প্রজারা বশ্যতা স্বীকার করিল এবং রাজস্বও যথারীতি লাভ হইল।

বালাজী বিশ্বনাথের সময় হইতেই মারাঠারা মালব দেশে চৌথ পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। দিল্লীর বাদশাহ বালাজি বিশ্বনাথকে মালব প্রদেশে চৌথ সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বাজীরাওই প্রথমে চৌথ আদায়ের চেষ্টা করেন। সেকালে মালব প্রদেশ মারাঠাদের নিকট, উত্তর ভারতে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ ছিল। এই কারণে বাজীরাও উহা সম্পূর্ণরূপে স্ব-করতলগত করিয়া ক্রমে ক্রমে মুঘল শাসিত উত্তর ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তারের সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ-প্রতিনিধি শ্রীপতি রাও এবিষয়ে বাজীরাও-এর বিশেষ বিরোধী ছিলেন। অপরদিকে মহারাজ সাহুর, বাজীরাও-এর এই প্রস্তাবে বিশেষ সহানুভূতি ছিল। সুতরাং তাঁহার অনুমতি পাইতে

কষ্ট পাইতে হইল না। মলহার রাও হোলকার, রণোজি সিন্ধিয়া, গোবিন্দজী বুন্দেলা প্রভৃতি মারাঠা সেনানায়কগণকে সহকারীরূপে লইয়া বাজীরাও প্রথমে মালব প্রদেশে অভিযান করেন এবং মালবরাজ গিরিধরকে দুইবার যুদ্ধে পরাস্ত করেন। মালব বিজয়ের পর মহারাজ সাহু অনেকটা বাজীরাও-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কর্ণাট অধিকার করিবার জন্য অভিযান করেন (১৭২৬ খ্রীঃ)। ঐ অভিযানের ফলে কর্ণাট হইতেও মারাঠাদিগের প্রাপ্য চৌথ ও সরদেশমুখী বাবদ বহু অর্থ লাভ হয়। মারাঠারা যখন কর্ণাট আক্রমণ করে, তখন নিজাম-উল-মুল্ক কতিপয় সেনানীর হস্তে কর্ণাট রক্ষার ভার দিয়া স্বয়ং মারাঠাদের উত্তরাঞ্চল আক্রমণ করেন। এই কারণে কর্ণাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পরেই বাজীরাওকে ঐ অঞ্চলে শান্তি স্থাপন করিতে যাইতে হইয়াছিল।

বাজীরাওএর এই অনুপস্থিতিতে নিজাম-উল-মুল্ক মহারাজ সাহুর নিকট প্রস্তাব পাঠাইলেন যে, মারাঠারা যদি তাঁহার অধিকার ভুক্ত স্থানে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের স্বত্ব ত্যাগ করেন তাহা হইলে, তিনি তদ্বিনিময়ে মারাঠাদিগকে নগদ কয়েক কোটী টাকা ও কয়েকটি পরগণা প্রদান করিবেন। বাজীরাওএর বিরুদ্ধবাদী কয়েকজন দুষ্ট বুদ্ধি লোকের পরামর্শে সরলমতি মহারাজ সাহু ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু বাজীরাও জানিতে পারিয়া নিজামের প্রস্তাব একেবারে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি মহারাজ সাহুকে বুঝাইলেন যে, মারাঠারা যদি এইভাবে স্বেচ্ছায় নিজামের অধিকার ভুক্ত স্থানে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের স্বত্ব পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে উক্ত রাজ্যে মারাঠাদের সার্ব্বভৌম ক্ষমতার হ্রাস পাইবে। নিজামের রাজ্যে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার মারাঠারা মুঘল বাদশাহের প্রদত্ত সনন্দ বলে লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ অধিকার ত্যাগ করা তাঁহাদের যুক্তিযুক্ত হইবে না। তাহা হইলে নিজামের মারাঠা-ভীতি কমিয়া যাইবে এবং তিনি মারাঠাদের বিরুদ্ধবাদীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিবার সুযোগ লাভ করিবেন। বাজীরাও-এর প্রস্তাব সমীচীন বোধ হওয়ায় মহারাজ সাহু পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিলেন। ইহাতে প্রতিনিধি শ্রীপতিরাও ও বাজীরাওএর মধ্যে ঘোর শত্রুতা বৃদ্ধি পাইল। কারণ শ্রীপতিরাওই নিজামের পক্ষ লইয়া মহারাজ সাহুকে সকল বিষয় সম্মত করাইবার চেষ্টা করেন।

এই প্রথম কৌশল নিস্ফল হইলে নিজাম মারাঠাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন। পর বৎসর

বাজীরাও প্রেরিত কর্মচারীরা নিজাম রাজ্যে চৌথ আদায় করিতে গমন করিলে, তিনি তাহা দিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন সাতারা-পতি মহারাজ সাহু ও কোলাপুরপতি শম্ভুজী উভয়েই যখন তাঁহার নিকট চৌথ দাবী করিতেছেন, তখন কে মারাঠা রাজ্যের প্রকৃত অধিপতি তাহা নির্ণীত না হইলে তিনি কাহাকেও চৌথ দিবেন না। নিজামের এই কৌশল বাজীরাও এর বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি নিজামের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক চৌথ আদায় করিবার আয়োজন করিলেন। এই উপলক্ষে নিজাম ও মারাঠাদের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। বাজীরাও এর রাজনীতি ও যুদ্ধ পরিচালনার কৌশলে নিজাম বাহাদুর বিষম বিপদে পড়িয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের সকল প্রকার ব্যবস্থা হইল এবং নিজাম ভবিষ্যতে মহারাজ শম্ভুজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া অথবা তাঁহার সাহায্য লইয়া মহারাজ সাহুর বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এই যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট কোনও ঘটনায় বাজীরাওএর বীরত্বে প্রীত হইয়া নিজাম বাহাদুর বলিয়াছিলেন—'ইস মুল্কমে এক বাজী, ঔর সব পাজি' অর্থাৎ এজগতে এক বাজীরাওই (বীরশ্রেষ্ঠ) আর সকলেই অধম। (মার্চ্চ, ১৭২৮খ্রীঃ)।

সমগ্র ভারতে পুনরায় হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করাই বাজীরাও-এর প্রধান লক্ষ্য ছিল। সেই জন্য কোনও হিন্দু নরপতি বিপন্ন হইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেই তিনি সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেন। নিজামের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইবার কয়েক মাস পরেই, বুন্দেলা রাজ ছত্রশাল সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পত্র প্রেরণ করেন। বাজীরাও অনতিবিলম্বে বুন্দেলা-রাজের সাহায্যার্থ অভিযান করেন। মুঘল সেনাপতি মহম্মদ খাঁ বঙ্গষ তখন বুন্দেলা রাজ্য আক্রমণ করিয়া ছত্রশালকে এক দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাজীরাও বঙ্গষের সহিত যুদ্ধ করিয়া বৃদ্ধ বুন্দেলা-রাজকে উদ্ধার ও তাঁহার রাজ্য মুঘল আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। কৃতজ্ঞ বুন্দেলাধিপতি পুরস্কারস্বরূপ বাজী-রাওকে যমুনা তীরবর্ত্তী ঝাঁশি দুর্গ এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে বহু ভূসম্পত্তি প্রদান করিলেন। কয়েক বৎসর পরে ছত্র-শালের মৃত্যুর সময়ে বাজীরাও পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তখন ছত্রশাল বাজীরাওকে স্বীয় রাজ্যের অনেক অংশ প্রদান করেন। তদবধি বুন্দেলখণ্ড চৌথ পদ্ধতিসূত্রে মারাঠা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৩৮ খ্রীঃ অব্দে মহম্মদ বঙ্গষ পুনরায় বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করেন। সেবারেও বাজীরাও ছত্রশালের পুত্র জগৎ রাজের সাহায্যের

জন্য গমন করেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় বঙ্গষকে পরাজিত করিয়া বুন্দেলারাজ্য নিরুপদ্রব করেন।

গুজরাত প্রদেশের প্রতি মারাঠাদের অনেক দিন হইতেই লোলুপ দৃষ্টি ছিল। নিজামের সহিত প্রথম যুদ্ধকালে বাজীরাও একবার গুজরাত আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১৭২৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি আর একবার গুজরাতে অভিযান করেন এবং তত্রস্থ মুঘল সুবেদার সরবলন্দ খাঁকে মারাঠা আধিপত্য মানিয়া লইতে এবং চৌথ ও সরদেশমুখী প্রদান করিতে আদেশ প্রদান করেন। পূর্ব্বেই আরও কতিপয় সেনাপতি গুজরাতে মারাঠা প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। সরবলন্দ খাঁ দিল্লী হইতে সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। তৎসত্ত্বেও ত্র্যম্বকরাও দাভাড়ে, পিলাজী গায়কবাড় কণ্ঠাজী কদম প্রভৃতি মারাঠা সেনানীগণ গুজরাতের নানাস্থানে লুট তরাজ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখন বাজীরাও স্বয়ং গুজরাতে গমন করিলেন। তাঁহার সহিত সরবলন্দ খাঁর সন্ধি হইল। সুবেদার মারাঠাদিগকে চৌথ ও সরদেশমুখী প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। বিনিময়ে মারাঠারা সকল প্রকার বহিঃশত্রুর আক্রমণ অথবা অন্তর্বিপ্লব হইতে গুজরাতকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সরবলন্দ খাঁর সহিত বাজীরাও'এর এই বন্দোবস্ত ত্র্যম্বকরাও প্রমুখ অপর মারাঠা সেনাপতিদের মনঃপূত হইল না। বাজীরাওএর ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব ও প্রতিপত্তি তাঁহাদিগকে বাজীরাওএর প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ করে। তদ্ভিন্ন এই বন্দোবস্তে তাঁহাদের যথেচ্ছাচারের পথ রুদ্ধ হওয়ায় তাঁহাদের আরও ক্রোধ হয়। সর্ব্বোপরি এই বন্দোবস্ত করিবার সময়ে বাজীরাও তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করেন নাই বলিয়া, তাঁহারা নিজদিগকে অবজ্ঞাত মনে করিতে লাগিলেন।

অতঃপর ঐ সকল সেনানীদের মধ্যে ত্র্যম্বকরাও দাভাড়ে প্রথমে বাজীরাওএর বিরুদ্ধে উত্থিত হইলেন। নিজামও পূর্ব্ব বৈরী স্মরণ করিয়া গোপনে দাভাড়ের সাহায্য করিতে লাগিলেন। গায়কবাড় কণ্ঠাজী প্রভৃতি সর্দ্দারেরাও দাভাড়ে সহিত মিলিত হইয়া, বাজীরাওএর সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর হইলেন। বাজীরাও যথাসময়ে সংবাদ পাইয়া বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে প্রস্তুত হইলেন। নিজাম বাহাদুর ঐ গৃহশত্রুদের সাহায্য করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া তিনি প্রথমে, নিজাম যাহাতে বিদ্রোহীদের সাহায্যের জন্য সৈন্য পাঠাইতে না পারেন তাহার ব্যবস্থা করিলেন। অতঃপর ১৭৩১ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে বাজীরাও ও

বিদ্রোহীদের মধ্যে যে তুমুল সংগ্রাম হইল তাহাতে বিপক্ষদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। মারাঠাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ বৃদ্ধি পায় ইহা বাজীরাওএর আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তজ্জন্য যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াও তিনি পরাজিত স্বজাতীয় সেনানীদের প্রতি কোনওরূপ দুর্ব্যবহার করেন নাই। বরঞ্চ যুদ্ধে হত ত্র্যম্বকরাও দাভাড়ের পুত্রকে পিতৃপদ প্রদান করিয়া শান্তি স্থাপন করেন। মহারাজ সাহুর চেষ্টায় পিলাজীরাও গায়কোবাড়ের সহিত তাঁহার সদ্ভাব পুনস্থাপিত হইল। মালব ও গুজরাতের রাজস্ব আদায় ও বিভাগ সম্বন্ধেও উভয় পক্ষেরই সন্তোষজনক মীমাংসা হইল।

অধুনা উল্লিখিত মারাঠা সেনানীদিগকে নিজাম বিদ্রোহী হইতে উৎসাহ দিয়াছিলেন বলিয়া, বাজীরাও তাঁহাকে উচিত শিক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু নিজাম ইহা জানিতে পারিয়া ভীত হইয়া স্বয়ংই সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। তৎকালে স্থির হইল যে তিনি মারাঠাদের আভ্যন্তরিক কোনও ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ করিবেন না। অথবা বাজীরাওকে দক্ষিণ ভারতের অন্য সকল স্থানে প্রভাব বিস্তার করিতে বাধা দিবেন না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই জিঞ্জিরা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের সিদ্দিরা মারাঠা রাজ্যে অতিশয় উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। শ্রীপতিরাও প্রমুখ সেনানীর প্রথমে ঐ উপদ্রব দমনে বিফল মনোরথ হইলে বাজীরাও স্বয়ং সিদ্দি দমনে যাত্রা করেন। তিনি সিদ্দিগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কয়েকটি প্রসিদ্ধ দুর্গ অধিকার করিলেন এবং ঐ অঞ্চলের এগারটি মহালের আয়ের অর্দ্ধাংশ পাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এইভাবে গুজরাত, মালব ও দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য স্থানে মারাঠা প্রভুত্ব দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া বাজীরাও উত্তর ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

যদিও পূর্ব্বে বাজীরাও মালবে ও গুজরাতে মারাঠা প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, তথাপি পুনরায় তাঁহাকে ঐ দুই স্থানে অভিযান করিতে হইয়াছিল। মালবের তদানীন্তন সুবেদার অতিশয় অত্যাচারপরায়ণ হওয়ায়, শান্তি স্থাপন করিবার জন্য তথায় গমন করা বাজীরাও আবশ্যক বোধ করেন। গুজরাতের সুবেদার সরবলন্দ খাঁ মারাঠাদিগকে চৌথ ও সরদেশমুখী প্রদান করিতে সম্মত হওয়ায়, দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে পদচ্যুত করেন এবং তৎপরিবর্ত্তে অভয় সিংহ নামক এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন। বাজীরাও প্রথমে মালবের সুবেদার দয়া বাহাদুরকে পরাস্ত করেন। বাদশাহের আদেশে মোহাম্মদ খাঁ বঙ্গষ, দয়া বাহাদুরকে সাহায্য

করিতে আসিয়া বিফল মনোরথ হন। তখন জয়পুরপতি জয়সিংহের অনুরোধে বাদশাহ মালবে মারাঠা আধিপত্য স্বীকার করিতে রাজী হইলেন। কিন্তু লিখিত কোনও সনন্দ না দেওয়াতে ভবিষ্যৎ বিবাদের মূল থাকিয়া গেল।

অতঃপর বাজীরাও প্রথমে গুজরাতের সুবেদার অভয় সিংহকে পরাস্ত করিয়া তথায় পুনরায় মারাঠা প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন। এই সময়েই তাঁহাকে সিদ্দিদিগকে দমন করিতে যাইতে হওয়ায়, তিনি সিন্ধে ও হোলকারকে দিল্লি অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। মারাঠা বাহিনী আগ্রা পর্য্যন্ত পৌছিলে বাদশাহ ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু প্রথমবারের প্রস্তাবগুলি বাজীরাওএর মনঃপুত না হওয়ায়, তিনি নিজের কতকগুলি সর্ত্ত প্রদান করিলেন। পরিশেষে একটা রফা হইল এবং তৎফলে মারাঠারা সমস্ত দক্ষিণ ভারতের 'সরদেশপাণ্ডে' পদের অধিকার লাভ করিলেন। এই অধিকার বলে নিজামের অধিকৃত সমস্ত প্রদেশের আয়ের উপর শতকরা পাঁচ টাকা বা মোট বার্ষিক নব্বই লক্ষ টাকা তাঁহাদের প্রাপ্য হইল। নিজামের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের সুযোগ ত্যাগ করা অসঙ্গত হইবে বলিয়া, বাজীরাও বাদশাহের প্রধান মন্ত্রী খান দৌরানকে ছয় লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিয়া ঐ স্বত্ব ক্রয় করিলেন। ইহার ফলে মারাঠাদের প্রতি নিজামের বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পাইল।

কিন্তু সমগ্র উত্তর ভারতে, বিশেষতঃ মুঘলশাসিত প্রদেশসমূহে মারাঠা প্রভুত্ব বিস্তার করিবার এবং ভারতে পুনরায় হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার যে উচ্চাশা বাজীরাও পূর্ব্বাবধি পোষণ করিতেন, এই সকল সাময়িক এবং বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থায় তাহা পূর্ণ হইতেছে না দেখিয়া তিনি আর সময়ক্ষেপ না করিয়া বাহুবলে অভীষ্ট লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তৎফলে পুনরায় মারাঠা-মুঘল সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। দিল্লীর বাদশাহও মারাঠাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া গোপনে নিজামের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। নিজামও মারাঠাদের প্রতি পূর্ব্ব বিদ্বেষবশতঃ আনন্দের সহিত সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু নিজামের সাহায্য পৌছিবার পূর্ব্বেই মারাঠাদের সহিত বিভিন্ন স্থানে মুঘলদের একাধিক সংঘর্ষ উপস্থিত হইল এবং শেষ পর্য্যন্ত বাদশাহ মারাঠাদের সহিত, তাহাদের সর্ত্তানুযায়ী সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন (মে, ১৭৩৪ খ্রীঃ)। এই সংঘর্ষের ফলস্বরূপ বাদশাহ মালব প্রদেশে মহারাজ সাহুর একচ্ছত্র আধিপত্য স্বীকার করিলেন এবং যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ত্রয়োদশ লক্ষ মুদ্রাও তাঁহাকে দিতে হইল।

এই মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষ শান্ত হইবার পর নিজাম নিজ বাহিনী লইয়া দিল্লীতে বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন দুষ্ট বুদ্ধি ওমরাও-দিগের পরামর্শে, বাদশাহ পুনরায় নিজামকে মারাঠা দলনে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। অনেক সামন্ত রাজপুত নৃপতি, অযোধ্যার নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্র, কোটার রাজা দুর্জ্জনশাল এবং রোহিলারা নিজামের সহিত মিলিত হইলেন। নিজামকে উৎসাহ দিবার জন্য বাদশাহ তাঁহার পুত্রকে মালব ও গুজরাতের সুবেদারীর সনন্দও প্রদান করিলেন।

অতঃপর পুনরায় মারাঠাদের সহিত সম্মিলিত বাদশাহী বাহিনার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল (জানুয়ারী ১৭৩৮ খ্রীঃ)। কয়েক মাস যুদ্ধ বিগ্রহাদি চলিবার পর নিজাম দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হইলেন। সুশিক্ষিত সৈন্যদল এবং উৎকৃষ্ট তোপখানা থাকা সত্বেও মারাঠা সেনানীদের বুদ্ধি কৌশলে নিজাম ভোপাল দুর্গে আবদ্ধ হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হইলেন মারাঠারা যে সকল স্থান পূর্ব্বে একাধিকবার জয় করিয়াছিলেন, সে সকল স্থানে তাঁহাদের আধিপত্য পুনরায় স্বীকৃত হইল এবং মারাঠারা বহু অর্থ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পাইলেন (মার্চ্চ, ১৭৩৮ খ্রীঃ)।

বাজীরাও যখন এইভাবে উত্তর ও মধ্য ভারতে যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন তখন কোঙ্কন প্রদেশে পর্ত্তুগীজ বণিকেরা অতিশয় উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। বাজীরাওএর অনুজ চিমণাজী আপ্পা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহাদের উৎপাত দমন করিতে পারেন নাই। বাজীরাও উত্তর ভারত হইতে প্রত্যাগত হইয়া পর্ত্তুগীজ দমনে যাইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার চেষ্টায় তখনকার মত উপদ্রব কিছু হ্রাস পাইল।

ইহার পরেই নাদির শাহ দিল্লী আক্রমণ করেন। তিনি দক্ষিণ ভারতেও আসিতে পারেন এই আশঙ্কায় বাজীরাও নিজাম প্রভৃতি সকল দেশীয় রাজাকে নাদির শাহকে বাধা দিবার জন্য মিলিত হইতে আহ্বান করেন। কিন্তু নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করাতে, ঐরূপ মিলিত আয়োজনের আর প্রয়োজন হয় নাই।

নাদির শাহের আক্রমণ-ভীতি দূর হইলে বাজীরাও কোঙ্কন উপকূলস্থ স্থান সমূহে পোর্ত্তুগীজ উপদ্রব দমন করিতে মনোনিবেশ করেন। বাজীরাও পেশোয়া হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই তাহারা বাণিজ্য ব্যপদেশে সমুদ্র তীরবর্ত্তী কতিপয় স্থানে কুঠী স্থাপন করে। কিন্তু ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাহারা বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে থাকে। ক্রমে নানাস্থানে তাহাদের অত্যাচার আরম্ভ

হইল। স্থানীয় অধিবাসীরা অনন্যোপায় হইয়া মহারাজ সাহুর শরণাপন্ন হইলেন। বাজীরাও পূর্ব্বেই পোর্ত্তুগীজদের অত্যা-চারের কথা শুনিয়াছিলেন এবং তাহা-দিগকে দমন করিবার ব্যবস্থাও করিতে ছিলেন। এক্ষণে মহারাজ সাহুরও উৎসাহ পাইয়া অনুজ চিমণাজী আপ্পা ও আরও কয়েকজন সেনানীকে লইয়া পোর্ত্তুগীজ দের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া স্থানে স্থানে খণ্ড যুদ্ধ ও কিছু নৌযুদ্ধও হয়। ক্রমে ক্রমে মারাঠারা পোর্ত্তুগীজ অধিকৃত অনেক স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। এই সময়ের মধ্যে গুরুতর রাজনীতিক কারণে বাজীরাওকে পুনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হওয়ায় তিনি পোর্ত্তুগীজ দলনের ভার অনুজ চিমণাজী আপ্পার উপর প্রদান করিলেন। চিমণাজীও বাজীরাওএর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া অশেষ বীরত্ব প্রকাশপূর্ব্বক অল্পকাল মধ্যেই পোর্ত্তুগীজদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন। বসই দুর্গ অধিকার করিবার সময়ে (মে, ১৭৩৯ খ্রীঃ) মারাঠাদের শৌর্য্য ও রণকৌশলের একাধিক বৈদেশিক লেখকও ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। বসই দুর্গ অধিকৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঞ্চলে পোর্ত্তুগীজ প্রভাব ও অত্যাচার বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়।

এই পোর্ত্তুগীজদিগের বিরুদ্ধে অভিযান চলিবার মধ্যেই, নিজামের বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযান করিবার আবশ্যক হওয়ায় বাজীরাও পুনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভোপালের যুদ্ধের পর নিজামের সহিত যে সকল সর্ত্ত হয়, নিজাম সে সকল সর্ত্ত যথাযথ পালন করিতে শৈথিল্য প্রদর্শন করাতেই, বাজীরাও আবার তাঁহাকে শিক্ষা দিবার দরকার বোধ করিলেন। এই ব্যাপারে নাগপুরের ভোঁসলে বংশীয় রঘুজী তাঁহার সহায় হইলেন। নিজাম এই সময়ে দিল্লীর নিকটে ছিলেন। তদ্ভিন্ন নিজামের পুত্রগণের মধ্যেও ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সুযোগে বাজীরাও প্রথমেই নিজামের জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসির জঙ্গকে আক্রমণ করিলেন। এই সময়ের মধ্যে সিন্ধে, হোলকার প্রভৃতি সেনানীরাও বাজীরাওএর সহিত যোগদান করিলেন। ফলে কয়েক মাস যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়াও, নাসির জঙ্গ সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন (মার্চ্চ, ১৭৪০ খ্রীঃ)। এই সন্ধির ফলে খান্দেশের কয়েকটী পরগণা মারাঠাদের অধিকারভুক্ত হইল।

এযাবৎ মারাঠাদের সকল অভিযানই দিল্লী পর্য্যন্তই হইয়া আসিতেছিল। এইবার বাজীরাও উত্তর ভারতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত মারাঠা প্রভুত্ব বিস্তার করিবার জন্য, সিন্ধে, হোলকার, চিমণাজী প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে নর্ম্মদার প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশে উপস্থিত হইবার পর তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন এবং কিছুকাল রোগাক্রান্ত থাকিয়া ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে, মাত্র একচল্লিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

বাজীরাও বিংশতি বৎসরকাল পেশোয়ার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘকালের অধিকাংশই যুদ্ধ বিগ্রহে অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া, তিনি আভ্যন্তরিণ ব্যবস্থায় অধিক মনোযোগ দিবার সুযোগ পান নাই। তাঁহার বীরত্ব ও উচ্চাকাঙ্খা অসাধারণ ছিল। কোনও রূপ নীচতা তাঁহার চরিত্রকে কলঙ্কিত করে নাই। বস্তুতঃ তদানীন্তন মারাঠা রাজপুরুষদিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত, সদ্বক্তা, দূরদর্শী পুরুষ আর কেহ ছিল না। রাজনীতিক্ষেত্রে অনেক সময়ে তাঁহার সদয় ব্যবহারই তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বিপদগ্রস্ত করিয়াছিল দুঃখের বিষয় তাঁহার স্বজাতীয়দের মধ্যে তাঁহার অনেক বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। তাঁহাদের বিপক্ষতাচরণের জন্য তিনি অনেক সময় স্বাভিষ্ট সম্পাদন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি আজীবন নিঃস্বার্থভাবে, অন্যের অনিষ্ট চিন্তা না করিয়া, যথাসাধ্য মারাঠা গৌরব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

বাজীরাও (দ্বিতীয়)—শেষ মারাঠা পেশোয়া। প্রথম মারাঠা যুদ্ধের পর রঘুনাথ রাও বন্দীভাবে গোদাবরী তীরে কোপারগাঁওতে বাস করিতে থাকেন। (রঘুনাথ রাও দ্রষ্টব্য) তথায় ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে তাঁহার মৃত্যু হয়। দুই বৎসর পরে পেশোয়া সওয়াই মাধব রাও মৃত হইলে, কে পেশোয়া হইবেন তাহা লইয়া সমস্যার সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিকভাবে মাধবরাওএর ভ্রাতুষ্পুত্র বাজীরাওএরই পেশোয়া পদে দাবী ছিল কিন্তু নানা ফড়নবিশ ইহাতে বিশেষ সম্মত ছিলেন না। তিনি পরামর্শ দেন যে, মাধবরাওএর বিধবা এক পোষ্য পুত্র গ্রহণ করুন এবং সেই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি স্বয়ং রাজ্যশাসন করিবেন। কিন্তু অন্যান্য মারাঠা সেনাপতি বা সামন্ত রাজারা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তখন নানা ফড়নবীশ, বাজীরাওএর কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিম্‌নাজী আপ্পাকে পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টাও বিফল হওয়ায়, তিনি আত্মরক্ষার জন্য পুনা পরিত্যাগ করিয়া সাতারায় প্রস্থান করেন।

এই সময়ের মধ্যে বাজীরাওএর সহিত দৌলতরাও সিন্ধিয়ার এক বন্দোবস্ত হয় যে, দৌলতরাও যদি বাজীরাওকে পেশোয়ার পদ পাইতে সাহায্য করেন, তবে বাজীরাও বিনিময়ে তাঁহাকে এক কোটী পঁচিশ লক্ষ

টাকা নগদ এবং পঁচিশলক্ষ টাকা আয়ের জায়গীর দিবেন। এই বন্দোবস্ত হওয়ায় দৌলত রাও, বাজীরাওএর পক্ষ অবলম্বন করিতে পুনায় উপস্থিত হইলেন। তাহার পূর্ব্বেই বাজীরাও ও তাঁহার অনুজ চিম্‌নাজী আপ্পা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুনাতে দৌলত রাও বাজীরাওএর নিকট পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির প্রথম কিস্তীবাবদ পঁচিশ লক্ষ টাকা দাবী করিলেন। বাজীরাও এক কারণ দর্শাইয়া উহা দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন, ইহাতে দৌলতরাও ক্রুদ্ধ হইয়া চিম্‌নাজীকে পেশোয়া পদে বরণ করিতে মনস্থ করিলেন। এই কার্য্যে নানা ফড়নবীসের অন্যতম সহযোগী পরশুরাম ভাউ তাঁহার সহায় হইলেন। তাঁহাদের উভয়ের মিলিত চেষ্টায় চিম্‌নাজী আপ্পা পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত হইলেন।

নানা ফড়নবীশ এই সংবাদ পাইয়া ভীত হইলেন, এবং পরশুরাম ভাও তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ফড়নবীসের মধ্যস্থতায় বাজীরাওএর সহিত ইংরেজদের এইরূপ সন্ধির প্রস্তাব হইল যে, ইংরেজ নগদ মুদ্রা ও জায়গীরের বিনিময়ে বাজীরাওকে পেশোয়ার পদলাভে সহায়তা করিবেন। কিন্তু ইংরেজেরা এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে একেবারেই সম্মত না হওয়ায় নানা ফড়নবীশ তুকোজী হোলকার, রঘুজী ভোঁসলা, কোলাপুরের রাজা, নিজাম প্রভৃতি সকলের সহিত গোপনে আলোচনা করিয়া ও তাঁহাদিগকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া, বাজীরাওএর পক্ষ অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এমন কি সিন্ধিয়াও শেষে ফড়নবীশকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। পরশুরাম ভাউ এই সংবাদ পাইয়া, চিম্‌নাজীকে লইয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু পরে ধৃত হইয়া নিহত হন। চিম্‌নাজীকে বন্দী করিয়া বাজীরাওএর নিকট আনয়ন করা হয়। ইহার কিছুকাল পরে (নবেম্বর, ১৭৯৬ খ্রীঃ) বাজীরাও যথারীতি পেশোয়া বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। নানা ফড়নবীশ তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হইলেন।

বাজীরাও প্রথমাবধিই ফড়নবীশের আধিপত্য হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে থাকেন। সিন্ধিয়াও, ফড়নবীশের প্রভুত্ব বিশেষ পছন্দ করেন নাই। ফলে অল্পকাল পরেই উভয়ের মিলিত চক্রান্তে ফড়নবীশ ক্ষমতাচ্যুত ও বন্দী হইলেন, তাঁহার স্থলে অমৃতরাও প্রধান মন্ত্রী হইলেন। সিন্ধিয়ার প্রাপ্য অর্থের দাবী মিটাইবার জন্য বাজীরাও কতকগুলি নূতন কর স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন; ইহাতে দেশে আরও অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইল।

অল্পকাল মধ্যে বাজীরাওএর সহিত সিন্ধিয়ার বিবাদ উপস্থিত হইল। সিন্ধিয়ার অর্থের দাবী মিটাইবার জন্য বাজীরাও যে সব ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার ফলে দেশে ভয়ানক অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমন কি কোনও কোনও স্থলে বিদ্রোহের ভাব দেখা গেল। তখন অমৃতরাও সিন্ধিয়াকে বন্দী করিবার জন্য বাজীরাওকে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু বাজীরাওএর সে চেষ্টা সফল হইল না। সিন্ধিয়াও তখন আত্মরক্ষার জন্য, এবং বাজীরাওকে জব্দ করিবার জন্য, নানা ফড়নবীশকে মুক্তি দিয়া স্বপক্ষে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিলেন। নানারূপ আলোচনার পর স্থির হইল যে, নানা ফড়নবীশ পুনরায় প্রধান মন্ত্রী হইবেন। কিন্তু এবারে নানা ফড়নবীশ মন্ত্রী হইয়া দীর্ঘকাল কাজ করিবার সুযোগ পাইলেন না। অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় সিন্ধিয়াই আবার ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার যথেচ্ছাচারিতায় রাজ্য মধ্যে অসন্তোষ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাজীরাও নিজেও খুব ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁহারও অব্যবস্থায় ও কুব্যবস্থায় নানারূপ উপদ্রবের সৃষ্টি হইতে লাগিল। তিনি কঠোর হস্তে সে সকল দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলে অসন্তোষের মাত্রা বাড়িয়াই চলিল। খ্রীঃ ১৮০০ সালে, তাঁহার নিজ রাজ্য যশোবন্তরাও হোলকারকর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায়, দৌলতরাও বাধ্য হইয়া পুনায় আধিপত্য করিবার লোভ পরিত্যাগ করিয়া, নিজ রাজ্য রক্ষার্থ গমন করিলেন। যখন হোলকারের সহিত সিন্ধিয়ার যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন পুনাতে নানারূপ ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। বাজীরাও চেষ্টা করিয়াও সে সকল আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারেন নাই। অপর দিকে হোলকার সিন্ধিয়াকে কিছু পরিমাণে পর্য্যুদস্ত করিয়া বাজীরাওকে স্ব-অধীনে আনিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। বাজীরাও উপায়ান্তর না দেখিয়া শেষে ইংরেজদের শরণাপন্ন হন। ১৮০২ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে বাজীরাও সিন্ধিয়া ও ইংরেজদের মিলিত সেনার সহিত হোলকারের যুদ্ধ হয়। তাহাতে হোলকারই জয়লাভ করেন। বাজীরাও রাজধানী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। তখন হোলকার, বাজীরাওএর পূর্ব্বতন মন্ত্রী অমৃতরাওকে পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু নানা গোলমালে তাহা হইয়া উঠিল না। হোলকার বাজীরাওকে বন্দী করিবারও চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাও বিফল হয়। বাজীরাও তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া বোম্বাইএর ইংরেজ শাসনকর্ত্তার শরণা-

পন্ন হন এবং তাঁহার নিকট সর্ব্বপ্রকার সাহায্য প্রার্থনা করেন। বোম্বাইএর শাসনকর্ত্তা প্রাথমিক সাহায্য প্রদান করিয়া, বড়লাটের নিকট কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য উপদেশ চাইয়া পাঠাইলেন। বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলী মারাঠাদের এই অন্তর্বিবাদের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি লিখিলেন যে বোম্বাইএর কর্তৃপক্ষ যেন বাজীরাওকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করেন এবং তাঁহার সহিত নূতনভাবে সন্ধি করেন। তখন সেই বৎসর ডিসেম্বর মাসে ইংরেজদের সহিত বাজীরাওএর নূতন সন্ধি হইল; বাজীরাও ইংরেজদিগকে রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন এবং তাঁহারাও বিনিময়ে বাজীরাওকে সকল প্রকার শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই সন্ধির ফলে বাজীরাও বহুল পরিমাণে ইংরেজদের অধীন হইয়া পড়িলেন। হোলকার চারিদিক পর্য্যালোচনা করিয়া স্ব-রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দের ৩রা মে বাজীরাও পুনরায়, ইংরেজদের সহায়তায় পেশোয়ার গদীতে আরোহণ করিলেন।

এই সময়ের মধ্যেই ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে টিপু সুলতান পরাজিত ও নিহত হন। যুদ্ধের পূর্ব্বে, টিপু গোপনে বাজীরাওএর সাহায্য লাভের চেষ্টা করেন। ১৭৯০ খ্রীঃ অব্দের 'ত্রিশক্তির মিলন' (Policy of Triple Alliance) নীতির ফলে পেশোয়া ইংরেজদিগকে সাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন। নানা ফড়নবীস যতদিন বাজীরাওএর মন্ত্রী ছিলেন, ততদিন টিপু সুলতান বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারেন নাই। কিন্তু বাজীরাও টিপু সুলতানকে সাহায্য করিতেই উৎসুক ছিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত নানারূপ ঘটনা বিপর্য্যয়ের জন্য শেষ পর্য্যন্ত কিছুই হইয়া উঠে নাই।

পেশোয়ার পদ লইয়া মারাঠাদের মধ্যে যে যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছিল, তাহার মধ্যে প্রবেশ করা, তদানীন্তন বড়লাটের প্রথমে আদৌ ইচ্ছা ছিল না। ইংরেজেরা বাস্তব পক্ষে তখন এবিষয়ে নিষ্ক্রিয়নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। বাজীরাও স্বয়ং যদি যাচিয়া ইংরেজদের সাহায্য না লইতে যাইতেন, তাহা হইলে এই সব ব্যাপারে ইংরেজেরা খুব আগ্রহের সহিত যুক্ত হইতেন না। শেষের দিকে অবশ্য ইংরেজদের এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয় এবং ফরাসীদের সহিত যুদ্ধে নিজাম, মারাঠা প্রভৃতি দেশীয় ক্ষমতাশালী নরপতি সমূহের সাহায্য পাইবার জন্য তাঁহারা উৎসুক হন। সেই কারণেই বাজীরাও ইংরেজদের সাহায্য লাভ করিতে বিশেষ অসুবিধা বোধ করেন নাই। ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে পেশোয়ার সহিত ইংরেজদের

যে নূতন সন্ধি (Renewal of Subsidiary Alliance) হয়, তাহার ফলে, ইংরেজরা টিপু সুলতানের রাজ্যের কিয়দংশ পেশোয়াকে কতকগুলি সর্ত্তে, প্রদান করিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু সর্ত্তগুলি লইয়া শেষ পর্য্যন্ত কোনও মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারায় ইংরেজদের ইচ্ছা আর কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

ইংরেজদের সহায়তায় গদি লাভ করিয়াও পেশোয়ার অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক হয় নাই। একাধিক বিরুদ্ধবাদী লোকের উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদাই সশঙ্ক থাকিতে হইত। তাঁহার পিতার পোষ্য পুত্র অমৃতরাও, পেশোয়ার গদি লাভের জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাঁহাকে শান্ত করিতে পেশোয়াকে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। আর্থিক ও সামরিক সুব্যবস্থা করিবার জন্য, অথবা ইংরেজদের সহিত নবস্থাপিত সন্ধির সর্ত্তসমূহ পূরণ করিবার জন্য তিনি যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে থাকেন, তাহাদের ফলে দেশে অসন্তোষ বাড়িয়াই চলিতে থাকে। এইজন্য মধ্যে ইংরেজকর্ত্তৃপক্ষকে মধ্যস্থ হইতে হইত। ফলে পরোক্ষভাবে পেশোয়ার ক্ষমতা হ্রাস ও ইংরেজদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে থাকে। মারাঠা সর্দ্দার বা সামন্ত রাজাদের অনেকেই পেশোয়ার অধীনতা স্বীকার করিতে অসম্মত হন। কেহ কেহ বিদ্রোহী হইলেন। ১৮০৪ খ্রীঃ অব্দে পরশুরাম শ্রীনিবাস প্রতিনিধি নামক জায়গীরদারেরা বিদ্রোহী হন। তাঁহাকে দমন করিতে পেশোয়াকে কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। যাহা হউক ক্রমে দেশে শান্তি স্থাপিত হয় এবং ১৮০৭ খ্রীঃ অব্দে যখন লর্ড মিণ্টো ভারতের বড়লাট হইয়া আসেন তখন পেশোয়ার অধিকার ভুক্ত স্থান সমূহে অপেক্ষাকৃত শান্তি বিরাজ করিতেছিল। ১৮১১ খ্রীঃ অব্দে মনষ্টুয়ার্ট এলফিন ষ্টোন (Monstuart Elphinstone) পেশোয়ার রাজদরবারে ইংরেজ দূত (Resident) হইয়া আসেন। তাঁহার মধ্যস্থতায় পুনার দক্ষিণাঞ্চলের জায়গীরদার ও সর্দ্দারদের সহিত পেশোয়ার সদ্ভাব স্থাপিত হইল এবং তাঁহাদের প্রায় সকলেই পেশোয়ার আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইলেন। কোলাপুরের রাজার সহিতও পেশোয়ার নানা কারণে বিবাদ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তাহাও এলফিন ষ্টোনের মধ্যস্থতায় অনেকটা শান্ত হয়। এই সকল ঘটনার ফলে পরোক্ষভাবে পেশোয়ার উপর ইংরেজদের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বাজীরাও তাহা বুঝিতে পারেন, কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও কোনও প্রতীকার করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

এলফিনষ্টোন দূতরূপে আসিবার পরেই, পেশোয়া তাঁহার মারফৎ ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন যে, তাঁহার সেনাদলকে উন্নততর যুদ্ধ প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য কতিপয় সুদক্ষ ইংরেজ সেনাপতি দেওয়া হউক। তিনি তাহাদের সমুদয় বেতন দিবেন। বাজীরাও-এর এই প্রস্তাবে প্রথমে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ রাজী হন নাই। দেশীয় রাজাদের ইয়োরোপীয় প্রথায় সুশিক্ষিত সেনা-বাহিনী গঠন যে, ইংরেজদের স্বার্থের অনুকূল হইবে না, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন। কিন্তু পরে তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হয় এবং কয়েকজন ইংরেজ সেনানী পেশোয়ার সৈন্যদলকে উন্নততর প্রণালীতে সুশিক্ষিত করিবার জন্য প্রেরিত হন।

কিন্তু এই ব্যবস্থা সবদিক দিয়া বাজীরাওএর অনুকূল হইল না। যে সকল ইংরেজ সৈনিক কর্ম্মচারী বাজীরাওএর সৈন্যদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রেরিত হন, তাঁহারা বাস্তবপক্ষে ইংরেজ কোম্পানীর কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহাদের উপর বাজীরাওএর কোনও-রূপ প্রভুত্ব ছিল না। সুতরাং তাঁহাদের কাজ ঠিকমত হইতেছিল কিনা তাহাও ধরিতে গেলে বিচার করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তদ্ভিন্ন আর এক বিষয়েও বাজীরাও ক্ষমতাহীন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম যখন সেনা দলের জন্য লোক ভর্ত্তি করা হইত, তখন তাহাদিগকে এই প্রতিজ্ঞা করান হইত যে, তাহারা বাজীরাওএর বশীভূত থাকিবে, তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিবে। কিছুকাল পরে তাহাদের প্রতিজ্ঞা বাক্যে এইটুকু অতিরিক্ত যোগ করিয়া দেওয়া হইল যে—যতদিন কোম্পানীর সহিত বাজীরাওএর সদ্ভাব থাকিবে ততদিন মাত্র তাহারা বাজীরাও এর অধীনতা স্বীকার করিবে ; প্রকৃত-পক্ষে তখন ইহাই দাঁড়াইল যে বাজীরাও নিজের অর্থ ব্যয় করিয়া, ইংরেজ সেনানীদের দ্বারা যে সুশিক্ষিত সৈন্য দল সৃষ্টি করিলেন, তাহা কেবল এমন স্থলেই কার্য্যকরী হইবে যেখানে ইংরেজ কোম্পানীর কোনও স্বার্থ থাকিবে না। এই ব্যবস্থায় বাজীরাও আরও অধিক ইংরেজদের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িলেন।

পেশোয়া বালাজী বাজীরাওএর (বাজীরাও প্রথম) সময় হইতেই বরদার গায়কোয়াড়ের সহিত অর্থনৈতিক বিবাদ চলিতেছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে প্রতিশ্রুত অর্থের জন্য পেশোয়া গায়কোয়াড়ের নিকট অর্থ দাবী করেন। ১৭৫১ খ্রীঃ অব্দে দামাজী গায়কোয়াড়ের সময় হইতে ঐ দাবী আরম্ভ হইয়াছিল এবং ১৮০৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত উহার পরিমাণ প্রায় চার কোটী টাকা দাঁড়াইয়াছিল। বরো-

দার গায়কোয়াড় ইংরেজদের মধ্যস্থতায় এই বিষয়ে একটি শেষ মীমাংসা করিতে উৎসুক হন। বাজীরাও প্রথমে ইহাতে খুব সম্মত না হইলেও, পরে সম্মত হই লেন। এই সকল বিষয় আলোচনা ও হিসাব পত্র মিলাইয়া পেশোয়ার প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য উভয় পক্ষের সম্মতিতে (বিশেষ ভাবে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে) গঙ্গাধর শাস্ত্রী নামক একজন সুদক্ষ উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী বরোদা হইতে পুনায় প্রেরিত হইলেন। কিন্তু বহুকাল পুনায় অবস্থান করিয়াও কিছু মীমাংসা করিতে পারিলেন না। পেশোয়াও যেন শীঘ্র শীঘ্র একটা মীমাংসায় উপনীত হইতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন না। ইতিমধ্যে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে গঙ্গাধর শাস্ত্রী আততায়ীর হস্তে নিহত হওয়ায়, একটা গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। বাজীরাও এই ভীষণ ঘটনার সহিত সাক্ষাৎভাবে কতদূর জড়িত ছিলেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা না গেলেও, ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ও বরোদার গায়কোয়াড় পেশোয়াকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া মনে করিলেন না। বস্তুতঃ গঙ্গাধর শাস্ত্রীর হত্যার পর হইতেই মারাঠা ও ইংরেজদের মধ্যে রাজনীতিক অবস্থা বিশেষ জটিল হইয়া উঠিল। পুনার রেসিডেণ্ট এলফিনষ্টোন সাহেব ত্রিম্বকজী ভাঙলিয়াকে এই হত্যার জন্য প্রধানভাবে দায়ী মনে করেন; তাঁহার বিশেষ দাবীতে পেশোয়া অনেকটা বাধ্য হইয়া ত্রিম্বকজীকে বন্দী করিয়া ইংরেজদের হস্তে সমর্পণ করেন। ইংরেজরা তাঁহাকে বোম্বাইএর নিকটবর্ত্তী ঠানা নামক স্থানে এক দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখেন।

পেশোয়া অবশ্য ইহা আদৌ পছন্দ করেন নাই। সেইজন্য কয়েক মাস পরে যখন সংবাদ আসিল যে ত্রিম্বকজী ঠানার দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছেন। তখন বাজীরাও বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

ত্রিম্বকজী স্বাধীনতা লাভ করিয়া গোপনে বলসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। এলফিনষ্টোন সাহেব ক্রমে ক্রমে সকল সংবাদই পাইতে লাগিলেন। বাজীরাও গোপনে ত্রিম্বকজীকে সাহায্য করিতেছেন সন্দেহ করিয়া, এলফিনষ্টোন লিখিলেন যে, বাজীরাও যেন অনতিবিলম্বে ত্রিম্বকজীকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিবার যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, কিন্তু পুনঃ পুনঃ এবং নির্ব্বন্ধাতিশয় অনুরোধেও বাজীরাও কিছুই করিলেন না। বরঞ্চ তাঁহার হাবভাব দেখিয়া, তিনি যে ত্রিম্বকজীকে গোপনে সাহায্য করিতেছেন, এই সন্দেহই এলফিনষ্টোনের মনে বদ্ধমূল হইল।

এদিকে পেশোয়াও এমনভাবে সব

ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন যাহাতে এলফিনষ্টোনের মনে হইল যে,বাজীরাও ইংরেজদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবেন। তখন তাঁহারা বিশেষ কঠোরতার সহিত কতকগুলি বিষয় দাবী করিলেন, ফলে বাজীরাও বাধ্য হইয়া ত্রিম্বকজীকে গঙ্গাধর শাস্ত্রীর হত্যাকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং যে ব্যক্তি ত্রিম্বকজীকে ধৃত করিতে পারিবে তাহাকে প্রচুর পুরস্কার দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। তাহা সত্বেও বাজীরাওএর অভিসন্ধি ইংরেজেরা আশঙ্কাজনক বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন এবং বড়লাট লর্ড হেষ্টিংস বাজীরাওএর সহিত সম্পূর্ণ নূতনভাবে এবং কঠিনতর সর্ত্তে সন্ধি করিবার জন্য এলফিনষ্টোনকে নির্দ্দেশ দিলেন। এইরূপ নির্দ্দেশও দিয়াছিলেন যে, বাজীরাও যদি সন্ধির সর্ত্ত সকল গ্রহণ করিতে অসম্মত হন, তবে বলপ্রয়োগেও যেন তাঁহাকে সেই সকল সর্ত্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়।

কিন্তু বলপ্রয়োগ করিতে হইল না। বাজীরাও নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত এবং সম্পূর্ণ বাধ্য হইয়াই সমস্ত সর্ত্ত মানিয়া লইয়া, নূতন সন্ধি করিলেন। ইহার ফলে তাঁহার ক্ষমতা আরও সঙ্কুচিত হইল। অন্য কোনও দেশীয় রাজ্যের সহিত স্বাধীনভাবে কোনও বিষয় আলোচনা করিবার তাঁহার আর ক্ষমতা রহিল না। তিনি একরূপ ইংরেজদের সামন্ত রাজারূপে পরিগণিত হইলেন। ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দের ১৩ই জুন এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল।

এই নূতন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেও, বাজীরাও মনে মনে ইংরেজদের উচ্ছেদ কামনাই করিতেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে অন্যান্য মারাঠা রাজ্যগুলিতে ইংরেজ বিদ্বেষ প্রধূমিত হইতেছিল এবং তাহারা সকলেই যথাসাধ্য গোপনে পরস্পরের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে উত্থিত হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। অবশ্য ইংরেজেরা এসকল বিষয় অধিকাংশই জানিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহারাও যথা কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে ছিলেন।

ভিতরে ভিতরে যে বিদ্বেষ বহ্নি প্রধূমিত হইতেছিল, ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে তাহার প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। সামান্য কয়েক মাস অনির্দ্দিষ্ট অবস্থার মধ্যে কাটিল। নবেম্বর মাসে প্রকৃতপক্ষে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ইহাই ইতিহাসে দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

বাজীরাও যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তখন তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, হোলকার, নিজাম, সিন্ধিয়া প্রভৃতির নিকট হইতে সাহায্য পাইবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা একেবারেই সফল হয় নাই।

ইন্দোরের হোলকার এবং ভোঁসলে কিছু সাহায্য করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ে, অনেকটা বাজীরাওএর অজ্ঞাতেই, সিন্ধিয়া ইংরেজদের সহিত এক সন্ধিতে আবদ্ধ হন। তাঁহার ফলে বাজীরাওকে কোনরূপ সাহায্য করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। নিজাম মনে মনে ইংরেজদের উচ্ছেদ কামনা করিলেও প্রকাশ্যে মারাঠাদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন না। সুতরাং বাজীরাওকে, ধরিতে গেলে, কয়েকজন জায়গীরদার ও সর্দারদের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধ চালাইতে হইল।

প্রথমেই কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধে বাজীরাওএর পরাজয় হওয়াতে তিনি আত্মরক্ষার জন্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পলায়ন করিতে লাগিলেন। আশা ছিল বিভিন্ন স্থানে নূতন করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিবেন। কিন্তু একাধিক ইংরেজ সেনাপতি যেভাবে বিভিন্ন দিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ইহাতে তাঁহার সে আশাও পূর্ণ হইল না। তিনি এইভাবে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকায়, ইংরেজেরা আস্তে আস্তে তাঁহার বিভিন্ন দুর্গগুলি অধিকার করিয়া লইতে লাগিলেন। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নামক স্থানে যে সামান্য যুদ্ধ হয়, তাহাতে বাজীরাওএর প্রধান সহকারী বাপু গোখলে নিহত হন। সেই যুদ্ধই প্রকৃতপক্ষে বাজীরাওএর শেষ যুদ্ধ; তাহার পর তিনি আর কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কয়েক মাস স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়া জুন মাসে, উপায়ান্তর না দেখিয়া ম্যালকমের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।

ভবিষ্যতে যাহাতে আর কোনও গোলমাল না হইতে পারে, তজ্জন্য ইংরেজ সরকার বাজীরাওএর প্রতি কোনওরূপ কৃপা প্রদর্শন করিলেন না। তাঁহারা বাজীরাওকে তাঁহাদের সকল প্রকার সর্ত্ত বিনা আপত্তিতে মানিয়া লইতে বাধ্য করিলেন। বার্ষিক মাত্র আট লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া, বাজীরাও কানপুরের নিকট বিঠুর নামক স্থানে যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হইলেন।

বিঠুরে বাজীরাও প্রায় ত্রিশ বৎসর বাস করেন। বহুদিন পর্য্যন্ত পেশোয়ার পদ পুনরায় লাভ করিবার ক্ষীণ আশা তিনি পোষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই মনোভাবের সুযোগ লইয়া অ্যাডাম ম্যাক্সওয়েল (Adam Maxwell) নামক একজন সাহেব এবং ওমরাও আলি নামক আর এক ব্যক্তি পেশোয়ার পদ পুনরায় পাওয়াইয়া

দিবেন এইরূপ মিথ্যা আশ্বাস দিয়া তাঁহার নিকট হইতে বহু অর্থ বঞ্চনা পূর্ব্বক গ্রহণ করেন। ইংরেজ আদালতে বিচারে অবশ্য উভয়েই আইনানুযায়ী দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পেশোয়ার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কালেই বাজীরাও ছয়জন নারীর পাণিগ্রহণ করেন। বিঠুরে বাস করিবার কালে তদুপরি আরও পাঁচটী নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকজনের গর্ভে কয়েকটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সকলেই শৈশবে গতায়ু হয়। ১৮২৭ খ্রীঃ অব্দে বাজীরাও চোন্দোপন্থ নানা সাহেব নামে তাঁহার এক আত্মীয়-পুত্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। তাহার পর তিনি আরও দুইটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে জানুয়ারী মাসে সাতাত্তর বৎসর বয়সে বিঠুরেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে, (দ্বিতীয়) বাজীরাওকে পেশোয়ার পদের যোগ্য বলিয়া মনে করা যায় না। অবশ্য পারিপার্শ্বিক অনেক ঘটনার প্রভাব তাঁহার চরিত্রকে যথাযথভাবে গঠিত হইতে দেয় নাই। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী পেশোয়াদের কাহারও সহিত তাঁহাকে যোগ্যতার মাপকাঠিতে তুলনা করা চলে না। তাঁহার জীবিতকালেই মারাঠা সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার অযোগ্যতাই ইহার একমাত্র কারণ নহে। পূর্ব্ব বাঁশে ঘুণ ধরিয়াছিল। অন্তর্বিপ্লব ও স্ব স্ব প্রধান হইবার চেষ্টায় সমগ্র মারাঠা জাতি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ঐ সময়ের মধ্যে যে ভাবে ধীরে ধীরে ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিল তাহাতে মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন বাজীরাওএর সময়ে না হইলেও অচিরেই যে ঘটিত সে বিষয়ে সংশয় করা যায় না।

বাজী সোমরাজ—তিনি বিজাপুরের নবাবের অধীনস্থ একজন সেনাপতি। ছত্রপতি শিবাজীকে বন্দী করিয়া বিজাপুরের নবাব মোহাম্মদ আদিল শাহের (১৬২৬—১৬৫৬ খ্রীঃ অব্দ) প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিবাজী গুপ্তচর মুখে ইহা অবগত হইয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া প্রাণ লইয়া পলাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

বাঞ্ছানাথ—এই জ্যোতিষী পণ্ডিত 'ভাবদর্পণ' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বাঞ্ছারাম নন্দী—১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে ঢাকা নগরী নবাবের অধীনস্থ কর্ম্মচারীর শাসনাধীন ছিল। এই শাসনকর্ত্তা অতি নিষ্ঠুরভাবে রাজস্ব আদায় করিতেন। এই সময়ে সুসঙ্গ রাজের রাজস্ব অনাদায়ী ছিল। সেই জন্য নাবালক

রাজকুমার কিশোর সিংহ ও তাঁহার অনুজ রাজসিংহ ধৃত হইয়া ঢাকায় নীত হন। শাসনকর্ত্তার সম্মুখে এই বালকদ্বয়কে উপস্থিত করিলে, তিনি আদেশ করিলেন যে, রাজস্ব অনাদায় পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রত্যেক বালককে দশটী বেত্রাঘাত করিতে হইবে। এই আদেশ শুনিয়া শিশু রাজকুমারদ্বয় রোদন করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময়ে একের শাস্তি অন্যে গ্রহণ করিতে পারিত। রাজকুমারদ্বয়ের সঙ্গে তাঁহাদের বিশ্বস্ত পরিচারক বাঞ্ছারাম নন্দী ছিলেন। প্রভুভক্ত প্রাচীন ভৃত্য বাঞ্ছারাম ইহা শুনিয়া এই শাস্তি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। প্রতিদিন কুড়ি ঘা বেত তাঁহার পৃষ্ঠে পড়িতে লাগিল। এইরূপে তিনদিন তিনি বেত্রদণ্ড গ্রহণ করিলেন। তথাপি রাজস্ব আদায় হইল না দেখিয়া, পরদিন শিশু রাজকুমারদ্বয়কে কামানের মুখে উড়াইয়া দিয়া জমিদারী হস্তান্তর করিবার আদেশ জারী হইল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় পরদিন প্রভাতেই তোপধ্বনীদ্বারা জানান হইল যে, ঢাকা নগরী সেই দিন হইতেই ব্রিটিশের অধিকারে আসিল। রাজকুমারদ্বয় রক্ষা পাইলেন।

বাণ—একজন সংস্কৃতের কবি। তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'চণ্ডীশতক'। খ্রীঃ দশম শতকে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

বাণকুমারী—বৌদ্ধ যুগের অবসানে আসামের গোয়াল পাড়া, কামরূপ প্রভৃতি স্থানে মন্ত্রবিদ্যার চরম উন্নতি হইয়াছিল। হাড়ীঝিচণ্ডী, বাণকুমারী, শশুরী ঝি কামাখ্যা প্রভৃতি গোয়ালপাড়াবাসিনী মহিলাগণ মন্ত্র ও যাদুবিদ্যায় সিদ্ধা ছিলেন এবং ভৈরবী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

বাণ পাল—তিনি পালবংশীয় একজন রাজা। সম্ভবতঃ তিনি সপ্তগ্রামে রাজত্ব করিতেন। কবিরাম বিরচিত 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' গ্রন্থ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে রাজা মহীপালের পুত্র বিভাণ্ড বাণরাজের মন্ত্রী ছিলেন।

বাণভট্ট— হর্ষচরিতাদি প্রণেতা। তিনি চিত্রভানুর পুত্র, অর্থপতির পৌত্র এবং পাশুপতের প্রপৌত্র। তাঁহারা বাৎস্যগোত্রাপত্য বিহার দেশীয় ব্রাহ্মণ। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের আশ্রয়ে থাকিয়া বাণভট্ট 'পার্ব্বতী পরিণয়' 'কাদম্বরী' ও 'শ্রীহর্ষ চরিত' প্রণয়ন করেন। শ্রীহর্ষ চরিতে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। শার্ঙ্গধর পদ্ধতি হইতে জানা যায় যে, বাণভট্টের সহিত সূর্য্যশতক প্রণেতা ময়ূরভট্টও হর্ষবর্দ্ধনের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। কাদম্বরী গ্রন্থ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তিনি পরলোক গমন করেন। তৎপর তাঁহার পুত্র ভূষণ বাণ 'কাদম্বরী' গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। বাণভট্ট খ্রীঃ ৬ষ্ঠ--৭ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

বাণসিংহ, রাজা—আসামের অন্তর্গত জয়ন্তিয়াপতি যশোমন্ত সিংহের মৃত্যুর পরে ১৬৬০ খ্রীঃ অব্দে বাণসিংহ রাজা হন। ১৬৬৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলে, প্রতাপ সিংহ রাজা হইয়াছিলেন। বাণ সিংহের সহিত আহোম নরপতি চক্রধ্বজের (সুপাং মাং) প্রণয় ছিল। ১৬৬৩ খ্রীঃ অব্দে চক্রধ্বজের সিংহাসন আরোহণ কালে বাণসিংহ নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন।

বাণীকণ্ঠ—একজন প্রাচীন বাঙ্গালী গ্রন্থকার। তিনি 'মোহমোচন' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন।

বাণীদত্ত—বোপদেব কৃত শতশ্লোকী গ্রন্থের বাণীদত্ত কৃত 'ভাবার্থ দীপিকা' নামে এক টীকা বর্ত্তমান আছে।

বাণীবিলাস— একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। তিনি পরাশর কৃত 'হোরা' গ্রন্থের এক টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বাণীরাম ঠাকুর—একজন পাঁচালীকার। 'নিয়তমঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী' তাঁহার রচিত। ইহার দুইখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

বাণীরামধর—একজন কবি। তিনি কবিতাকারে 'শীত-বসন্ত' উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন।

বাণেশ্বর—পাঁচ শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বাণেশ্বর পণ্ডিত ত্রিপুরার 'রাজমালা' নামক ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান শ্রীহট্ট জিলার ঢাকা দক্ষিণ পরগণার অন্তর্গত ঠাকুরবাড়ী গ্রাম। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শুক্রেশ্বর। তাঁহারা শ্রীহট্টের প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত। শ্রীহট্টের ঐ অংশ তখন ত্রিপুরা মহারাজের রাজ্যভুক্ত ছিল। বাণেশ্বর ত্রিপুরার তদানীন্তন নরপতি ধর্ম্মমাণিক্যের (১৪৩১—১৪৬২ খ্রীঃ অব্দ) সভাপণ্ডিত ছিলেন। বাণেশ্বর স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর শুক্রেশ্বর ও ত্রিপুরার চতুর্দ্দশ দেবতার পুরোহিত দুর্লভেন্দ্র চন্তাইএর সাহায্যে রাজমালা রচিত করিয়াছিলেন।

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার— ইংরেজ রাজত্বের প্রথমযুগের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। দেবীবর ঘটকের গুরু শোভাকরের বংশে তাঁহার জন্ম হয়। বাণেশ্বরের পিতার নাম রামদেব তর্কবাগীশ।

কুল প্রথামত চতুষ্পাঠীর অধ্যয়ন সমাপন করিয়া তিনি নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত হন। কোনও কারণে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হওয়ায় বাণেশ্বর বর্দ্ধমানরাজ চিত্রসেনের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং রাজাদেশে 'চিত্রচম্পূ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। উহা গদ্যে পদ্যে লিখিত চিত্রসেনের জীবনী। সেই সময়ে দেশে বর্গীর হাঙ্গামা চলিতেছিল। বাণেশ্বরের গ্রন্থ

হইতে বর্গীর হাঙ্গামার অনেক বিবরণ জানিতে পারা যায়।

রাজা চিত্রসেনের মৃত্যুর পর বাণেশ্বর পুনরায় কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ সভায় আগমন করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের মারফৎ ইংরেজ সরকারেও তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রভাব হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক ব্যবস্থা তাঁহার নিকট হইতে লওয়া হইত। এই বিষয়ে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

কিছুকাল পরে তিনি নদীয়া ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন এবং রাজা নবকৃষ্ণের আশ্রয়ে থাকেন। নবকৃষ্ণ প্রদত্ত ভূমিতে তিনি বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

দেওয়ানী পাইবার পর, হেষ্টিংসের (Warren Hastings) আমলে যখন দেওয়ানী আদালতের কাজের সুবিধার জন্য হিন্দু আইন সংকলন করিবার আবশ্যকতা তীব্রভাবে অনুভূত হইল, তখন যে এগারজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের উপর উপযুক্ত গ্রন্থ প্রণয়নের ভার প্রদত্ত হয়, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান ছিলেন। অন্যান্য দশজনের মধ্যে, পলপুরের কৃপারাম, জোড়াবাড়ীর রামগোপাল তর্কপঞ্চানন ও কালীকিঙ্কর, এবং সীতারাম ভাট এই কয়জনের নাম পাওয়া গিয়াছে। এই এগারজন পণ্ডিত মিলিত হইয়া দেওয়ানী আদালতের বহু নজীর দেখিয়া একখানি গ্রন্থ সংকলন করিয়া দেন, তাহার নাম হয় 'বিবাদার্ণব-সেতু'। প্রথমে সংস্কৃতজ্ঞ একজন মৌলবীকে দিয়া উহা ফারসীতে অনুবাদ করান হয়; পুনরায় ফারসী হইতে হালহেড্‌স নামে একজন সাহেব উহা ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। উহার ইংরেজি সংস্করণের নাম হয় হালহেড্‌স জেন্টু ল (Halhad's Gentoo Law)। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত এই গ্রন্থখানিই সুপ্রীম কোর্টের প্রধান ভরসা ছিল। পরে সার উইলিয়াম জোন্‌স (Sir Willam Jones) জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সাহায্যে আর একখানি নূতন সংহিতা প্রণয়ন করেন। তাহার নাম 'বিবাদভঙ্গার্ণব'।

বাণেশ্বরের "চিত্রচম্পূ" কাব্য ১৬৬৬ শকে (১৭৪৩ খ্রীঃ) রচিত হয়। আজ পর্য্যন্ত উহাতে প্রদত্ত বর্গীর হাঙ্গামার বিবরণ, প্রাচীনতম বলিয়া গৃহীত হইতেছে।

বাতায়ন নাথ—তিনি নাথপন্থী এক- সিদ্ধপুরুষ। অপান নাথ দেখ।

বাতাসু সরকার—প্রাচীন বাঙ্গালী মুসলমান কবি। তাঁহার নিবাস বগুড়া জিলায় ছিল। ১২৪৬ বঙ্গাব্দে তিনি 'ছিলছত্র বাজারজঙ্গ' নামে একটী গ্রন্থ রচনা করেন।

বাৎস্যায়ণ—(১) একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। 'পুরুষ লক্ষণ' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

বাৎস্যায়ন—(২) তিনি ন্যায় দর্শনের ভাষ্যকার। তিনিই চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। চাণক্য দেখ।

বাদরুল ইসলাম শেখ—তিনি শেখ মইনউদ্দিন আব্বাসের পুত্র। বঙ্গের স্বাধীন রাজা গণেশকে (১৪০৫—১৪১৪ খ্রীঃ অব্দ) রাজসভায় উপস্থিত হইয়া অভিবাদন না করায় নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

বাদরায়ণ—একজন জ্যোতির্ব্বিত পণ্ডিত। 'বাদরায়ণ প্রশ্ন' নামক গ্রন্থ ও 'মুহূর্ত্ত দীপিকা বা দর্পণ' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত। এতদ্ব্যতীত বৃহজ্জাতকের টীকায় উৎপল ভট্ট বাদরায়নের কৃত জাতকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

বাদরি—একজন প্রাচীন ভেদাভেদবাদী। তাঁহার মতে বেদজ্ঞানী পুরুষের শরীরাদি নাই। সেই হেতু মুক্ত পুরুষ নিরিন্দ্রিয় এবং অশরীর।

বাদল—চিতোরের রাণা রতন সিংহের পত্নী রাণী পদ্মিনীর রূপ লাবণ্যের কথা শুনিয়া দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেন। রাজপুত ও মুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে পদ্মিনীর পিতৃব্য গোরা নিহত হন এবং ভ্রাতা বাদল ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া আহত হইয়া শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শত্রুপক্ষীয়েরা গোড়া ও বাদলের বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিল। যুদ্ধে রতন সিংহ নিহত হন। পদ্মিনী অগ্নি-প্রবেশ করেন। রতনসিংহ, পদ্মিনী ও গোরা দেখ।

বাদিচন্দ্র—জৈন গ্রন্থকার। তিনি অষ্টাদশ সর্গে পাণ্ডবপুরাণ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। উহা মহাভারতের জৈন সংস্করণ। এইরূপ তাঁহার আরও অনেক গ্রন্থ আছে।

বাদীরাজ—দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের বাদীরাজ 'পার্শ্বনাথ চরিত্র' নামে জৈনদের একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বান্দা—গুরু গোবিন্দ সিংহের একজন প্রিয় শিষ্য। তিনি দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ও বৈরাগী সম্প্রদায়ের একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। গুরুগোবিন্দের মৃত্যুর পরে তিনি শিখদিগকে সমবেত করিয়া গুরুর শর প্রদর্শন করিলেন এবং বলিলেন যে, তাহাদের জয় সুনিশ্চিত। তাঁহার বাক্যে শিখগণ উৎসাহিত হইয়া গুরুগোবিন্দের পুত্র হত্যার প্রতিশোধ লইতে কৃতসংকল্প হইলেন। প্রথমেই শিরহিন্দ দুর্গের অধিপতি উজির খাঁর প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়িল। শিরহিন্দের অধিবাসীরা শিখদের আগমন সংবাদ পাইয়া দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। দুর্গ আক্রমণ হইল, উজির খাঁ শিখদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হইলেন।

দিল্লীর সম্রাট প্রথম বাহাদুর

শাহ সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে তাঁহার ভ্রাতা কামবক্সকে দমনে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্রীদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া রাজপুতদিগকে দমন করিবার জন্য উদ্যোগী হইতেছিলেন, এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন যে, শিখেরা প্রবল হইয়া শিরহিন্দের শাসন কর্ত্তাকে হত্যা করিয়াছে। বাহাদুর শাহ দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আর রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন না। তখনই সসৈন্যে লাহোর অভিমুখে রওনা হইলেন। পথিমধ্যে তাঁহার সেনাপতিরা একদল শিখকে পরাস্ত করিয়া বান্দার অভিমুখে রওনা হইলেন। বান্দা অবিলম্বে লোহাগড় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মুঘল সৈন্য দুর্গ পরিবেষ্টন করিলে, বান্দার একটী অনুচর যুবক, বান্দার বেশে দুর্গ হইতে বহির্গত হইলে, মুঘল সৈন্য তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। ইত্যবসরে বান্দা দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া পলায়ন করিলেন। অতঃপর বান্দা কয়েকটী সামান্য সামান্য যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, লাহোরের উত্তরবর্ত্তী পর্ব্বতমালা মধ্যে জম্মুর সন্নিকটে স্বীয় আবাসস্থান স্থাপন করিলেন। ইতিমধ্যে ১৭১২ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বাহাদুর শাহ লাহোরে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীর সিংহাসন লইয়া বাহাদুর শাহের পুত্রদের মধ্যে ভীষণ কলহ আরম্ভ হইল। মুঘলদিগের এই সমুদয় আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও অন্তর্দ্রোহে শিখদিগের বিশেষ সুবিধা হইল। তাঁহারা পুনর্ব্বার মিলিত হইয়া অজেয় হইয়া উঠিল। তাঁহারা বিপাশা ও ইরাবতী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে, গুরুদাসপুর নামে একটী বৃহৎ দুর্গ নির্ম্মাণ করিল।

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পরে জাহান্দর শাহ নয় মাস দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তৎপরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফররুখশিয়ার ১৭১৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন। লাহোরের শাসনকর্ত্তা শিখদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু একটী খণ্ড যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলেন। শিখেরা তখন শরহিন্দ অভিমুখে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তথাকার শাসনকর্ত্তা বায়জিদ খাঁ তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু একটী ধর্ম্মোন্মত্ত যুবক ধীর পদবিক্ষেপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করে। সেই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। অধিনায়কের মৃত্যুতে মুসলমানগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। দিল্লীর সম্রাট, কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা আবদুল সামাদ খাঁকে লাহোরের শাসন কর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়া শিখদিগকে দমন করিতে আদেশ দিলেন। তিনি তুরাণি বংশীয় একজন সম্ভ্রান্ত

ব্যক্তি ও সুচতুর সেনাপতি ছিলেন। বান্দার সৈন্যের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। প্রথমে বান্দা প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া বহু মুঘল সৈন্য নিহত করিলেন; কিন্তু পরে বিপুল মুঘল সৈন্যের সহিত পারিয়া উঠিলেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়া তিনি গুরুদাস-পুরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মুঘল সৈন্য দুর্গ পরিবেষ্টন করিয়া, দুর্গে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণের পথ রুদ্ধ করিলেন। কিছুদিন মধ্যেই দুর্গে খাদ্যা-ভাব উপস্থিত হইল। বান্দার সৈন্য-দল অশ্ব গর্দ্দভ প্রভৃতি ভারবাহী জন্তুর মাংসে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া অবশেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। শিখদিগকে বহিঃস্থিত একটী পট্টাবাসের নিকটে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হইল। তাঁহারা অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে পর, তাঁহাদিগকে অসিমুখে নিক্ষেপ করা হইল। এইরূপে দুই সহস্রাধিক শিখ মৃত্যু বরণ করিল। বান্দাকে স্বর্ণঝালরমণ্ডিত লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া হস্তীপৃষ্ঠে স্থাপনপূর্ব্বক দিল্লীতে প্রেরণ করা হইল। এই স্থানে তাঁহার সহচরদের মধ্যে প্রতিদিন একশত করিয়া নিহত হইতে লাগিল। সপ্তম দিবসের বিচারে তিনি দুষী সাব্যস্ত হওয়ায় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি একজন বিচক্ষণ জ্ঞানী ব্যক্তি হইয়াও কিরূপে এই সকল পাপকার্য্য করিলেন?' তদুত্তরে তিনি উত্তর করিলেন—'আমি দুষ্টের দমনের জন্য ভগবানকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি।'

বান্দার পুত্র তাঁহার সম্মুখে আনীত হইল। বান্দার হস্তে একখানা ছুরিকা প্রদান করিয়া তাঁহাকে স্বীয় পুত্রকে হত্যা করিবার আদেশ দেওয়া হইল। বান্দা অসম্মত হইলে, তাঁহার সম্মুখে তাঁহার পুত্রকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইল। বান্দা অম্লানবদনে তাহা নিরীক্ষণ করিলেন। অবশেষে বান্দাকে হস্তপদ বন্ধনপূর্ব্বক ভূমিতে শয়ান করাইয়া উত্তপ্ত সন্দংশদ্বারা তাঁহার গাত্র হইতে মাংসখণ্ড ছিন্ন করিয়া বধ করা হইল। এইরূপ অমানুষিক অত্যা-চারেও তাঁহার মানসিক স্থৈর্য্য নষ্ট না হওয়ায় সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা ১৭১৫ খ্রীঃ অব্দে সংঘটিত হয়।

বান্দা ঠাকুর—মেবারের রাণা অমর সিংহের রাজত্বকালে (১৫৯৭—১৬২০ খ্রীঃ) অন্তলা দুর্গ মুঘলদের অধিকারে ছিল। রাজধানীর নয় ক্রোশ পূর্ব্বে অন্তলা দুর্গ অবস্থিত। রাণা অমর সিংহ যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার শক্তাবৎ ও চন্দাবৎ সর্দ্দারদের মধ্যে সেনাদলের সম্মুখ রক্ষণ ভার লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল। এযাবৎ এই সম্মান চন্দাবতেরাই লাভ

করিয়া আসিতেছিলেন। এখন সক্তাবতেরা শক্তিশালী হইয়া এই সম্মানের দাবী করিলেন। রাণা অমর সিংহ নানা প্রকারে এই বিবাদ মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইয়া বলিলেন—'যে দল অগ্রে অন্তলা দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে, তাঁহারাই 'হিরোল' রক্ষার ভার প্রাপ্ত হইবে।' সেনাবলের সম্মুখ ভাগকে হিরোল কহে। রাণার বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র উভয় দল তর্ক-বিতর্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তলা অধিকার করিবার জন্য প্রধাবিত হইলেন। অন্তলা একটী উচ্চ ভূমির শির্ষদেশে অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিক উচ্চ পাষাণময় প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত। এই দুর্গে প্রবেশ করিবার মাত্র একটী পথ। শক্তাবৎ সর্দ্দার হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দুর্গের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বারে শঙ্কু সংলগ্ন থাকায় হস্তী মস্তক দ্বারা দ্বার ভগ্ন করিতে পারিল না। শক্তাবৎ সর্দ্দার হস্তী পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া স্বয়ং পৃষ্ঠদেশ দ্বারে সংলগ্ন করিয়া মাহুতকে তাঁহার দিকে হস্তীকে চালাইতে আদেশ দিলেন। সর্দ্দারের দেহ হস্তীর মস্তকের আঘাতে নিষ্পেষিত হইয়া গেল কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই দুর্গের দ্বারও ভগ্ন হইল। শক্তাবৎ সৈন্যেরা দলে দলে দুর্গে প্রবেশ করিল।

অপরদিকে চন্দাবৎ সর্দ্দার দুর্গ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে যাইয়া প্রাণ হারাইলেন। তিনি প্রাচীরতলে পতিত হইলেও সৈন্যেরা অধিনায়কের মৃত্যুতে সাহস হারাইল না। অন্যতম সর্দ্দার বান্দা ঠাকুর, সেই মৃত দেহ একখানি উত্তরীয়দ্বারা জড়াইয়া আপন পৃষ্ঠে দৃঢ়-রূপে বন্ধনপূর্ব্বক দুর্গ প্রাচীরে আরোহণ করিলেন। হস্তস্থিত শূলদ্বারা শত্রু সৈন্য নিপাত করিতে করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া সর্দ্দারের মৃত দেহ অন্তলার দুর্গ শিরে নিক্ষেপ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যেই বান্দা ঠাকুর 'হিরোল' 'হিরোল' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। হিরোল রক্ষার সম্মান চন্দাবৎদের রহিল। যদিও শক্তাবৎদের আত্মোৎসর্গের কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না। দুর্গ মধ্যস্থ অসংখ্য মুঘল সৈন্য এই উভয় দলের হস্তে প্রাণ হারাইল। অতি অল্পই পলাইয়া প্রাণ বাচাইতে পারিয়াছিল।

বান্দুরাও—তিনি বুন্দির রাজা বীরু রাওএর পুত্র। ১৪৬০ খ্রীঃ অব্দে পিতার মৃত্যুর পরে তিনি রাজা হন। তাঁহার ন্যায় দাতা নরপতি রাজপুত কুলে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি রাজা হইবার অল্প পরেই দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তিনি পূর্ব্বেই ইহা বুঝিতে পারিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই দূরদর্শিতার ফলে তাঁহার প্রজাকুল রক্ষা পাইয়াছিল। এই প্রজা-পালক ধার্ম্মিক নরপতিও শেষজীবনে

কষ্ট পাইয়াছিলেন। তাঁহার দুই ভ্রাতা সমরসিংহ ও অমরসিংহ রাজ্য লোভে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দিল্লীর সম্রাটের সাহায্যে তাঁহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তিনি বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নারায়ণ দাস একাদশ বৎসর পরে পিতৃব্যদ্বয়কে হত্যা করিয়া বুন্দি পুনর্ব্বার অধিকার করেন (১৪৯১ খ্রীঃ)।

বাপুদেব শাস্ত্রী—গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। ১৮২১ খ্রীঃ অব্দে পুনা নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সীতারাম দেব বেদবিৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। শৈশবে বাপুদেব সংস্কৃত এবং মারাঠী বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষা করেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি পিতার সহিত নাগপুরে চলিয়া আসেন এবং তথায় কৌমুদী ব্যাকরণ লীলাবতী ও বীজগণিত অধ্যয়ন করেন। সেহোরের পলিটিকেল এজেণ্ট এল, উইল্‌কিন্সন সাহেব একবার নাগপুরে আসিয়া বাপুদেবের গণিতবিদ্যায় নৈপুণ্য দর্শনে আনন্দিত হন এবং তথা হইতে তাঁহাকে সেহোরে লইয়া যান। সেইখানে যাইয়া বাপুদেব দুইবৎসরকাল সকালে সংস্কৃত কলেজে সিদ্ধান্ত শিরোমণি ও বৈকালে হিন্দী বিদ্যালয়ে পাটীগণিত ও বীজগণিতের অধ্যাপনা করেন। ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে এল, উইল্‌কিন্সন সাহেবের যত্নেই তিনি বেনারস সংস্কৃত কলেজের গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি ইউরোপীয় প্রণালীতে একখানি বীজগণিত হিন্দীতে রচনা করিয়া ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে উত্তর পশ্চিমের ছোট লাট টমাসন কর্ত্তৃক দুই হাজার টাকা মূল্যের একটী খেলাত প্রাপ্ত হন। 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত' তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। হিন্দী ভাষায় বীজগণিতের দ্বিতীয় ভাগ রচনা করিলে, তদানীন্তন ছোট লাট মিউর (Muir) সাহেব দরবার করিয়া তাঁহাকে একহাজার টাকা ও এক যোড়া বহুমূল্যবান্ শাল প্রদান করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় পাটীগণিত, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া সম্মানিত করেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী ইংরেজ সরকার কর্ত্তৃক তিনি সি, আই, ই (C.I.E.) উপাধি ভূষিত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সদস্য ছিলেন। গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। জয়পুরাধিপতি প্রতিষ্ঠিত বেনারসে যে মানমন্দির আছে, ইহার মর্ম্ম সেই সময়ে বাপুদেবই বুঝিতেন এবং বুঝাইবার

সমর্থ রাখিতেন। ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে এই মনীষী পরলোক গমন করেন।

বাপু ভকত—তিনি গুজরাট দেশীয় সাধক। তাঁহার গুরুর নাম ধীরো ভকত। তিনি ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। এখনও গুজরাটী ভাষায় রচিত তাঁহার পদ লোকের মনে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করে।

বাপু সিন্ধিয়া—দৌলতরাও সিন্ধিয়ার অন্যতম সেনাপতি। তাঁহার অত্যাচারে মিবার ভূমি শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। অবশেষে মিবারপতি রাণা ভীমসিংহ ইংরেজের সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহার অত্যাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ভীমসিংহ রাণা দেখ।

বিকু খাঁ, নবাব বাহাদুর—১৭৭৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি শ্রীহট্টের ফৌজদার ছিলেন।

বাপ্পারাও—চিতোরের প্রসিদ্ধ রাণা। ৭৩১ খ্রীঃ অব্দে প্রসিদ্ধ শিলাদিত্যের বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তিন বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা নাগাদিত্য ভিলগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলে পুরোহিতগণ গোপনে বাপ্পাকে রক্ষা করেন। প্রথমে তাঁহারা ভাণ্ডির দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন; কিন্তু এই স্থান নিরাপদ নহে মনে করিয়া তাঁহারা এই শিশু বালকসহ ত্রিকূটগিরির পাদ-তলে আশ্রয় লইলেন। এইস্থানে বাপ্পা ব্রাহ্মণদিগের গোচারণ করিতেন। নিকটেই অরণ্য মধ্যে একলিঙ্গেশ্বর মহাদেবের মন্দির ছিল। শারদীয় ঝুলনোৎসব রাজপুতদিগের একটী বিশেষ আনন্দের উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষে দলে দলে বালক বালিকা এখানে সমবেত হইয়া ঝুলন লীলায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই স্থান শোলাঙ্কীবংশীয় কোন রাজার অধীন ছিল। ঐ রাজ দুহিতা স্বীয় সহচরী ও অন্যান্য কুমারীদের সহিত ক্রীড়ার্থে এই কুঞ্জকাননে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা দোলনার জন্য রজ্জু অন্বেষণ করিতেছিলেন। এমন সময় বাপ্পাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট রজ্জু প্রার্থনা করিলেন। বাপ্পা কৌতুক করিয়া বলিলেন—'তোমরা যদি অগ্রে আমাকে বিবাহ কর, তবে এখনই তোমাদিগকে রজ্জু আনিয়া দি।' কৌতুকপ্রিয়া বালিকাগণ বলিল—'হাঁ তোমাকে বিবাহ করিব।' তখনি রাজনন্দিনীর গাত্রাভরণের সহিত বাপ্পার পরিধেয় বসনাগ্র সংবদ্ধ হইল। সমস্ত বালিকাগণ পরস্পরের কর ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত একত্র এক শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া একটী প্রকাণ্ড সহকার তরু প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল। এই লীলা বিবাহই যে পরে প্রকৃত বিবাহে পরিণত হইবে বাপ্পা তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। উৎসবান্তে সকলেই স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। কিছুকাল পরে রাজ-

কুমারী বিবাহ যোগ্যা হইলে, শোলাঙ্কী রাজ পাত্র স্থির করিলেন। পাত্র পক্ষীয় সামুদ্রিক ব্রাহ্মণ কুমারীর কর রেখা দৃষ্টে বলিলেন—'রাজকুমারীর বিবাহ ইতিপূর্ব্বেই সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে।" এই অভিনব বাক্য শ্রবণে সকলের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। চারিদিকে ইহার অভিনয় কর্ত্তার অনু-সন্ধানে লোক প্রেরিত হইল। বাপ্পাও এই সংবাদ শুনিলেন। তিনি তাঁহার সহচর ভিল বালকগণকে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করিলেন যে, তাঁহার সংবাদ যেন তাহারা কাহাকেও প্রদান না করে; পরন্তু তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাত হইবে তাহা জ্ঞাপন করিবে। তৎপর বাপ্পা সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পর্ব্বত-মালার এক নিভৃত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বালীয় ও দেব নামক দুই-ভিল কুমার তাঁহার সঙ্গী হইল। তাঁহারা আজীবন সুখে দুঃখে তাঁহার সঙ্গে ছিল। এই সময়ে বাপ্পা হারীত নামে এক মহাযোগীর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং নানাপ্রকারে সেবা করিয়া তাঁহার প্রসাদ লাভ করেন। ঐ মহাযোগী তাঁহাকে 'একলিঙ্গাকা দেওয়ান' এই উপাধি প্রদান করেন। ইহার কিছু-দিন পর তিনি সিদ্ধপুরুষ গোরক্ষনাথের দর্শন লাভ করেন। গোরক্ষনাথ তাঁহাকে একখানি দ্বিধার তরবারি প্রদান করেন। তৎপর তিনি স্বীয় মাতুল বংশীয় নরপতি মালবের অধীশ্বর মান-সিংহের দরবারে উপস্থিত হইয়া সামন্ত নৃপতিরূপে জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন। মানসিংহ ভাগিনেয় বাপ্পাকে অধিক সমাদর করেন, এই সন্দেহ বশতঃ অন্যান্য সামন্ত নৃপতিবর্গ বাপ্পার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন: এমন সময়ে শত্রু কর্ত্তৃক চিতোর আক্রান্ত হইল। সামন্ত নৃপতিবর্গ বাপ্পাকে যুদ্ধে পাঠাইতে বলিয়া মানসিংহের প্রতি বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিল। বাপ্পা দ্বিরুক্তি না করিয়া, শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করি-লেন। সামন্ত নৃপতিবর্গ অগত্যা নিজেদের সম্মান রক্ষার্থে বাপ্পার অনু-গামী হইল। বাপ্পা শত্রুকে বিতাড়িত করিয়া বিজয়োল্লাসে রাজধানীতে প্রত্যাগত না হইয়া আপনার পিতৃ পুরুষের রাজধানী গজনী নগরে উপ-স্থিত হইলেন। তথাকার মুসলমান নরপতি সেলিমকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সৌরকুলোৎপন্ন একজন সামন্ত নর-পতিকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং সেলিমের দুহিতাকে স্বয়ং বিবাহ করিয়া চিতোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইতিমধ্যে সামন্ত নৃপতিবর্গ মানসিংহের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে বিনাশ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। বাপ্পা এই সুযোগে সামন্ত নরপতিদের সাহায্যে স্বীয় মাতুলকে অপসারিত

করিয়া চিতোর অধিকার করিলেন। কুতজ্ঞতার পবিত্র মস্তকে পদাঘাত করিয়া বাপ্পা এই গর্হিত কার্য্য করিলেন। পরিণত বয়সে বাপ্পা খোরাসন আক্রমণ করিয়া তদ্দেশ অধিকার করেন। কথিত আছে তিনি ইস্পাহান কান্দাহার, কাশ্মীর, ইরাণ, তূরাণ, কাফ্রাস্থান প্রভৃতি দেশ অধিকার করিয়া তৎ তৎ দেশের রাজকুমারীগণকে বিবাহ করেন। এই সকল রমণীর গর্ভে বাপ্পার ১৩০টী পুত্র জন্মে। তাঁহারা নোশেরা পাঠান নামে খ্যাত। তাঁহারা নিজ নিজ জননীর নামানুসারে এক একটী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। হিন্দু বনিতাদের গর্ভেও ৯৮টী পুত্র জন্মিয়াছিল। তাঁহারা সকলেই অগ্নি উপাসী সূর্য্যবংশীয়। ৮১১ খ্রীঃ অব্দে একশত বৎসরে বাপ্পারাও পরলোক গমন করেন। ৭২৮খ্রীঃ অব্দে তিনি চিতোরের সিংহাসন অধিকার করিয়া ছিলেন।

বাখর জঙ্গ নবাব—মুরশিদাবাদের নবাব মবারক উদ্দৌলার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র বাবর জঙ্গ নবাব হইয়া ১৭৯৩—১৮১০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তখন নবাব নাজিমের বৃত্তি বার্ষিক ১৬ লক্ষ টাকা ও পরিবারস্থ অন্যান্যের বৃত্তি বার্ষিক ২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নবাব আলীজা নবাব হইয়াছিলেন।

বাবর শাহ—ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম জহির উদ্‌দিন মোহাম্মদ বাবর শাহ। প্রসিদ্ধ তুর্কজাতীয় দিগ্বিজয়ী তৈমুরলঙ্গ-এর অধস্তন পঞ্চমপুরুষ ওমর শেখ মির্জা তাঁহার পিতা ছিলেন। ওমর শেখ ফরগনা নামক ক্ষুদ্র এক রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। উহার চতুষ্পার্শ্বে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে তৈমুর বংশধরেরা রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে অতিশয় বৈরীভাব বর্ত্তমান ছিল। বাবরের যখন বয়স মাত্র একাদশ বর্ষ তখন ওমর শেখ মিরজার মৃত্যু হয়। ঠিক সেই সময়েই জ্যেষ্ঠতাত সুলতান আহমদ মিরজা ও তাঁহার শ্যালক মোহাম্মদ খাঁ মিলিত হইয়া বাবরের পিতৃ রাজ্য আক্রমণ করিলেন। দ্বাদশ বর্ষীয় বালক বিশেষ তেজস্বীতার সহিত যুদ্ধ করিয়া সে যাত্রা রাজ্য রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু উহার অধিকাংশ স্থলই সাময়িকভাবে তাঁহার অধিকারচ্যুত হইল। কয়েক বৎসর বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া তিনি ফরগণার সমুদয় অংশ অধিকার করিলেন এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে সমরখন্দ রাজ্যও অধিকার করিলেন। তখন তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র; কিন্তু ইহাতেও তাঁহার বিপদ কাটিল না। ঐ সকল স্থান সম্পূর্ণভাবে নিজ অধিকারে রাখিতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে

হইয়াছিল। তাঁহার শত্রুর অভাব ছিল না। মধ্যে কিছুকালের জন্য তিনি কষ্ট অর্জ্জিত ফারগণা ও সমরখন্দ উভয় রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে অংশ্ত তিনি পুনরায় উভয় রাজ্যই অধিকার করেন। আবার কিছুকাল পরে উভয় রাজ্য হইতেই বিতাড়িত হইলেন। এইভাবে কয়েক বৎসর নানারূপ অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া বাবরের জীবন কাটিল। তিনি পিতৃ রাজ্যহারা হইয়া অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য ক্রমে বাল্খনগরীর সন্নি-কটবর্ত্তী তরমুজ নামক স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে কাবুল রাজ্যে অন্তর্বিদ্রোহ চলিতেছিল। তরমুজ অধিপতি বাখর,বাবরকে কাবুলে যাইয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিতে বলিলেন। বাবর বাখরের পরামর্শানুযায়ী কাবুল অভি-মুখে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কাবুলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বাবর কাবুলের প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলে কাবুলের তদানীন্তন অধিপতি মুকিম বেগ তাঁহাকে বাধা দিলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই বাবরের সহিত মুকিম বেগের সন্ধি স্থাপিত হইল এবং বাবর কাবুল রাজ্যের অধিপতি হইলেন। মুকিম বেগ কাবুল পরিত্যাগপূর্ব্বক কান্দাহারে নিজ ভ্রাতা শাহ বেগ সমীপে গমন করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে তৈমুরবংশীয় নরপতি সুলতান হোসেন মীরজার আহ্বানে বাবর উজবেগ অধিপতি সইবানের আক্রমণ হইতে খোরাসান রক্ষা হেতু হোসেন মীরজার সাহায্যের জন্য গমন করেন। কিন্তু তিনি খোরা-সানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই হোসেন মীরজার মৃত্যু হওয়ায় বাবর প্রথমে হীরাটে গমন করেন এবং পরে কাবুলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বাবরের এই অল্পকাল স্থায়ী অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া তাঁহার পিতৃব্য পুত্র খান মীরজা কাবুলের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। বাবরের প্রত্যাবর্ত্তনে খান মীরজার সুমতি হইল এবং তিনি সিংহা-সন বাবরকে ছাড়িয়া দিয়া কান্দাহারে গমন করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে বাবর পুনরায় উজবেগদিগের নিকট হইতে সমরখণ্ড রাজ্য অধিকার করেন। ইহাতে তাঁহার রাজ্য উত্তরে ও পশ্চিমে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। কিন্তু ইহাতে তাঁহার অদৃষ্টের দুর্ভোগ শেষ হইল না।

সমরখন্দ রাজ্য নিজ অধিকার ভুক্ত করিলেও বাবর প্রকৃত পক্ষে ঐ অংশ টুকুর জন্য কিয়ৎপরিমাণে পারস্যের শাহের সামন্ত নরপতিরূপ ছিলেন। পারস্যের নৃপতিরা শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। বাবর পারস্যের শাহের আনুগত্য স্বীকার করিয়া অনেক বিষয়ে

শিয়া সম্প্রদায়ের মতানুসারে চলিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার সুন্নী সম্প্রদায়ের প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। একজন বিদ্রোহী উজবেগ সেনাপতির নিকট যুদ্ধে বার বার পরাজিত হইয়া বাবর কাবুলে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

সমরখন্দে তৈমুরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজচক্রবর্তীর ভোগ করাই বাবরের মনোভিলাষ ছিল। কিন্তু একাধিকবার চেষ্টা করিয়াও তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়ায় তিনি অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

কাবুলের ন্যায় ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া বাবর সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। ভারতের ঐশ্বর্য্যের কথা তিনি শুনিয়াছিলেন। অতঃপর সেইজন্য তিনি পশ্চিমদিকে ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা না করিয়া পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

বাবর ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তার করিবার জন্য, কয়েকবার অভিযান করেন। তাহার মধ্যে প্রথম চারি বারের অভিযান বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। পঞ্চম বারেই তাঁহার চেষ্টা সফল হয়। এই সময়ে লোদীবংশীয় আফগান জাতীয় সম্রাট ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার কুশাসনে দেশে ঘোরতর অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। ইব্রাহিম লোদীর এক ভ্রাতা তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিলেন। পঞ্জাবের শাসন কর্তা দৌলত খাঁও স্বাধীন রাজার ন্যায় চলিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। ইব্রাহিম লোদীর নিকট আত্মীয় আলম খাঁ কাবুলে গমনপূর্ব্বক বাবরকে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। দৌলত খাঁও দুর্বুদ্ধি বশতঃ বাবরকে আহ্বান করিয়া দূত প্রেরণ করেন। বাবর এই সকল অবস্থা তাঁহার পক্ষে বিশেষ অনুকূল বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং অচিরে পঞ্জাবে উপনীত হইলেন। তথায় নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি আলম খাঁ-কে নূতন রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া কাবুলে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

বাবরের এই ব্যবস্থায় দৌলত খাঁ অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। বাবর কাবুলে প্রস্থান করিবার পরই আলম খাঁ যুদ্ধে দৌলত খাঁর নিকট পরাজিত হইয়া কাবুলে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর বাবর আলম খাঁকে সঙ্গে লইয়া বিপুলবাহিনীসহ ১৫২৫ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে পুনরায় পঞ্জাবে উপনীত হইলেন। প্রথমে দৌলত খাঁ বৃহত্তর সৈন্যবাহিনী লইয়া বাবরের গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু বাবর অক্লেশে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া ক্রমে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া

পাণিপথের বিশাল রণক্ষেত্রে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তথায় ইব্রাহিম লোদীর সহিত বাবরের তুমুল সংগ্রাম হইল এবং লোদীকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিলেন।

পাণিপথের যুদ্ধের পরই বাবর দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। এই সময়ে দিল্লীর সিংহাসনের আধিপত্য পঞ্চনদ হইতে অনুগাঙ্গ প্রদেশ ও হিমাচল হইতে গোয়ালিয়র এই ভূখণ্ডেই আবদ্ধ ছিল। অন্যান্যস্থলে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বর্ত্তমান ছিল। ঐ সকল রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেকে সমবেত হইয়া তাঁহাকে বিতাড়িত করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। দিল্লীর শাসনাধীন প্রদেশ সমূহও সহজে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে নাই। তদুপরি তাঁহার অনুগামী সৈন্য ও সেনানীগণের মধ্যে অনেকেই ভারতবর্ষে বাস করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এই সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও তিনি আদৌ নিরুৎসাহ হন নাই। রাজনীতি কৌশল, সদয় ব্যবহার ও আবশ্যকমত বীরত্ব প্রকাশ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে সমুদয় অধিকৃত স্থানে তাঁহার শাসন দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। বহুকালের অত্যাচার পীড়িত প্রজাপুঞ্জ তাঁহার সদয় ব্যবহারে তুষ্ট হইয়া সহজেই বশ্যতা স্বীকার করিতে লাগিলেন। এইভাবে কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশে সুশাসন প্রবর্ত্তিত ও শান্তি স্থাপিত হইল।

দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়াও বাবর সমরখন্দ জয়ের আশা ত্যাগ করেন নাই। ভারতবর্ষে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া তিনি পুত্র হুমায়ুনকে সমরখন্দ বিজয়ে প্রেরণ করেন। কিন্তু এ অভিযান সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়।

বাবর ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত পাঁচ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। ইহার মধ্যে বিহার প্রদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি সাহসী, অধ্যবসায়ী, মিষ্টভাষী ও সুপণ্ডিত ছিলেন। বিপদে ধৈর্য্য, অভ্যুদয় কালে ক্ষমা, যুদ্ধে বিক্রম প্রভৃতি মহাপুরুষোচিত অনেক গুণ তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। তিনি প্রতিদিন যে সমস্ত কার্য্য করিতেন তাহা স্বহস্তে লিখিয়া রাখিতেন। সেই সকল পাঠ করিলে তাঁহার সরলতা ও উদারতার যথেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। ১৫৩০ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে আগ্রা নগরে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহারই নির্দ্দেশমত কাবুল নগরীর উপকণ্ঠে এক প্রাকৃতিক শোভাপূর্ণ স্থানে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হুমায়ুন পিতৃ-

সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুমায়ুন ও সংগ্রামসিংহ দ্রষ্টব্য।

বাবরী সাহেব—খ্রী: পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে দিল্লীতে বাবরী সাহেব নামে এক সুফি সাধক ছিলেন। তিনি হিন্দু ছিলেন। হিন্দু বা মুসলমানের কোন সঙ্কীর্ণতাই তাঁহার মধ্যে ছিল না। তাঁহার রচিত পদগুলি উচ্চভাবে পূর্ণ।

বাবা ইসা—একজন মুসলমান সাধক। সিন্ধুদেশের অন্তর্গত তাত্তানগরে তাঁহার সমাধি আছে। অনুমান ১৫১৪ খ্রীঃ অব্দের (হিঃ ৯২০) পূর্ব্বে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

বাবা খাঁ—সম্রাট আকবরের সময়ে খাজা মজাফর খাঁ তরবতি ১৫৭৯—৮০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সম্রাট আকবর শাহ তাঁহার সাহায্যার্থ রায় পুত্রদাস ও মীর আদমকে রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তা, রিজভি খাঁকে বক্সি ও আবদুল ফতে খাঁকে বিচারপতির পদে নিযুক্ত করিলেন। মুঘল সেনাপতিগণ পাঠানদের জায়গীর অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। জলেশ্বরের জায়গীরদার খালেদি খাঁ ও ঘোড়াঘাটের জায়গীরদার বাবা খাঁ বলিলেন—'প্রাণ দিব তবু জায়গীর ছাড়িব না।' তাঁহারা বিদ্রোহী হইয়া গৌড়নগর অধিকার করিলেন ও সমুদয় জায়গীরদারদিগকে তাঁহাদের সঙ্গে মিলিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তাঁহারাও বিদ্রোহী হইয়া বাবা খাঁর সঙ্গে মিলিত হইলেন। বিদ্রোহীগণ যেখানে যেখানে সম্রাটের সঞ্চিত অর্থ দেখিতে পাইল, তাহা লুণ্ঠন করিতে লাগিল। মজঃফর খাঁ আত্মরক্ষার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সম্রাট এই সংবাদ পাইয়া মনে করিলেন, শাসনকর্ত্তার কঠোর শাসনেই তাঁহারা বিদ্রোহ হইয়াছে। সুতরাং তিনি তাঁহাদের সাহসের প্রশংসা করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সম্রাট তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। এই আদেশ বাবা খাঁর পক্ষে অপমানকর হইলেও তিনি জায়গীরদারদিগকে তাহা জানাইলেন। তাঁহারা পুত্রদাস ও রিজভি খাঁকে তাঁহাদের নিকট এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। বিদ্রোহীরা পুত্রদাস ও রিজভি খাঁকে হাতে পাইয়া বন্দী করিল ও শাসনকর্ত্তার নিকট অসঙ্গত দাবী করিল। এদিকে বিহারের জায়গীরদারেরা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিল। তাণ্ডা দুর্গ বিদ্রোহীরা আক্রমণ করিয়া মজঃফর খাঁকে বধ করিল। সম্রাট এই সংবাদ শ্রবণে বিশেষ চিন্তিত হইলেন। তিনি রাজা তোডরমল্লকে বঙ্গদেশের বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করেন। তিনি বঙ্গদেশে আসিয়াই প্রথমে বিহারের হিন্দু জমিদার-

দিগকে হস্তগত করেন। এই সময়ে বাবা খাঁ পরলোক গমন করিলেন। বিদ্রোহীরা উপযুক্ত নেতার অভাবে অচিরেই বশীভূত হইল।

বাবা ফতু—কাঙ্গরা রাণীতালে তাঁহার দরগা আছে। তিনি হিন্দু সাধক যোগীগুরু গুলাবসিংহের শিষ্য ছিলেন।

বাবা রতন—একজন মুসলমান সাধক। তাঁহার অন্য নাম আবুরজা। তিনি অতিশয় দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন।

বাবালাল—তাঁহার জন্মস্থান মালাবার প্রদেশ। ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া নানাস্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক লাহোরে আসেন এবং শ্রীচৈতন্য স্বামী বা বাবা চেতনের শিষ্য হইয়া সিদ্ধি লাভ করেন। ক্ষত্রিয় কুলে খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাম নামে ভগবানকে আরাধনা করিতেন। তাঁহার রাম কোন অবতার বা দেবতা ছিলেন না। তিনি বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি বলিতেন—শম, দম চিত্ত শুদ্ধি, দয়া, পরসেবা, সহজভাব, সত্যদৃষ্টি, ক্ষয় প্রভৃতি দ্বারা ভক্তি ও প্রেমের পথে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। তিনি দিল্লীর সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার সঙ্গে গভীর যোগে মিলিত হইতেন। একখানা পারসী গ্রন্থে তাহার বিবরণ আছে।

বাবালাল গুরু—তিনি মালব দেশের একজন হিন্দী কবি। জাতিতে তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন।

বাবা শ্রীঠাকুরদাসজী—একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ ও প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী, উদাসীন সম্প্রদায়ের প্রধান। তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বের ইতিহাস সঠিকভাবে কিছু জানা যায় না। এক বিবরণে প্রকাশ তিনি চাম্বা নগরীর এক রাজ-পুরোহিতের মানত সন্তান। ছয় বৎসর বয়সের সময়ই স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি গৃহত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত পুরোহিত ও তাঁহার স্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে তখন তিনি নিবৃত্ত হন। তৎপরে ঐ পুরোহিত দম্পতীর মৃত্যু হইলে পর দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। তিনি গুরু ঈশ্বর দাসের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভারতের সুগম দুর্গম সমস্ত তীর্থ স্থানই তিনি পর্য্যটন করিয়াছিলেন। গয়া জেলার ধনিয়া পাহাড়ীতে বাবার সুবৃহৎ আশ্রম। বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে, বিশেষতঃ চাতুর্মাস্য উপলক্ষে সহস্র সহস্র সাধু সন্ন্যাসী ও গার্হস্থ্য-ধর্ম্মাবলম্বী শিষ্যগণ এই আশ্রমে আগমন করিয়া থাকেন। এই সকল পর্ব্বের মধ্যে আশ্বিনের প্রথম পক্ষের দশমীতে গুরু নানকের তিরোধান উপলক্ষে যে

উৎসব (গুরুপরা) হয় তাহাই প্রধান। এই উপলক্ষে বাবাজী আগত সকল সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সাধুকে লোটা, কম্বল ও বস্ত্রাদি এবং মর্য্যাদা অনুসারে অর্থদান ও আতিথ্য প্রদান করিতেন। গৃহী, সন্ন্যাসী যাঁহার যতদিন ইচ্ছা সেই স্থানে থাকিতে পারেন, তাঁহারা রাজ-ভোগের ন্যায় সেবা প্রাপ্ত হন। বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও বাবা কখনও বিভূতি প্রদর্শন করিতেন না। কিন্তু কোনও কোনও সময় আশ্চর্য্য ও অলৌকিকভাবে তাঁহার বিভূতি প্রকাশিত হইয়া পড়িত।

১৩০২ বঙ্গাব্দের রাজগিরের মেলায় বাবার ছাউনী অগ্নি সংযোগে ভস্ম হইয়া তন্মধ্যস্থিত বাবার আশ্রিত ও সমাগত সহস্র সহস্র সাধুর সেবার উপযোগী বহু সহস্র টাকার দ্রব্য সামগ্রী নষ্ট হইয়াছিল। পরদিন এই সাধু ও সেবকমণ্ডলীর সেবার কি ব্যবস্থা হইবে তাহা ভাবিয়া সকলেই অস্থির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অবিচলিত চিত্ত প্রশান্তমূর্ত্তি বাবা একটী কাপড় মুড়ি দিয়া নিস্তব্ধভাবে শুইয়া রহিলেন। একজন সেবক নিকটে বসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার হাতে বাবার অন্তর্হিত কটুয়া ঠেকিল। খুলিয়া দেখিলেন উহা মোহর পূর্ণ। তিনি বিস্মিতভাবে বাবাকে এই কথা বলিলেন, তখন বাবা মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন, "ইহা গুরু মহারাজের দান, সাধু সন্ন্যাসীদের সেবায় লাগাইয়া দাও।" এতদ্ব্যতীত অল্প সময়ের মধ্যেই কেমন করিয়া আরও হাজার হাজার টাকা জমা হইয়া গেল, তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। এক শিষ্য অতি দ্রুত এক ছাউনি পুনরায় প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তদ্বির করিতে আসিয়া গৃহদাহের কোন চিহ্নও দেখিতে পাইলেন না।

বাবার বয়স সম্বন্ধে নানামত প্রচলিত আছে। সত্তর হইতে সাত শত পর্য্যন্ত প্রবাদ আছে। তিনি যে অযোনীসম্ভূত ও বনখণ্ডি বাবার তৃতীয় অবতার এই মতও ক্রমশঃ প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। গয়াবাসীগণের অনেকের মতে তিনি বাবা মহেশ্বরের অবতার। হিন্দু, মুসলমান খ্রীষ্টান স্ত্রী ও পুরুষ নির্ব্বিশেষে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে বাবাজীর বহু শিষ্য রহিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক মনীষী ভাবুক এবং ভক্ত রহিয়াছেন। বাবার শক্তি ও ঐশ্বর্য্য এবং ঐশিকতার কথা ভাবিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। তাঁহার কৃপালাভে অনেকেই নানাপ্রকার ভাগ্য বিপর্য্যয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে তিনি দেহ রক্ষা করেন।

বাবা সাহানা— পঞ্জাবের অন্তর্গত বলভ জিলায় তিনি বাস করিতেন।

তিনি একজন মুসলমান সাধকের শিষ্য হইয়া সিদ্ধিলাভ করেন। এখন তাঁহার স্থানে হিন্দু মুসলমান সকলেই একত্র হইয়া সাধন করেন।

বাবিনিয়া—তিনি সিন্ধুদেশের অন্তর্গত তাত্তানগরের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার উপাধি জাম ছিল। দিল্লীর ফিরোজ শাহ তোগলক (১৩৫১—১৩৮৮ খ্রীঃ) একবার ১৩৬১ খ্রীঃ অব্দে তাত্তা নগর আক্রমণ করিয়া জাম বাবিনিয়াকে পরাস্ত করেন। কিন্তু দুর্গ অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়া গুজরাটে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ে পথ ভ্রান্ত হইয়া দীর্ঘ ছয় মাস অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন। তৎপরে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি আবার তাত্তানগর আক্রমণ করেন। জাম বাবিনিয়া এইবার পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করেন।

বাবু মন্‌কলী—তিনি একজন আফগান সেনাপতি। প্রথমে তিনি দায়ুদ খাঁর অধীনে ঘোরা মাঠে কিল্লাদার বা শাসনকর্ত্তা ছিলেন। দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহের সময়ে মুনিম খাঁ উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। সেই সময় বাবু মন্‌কলী মুঘল পক্ষে যোগদান করেন। এই সুযোগ্য সেনাপতি জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেও জীবিত ছিলেন। হাতিম খাঁ ও মামুদ খাঁ নামক তাঁহার দুই পুত্রও সেনাপতি ছিলেন।

বাবুরাও গেণু—তিনি বোম্বাইয়ের বিদেশী বর্জ্জন আন্দোলনের সময়, বিদেশী কাপড় বোঝাই মোটর লরী থামাইবার জন্য তাহার সামনে দাঁড়াইয়া ছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি মোটর চাপা পড়িয়া নিহত হন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় সকল ধর্ম্মের লক্ষাধিক লোক যোগ দিয়া, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের চেষ্টা নূতন উৎসাহের সহিত চলিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর অনভিপ্রেত পরোক্ষ কারণস্বরূপ একটি কথা বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান সোসিয়েল রিফর্ম্মার লিখিয়াছিলেন যে, বোম্বাইয়ের একজন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অতি অবিবেচনার সহিত একটী উক্তি করিয়াছিলেন —'চলন্ত মটর লরীর সামনে আত্মনিক্ষেপ করিয়া পিকেটারদের নিজেদের অকপটতা প্রমাণ করা উচিত।' উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন—'আমরা যখন এই লঘুতাপ্রসূত উক্তির বিবরণ পাঠ করি, তখন মনে করিয়াছিলাম ইহার ফলে গুরুতর কিছু ঘটিবে, দুঃখের বিষয় তাহার পরেই এই দুর্ঘটনা। বাবুরাও গেণু দ্বিজেতর কামাটী জাতীয় ছিলেন। অথচ তাঁহার শব বহন করিয়াছে সকল হিন্দু জাতি এবং মহিলারাও। আরও আনন্দের বিষয় একটী উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশীয়া বোম্বাইয়ের 'যুদ্ধ মন্ত্রণা সভার' নেত্রী শ্রীযুক্তা স্নেহলতা হজরত তাঁহার

চিতায় অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন জাতীয়তার প্রবল তরঙ্গাঘাতে অনেক প্রাচীন কুসংস্কার ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এবং যাইবে। বাবুরাও গেণুর মৃত্যু ১৯৩০ সালে সংঘটিত হয়।

বাবু রায়—তিনি বর্দ্ধমান রাজবংশের আবু রায়ের পুত্র। তাঁহার সময়ে বর্দ্ধমান পরগণা ও অন্য তিনটী মহলের অধিকারী তাঁহারা হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ঘনশ্যাম রায়। সঙ্গম সিংহ দেখ।

বাবুলাল—তিনি লক্ষ্ণৌবাসী একজন বদান্য জমিদার। তাঁহার অর্থেই বঙ্গের নবদ্বীপ বিদ্যাস্থানের পাকা টোল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। তিনি তথাগত ছাত্রদের অশনেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বাভরণ—একজন চন্দ্রোপাসক যতী। তিনি সশিষ্য শঙ্করাচার্য্যের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শিষ্য শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

বাভ্রব্য—তিনি একজন প্রাচীনকালের কামশাস্ত্রকার। মহারাজ বাভ্রব্য ধর্ম্মার্থের সহিত ত্রিবর্গান্তর্গত কামের সম্বন্ধ দেখাইয়া নন্দীশ্বর কৃত কামশাস্ত্রের সংস্কার সাধন করেন।

বামজানুনাথ—তিনি একজন নাথপন্থী যোগী। আপণ নাথ দেখ।

বামদেব—(১) একজন জ্যোতিষী। 'বর্ষমঞ্জুরী' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

বামদেব—(২) পরম ভক্ত সাধু বামদেব একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব সাধক ছিলেন। তিনি পরম ভক্ত সাধক নামদেবের মাতামহ ছিলেন। নামদেব দেখ।

বামদেব দত্ত—একজন সংবাদপত্রসেবী। হুগলী জেলার অন্তর্গত বৈঁচী গ্রামের সুবিখ্যাত দত্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক এবং 'দৈনিক' ও 'বঙ্গনিবাসী' সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। সরস রচনায়ও তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

বামন—(১) একজন জ্যোতির্ব্বিদ। তাঁহার পুত্র চক্রধর 'যন্ত্র চিন্তামণি' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পীতাম্বরকৃত 'বিবাহ পটলে' বামনের বিষয় উল্লেখ আছে। ১৪৮১ শকের (১৫৫৯ খ্রীঃ) পূর্ব্বে বামন 'তাজকতন্ত্র বা সারোদ্ধার, গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত একখানি স্ত্রীজাতকও আছে।

বামন—(২) প্রাচীন সংস্কৃত বৈয়াকরণ তাঁহার রচিত পাণিনির 'কাশিকাবৃত্তি' সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। চীন পরিব্রাজক ই-সিং গ্রন্থখানিকে বহু স্থানে পঠিত হইতে দেখিয়াছিলেন। উহার অংশবিশেষ প্রথম চারি অধ্যায় জয়াদিত্যের রচিত। জিনেন্দ্র বুদ্ধি নামক একজন বৌদ্ধ আচার্য্য উহার একখানি টীকা রচনা করেন। বামন খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার "কাব্যালঙ্কার" গ্রন্থ ছন্দশাস্ত্রের একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

বামনদাজীওক—মারাঠা লেখক ও সাংবাদিক। ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি শিক্ষা বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে করিতে রায়পুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন।

তিনি মারাঠী ভাষায় গদ্য ও পদ্যে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। কাদম্বরী, স্বপ্ন বাসবদত্তা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থগুলি তিনি সুললিত মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করেন। মারাঠী সাময়িক পত্রিকা সমূহে তাঁহার বহু সারগর্ভ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছিল। 'কাব্যেতিহাস সংগ্রহ' নামক একখানি পত্রিকা তিনি বহুকাল সম্পাদন করেন। তাহাতে প্রাচীন মারাঠী কবিদিগের কবিতা সমূহ সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইত।

১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বামনদাস বসু, মেজর—খুলনা জিলার অন্তর্গত টেংরা ভবানীপুর গ্রামে ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দের ২৪শে আগষ্ট (১২৭৪ বঙ্গাব্দ) তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা শ্যামাচরণ বসু পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে মাত্র ৪০ বর্ষ বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। (শ্যামাচরণ বসু দেখ)। শ্যামাচরণ বসুর সুশীলা স্ত্রী দুইটি পুত্র ও দুইটী কন্যা লইয়া বিধবা হইলেন। স্বামী বিষয় সম্পত্তি বেশ রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু বন্ধু বলিয়া পরিচিত কোন কোন লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় ভুবনেশ্বরী দেবী নিঃস্ব হইয়া পড়েন। এই সময়ে নিজের অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া সংসার চালাইতে লাগিলেন। পিতার মৃত্যু সময়ে বামনদাসের বয়স মাত্র পাঁচ মাস ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীশচন্দ্র বসু বিদ্যার্ণব মহাশয়, তাঁহার চেয়ে ছয় বৎসরের বড় ছিলেন। বামনদাস ছিলেন ভাই বোনদের মধ্যে সকলের ছোট। তিনি ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৮৭ সালে মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় এক বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হইয়া, অতিশয় দুঃখিত হন। তাঁহার দাদা শ্রীশচন্দ্র ও ভগিনীপতি তারণচন্দ্র দাসের পরামর্শে ও অর্থ সাহায্যে তিনি বিলাত গমন করেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি এলাহাবাদের পরলোকগত হরিমোহন দে মহাশয়ের কন্যা সুকুমারী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

১৮৮৮ সালের আগষ্ট মাসে তিনি ইংলণ্ডে পঁহুছেন। দুই বৎসরের মধ্যে প্রথমে এল, এম, এস, তৎপরে এম, আর, সি, এস ও সর্ব্বশেষে আই, এম, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এক বৎসর

শিক্ষানবিস অবস্থায় থাকিয়া ১৮৯১ সালের এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষে আগমন-পূর্ব্বক বোম্বাই প্রদেশে কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কর্ম্মব্যপদেশে তিনি চীন, আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। অধিকাংশ সময়ে তিনি সৈন্যদলের সঙ্গে ছিলেন। মধ্যে মধ্যে সিভিল সার্জনের কাজও করিতেন। এইরূপে ১৭ বৎসর চাকুরী করিয়া স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় ১৯০৭ সালে পেনসন গ্রহণ করেন। পেনসন লইবার অন্যতম কারণও ছিল। তিনি অতি তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাঁহার নিজের আত্মসম্মান বোধ অতিশয় প্রখর ছিল। এইরূপ লোকের পক্ষে সৈন্যদলের ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদের সহিত মিলামিশা ও চলাফিরা প্রীতিকর ছিল না। তাঁহাদের সহিত প্রায়ই নানা বিষয়ে খিটিমিটি হইত। বসু মহাশয় কোন কথারই উপযুক্ত উত্তর দিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। ইহা সাহেবেরা বড় পছন্দ করিতেন না। ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে ডাক্তার বসু মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ললিত মোহনের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মের অনতিকাল পরেই, সুকুমারী দেবী অসুস্থ হন এবং ক্রমে ক্রমে রোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অবশেষে ১৯০২ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। সেই সময়ে মেজর বসুর বয়স মাত্র ৩৫ বৎসর হইলেও তিনি আর বিবাহ করেন নাই। শিশু পুত্রটিকে তাঁহার পিসীমাতা শ্রীমতী জগৎমোহিনী দেবী প্রতিপালন করেন। মেজর বসু পূর্ব্বে আমিষ ভোজন করিতেন; কিন্তু পত্নী বিয়োগের পর আর কখনও আমিষ আহার করেন নাই। বরাবর নিরামিষ ভোজী ছিলেন। তিনি মদ্য অথবা চা পান করিতেন না।

পূর্ব্বেই তাঁহারা এলাহাবাদ প্রবাসী হইয়াছিলেন। এলাহাবাদে তাঁহারা যে বাটী নির্ম্মাণ করেন, উহার নাম মাতৃদেবীর নাম সংযোগে ভুবনেশ্বরী ভবন রাখেন। তাঁহারা দুই ভ্রাতাই অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। মেজর বসু পেনসন লইয়া এলাহাবাদে আসিলে তথাকার কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার তাঁহাদের আর্থিক ক্ষতির ভয়ে, মেজর বসুকে এলাহাবাদে চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে নিষেধ করেন। ডাক্তার বসু তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার উচ্চ হৃদয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বিনা অর্থে কেবল বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে চিকিৎসা করিতেন। তিনি অতি সাদাসিদা ভাবে চলিতেন। কোনরূপ আড়ম্বর তাঁহার ছিল না। পড়া ও লেখা তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ ছিল। শেষ জীবনে চক্ষে ছানি পড়ায় চক্ষে ভাল দেখিতেন না, তবু তাঁহার লেখাপড়ার বিরাম ছিল না। সমস্ত দিন পড়িতেন অথবা লিখিতেন।

তাঁহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের একটী তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

(1) Rise of Christian Power in India. (2) Story of Satara. (3) History of Education in India under the rule of the East India Company. (4) Ruin of Indian trade and Industry. (5) The Consolidation of Christian Power in India. (6) My Sojourn in England. (7) The Colonization of india by Europeans. (8) Indian Medical Plants. (9) Diabetis Mellitus and its Diabetic Treatment. তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই।

(1) The Second Afgahan War of 1879 80. (3 The Indian Foods and Diabetis. (4) The Philosophy of Human Existence. (5) The Economic Geography of India. (6) The Indian Medical Celebreties. (7) The Health Resorts of India. (8) Uplift of Humanity.

এতদ্ব্যতীত প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

তাঁহার Rising of the Christian power in India. অর্থাৎ ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমেরিকার সাণ্ডারল্যাণ্ড সাহেব বলিয়াছিলেন— 'আমার বিবেচনায় ভারতবর্ষের ব্রিটিশ রাজত্বের যত ইতিহাস আছে, তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলিও উৎকৃষ্ট। বিলাতি ওয়েষ্ট মিনিষ্টার গেজেটের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্পেণ্ডার সাহেব তাঁহার 'পরিবর্ত্তনশীল প্রাচ্য'(Changing East) গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, জীবনের নানা বিভাগে শক্তিমান লোক ভারতে যত আছে, অন্য কোন প্রাচ্য দেশে তত নাই। তাঁহার মতে ভারতের অনেক লোক ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ লোকদের সহিত, বুদ্ধি বিদ্যাসাপেক্ষ কাজে, সমকক্ষতা করিতে পারেন। এই বলিয়া তিনি যে কয়জন ভারতবাসীর নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু ও বামনদাস বসুর নাম করিয়াছেন।

মেজর বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র ও তিনি পাণিনি কার্য্যালয় স্থাপন করেন। এখান হইতে অদ্যাবধি পাণিনি ব্যাকরণ ইংরেজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ প্রকাশিত হয়। ম্যাক্সমুলার প্রভৃতি ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা এইজন্য তাঁহার পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তদ্ভিন্ন শ্রীশচন্দ্র কয়েকটী প্রধান প্রধান

উপনিষদের ঐরূপ সংস্করণ প্রকাশ করেন। ভট্টোজী দীক্ষিত প্রণীত 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' ব্যাকরণ উভয় ভ্রাতা ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া বাহির করেন। কোন কোন স্মৃতি ও অন্যান্য গ্রন্থও পাণিনি আফিস হইতে প্রকাশিত হয়। 'সেক্রেড বুক অব দি হিণ্ডুজ (Secred Book of the Hindus) নাম দিয়া পাণিনি আফিস হইতে অনেকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থের মূল ও অনুবাদ এবং কতকগুলির কেবল ইংরেজী অনুবাদ উভয় ভ্রাতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মেজর বসুর পাঠানুরাগ যেমন প্রবল ছিল, স্মৃতি শক্তিও তেমনি প্রবল ছিল। বাঙ্গালা, ইংরেজী, সংস্কৃত, আরবী ও পারস্য প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। পঠিত বিষয়ের বহুস্থান তিনি আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

পাঠাবস্থায় বিলাতে অবস্থানকালে পুরাতন বইয়ের দোকান ঘুরিয়া অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও ছবি তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এইরূপ গ্রন্থ সংগ্রহে ও খবরের কাগজের কাটিং সংগ্রহে তাঁহার অনুরাগ ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশবাবুরও এইরূপ গ্রন্থ সংগ্রহে বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁহাদের সংগৃহীত গ্রন্থরাশির দ্বারা একটী পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। এই পারিবারিক গ্রন্থাগারের নাম 'ভুবনেশ্বরী লাইব্রেরী' রাখা হয়। ইহাতে প্রধানতঃ সংস্কৃত, প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ক বহি বিস্তর আছে। মেজর বসুর বন্ধু বোম্বাইয়ের কর্ণেল কীর্তিকর ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে একবার এলাহাবাদে আসিয়া তাঁহার লাইব্রেরী দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হন। তিনি তাঁহার জীববিদ্যা ও উদ্ভিদ বিদ্যা বিষয়ক সমুদয় গ্রন্থ পত্রিকা, অপুষ্পক উদ্ভিদ সমূহের নমুনা, রঙিন ছবি ও ফটোগ্রাফ প্রভৃতি এক চরম পত্রদ্বারা তাঁহার বন্ধু মেজর বসুকে দান করিয়া যান। মেজর বসু তাঁহার বন্ধুর এই অমূল্য সম্পত্তি ১৯২০ সালে স্বীয় উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের একশত সেট (যাহার প্রতি সেটের মূল্য ১৭৫ টাকা) সহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। এই সকল এই সর্ত্তে তিনি দান করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় একটী শুষ্ক উদ্ভিদ মন্দির স্থাপন করিয়া, তাহার নাম রাখিবেন কীর্ত্তিকর উদ্ভিদ মন্দির এবং ভারতবর্ষের অপুষ্পক উদ্ভিদ সমূহ সম্বন্ধে একটী গ্রন্থ রচনা প্রকাশ করাইবেন, যাহাতে কীর্ত্তিকর মহাশয়ের তদ্বিষয়ক গবেষণা ও চিত্র সমূহ সন্নিবিষ্ট হইবে। মেজর বসু তাঁহার লাইব্রেরীর কিয়দংশ তাঁহার জীবদ্দশাতেই প্রয়াগের মহিলা বিদ্যাপীঠে দান করিয়া গিয়াছেন।

মেজর বসু যে কেবল পুরাতন পুস্তকই সংগ্রহ করিতেন তাহা নহে,

পুরাতন খবরের কাগজ এবং পত্রিকাও তিনি খুব সংগ্রহ করিতেন। যত বই তিনি পড়িতেন, তাহা হইতে প্রয়োজনীয় অংশ খাতায় টুকিয়া রাখিতেন।

তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এলাহাবাদ পাব্লিক লাইব্রেরীর কমিটির সভ্য ছিলেন। তিনি যখন উহার সম্পাদক ছিলেন তখন কোম্পানীর আমলের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় পার্লিয়ামেন্টের সমুদয় রিপোর্ট আনাইয়া ছিলেন। ব্রিটিশ অধিকার ভুক্ত ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস জানিবার পক্ষে এগুলি অত্যা-বশ্যক। ১৯১০—১৯১১ সালে যে প্রদর্শনি হয়, মেজর বসু তাহার প্রত্নতত্ব ও ভারতীয় ঔষধ এই দুইটী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কমিটির সভ্য ছিলেন। প্রদর্শনীতে তাঁহার ঔষধ সংগ্রহ প্রদর্শিত হয়। এই সংগ্রহ তিনি এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটীর প্রস্তাবিত মিউজিয়ামে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রদর্শনীর কমিটির সভ্য ছিলেন বলিয়া আরও দুইটী কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। প্রথম তাঁহার চেষ্টায় ভারতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনের বন্দোবস্ত হয়, এবং তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে ডাঃ আনন্দকুমার স্বামীকে চিত্র বিভাগের ভার দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারতীয় কার্পাস, পশমী কাপড় কম্বলাদির যে নমুনা বহি প্রস্তুত হয়, তাহা তিনি লক্ষ্ণৌ হইতে আনাইয়া প্রদর্শনীতে দেখান। এই নমুনা বহির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকে কিছুই জানিতেন না। বিলাতের তাঁতিরা প্রথমে ভারত-বর্ষের লোকদের পছন্দ মত কাপড় ও পাড় প্রস্তুত করিতে পারিত না। সেই তাঁতিদের সুবিধার জন্য ভারতের সাত শত রকম কাপড়, পাড়, কম্বল, প্রভৃতির টুকরা কাটিয়া ১৮ ভালুম বহি প্রস্তুত হয়। এই বহি মাত্র কুড়ি সেট প্রস্তুত হয়। তাহার একটী সেটও প্রথমে ভারতবর্ষে ছিল না। পরে ১৩ সেট ইংলণ্ডের বস্ত্র শিল্পের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে ও ৭ সেট ভারত-বর্ষে রাখা হয়। তাঁহার এক সেট লক্ষ্ণৌয়ে ছিল, ইহা মেজর বসু জানি-তেন। তাহা তিনি লক্ষ্ণৌ হইতে আনাইয়া প্রদর্শনীতে সকলকে দেখান। এই প্রদর্শনী খুব বৃহৎ হইয়াছিল। ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে বহুলোক ইহা দেখিতে আসিয়াছিলেন। বহু ব্যক্তি তাঁহার গৃহেও অতিথি হইয়া-ছিলেন। মেজর বসু মহাশয় চাকুরী উপলক্ষে যখন উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ছিলেন। তখন অনেক দুরধিগম্য স্থানে যাইয়া খনন করাইয়া ভূগর্ভ হইতে অনেক বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কার করেন। এই সকল গান্ধার শিল্পের নিদর্শন তাঁহার গৃহে আছে। এই সকল পাটনা মিউজিয়ামের জন্য, পর-লোকগত অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমা-

দার মহাশয় তিন হাজার টাকা মূল্যে ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মেজর বসু ইহা দেন নাই। মেজর বসু একবার কোশাম্বী দেখিতে গিয়া এক মুদির দোকানের বারাণ্ডায় উঠিবার ধাপে প্রাচীন লিপিযুক্ত একখানি প্রস্তর ফলক দেখিতে পাইয়া তাহা তৎক্ষণাৎ কয়েক আনা মূল্যে ক্রয় করেন। এই সংবাদ পাইয়া প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার ছাপ তুলিয়া পাঠ করেন। ইহার লিপি অতি প্রাচীন। রাখালবাবু একশত টাকা দিয়াও ইহা ক্রয় করিতে সমর্থ হন নাই। মেজর বসু প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহে খুব উৎসাহী ছিলেন। অনেক দুষ্প্রাপ্য মুদ্রাও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অপহৃত হয়।

মেজর বসু সাধারণত সার্ব্বজনিক কাজে যোগ দিতেন না। অধিকাংশ সময়ই নিজের লেখাপড়া লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। তবু সময়ে তাঁহাকে নানা কাজে যোগ দিতে হইত। ভারতীয় ঔষধ সংগ্রহ ও তদ্বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করায়, তিনি একবার নিখিল ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদীয় কন্‌ফারেন্সের লাহোর অধিবেশনের সভাপতি মনোনীত হন। একবার পরলোকগত বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সহিত ধর্ম্ম সম্মিলনীর সহযোগী সম্পাদক হন। একবার তিনি আর্য্য সমাজের শ্রদ্ধানন্দ স্বামী প্রতিষ্ঠিত গুরুকুলের বার্ষিক উৎসবে সভাপতির কাজ করেন। তিনি বঙ্গীয় ধন বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ছিলেন। এই পরিষদকে তাঁহার এতদ্বিষয়ক সমুদয় লেখা সংগ্রহ দান করিয়াছেন।

তিনি নানা প্রাচীন ও আধুনিক ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত আরবী ও ফারসী জানিতেন বলিয়া হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম্ম এবং কৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক অভিজ্ঞ ছিলেন। আধুনিক ভাষার মধ্যে তাঁহার মাতৃ ভাষা বাঙ্গালা ছাড়া পঞ্জাবী, পশতো, সিন্ধি, কাশ্মীরী, হিন্দী, উর্দ্দু নেপালী, গুজরাটী ও মহারাঠী ভাষা জানিতেন এবং তত্তৎ ভাষীয় লোকদের সঙ্গে সেই সেই ভাষায় কথা বলিতেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে কাজ করিবার সময় রক্ষীহীন হইয়া পাঠান গ্রামে যাইতেন। তাঁহার উপরস্থ কর্ম্মচারীরা ইহাতে ভয় পাইতেন। কিন্তু এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি অজাত শত্রু ছিলেন। মেজর বসু কখন কখন সামরিক কর্ম্মচারীদের পশতো ভাষার পরীক্ষক হইতেন। একবার একটী অল্প বয়স্ক ইংরেজ অফিসারের পশতো ভাষার মৌখিক পরীক্ষার সময়ে তাঁহাকে একটী পশতো কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহার অর্থ ছিল মানুষ। কিন্তু সেই উদ্ধত যুবক অফিসার তাঁহাকে অপমানিত করিবার জন্য

উত্তর করিল—'ইহার অর্থ কালা আদমী' মেজর বসু তখন শান্তভাবে উত্তর করিলেন—'না, ইহার মানে সাদা ইতর লোক।' যুবক তখন সেনাপতির নিকট মেজর বসুর বিরুদ্ধে নালিশ করিল। সেনাপতি সকল কথা শুনিয়া যুবককে বলিলেন—তুমি মুখের মত জবাব পাইয়াছ।

তিনি সার্ব্বজনিক কোন প্রচেষ্টায় যোগ দিতেন না বটে; কিন্তু দেশের চিন্তায় তিনি নিমগ্ন থাকিতেন। দেশের পরাধীনতা ও অপমানে তিনি মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইতেন। জালিয়ানওয়ালা হত্যাকাণ্ডের পরে তিনি কয়েক রাত্রি ঘুমাইতে পারেন নাই। তিনি অতিশয় স্বাধীনতাপ্রিয় ও স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন। কিরূপে সমস্ত মানব জাতির উন্নতি হইতে পারে তিনি তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার অনেক প্রবন্ধ সংবাদ পত্রাদিতে বাহির হইয়াছে।

তাঁহার ধর্ম্ম মত উদার ছিল। তিনি আজীবন হিন্দু সমাজ ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ শ্রীশচন্দ্র থিয়সফিষ্ট, তাঁহার ভগিনী জগৎমোহিনী ও ভগিনীপতি তারণচন্দ্র দাস ব্রাহ্ম ছিলেন। বসু মহাশয় জাতিভেদ প্রথাকে হিন্দু সমাজের নানা দুর্গতির কারণ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি পর্দ্দা প্রথার বিরোধী ছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য ফ্যাসন প্রিয়তা অপছন্দ করিতেন। তিনি তাঁহার ভগিনী ও ভগিনীপতির নামে এলাহাবাদে মেয়েদের জন্য 'জগৎ তারণ' বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহার জন্য কিছু অর্থও দান করিয়াছেন। ইহাতে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়ান হয়। এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি ১৯৩০ খ্রীঃ অব্দে ২৩শে সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন।

বামনদাস মুখোপাধ্যায়—নদীয়া জিলার অন্তর্গত উলা বা বীরনগরের স্বনাম ধন্য জমিদার মহাদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র ও দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। ১২১০ বঙ্গাব্দের ১০ই আষাঢ় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ও পিতামহের ন্যায় তিনিও বিদ্বান ও দাতা ছিলেন। তিনি এক জন কৃতি পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সময়ে জমিদারীর আরও অনেক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি কেবল অর্থ উপার্জ্জনেই সময় ক্ষেপণ করেন নাই, জ্ঞান চেষ্টায় তিনি যথেষ্ট সময় নিয়োগ করিতেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র সার্ব্বভৌম নামক একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক দ্বারা 'দুর্গার্চ্চনা বারিধি' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করাইয়া ছিলেন। তিনি স্বয়ং 'গোভিলোক্ত সামবেদীর সন্ধ্যা' নামক সবিচার গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য। তিনি সেই সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম আন্দোলনের ও

বিধবা বিবাহ প্রভৃতি সমাজ সংস্কারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ১২৮১ বঙ্গাব্দের ২৪শে পৌষ তিনি পরলোক গমন করেন।

বামন পণ্ডিত—মারাঠী পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। বোম্বাই প্রদেশের সাতারা জিলায় তাঁহার নিবাস ছিল। তিনি খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন সংস্কৃত ভাষাও সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত তাঁহার সহিত বিচারে পরাজিত হন। এই কারণে তিনি অতিশয় গর্ব্ব অনুভব করিতেন। দাক্ষিণাত্যে তাঁহার সমতুল্য পণ্ডিত আর কেহ নাই মনে করিয়া তিনি কাশীর পণ্ডিতদের সহিত বিচার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্ম বারাণসী গমন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা হইয়া উঠে নাই।

তিনি বৈদান্তিক ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'যথার্থ দীপিকা' ও 'নিগমসার' বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। মাতৃভাষায় তাঁহার রচনা অতি সুমধুর ও লালিত্যপূর্ণ বলিয়া মারাঠী কথকেরা উহা প্রায়ই আবৃত্তি করিয়া থাকেন। তাঁহার রচনায় সংস্কৃত কথার বাহুল্যের জন্ম তুকারামের রচনার স্থায় উহা জনসাধারণের মধ্যে খুব প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু তাঁহার রচিত গ্রন্থ সকলের প্রতিপাদ্য বিষয়ই সংস্কৃতবহুল ভাষা ব্যবহার করিতে তাঁহাকে বাধ্য করে। মারাঠী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে খুব সম্ভব ১৬৭৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বামবাহাদুর—তিনি নেপালের প্রসিদ্ধ প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি জঙ্গ বাহাদুরের অনুজ ভ্রাতা। বামবাহাদুর একজন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দের তীব্বত যুদ্ধে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারই বীরত্বে তীব্বতীয়দের কয়েকটী দুর্গ নেপালের অধিকারে আসে। তীব্বত যুদ্ধের পরে জঙ্গ বাহাদুর রাজ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে পর, বামবাহাদুরই ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের ১লা আগষ্ট প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই পদ পূর্ণ এক বৎসরও ভোগ করিতে পারিলেন না। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের ২৫শে মে তিনি পরলোক গমন করেন।

বামা ক্ষ্যাপা—সুপ্রসিদ্ধ শক্তি মন্ত্রের সাধক ও সিদ্ধ মহাপুরুষ। ১২৪৪ সালের ১২ই ফাল্গুন বীরভূম জেলায় তারা পীঠের অনতিদূরবর্ত্তী আটলা গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম সর্ব্বানন্দ চট্টোপাধ্যায় মাতার নাম রাজকুমারী দেবী। বাল্যকালে তাঁহার নাম বামাচরণ ছিল। শৈশবেই তাঁহার প্রেমোন্মত্ততা প্রকাশিত হয়। তাঁহার

চরণই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য বস্তু ছিল এবং তারার চরণেই মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই আবাল্য প্রেমোন্মত্ততার জন্তই তিনি পরে বামা ক্ষ্যাপা নামে দেশ বিদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। কৈশোর বয়সেই তিনি গৃহত্যাগ করিয়া তারাপীঠের মহাশ্মশানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ সময় কৌল চূড়ামণি ব্রজবাসী কৈলাসপতি তাঁহাকে বৈধ দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। এই তারাপীঠে প্রাচীনকাল হইতে অনেক মহাপুরুষ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। জনপ্রবাদ বশিষ্ঠ ঋষির স্মৃতিও এই স্থানের সহিত জড়িত করে এবং এই স্থানকে তাঁহার সিদ্ধিক্ষেত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। নাটোরের সাধকপ্রবর রাজা রামকৃষ্ণ, আনন্দনাথ, মোক্ষদানন্দ, কৈলাসপতি প্রভৃতি অনেকেই এই স্থানে সাধনা করিয়া গিয়াছেন। বামাচরণ দীক্ষা গ্রহণের পর হইতে তারা চিন্তায় তন্ময় থাকিতেন, তারা ভক্তি তাঁহার স্বভাবগত ছিল। তিনি অবিরত তারা নাম কীর্ত্তন করিতেন। নিয়মিত পূজা করিতে বসিলেই, তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন। তাঁহার মা ডাকে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া যাইত। ক্রমে তিনি যোগ সাধনায় ইষ্টদেবী তারার দর্শন লাভ বা সিদ্ধিলাভ করেন। কামজয়ী দ্বন্দ্বাতীত বামাচরণ কিছুদিন গুরুসঙ্গ করিবার পর, তদীয় গুরুদেব কৈলাসপতি বশিষ্ঠদেবের সিদ্ধ পঞ্চমুণ্ডি আসন ছাড়িয়া দিয়া অন্তর্হিত হন। অদ্যাপি এই সিদ্ধ পঞ্চমুণ্ডি আসনে কেহ বসিতে পারেন নাই। বামা ক্ষ্যাপা আজীবন তারা পীঠের মহাশ্মশানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার সিদ্ধিবার্ত্তা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। নানা স্থান হইতে দলে দলে লোক তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিত। তিনি কৃপাসিন্ধু বশিষ্ঠদেব, তারাপীঠের ভৈরব, শ্রীবামদেব প্রভৃতি নামেও অভিহিত হইতেন। তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ দিনে অতিশয় বৃষ্টি হইতেছিল তিনি স্বীয় শক্তি বলে বৃষ্টি রোধ করিয়া নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণাদি সকলকেই চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদে বহুলোক নানা বিপদ ও রোগ শোকাদি হইতে মুক্তি লাভ করিত। তাঁহার বাক্য কখনও বিফল হয় নাই। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২রা শ্রাবণ এই সিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে তারাতত্ত্বের আভাষ প্রদান পূর্ব্বক নিজ সাধনায় সকলকে মুগ্ধ করিয়া মহাপ্রস্থান করেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর হইতে প্রতি বৎসর তাঁহার জন্ম তিথি ও মৃত্যু তিথি উপলক্ষে তারাপীঠে তাঁহার বহু ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ এবং অন্যান্য বহু লোকের সমাবেশ হইয়া থাকে। দুই বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় 'বামাক্ষ্যাপা সঙ্ঘ' নামে একটী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বামাদাসী—একজন মহিলা 'ঝুমুর সঙ্গীত' রচয়িত্রী। তাঁহার রচিত সঙ্গীত গুলি অশ্লীলতা বর্জ্জিত।

বামাদেবী— প্রসিদ্ধ কবি জয়দেবের জননী। জয়দেব দেখ।

বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—একজন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী। বর্দ্ধমান জেলার সাতগাছিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই ছবি আঁকায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ দেখিয়া জনাইয়ের জমিদার পূর্ণচরণ মুখোপাধ্যায় ও সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য পরামর্শ দেন। তাঁহাদের পরামর্শে তিনি সরকারী আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হন। তৎপূর্ব্বে তিনি শ্রীধরপুর স্কুলে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। সরকারী আর্ট স্কুলে কিছু শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি তৈল চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করিবার জন্য, তদানীন্তন খ্যাতনামা চিত্রকর প্রমথনাথ মিত্রের নিকট অয়েল পেন্টিং শিক্ষা করিতে চেষ্টা করেন এবং ইহার পরেও বেকার (Backer) নামক একজন অভিজ্ঞ জার্ম্মাণ চিত্রকরের নিকট কিছুদিন চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসা আরম্ভ করেন। এলাহাবাদ লাহোর, অমৃতসহর, গোয়ালিয়র, জয়পুর যোধপুর প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, তথাকার রাজা মহারাজাগণের চিত্র অঙ্কিত করিয়া যথেষ্ট যশ ও অর্থলাভ করেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই সময় তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, মনোমোহন ঘোষ ও মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির তৈল চিত্র অঙ্কন করিয়া যশস্বী হন। রবিবর্ম্মার পৌরাণিক চিত্র দেখিয়া তিনি পৌরাণিক চিত্র প্রকাশের ইচ্ছা করেন। পৌরাণিক চিত্রের শিল্পী হিসাবে বাঙ্গালার বাহিরেও তাঁহার যথেষ্ঠ খ্যাতি ছিল। তাঁহার 'দুর্ব্বাসা শকুন্তলা', 'শান্তনু গঙ্গা', 'কলঙ্কভঞ্জন', 'অর্জ্জুন উর্ব্বশী' প্রভৃতি চিত্র তাঁহার নাম এদেশে চিরকাল অক্ষয় করিয়া রাখিবে। তিনি সরল ধর্ম্মপ্রাণ ও নিরহঙ্কার ব্যক্তি ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি শালিখায় বসবাস করিতেন। ১৯৩২ খ্রীঃ অব্দে ৭৪ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

বায়জিদ—তিনি দিল্লীর সম্রাট বহলোল লোদীর অন্যতম পুত্র এবং পিতার জীবিতকালেই পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন লাভের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হন।

বায়জিদ খাঁ—তিনি বাঙ্গালার নবাব সোলেমান কররাণির (১৫৬৪—৭২ খ্রীঃ অব্দ) পুত্র। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি বাঙ্গালার নবাব হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য ইমাদ খাঁর পুত্র হাঁমু

কর্ত্তৃক নিহত হন। হাঁসু, বায়জিদের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু আফগান সেনাপতি লোহানী খাঁ প্রভৃতি হাঁসুকে বধ করিয়া সোলেমান কররানির অন্যতম পুত্র দাউদখাঁকে সিংহাসন প্রদান করেন।

বায়জিদ, রাজা—শ্রীহট্টের অন্তর্গত প্রতাপগড়ের মুসলমান রাজা। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মালিক মোহাম্মদ মৃজা তোরাণি এই রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পিতা মালিক প্রতাব একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন, তাঁহারা ত্রিপুরাধিপতির সামন্ত রাজা। ত্রিপুরাধিপতি কর্ত্তৃক 'রাজা' উপাধিও পাইয়াছিলেন। একবার কোন যুদ্ধে রাজা প্রতাব, ত্রিপুরাধিপতি প্রতাপ মাণিক্যকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পুরস্কারস্বরূপ ত্রিপুরাধিপতি প্রতাপ মাণিক্য, স্বীয় কন্যা রত্নাবতীর সহিত প্রতাবের পুত্র বায়জিদের বিবাহ দেন। ১৪৯১ খ্রীঃ অব্দে মালিক প্রতাব (রাজা) গতায়ু হইলে, তাঁহার পুত্র বায়জিদ রাজ্য লাভ করেন। বায়জিদের রাজ্য লালসা অচিরেই হৈরম্বপতি সহিত বিবাদ সংঘটন করাইয়া দেয়। এই যুদ্ধে বায়জিদের জ্যেষ্ঠ পুত্র মারামত খাঁ খুব বীরত্বের পরিচয় দেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে মারামত খাঁ উপস্থিত ছিলেন না। তিনি সসৈন্যে ময়মনসিংহের অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ীতে বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিত সময়ে উদাই ও বুদাই নামক দুই মল্ল ভ্রাতৃদ্বয়ের অসীম সাহস ও বুদ্ধি কৌশলে হৈরম্বপতির সৈন্যগণ পরাজিত ও বহু সংখ্যক নিহত হইল। বর্ত্তমান কাছাড় জিলা হৈরম্ব দেশ নামে খ্যাত ছিল। এই প্রকারে ক্রমে বল সঞ্চয় করিয়া বায়জিদ নিজকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। প্রকৃতপক্ষে বায়জিদ স্বাধীনই ছিলেন। শ্রীহট্টের কাননগুর অধীন তিনি ছিলেন না। এই সময়ে শ্রীহট্টের কাননগু গহুর খাঁর সহকারী সুবিদরাম ও রামদাস, সংগৃহীত রাজস্ব রাজ সরকারে প্রদান না করিয়া পলায়ন পূর্ব্বক বায়জিদের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক বিদ্রোহী তাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। এই সব কারণে বাঙ্গালার নবাব হোসেন শাহ তাঁহাকে দমন করিবার জন্য একদল সৈন্য সরওয়ার খাঁর (সর্ব্বানন্দ) অধীনে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে বায়জিদ পরাজিত হইয়া, স্বীয় কন্যাকে সরওয়ার খাঁর সঙ্গে বিবাহ দিয়া, তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করেন। ইহার কিছুকাল পরেই সুলতান বায়জিদ পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র মারামত খাঁ রাজ্যলাভ করেন। মারামত খাঁর মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পুত্র জমসের খাঁ রাজ্য লাভ করেন। জমসের খাঁর আট পুত্রের মধ্যে আফতাব উদ্দিন বিখ্যাত ছিলেন। এই

সময়ে হৈড়ম্বপতি তুলসীধ্বজ প্রতাপগড় আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার বীর্য্যবতী রাণী কমলা দেবী স্বামীর নিধনের প্রতিশোধ লইবার বাসনায় স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন। রাজা আফতাব উদ্দিনের সৈন্য সমূলে বিনষ্ট হইল এবং তিনিও যুদ্ধে নিহত হইলেন। প্রতাপগড় হৈরম্ব রাজ্যের অন্তর্ভূত হইল। আফতাব উদ্দিনের অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ রাজ্য হারা হইয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিলেন।

বারওয়েল রিচার্ড (Barwell Richard)—১৭৪১ সালের ৮ই অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা উইলিয়াম বারওয়েল সেই সময়ে বাঙ্গালা দেশের গবর্ণর ছিলেন। ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি একজন কেরাণীরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাজে নিযুক্ত হন। ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং আইন অনুসারে ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রথম ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইলেন এবং বারওয়েল প্রভৃতি মন্ত্রণা সভার সদস্য পদ লাভ করেন। তিনি বরাবর বড়লাটকে সমর্থন করিতেন। এই উপলক্ষে একবার বড়লাটের প্রতিদ্বন্দ্বী—ক্লেবারিং সাহেবের (Clavering) সহিত ১৭৭৫ সালে তাঁহার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছিল। ১৭৮১ সালের ১লা অক্টোবর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি প্রচুর অর্থশালী ছিলেন। কেহ কেহ বলেন তিনি অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৮০৪ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

বারতেমা— খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম বর্ষে বারতেমা ও বারবোসা নামে দুইজন পর্য্যটক এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিবরণ পাঠে ভারতবর্ষের তদানীন্তন ঐশ্বর্য্যের কথা অবগত হওয়া যায়।

বারদর বেণা—এই হিন্দী কবি কনৌজরাজ জয়চন্দ্রের পুত্র শিবাজীর সঙ্গে থাকিতেন।

বারবক—তিনি দিল্লীর সম্রাট বহলোল লোদীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। বহলোল তাঁহাকে জৌনপুরের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। বহলোলের মৃত্যুর পরে সেকেন্দর শাহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকরেন। সেকেন্দরের সহিত বারবকের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি সেকেন্দরের বশীভূত হন। কিন্তু তিনি অতি অকর্ম্মণ্য শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সময়ে জৌনপুরের অধীনস্থ জমিদারেরা বার বার বিদ্রোহী হয়। তিনি কিছুতেই তাঁহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হন নাই। সেইজন্য সেকেন্দর শাহ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া, অন্য একজনকে জৌনপুরে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বারবকবর্ষ—তিনি দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের অন্যতম সেনাপতি। গিয়াসউদ্দিন বলবন বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবার সময়ে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনিই বাঙ্গালার বিদ্রোহী নবাব তুগলকে পরাস্ত ও নিহত করেন।

বারবক শাহ—তিনি বাঙ্গালার নবাব নাসিরউদ্দিন আবুল মুজাফর মামুদ শাহের (১৪৪২—১৪৬০ খ্রীঃ অব্দ) পুত্র। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম ও উপাধি রুকনুউদ্দিন আবুল মুজাহিদ বারবক শাহ। পিতার জীবিতকালেই তিনি সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি রাজপ্রাসাদ ও রাজ্যরক্ষার্থ ৮ হাজার আবিসিনীয় (হাবসী) দাস ও খোজা সৈন্য প্রতিপালন করিতেন। তাঁহারা সুদক্ষ অশ্বারোহী ও খুব বিশ্বাসী ছিল। বারবকশাহ তাঁহাদের কোন কোন লোককে উচ্চ রাজ কার্য্যেও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বারবক শাহ ন্যায়পরায়ণ ও ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে প্রজাগণ সুখে ছিল এবং গৌরনগর সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফেরিয়া-ই-সুজা নামে একজন পর্ত্তুগীজ পর্য্যটক ও ঐতিহাসিক পণ্ডিত স্বচক্ষে গৌড়নগর পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে, 'গৌড়ের লোকসংখ্যা ১২ লক্ষের উপর' ইহার পথগুলি প্রশস্ত, পরিষ্কার ও সরল। পথের উভয় পার্শ্বস্থ বৃক্ষশ্রেণী পথিকদিগকে উত্তাপ হইতে রক্ষা করে।' বারবক শাহের মৃত্যুর পরে ১৪৭৪ খ্রীঃ অব্দে তাহার পুত্র ইউসফ শাহ বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বারবোসা—বারতেমা দেখ।

বারাণসী ঘোষ—কলিকাতার বাগবাজারের প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাধাকান্ত ঘোষের চারি পুত্রের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। বারণসী ঘোষ চব্বিশ পরগণার তদানীন্তন কালেক্টার গ্রেডুইন সাহেবের দেওয়ানের কার্য্য করিতেন। সাধারণের মঙ্গলার্থে তিনি বারাকপুরের নিকট হুগলী নদীর তীরে ছয়টী শিবমন্দির স্থাপন ও একটী স্নান ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। কলিকাতার যোড়াসাঁকো নামক স্থানে তিনি একটী প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। তিনি খুব অর্থশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নামে কলিকাতায় একটী রাস্তা আছে। তিনি যোড়াসাঁকোর শান্তিরাম সিংহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

বার্ণিয়ার— একজন ফরাসী দেশীয় পর্য্যটক। তিনি দিল্লীর সম্রাট শাহজাহানের কারারুদ্ধকালে দিল্লীতে ছিলেন। তাঁহার বিবরণ পাঠ করিলে

জানা যায় যে, আওরঙ্গজীব পিতার প্রতি খুব সদ্ব্যবহার করিতেন।

বালকাচার্য্য—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—বালবোধ।

বালকৃষ্ণ—(১) একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। তিনি তাপ্তি নদীর তীরে বাস করিতেন এবং বাসস্থানের নাম প্রকাশ ছিল। 'তান্ত্রিক কৌস্তুভ' নামক একখানা তান্ত্রিক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

বালকৃষ্ণ—(২) তিনি জৈমিনীসূত্রের ভাষ্যকার। ১৭৮৮ শকের (১৮৬৬ খ্রীঃ) পূর্ব্বে তিনি জৈমিনী সূত্রের এক ভাষ্য রচনা করেন।

বালকৃষ্ণ—(৩) একজন গ্রন্থকার। 'দশকর্ম্ম' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

বালকৃষ্ণ ভট্ট—খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি বারাণসী নগরে মৌনিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রঙ্গনাথ দীক্ষিত। বালকৃষ্ণ এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গদাধর ভট্টাচার্য্যকৃত 'শক্তিরস' গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। তাঁহার রচিত টীকা 'শক্তি পদার্থ দীপিকা' নামে খ্যাত। তাঁহার পুত্র রাঘবেন্দ্র ভট্টও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

বালকৃষ্ণ রায়—তিনি বাঙ্গালার নবাব মুরশিদ কুলী খাঁর রাজসভার একজন খুব বিশ্বাসী ক্ষমতাশলী ও সম্মানিত কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহারই বিশেষ সহায়তায় মুরশিদ কুলী খাঁর মৃত্যুর পরে, তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দিন বাঙ্গালার নবাব হইতে পারিয়াছিলেন।

বালগঙ্গাধর তিলক— প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ ও জননায়ক। ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের ২৩শে জুলাই (শ্রাবণ, ১২৬৩ বঙ্গাব্দ) বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত রত্নগিরি নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম গঙ্গাধরপন্ত তিলক বালগঙ্গাধরের সামাজিক নাম ছিল বলবন্ত; কৌলিক নাম কেশব। মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে নিজ নামের সহিত পৈতৃক নাম যুক্ত করিবার রীতি প্রচলিত আছে। সেই অনুযায়ী বালগঙ্গাধরের সম্পূর্ণ নাম বলবন্ত গঙ্গাধর তিলক। তাঁহার পিতা গঙ্গাধরপন্তের ফলিত জ্যোতিষের উপর বিশেষ বিশ্বাস ছিল। তিনি পুত্রের জন্মক্ষণ, সময়, তারিখ প্রভৃতি বিশেষ সতর্কতার সহিত স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এবং পরে শাস্ত্রসঙ্গত রীতিতে পুত্রের যথাযথ কোষ্ঠী পত্রও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কিন্তু জন্মপত্রিকায় উল্লিখিত অনেক গুরুতর বিষয় বালগঙ্গাধর তিলকের জীবনে আদৌ ফলে নাই।

গঙ্গাধর পন্থ সামান্য ইংরেজি শিখিয়া সরকারী শিক্ষা বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা

লাভ করিতে না পারায় তাঁহার আজীবন ক্ষোভ ছিল। দুঃখের বিষয় তিনি পুত্রকে উচ্চ শিক্ষা দিয়া যাইতে পারেন নাই। বালগঙ্গাধর যখন ষোড়শ বৎসরের বালক, তখনই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। সেই বৎসরই বালগঙ্গাধর বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অধ্যবসায়ী কর্ম্মঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, ধর্ম্মভীরু কর্ম্মচারীরূপে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল।

বাল গঙ্গাধরের শৈশব শিক্ষা প্রধানতঃ পিতার নিকটেই হইয়াছিল গঙ্গাধর পন্থ সংস্কৃত ও মারাঠী সাহিত্যে এবং গণিত শাস্ত্রে—বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্রেরও ঐ সকল বিষয়ে বিশেষ আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। স্মরণশক্তি প্রখর থাকায় শৈশবে অনেক সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছিলেন। একটী শ্লোক আবৃত্তি করিতে শিখিলে গঙ্গাধর পন্থ পুত্রকে উৎসাহ দিবার জন্য একটী পাই পুরস্কার দিতেন। এইভাবে বালগঙ্গাধর প্রায় দুই টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দশম বর্ষ বয়সেই সংস্কৃতে তাঁহার এমন ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল যে, অনায়াসে শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। একাদশবর্ষ বয়সে তিনি ইংরেজি উচ্চ-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তাহার পূর্ব্বেই পিতার নিকট পাটীগণিত প্রায় সম্পূর্ণ এবং বীজগণিত ও জ্যামিতির অনেক অংশ শিক্ষা করিয়াছিলেন। অষ্টমবর্ষে যখন তাঁহার উপনয়ন হয়, তাহার পূর্ব্বেই তিনি অমরকোষের অর্দ্ধেক এবং ব্রহ্মকর্ম্মের অধিকাংশ পাঠ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে বালগঙ্গাধর তিলকের পিতা পুনায় বদলী হন। সেই খানেই পরবৎসর তিনি ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। এই সময়েই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়িবার সময়েই শিক্ষকগণ তাঁহার মেধা ও স্মরণশক্তির পরিচয়ে বিস্মিত হইতেন। শিক্ষক মহাশয় অঙ্ক জিজ্ঞাসা করিলে মুখে মুখে কষিয়া উত্তর দিতেন। লিখিয়া অঙ্ক কষিতে বলিলে উত্তর দিতেন "মনে মনেই যখন উত্তর বাহির করা যায়, তখন আবার লিখিয়া হাত ব্যথা করা কেন?" ঐ শিক্ষালয়ে তিনি দুই তিন বছরে ৪।৫ শ্রেণীর পাঠ সমাপন করিয়া ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে বিশেষ কৃতীত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণের সহিত তাঁহার প্রায়ই মনোমালিন্য হইত। বয়োজ্যেষ্ঠদিগের সহিত তর্ক করিবার জন্য তিনি বুদ্ধিমান কিন্তু তার্কিক, সুবিবেচক ও একগুঁয়ে বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। একবার একটি বিষয় লইয়া সংস্কৃত শিক্ষকের সহিত তাঁহার মতানৈক্য হয়। তদানীন্তন ইংরেজ প্রধান শিক্ষক সংস্কৃত

শিক্ষকের পক্ষ অবলম্বন করায় তিলক সরকারী বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন। পূর্ব্বোক্ত শিক্ষক বদলি হওয়ায় তাঁহার স্থলে অন্য ব্যক্তি আসিলে তিনি পূর্ব্বের বিদ্যালয়ে ফিরিয়া আসেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার এক বৎসর পূর্ব্বে, তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল তাপীবাঈ। বিবাহের পর দেশ প্রচলিত প্রথানুসারে তিনি শ্বশুর পরিবার প্রদত্ত সত্যভামা নামে পরিচিত হন।

১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে তিলক 'ডেকান কলেজে' (Deccan College) ভর্ত্তি হন। পূর্ব্বেই পিতৃবিয়োগ হওয়াতে পিতৃব্য গোবিন্দরাও তাঁহার অভিভাবক হন। কলেজে তিনি কখনও সুশীল ও সুবোধ' বালকের ন্যায় নিয়মিত পাঠ্য বিষয়ে মনোযোগ অথবা অধ্যাপকের অধ্যাপনার সময়ে উপস্থিত থাকিতেন না। প্রথম প্রথম স্বাস্থ্য ভাল না থাকার জন্য শরীর চর্চ্চাতেই বেশী মনোযোগ দিতেন। কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময়ে এক বছর তিনি, প্রকৃত পক্ষে, অধ্যয়ন অপেক্ষা ব্যায়াম, সন্তরণ, অশ্বারোহণে ভ্রমণ প্রভৃতি কার্য্যেই সময় অতিবাহিত করেন। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন বলিয়া, সাধারণ ছাত্রদিগের ন্যায় পাঠ্য গ্রন্থ লইয়া, দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ করা তাঁহার প্রয়োজন হইত না। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য অধিক মনোযোগ ও সময় দেওয়ার জন্য প্রথমবারের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না বটে; কিন্তু ব্যায়ামের প্রতিযোগীতায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন। কিন্তু অধ্যাপকগণ নানা বিষয়ে তাঁহার অসাধারণত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহার সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করিতেন। ছাত্র হিসাবে তিনি বিশেষ যশস্বী হইতে পারেন নাই, কিন্তু প্রখর বুদ্ধির জন্য, বিশেষতঃ সংস্কৃত ও গণিতে ব্যুৎপত্তির জন্য সমপাঠীদের বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এফ্-এ (First Arts) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ডেকান কলেজের গণিতের অধ্যাপকের অধ্যাপনায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া বোম্বাই-এর এলফিনষ্টোন (Elphinstone) কলেজে চলিয়া যান। সেখানের অধ্যাপনাও মনোঃপূত না হওয়ায়, পুনরায় ডেকান কলেজে ফিরিয়া আসিলেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে নিজের চেষ্টাতেই বিশেষ পরিশ্রম করিয়া প্রথম বিভাগে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বামন শিবরাম আপ্টে নামক আর একজন ছাত্রও তাঁহার ন্যায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। আপ্টে মহাশয়ও পরবর্ত্তী জীবনে জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে তিলক আইন (L. L. B.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

মধ্যে গণিত শাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে পড়াশুনা করা ঠিক তাঁহার প্রকৃতি গত ছিল না; কিন্তু যে বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ জন্মিত, সেই বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভের জন্য কোনওরূপ চেষ্টার ত্রুটী করিতেন না। আইন পড়িবার সময়ে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম সম্যক বুঝিবার জন্য যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাদি শাস্ত্রসমূহের মূল পাঠ করিয়াছিলেন।

বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরই ধরিতে গেলে, তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। তাঁহার জীবনে যে কয়টি বিষয় তাঁহার মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার মধ্যে বরোদার গায়কোয়াড় মল্‌হররাও-এর রাজ্যচ্যুতি, বাসুদেব বলবন্ত ফড়্‌কে নামক উন্মার্গগামী ব্রাহ্মণ যুবককর্ত্তৃক (বাঙ্গালা দেশের ন্যায়) সন্ত্রাসবাদ প্রচলনের চেষ্টা এবং ১৮৭৭—৭৮ খ্রীঃ অব্দের বোম্বাই প্রদেশে সংঘটিত ভীষণ দুর্ভিক্ষ এই তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। এই সকল বিষয়ে তৎকালীন মারাঠা সমাজে গভীর আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। বোম্বাই প্রদেশের সমুদয় শিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি এই সকল বিষয়ে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। অপরিণত বুদ্ধি ছাত্র ও যুবকদলের উপর দেশের মনীষীবর্গের চিন্তা ও কার্য্যের প্রভাব বিশেষভাবে পতিত হইত। বস্তুতঃ তিলক যখন কলেজের ছাত্র, তখন সমগ্র মারাঠা সমাজে শিক্ষা বিস্তার, রাজনীতি, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে বহু বিস্তৃত এবং সুচিন্তিত কর্ম্ম পদ্ধতি মূলক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং তীক্ষ্ণবুদ্ধি চিন্তাশীল যুবক তিলকও যে ঐ সকল বিষয়ের সহিত চিন্তা ও কার্য্যের সহযোগীতা রক্ষা করিয়া চলিবেন, তাহা মনে করা একান্তই স্বাভাবিক। সেই জন্য তিলক প্রমুখ বহু শিক্ষিত যুবকের মনেই দেশ সেবার মহান আকাঙ্খা জাগ্রত হয় এবং শিক্ষা জীবন শেষ করিয়া তাঁহারা প্রায় সকলেই দেশ সেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন। তিলকের বাসনা হইয়াছিল যে শিক্ষা বিস্তার ও সংবাদ পত্র পরিচালন, এই কার্য্যের দ্বারা তিনি দেশ সেবা করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন হইবার পরেই তিনি প্রথমে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে 'নিবন্ধমালা' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা পরিচালনা কার্য্যে যে সকল উৎসাহী দেশ কল্যাণকামী যুবক তিলকের সহযোগী ছিলেন অথবা তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে গোপাল গণেশ আগরকার, বামন শিবরাম আপ্টে,

বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপ্‌লুঙ্কার, মহাদেব বল্লল নামযোশী প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। রচনার বৈশিষ্টে, ভাবের নূতনত্বে, সমালোচনারীতির নির্ভীকতায়, অল্পদিনের মধ্যেই তিলকের নিবন্ধমালা শিক্ষিত সমাজের সুদৃষ্টিতে পতিত হইল। কিছুকাল পরে মারাঠী ভাষায় কেশরী এবং ইংরেজি ভাষায় দি মাহরাট্টা (The Mahratta) পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ায় তিলক প্রমুখ কর্ম্মবীরদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসার লাভ করিল এবং মারাঠা জাতীর মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার স্রোত তীব্রতর বেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল।

কোলাপুরে তখন শিবাজীর বংশের এক শাখা রাজত্ব করিতেন। ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে কোলাপুর অধিপতি রাজারাম পরলোকগত হইলে, পর বৎসর তাঁহার বিধবা মহিষীদ্বয় একটি পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরেই ঐ ভাবী-কোলাপুরপতি সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহজনক ও আশঙ্কামূলক কথা চারিদিকে প্রচারিত হইতে লাগিল। সেই সূত্রে কোলাপুর দরবারের একজন পদস্থ কর্ম্মচারীর (রাও বাহাদুর বারভে) নামেও নানারূপ অপ্রিয় কথা প্রচলিত হইতে লাগিল। সাংবাদিকের কর্ত্তব্য বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তিলক মারহাট্টা ও কেশরী পত্রিকাদ্বয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। ফলে রাও বাহাদুর বার্ভে তিলক ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের বিরুদ্ধে বোম্বাই হাইকোর্টে মানহানীর মকর্দ্দমা আনয়ন করেন। এই সংস্রবে বোম্বাই'র শিক্ষিত সমাজে বিশেষ উত্তেজনার উদ্ভব হয়। বিচারে তিলক ও আগরকারে চারি মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড লাভ করিলেন। কারাগারে সদ্ব্যবহারের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাদের দণ্ডভোগের সময় একুশদিন কমাইয়া দেওয়া হয়। যথা সময়ে মুক্তি লাভ করিয়া উভয়েই জনসাধারণকর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। দেশ সেবাক্ষেত্রে তিলকের যোগ্যতার এই প্রথম পুরস্কার (অক্টোবর, ১৮৮২ খ্রীঃ)।

বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপ্‌লুঙ্কর নামে সেই সময়ে পুনা অঞ্চলে একজন শিক্ষানুরাগী স্বাধীনচেতা জনহিতকামী ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে তিলক তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া একটি ইংরেজি বিদ্যালয় (New English School) স্থাপন করিলেন। সেই সময়ে পুনাতে সরকারী ইংরেজি বিদ্যালয় ভিন্ন আর অন্য ভাল বিদ্যালয় ছিল না। মাধবরাও নামযোশী, বাসুদেব শাস্ত্রী খড়ে, নন্দর্গীকার শাস্ত্রী প্রভৃতি আরও কয়েকজন উৎসাহী যুবক তিলক ও বিষ্ণু শাস্ত্রীর সহিত যোগ দিলেন। এইরূপ কয়েকটি কর্ম্মবীরের সমবেত চেষ্টায়, নানারূপ বাঁধাবিপত্তি ও প্রতিকূলতার মধ্যেও বিদ্যালয়টি দ্রুত উন্নতির

পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিন উহার ছাত্র সংখ্যা ছিল উনিশটি। পাঁচ বৎসরের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা এক হাজারের উপর দাঁড়াইল। উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর বার্ষিক প্রতিযোগীতা পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের ফল এরূপ সন্তোষজনক হইয়াছিল যে সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা দ্রুত গতিতে কমিতে আরম্ভ করিল। ফলে সরকারী বিদ্যালয়টি উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব পর্য্যন্ত হইয়াছিল। অথচ তিলকের সহকর্ম্মীরা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়া মাসিক ত্রিশ টাকার বেশী পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন না।

এই শিক্ষালয়ের স্থাপনাবধি তিলকের মনে উহার সহিত একটি কলেজ খুলিবারও ইচ্ছা ছিল। বিদ্যালয়টিকে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি কলেজ খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই উদ্দেশ্য সাধনের প্রথম ধাপ স্বরূপ ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দের ২৪শে অক্টোবর 'দক্ষিণ ভারতীয় শিক্ষা সংসদ' (Deccan Education Society) প্রতিষ্ঠিত হইল। ঐ সংসদের সদস্যগণ অতি সামান্য পারিশ্রমিকে দেশে শিক্ষা বিস্তারের কার্য্যে আত্ম নিয়োগ করিতে মনস্থ করিলেন। বোম্বাই প্রদেশের নানা স্থানে শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে এই শিক্ষা সংসদের দান বহু বিস্তৃত। সুদীর্ঘ এগার বৎসরকাল বালগঙ্গাধর তিলক একান্ত নিষ্ঠার সহিত, ঐ সংসদের সকল প্রকার কার্য্যে আত্ম নিয়োগ করিয়া ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে, নানারূপ আভ্যন্তরিক অশান্তির হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য, উহার সহিত সকল সংশ্রব ছিন্ন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু যতদিন তিনি উহার সহিত যুক্ত ছিলেন, ততদিন অধ্যাপনা হইতে আরম্ভ করিয়া, সংসদের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও উহার সকলপ্রকার ব্যবস্থার জন্য, তিনি অতুলনীয় পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে বোম্বাই অঞ্চলে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ইহার পূর্ব্বে, তাহার ছাত্র জীবনে যখন আর একবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তখনই জনসাধারণের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের যথোচিত চেষ্টার অভাব দর্শন করিয়া, তিনি বিশেষ ব্যথিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ছাত্রজীবন তখনও শেষ না হওয়াতে তিনি ইচ্ছা থাকিলেও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এইবার তিনি নিজের কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিবার সুযোগ পাইলেন। কতিপয় সহকর্ম্মীদের লইয়া তিনি একটি সাহায্য সঙ্ঘ গঠন করিলেন এবং একটি সুচিন্তিত কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করিয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। কেশরী ও মারহাট্টা পত্রিকাদ্বয়েতে এবিষয়ে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করিতে

লাগিলেন। অপরদিকে রায়তদিগকে আইন সঙ্গতভাবে আন্দোলন করিতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। সরকারী আইনে, এইরূপ অন্নকষ্টের সময়ে খাজানা না দিবার যে সকল বিধি আছে, সেই সকল মুদ্রিত করিয়া প্রজা-দিগের মধ্যে বিতরণ করিতে অথবা লোক পাঠাইয়া তাহাদের মধ্যে উহা প্রচার করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য কর্তৃপক্ষ ইহাতে তাঁহার উপর রুষ্ট হইলেন। কিন্তু তিলকের কাজে আইন বহির্ভূত কিছু না পাইয়া, কোন-রূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও করিতে পারিতেছিলেন না। কয়েকবার অবশ্য তাঁহার সহকর্ম্মীদের মধ্যে দুই তিন জনকে রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে শাস্তি দিবার চেষ্টা হয়; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই।

এই দুর্ভিক্ষের আক্রমণ প্রশমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, বোম্বাইয়েতে ভীষণ প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হইল। এই নূতন অতি মারাত্মক রোগের প্রাদুর্ভাবে কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণ সকলেই ভীষণ শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। রোগের বিস্তার ব্যাহত করিবার জন্য এবং রোগাক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য যে সকল ব্যবস্থা করা হইল তাহাতে বহু গুরুতর ত্রুটী রহিয়া গেল। তিলক তখন পুনাতে উপস্থিত থাকিয়া এক-দিকে যেমন শঙ্কাপীড়িত জনসাধারণকে অভয় প্রদান ও রোগাক্রান্তদের চিকিৎ-সার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, অপর দিকে সেইরূপ মারহাট্টা ও কেশরী পত্রিকায় সরকারী ব্যবস্থার দোষ প্রদর্শন করিয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী দুর্ভিক্ষের সময়ে তিলককে কোনওরূপ শাস্তি প্রদান করিতে পারা যায় নাই বলিয়া, কর্তৃপক্ষের বিশেষ ক্রোধ সঞ্চিত হইয়া-ছিল। এইবারে তাঁহারা তিলককে জব্দ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তেমন কোনও সুযোগ প্রথম প্রথম ঘটিয়া উঠিল না। বোম্বাই প্রবাসী ইংরেজেরাও তিলকের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাঁহারাও নানা ভাবে তিলকের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের পত্রিকা সমূহও এবিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু দেশে সরকারী ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষও ক্রোধ ক্রমশই বাড়িয়া চলিতে লাগিল। লোকে সরকারী হাসপাতালে রোগীকে না পাঠাইয়া, তিলক ও তাহার সহ-কর্ম্মীদের স্থাপিত হাসপাতালে পাঠাইতে লাগিল। এইভাবে একদিকে যেমন তিলকের লোকপ্রিয়তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, অপরদিকে সেইরূপ কর্তৃপক্ষের ও প্রবাসী ইংরেজদের তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ বাড়িয়া চলিতে লাগিল। কর্তৃপক্ষ তিলকের যুক্তিসঙ্গত

আলোচনায় কর্ণপাত করা অথবা তাঁহার অভিজ্ঞতা-প্রসূত ব্যবস্থা অনু- কাজ করা, কিছুরই আবশ্যকই বোধ করিলেন না। এদিকে জন সাধারণের বিদ্বেষও ক্রমাগত বাড়িয়া চলিল।

অবশেষে ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দের জুন মাসে দামোদর চাপেকর নামক এক ব্যক্তির হস্তে একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী নিহত হইলেন। প্লেগ নিবারণ কল্পে যে সরকারী ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছিল, তিনি সেই সকল ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করার একজন ভারপ্রাপ্ত পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। সেই সঙ্গে একজন সৈনিক বিভাগের পদস্থ কর্ম্মচারীও দামোদরের সহকর্ম্মীর হস্তে নিহত হইলেন।

এই ঘটনায় ভারতের সর্ব্বত্র এবং ইংলণ্ডেও ইংরেজদের মধ্যে যে গভীর উত্তেজনার উদ্ভব হইল, তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে তিলককেই ইহার জন্য দায়ী করিতে লাগিলেন। বোম্বাইর তৎকালীন শাসনকর্ত্তা লর্ড স্যাণ্ডহার্ষ্ট (Send Hurst) অবশ্য এই হত্যা ব্যাপারের সঙ্গে তিলকের কোনও যোগ ছিল তাহা মনে করেন নাই, কিন্তু তিনিও প্রবাসী ইংরেজদের ও তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত ইংলণ্ডের সংবাদ পত্র সমূহের আন্দোলন উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সেই বৎসর ২৭শে জুলাই বোম্বাই নগরে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল। তিনি সেই সময়ে বোম্বাইতে যাইয়া, কয়েকটি ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্রে তাঁহার বিরুদ্ধে যে বিষ উদ্গীরণ করা হইতেছিল, সে বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য আইনজ্ঞদের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিলকের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে কেশরীর মুদ্রাকরকেও গ্রেপ্তার করা হয় এবং 'পুনাবৈভব', 'মোদবৃত্ত', 'প্রতোদ' 'জ্ঞান প্রকাশ' ও 'সুধাকর' নামক কয়েকটি দেশীয় সংবাদপত্রের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং কয়েকজন ব্যক্তিকে নির্ব্বাসিত করা হয়।

সপ্তাহ খানেক পরে তিলককে প্রথমে জামীনে মুক্তি দেওয়া হয়, পরে ৮ই আগষ্ট বোম্বাই হাইকোর্টে বিশেষ জুরীর সাহায্যে তাঁহার বিচার আরম্ভ হইল। জুরীগণের মধ্যে ছয়জনই ইংরেজ এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহই মারাঠী ভাষা জানিতেন না। কেশরী পত্রিকাতে প্রকাশিত দুইটি প্রবন্ধই তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তি ছিল। তাহাদের মধ্যে একটিতে তিনি শিবাজী কর্ত্তৃক আফজল খাঁর হত্যা সমর্থন করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগে সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষ উত্তেজনা ও আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। দেশীয়

পরিচালিত প্রায় সমুদয় সংবাদপত্রই তিলকের পক্ষ সমর্থণ করিয়া সরকারী কাজের তীব্র সমালোচনা করিতে থাকেন। ফল অবশ্য কিছুই হয় নাই। বিচারে তিলকের প্রতি আঠার মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। (১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭ খ্রীঃ)। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে প্রিভি কাউন্সিলে (Privy Council) আপীল করা হইয়াছিল। তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। প্রায় এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়া, নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হইবার ছয় মাস পূর্ব্বেই তিনি মুক্তি লাভ করেন। এই ব্যাপারে ইংলণ্ড প্রবাসী খ্যাতনামা জর্ম্মণ মনীষী ম্যাক্সমুলার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিলকের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ওরিয়ণ' (Orion) পাঠ করিয়া ম্যাক্সমুলার তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি উদ্যোগী হইয়া বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত একখানি প্রার্থনা পত্র সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নিকট প্রেরণ করেন। এদেশস্থ ইংরেজ রাজ পুরুষগণ তখন বলিয়াছিলেন যে, তিলক দয়া ভিক্ষা করিলেই তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে। তিলক দয়াভিক্ষা করিতে আদৌ সম্মত হইলেন না। পরিশেষে পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা-পত্র প্রেরণের ফলে তিনি মুক্তি লাভ করিলেন। বন্দী অবস্থায় থাকিবার কালেই, প্রধানতঃ ম্যাক্সমুলারের চেষ্টার ফলে কারাগারে তিলককে অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় রাখা হইয়াছিল এবং তাঁহাকে লেখাপড়া করিবার সুযোগও প্রদান করা হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি 'আর্য্যদিগের বাসভূমি' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনার আয়োজন করিতেছিলেন।

দামোদরকর্তৃক অনুষ্ঠিত হত্যা কাণ্ডের জন্য তিলককেই প্রধানতঃ দায়ী করিতে ইংরেজ সংবাদপত্রদের উৎসাহের সীমা ছিল না। কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া এইরূপ দুইটি পত্রিকার বিরুদ্ধে তিনি মানহানীর মকর্দ্দমা আনয়ন করেন। একটি বোম্বাই নগরীর টাইম্স অব্ ইণ্ডিয়া (The Times of India) অপরটি ইংলণ্ডের গ্লোব (The Globe)। দুইটি পত্রিকার সম্পাদকই স্বীয় স্বীয় মন্তব্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হন।

জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তা বোধ ও সঙ্ঘভাব জাগ্রত করিবার জন্য তিলক দুইটি অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করেন। একটি গণপতি উৎসব, অপরটি শিবাজী উৎসব। প্রথমটি ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে প্রবর্ত্তিত হয় এবং দ্বিতীয় উৎসবটি উহার দুই বৎসর পরে আরম্ভ হয়। প্রথমাবধি তিলকের বিরুদ্ধবাদীরা এবং শাসন কর্তৃপক্ষ এই দুই বিষয়ে বিরোধিতা করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তখন-

কার দিনে দেশের রাজনীতিকদের মধ্যে প্রায় সকলেই প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণ করিতেন। এই সকল রাজনীতিক (Liberal) বা মধ্যপন্থী (Moderates) নামে পরিচিত হন। তাঁহারা তিলকের ন্যায় প্রগতিশীল রাজনীতিকের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন না। এই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতির নাম সমধিক পরিচিত। ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দের শিবাজী উৎসব উপলক্ষে লিখিত একটি রচনার জন্যই তিলকের কারাদণ্ড হয়।

এই সময়েই বোম্বাই প্রদেশের নানা স্থানে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা আরম্ভ হয়। বোম্বাই প্রদেশের নানা স্থানে কিছুকাল পূর্ব্বে গো-রক্ষা সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। তিলকের বিরুদ্ধবাদীরা প্রচার করিতে লাগিলেন যে, ঐ গো-রক্ষা সমিতির কার্য্যের সহিত তিলক ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছেন এবং প্রধানতঃ তাঁহারই গুপ্ত প্রচেষ্টার ফলে ঐরূপ দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে। তিলক আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ কেহই বিবেচনার মধ্যে আনেন নাই। বস্তুতঃ সেই সময়ে বিশেষ প্রভাবশালী একদল লোক যে কোনও উপায়ে তিলকের প্রতিপত্তি খর্ব্ব করিতে ও তাঁহাকে নানাভাবে নির্য্যাতিত করিতে প্রয়াস পাইতেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই সকল লোকদের মধ্যে সমগ্র ভারতে বিশেষভাবে পরিচিত বিশিষ্ট রাজনীতিক নেতাও ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সামান্য বিষয়ে অতিশয় ক্ষুদ্রমনার পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ মারাঠী গণিতবিদ্ পরঞ্জপে যখন ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য যে সভা আহূত হয়, তাহাতে এই সকল হীন প্রকৃতির লোকের চেষ্টায়, তিলকের আমন্ত্রণও হয় নাই।

বাবা মহারাজ নামক একজন মারাঠী সর্দ্দারের অন্তিম অনুরোধে তিলক তাহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও বিধবা পত্নীর তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই বিষয়ে আরও কয়েকজন অছি (Trustee) ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহই বিশেষ কিছু করিতেন না। এ বিষয়ে জড়িত হইয়া, শত্রু পক্ষের চক্রান্তে তিলককে এক দীর্ঘকাল স্থায়ী মামলার মধ্যে পড়িতে হয়। তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা প্রাণপণে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন যে, তিলক ঐ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে অসাধুতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দলিল প্রভৃতি জাল করিয়া অর্থাদি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া এই

মামলা চলে। উহাতে তিলকের বিরুদ্ধে ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়বিধ অভিযোগ আনীত হয়। পরিশেষে প্রিভি-কাউন্সিল পর্য্যন্ত যাইয়া মকর্দ্দমায় তিলকই জয়লাভ করেন। সামান্ত দুই একটি বিষয়ে ভিন্ন সমুদয় প্রধান প্রধান বিষয়ে তিনি নির্দ্দোষ বলিয়া ব্যক্ত হইলেন। সমুদয় বিষয় নিষ্পত্তি পাইতে প্রায় চৌদ্দ বৎসর লাগিয়াছিল।

কর্ম্মক্ষেত্রের প্রথম কয়েক বৎসর তিলক বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন এবং সংবাদপত্র (মারহাট্টা ও কেশরী) পরিচালনার জন্যই প্রধানতঃ সময় ও শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে দক্ষিণ ভারতীয় শিক্ষাসংসদের সহিত সমুদয় সংস্রব ছিন্ন করিবার পর তিনি একটু ঘনিষ্ঠভাবে কংগ্রেসের কাজে যোগ দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কংগ্রেসে যাহাদের প্রতিপত্তি ছিল তাহারা বর্ত্তমানকালের রাজনীতিক ভাষায় মধ্যপন্থী। তাঁহাদের রাজনীতির চর্চ্চা বক্তৃতা প্রদান, প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা, প্রতিবাদ মূলক প্রস্তাবাদি গ্রহণ করা, আবশ্যক মত লাটসকাশে অথবা ইংলণ্ডে আন্দোলনের জন্য লোক প্রেরণ (Deputation)। তিলক প্রথমাবধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে,এই ধরণের রাজনীতি চর্চ্চার দিন শেষ হইয়াছে। কংগ্রেসকে আর বার্ষিক আলোচনা ও প্রতিবাদ সভারূপে চালাইলে হইবে না। এ যাবৎ সরকারী কাজের প্রতিবাদই হইয়াছে। কিন্তু সরকার আমাদের প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিলে বা অনুরোধ রক্ষা না করিলে কংগ্রেস কি করিবে তাহা স্থির ছিল না। তিলক প্রমুখ নব্য উন্নতিশীল নেতৃবৃন্দ কথা অপেক্ষা কাজের উপরই বেশী গুরুত্ব দিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ইহাতে নব্যদলের সহিত প্রাচীন দলের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। তাঁহারা তিলক প্রভৃতি প্রগতি পরায়ণ নেতাদিগকে তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষামত কাজ করিতে দিতে সম্মত হইলেন না। তিলক ও তাঁহার অনুগামীবৃন্দ নানাভাবে বাধা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দে পুনা নগরীতে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তিলকই উহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা নানারূপ চক্রান্ত করিয়া বাধা সৃষ্টি করিতে থাকেন। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য কংগ্রেসের অধিবেশন যথাযথভাবেই সম্পন্ন হইল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উহার সভাপতি হইয়াছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশনের পর শিবাজী উৎসবও মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। সুরেন্দ্রনাথও সেখানে পৌরহিত্য করিয়া সকলকেই শিবাজী উৎসবে যোগ দিবার জন্য উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করেন।

এই সময় হইতে ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত কংগ্রেসের কার্য্য পদ্ধতিতে তিলক খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই, পূর্ব্বেই উহার কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি অবশ্য কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন নাই। প্রায় প্রতি অধিবেশনেই উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার বক্তব্য সকলের নিকট উপস্থিত করিতেন। কিন্তু তাঁহার মতানুগাব্যক্তির সংখ্যা অত্যন্ত কম থাকাতে তাঁহাদের সমুদয় চেষ্টাই প্রায় অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিষ্ফল হইত। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তাঁহার অনুগামীদিগের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিল। ১৯০২ খ্রীঃ অব্দে লর্ড কার্জ্জন ভারতের প্রধান শাসনকর্ত্তা (Governor General) হইয়া আসিলেন। তাঁহার শাসনকালে নানা বিষয়ে উন্নততর প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলেও মোটের উপর দেশে বিশেষ-ভাবে শিক্ষিত লোকের মধ্যে—অশান্তি বাড়িয়াই চলিয়াছিল;

বঙ্গবিভাগ সংঘটিত হইলে যে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা প্রথমে বাঙ্গালাদেশে আরম্ভ হয়। অন্যান্য প্রদেশের বিশিষ্ট নেতার মধ্যে অতি অল্প লোকেই এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উহার প্রতি বিরূপভাবই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরাই ধরিতে গেলে প্রথম ব্যাপকভাবে এমন একটা কিছু করিতে আরম্ভ করেন, যাহার সহিত তিলকের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যে 'কথার' সহিত 'কাজ'ও ছিল। বিলাতী বর্জ্জন (Boycott) আন্দোলনই ছিল সেই কাজ। কর্ম্মবীর তিলক এইবার নিজের মনের মত কর্ম্মীর সন্ধান পাইয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইলেন। বাঙ্গালাদেশের নেতা-দের প্রতি তিনি সর্ব্বপ্রকারে সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। তিনি বাঙ্গালীদের এই 'বর্জ্জন' আন্দোলনটিকে একটী সর্ব্ব-ভারতীয় আন্দোলনে পরিণত করিবার প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত কংগ্রেসের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থার উপর বিশেষ প্রভাব জন্মে নাই। তথাপি তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে কংগ্রেস যেন এই 'বর্জ্জন' আন্দো-লনটিকে তাহার মূলনীতি স্বরূপ গ্রহণ করে। তাঁহার এই প্রচেষ্টার সহিত বাঙ্গালাদেশের বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, পঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়, বোম্বাই প্রদেশের গণেশ খাপার্দ্দে, মাদ্রাজের সুব্রহ্মণ্য আইয়ার প্রভৃতির বিশেষ সহানুভূতি ও যোগ ছিল। ১৯০৫ খ্রীঃঅব্দে বারাণসী নগরে অনুষ্ঠিত

কংগ্রেসের অধিবেশনে সভপতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে, তাঁহার অভিভাষণে বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদ ও বর্জ্জন আন্দোলন সমর্থন করেন। কিন্তু তিলকের ইচ্ছা ছিল যে, কংগ্রেস যেন পৃথক প্রস্তাবাদি গ্রহণ দ্বারা 'বর্জ্জন' আন্দোলন সমর্থ করেন এবং অন্যান্যকে উহার অনুরূপ আন্দোলন করিতে অনুরোধ করে। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। তিনি আশা করিলেন যে, পরবর্ত্তী বৎসর কলিকাতা নগরে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে হয়ত, তাঁহার অভিলাষানুরূপ কার্য্য হইবে। বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ বাঙ্গালী নেতাগণ সেইজন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, তিলক যেন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের (১৯০৬ খ্রীঃ) সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু অবস্থা গতিকে তাহা হইল না। দাদাভাই নৌরজী সভাপতি হইলেন। তখন তিলক, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি নেতৃবর্গের বিশেষ চেষ্টার ফলে, সেই বৎসর কংগ্রেসের মণ্ডপ হইতে বর্জ্জননীতি সমর্থিত হইয়া প্রস্তাব গৃহীত হইল।

পরবর্ত্তী বৎসর লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু পঞ্জাবে তিলকের প্রভাব অধিক হইতে পারে আশঙ্কায়, নাগপুরে অধিবেশন করিবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সেখানেও হইতে পারিল না। নিখিল ভারতীয় কার্য্যকরী সমিতির (All India Congress Committee) নির্দ্দেশে সুরাট নগরে কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়া স্থির হইল। সুরাটে অনুষ্ঠিত অধিবেশন পণ্ড হইয়া যায়। তাহার প্রধান কারণ সেই অধিবেশনের কর্ণধারগণ, তিলক, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ প্রমুখ প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দের প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য বর্জ্জন আন্দোলন, জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলি সেই অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় হইতে বাদ দিবার চেষ্টা করেন।

সুরাটে তাঁহাদের সমুদয় চেষ্টা এই ভাবে বৃথা হইল দেখিয়া তিলক দুঃখিত হইলেন কিন্তু নিরাশ হইলেন না। তিনি জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি কি হওয়া উচিত, তাহা প্রচার করিবার জন্য মারাঠী ভাষায় 'রাষ্ট্রমত' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পত্রিকাখানি বেশীদিন প্রকাশিত হইতে পারে নাই। রাজদ্রোহের অভিযোগে তিনি নির্ব্বাসিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়।

এই সময়েই, অন্যান্য বহুবিধ গুরুতর কাজের মধ্যেই তিনি পুনা জিলা রাষ্ট্রনীতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। ঐ সম্মেলনের অধিবেশনে প্রগতি-শীল রাজনীতিক মতামত আলোচিত হয় এবং সকল সম্প্রদায়ের ও বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনীতিক

গণকে, দেশের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, এক সঙ্গে কাজ করিবার জন্য, অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পুনা সম্মেলনেরই একটি নির্দ্ধারণ অনুসারে অতঃপর তিলক মাদক দ্রব্য প্রধানতঃ সুরা ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। এই কাজে তিনি মধ্যপন্থীদের এবং অনেক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহাদের বিরোধ উপস্থিত হইল। একাধিক স্থানে শান্তি রক্ষকদের সহিত মদ্যপান নিবারণী সভার স্বেচ্ছাসেবকদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল।

এই সময়ের মধ্যে কংগ্রেসের দুইটি বিভিন্ন শাখার (মধ্যপন্থী ও তিলক প্রমুখ প্রগতিপন্থী) মধ্যে একটি মীমাংসার জন্য তিনি চেষ্টা করিতে থাকেন। ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বাঙ্গালা দেশের পাবনা সহরে কবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে যে প্রাদেশিক রাষ্ট্রনৈতিক সম্মেলন হয় তাহাতে বাঙ্গালার রাজনৈতিকেরা প্রায় একমত হইয়া অধিবেশন সম্পন্ন করেন। বোম্বাই প্রদেশেও সেইরূপ একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া তদনুরূপ আলোচনা ও নির্দ্ধারণাদি হইল।

এই সময়েই বাঙ্গালা দেশে সন্ত্রাসবাদ আত্মপ্রকাশ করিল। মজঃফরপুরে বোমার আঘাতে দুইজন নিরপরাধ ইংরেজ নিহত হইলেন। দেশে আবার উত্তেজনার উদ্ভব হইল। চারিদিকে সরকারী দমননীতির বহুল প্রচার আরম্ভ হইল। নানাস্থানে সংবাদপত্র দলন আরম্ভ হইল। যদিও তিলক প্রকাশ্যে একাধিকবার সন্ত্রাসবাদীদের কাজের তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন, তথাপি কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে শৃঙ্খলিত করা আবশ্যক বোধ করিলেন। কেশরী প্রভৃতি সংবাদ পত্রে তাঁহার লিখিত দুইটি প্রবন্ধের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনীত হইল এবং ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দের ২৪শে জুন তিনি বন্দী হইলেন। প্রায় এক মাস পরে, হাইকোর্টের সেসন জজের বিচারে তাঁহার প্রতি ছয় বৎসরের জন্য নির্ব্বাসন ও এক সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড প্রদান করা হইল (২২শে জুলাই ; তাহার পরদিন তাঁহার ৫৩তম জন্মতিথি ছিল)। এই ঘটনায় সমগ্র ভারতে যুগপৎ বিষাদ ও আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল। যাহারা তিলকের মতানুযায়ী ছিলেন তাঁহারা এই বৃদ্ধ সর্ব্বজনমান্য জননেতার দুঃখে ম্রীয়মান হইলেন। যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন তাঁহারা মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। একাধিক সর্ব্বভারতীয় মধ্যপন্থী নেতার কার্য্যের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছিল যে তাঁহারা যেন মনে করিয়াছিলেন যে তিলক

স্বকৃত পাপের ফল ভোগ করিতে গেলেন। প্রথমে ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চে (Full Bench) আপীল দায়ের করা হয়, তাহার পর বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলেও আবেদন করা হয়। কিন্তু কোথায়ও কোনও ফল হয় নাই।

তিলককে প্রথমে প্রায় তিন মাস সবরমতি কারাগারে রাখা হয়। তাহার পর তাঁহাকে ব্রহ্মদেশের প্রাচীন রাজধানী মান্দালয় নগরে প্রেরণ করা হয়। সুদীর্ঘ ছয় বৎসরকাল সম্পূর্ণভাবে দণ্ড ভোগ করিবার পর ১৯১৪ খ্রীঃঅব্দের ১৬ই জুন তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। পাছে পূর্ব্ব হইতে সংবাদ পাইলে জনসাধারণের পক্ষ হইতে কোনওরূপ সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হয়, তজ্জন্য মধ্যরাত্রে গোপনে তাঁহাকে নিজ বাসভবনের নিকটে আনিয়া মুক্তি দেওয়া হয়। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে ১৯১১ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর দরবার উপলক্ষে অনেক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ডকাল হ্রাস করা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কোনই বিবেচনা করা হয় নাই। এমনি দণ্ডবিধির সাধারণ নিয়মানুসারে সৎ আচরণের জন্য দণ্ডাদেশকালের যে হ্রাস করিবার প্রথা আছে, তাঁহার সম্বন্ধে সে প্রথাও অবলম্বন করা হয় নাই।

তিলক যতদিন রাজবন্দী ছিলেন ততদিন বোম্বাই অঞ্চলে প্রগতিপরায়ণ বা নব্য দলের প্রভাব কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছিল। তিনি যখন মুক্তি পাইয়া দেশে ফিরিলেন তাহার অল্পকিছুকাল পরেই ইয়োরোপে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে তিলক হয়ত পুনরায় এই সুযোগে বিপ্লবমূলক আন্দোলন আরম্ভ করিবেন। কিন্তু তিনি তাহার বিপরীত কাজই করিলেন। তিনি জনসাধারণকে সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধের জন্য সরকারকে সাহায্য করিতেই উপদেশ দিলেন। এমন কি ভারতে উপযুক্ত সৈন্যদল গঠনের জন্য সর্ব্বতোভাবে সরকারকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিশেষ আমল দিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করা অথবা তাঁহাকে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় পরামর্শ সভায় আহ্বান করা, এসব কিছুই তাঁহারা করিতে বিশেষ উৎসাহ দেখাইলেন না। বরঞ্চ সম্পূর্ণ বিনা কারণে পঞ্জাব প্রদেশ গমন করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ হইল।

নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি পুনরায় ধীরে ধীরে রাজনীতি ক্ষেত্রে পূর্ব্বপ্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। প্রধানতঃ তিনটী বিষয়ে তিনি মনঃসংযোগ করিলেন। (১) কংগ্রেসপন্থা রাজনীতিকদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন। (২) নিজের একটী প্রগতিশীল রাজনৈতিক

দল গঠন এবং (৩) স্বায়ত্ব শাসন (Home Rule) লাভের জন্য বিশেষভাবে আন্দোলন। প্রথমটির জন্য তাঁহার সকল চেষ্টাই বৃথা হয়। মধ্যপন্থীরা তিলকের সহিত সমান তালে চলিতে অসমর্থ হইয়া, তাঁহাকে কংগ্রেসের ব্যাপারে যতদূর সম্ভব পরিহার করিয়া চলিবার চেষ্টাও করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের সেই চেষ্টা কতকটা সফলও হইয়াছিল। প্রথম বিষয়টি তাঁহার আন্তরিক চেষ্টাতেও বিফল হইল দেখিয়া তিনি দ্বিতীয়টির জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যে একটি বিশেষ প্রভাবশালী প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল গড়িয়া উঠিল। কিন্তু তিনি কোনও দিন কংগ্রেসের বাহিরে থাকিয়া দেশের সেবা করিতে উৎসুক ছিলেন না বলিয়া, উহার কর্ণধারগণের সহিত মতভেদ হইলেও যথাসম্ভব সদ্ভাব রক্ষা করিয়া কংগ্রেসের সঙ্গেই মিলিয়া কাজ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তখনকার কংগ্রেস বিশেষ জোরের সহিত স্পষ্টভাবে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বায়ত্বশাসন দাবী করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল দেখিয়া, ১৯১৩ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে তিনি ভারতীয় স্বায়ত্ব শাসন সঙ্ঘ (Indian Home Rule League) স্থাপন করিলেন। সেই বৎসরই তাঁহার ষষ্ঠি বৎসর পূর্ণ হওয়ায় কৃতজ্ঞ গুণগ্রাহী মারাঠারা তাঁহার জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন করিলেন। ব্যক্তিগতভাবে বহু বন্ধু ও হিতৈষী তাঁহাকে উপহার প্রদান করিলেন। তদ্ভিন্ন একলক্ষ টাকার একটি তোড়াও তাঁহাকে প্রদত্ত হইল।

তিলকের এই ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব কর্ত্তৃপক্ষের যে বিশেষ প্রীতি উৎপাদন করে নাই তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিলক হয়ত বার্দ্ধক্য বশতঃ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি চর্চ্চা হইতে নিবৃত্ত হইবেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের সে আশা পূর্ণ না হওয়ায় তাঁহারা পুনরায় তাঁহাকে দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত তাঁহার তিনটি বক্তৃতার জন্য ১৯১৬ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে আবার তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হইল এবং বিচারে এক বৎসর সদ্ভাবে থাকিবার জন্য তাঁহার নিকট হইতে দশ হাজার টাকার দুইটী জামীন চাওয়া হইল। এবারে সৌভাগ্যবশতঃ হাই-কোর্টে আবেদনের ফলে ঐ দণ্ডাদেশ প্রত্যাহৃত হইল।

তখন হইতে কংগ্রেসের ভিতরে থাকিয়া এবং আবশ্যকমত তাহার বাহিরে থাকিয়া তিলক 'স্বায়ত্ব-শাসন আন্দোলন অতি তীব্রভাবে পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ ইংরেজ মহিলা Mrs. Annie Beasant

তাঁহার প্রধান সহযোগী ছিলেন।

১৯১৭ খ্রীঃ অব্দে ভারতের শাসন পদ্ধতির কি ভাবে সংস্কার করা চলে তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য তদানীন্তন ভারতসচীব মণ্টাগু সাহেব (Montague) ভারতে আগমন করেন। তিনি আসিবার পূর্ব্বেই অনেক রাজনীতিক নেতা, তাঁহার আগমনের ফলে একটা খুব বিশেষ কিছু লাভ হইবে বলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। মণ্টাগু সাহেবের সহিত বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ডের (Lord Chelmsford) সহযোগীতায় যে নূতন শাসন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল, তাহাতেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া বহু মধ্যপন্থী রাজনীতিক নেতা উহা গ্রহণ করিতে একান্ত আগ্রহ দেখাইলেন। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রাচীন কংগ্রেসপন্থীগণ প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া 'উদারনীতিক সঙ্ঘ' (Liberal League) নামে একটি রাজনীতিক দল গঠন করিলেন; কিন্তু দেশের অধিকাংশ রাজনীতিকই উহার তীব্র নিন্দা করিতে লাগিলেন।

বহু পূর্ব্ব হইতে তিলক ভারতের স্বায়ত্ব শাসনের দাবী ইংলণ্ডের জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার জন্য ইংলণ্ডে একটি প্রতিনিধি সঙ্ঘ (Deputation) পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৯১৫ খ্রীঃ অব্দের প্রথম চেষ্টা বিফল হয়। সেই সময়ে ইয়োরোপে মহাযুদ্ধ চলিতেছিল বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ঐরূপ কোনও রাজনীতিক দলকে ইংলণ্ডে যাইতে দিতে সম্মত হন নাই। ১৯১৮ খ্রীঃ অব্দে আবার ঐরূপ প্রতিনিধি সঙ্ঘ পাঠাইবার চেষ্টা হইল। উহার ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য তিলক মহারাষ্ট্রের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু এবারেও প্রেরণ করা সম্ভব হইল না।

ইহার কিছুকাল পরেই নিজের ব্যক্তিগত কারণে তিলক ইংলণ্ডে যাইবার অনুমতি লাভ করিলেন। ১৯১০ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র "টাইম্‌স"এর পক্ষ হইতে সার ভালেণ্টাইন চিরোল (Sir Valentine Chirol) নামক এক ব্যক্তি ভারতবর্ষের রাজনীতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার জন্য প্রেরিত হন। তিনি কিছুকাল এদেশে থাকিয়া এবং নানা সম্প্রদায়ের লোকের সহিত আলোচনা করিয়া যে জ্ঞানলাভ করেন, তাহা হইতে ইংরেজিতে 'ভারতে' অশান্তি (The Unrest in India) নামে একখানা পুস্তক রচনা করেন। তিনি ঐ পুস্তক প্রায় সমুদয় প্রগতিশীল (সরকারী রাজনীতিক ভাষায় উগ্রপন্থীরা Extremist) জননায়ক সম্বন্ধে অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ

করেন। বিশেষভাবে তিলকের নামে অত্যন্ত অপ্রীতিকর ও আপত্তিকর মন্তব্য সকল ঐ পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয়। এই কারণে তিলক সার ভ্যালেণ্টাইনের নামে মানহানীর মকর্দ্দমা করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিতে মনস্থ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যখন ইংলণ্ডে রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার জন্য প্রতিনিধি দল গমন করিবেন তিনিও তাহাদের সহিত গমন করিয়া সেই কাজের সঙ্গে সঙ্গে মকর্দ্দমা করিবেন। কিন্তু রাজনীতিক প্রতিনিধি দল (Deputation) প্রেরণ করার পথে ক্রমশঃই বাধা উপস্থিত হইতে লাগিল দেখিয়া তিলক নিজে শুধু মকর্দ্দমার জন্যই ইংলণ্ডে গমন করিতে মনস্থ করিলেন। এক্ষেত্রেও কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সহজে যাইবার সুযোগ প্রদান করেন নাই। যখন তাহারা দেখিলেন না দিলে আর গত্যন্তর নাই তখন সম্মতি দিলেন বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিলককে এই সর্ত্তে আবদ্ধ করাইয়া লইলেন যে তিনি এই মকর্দ্দমার কাজে ইংলণ্ডে অবস্থানকালে কোনও রূপ রাজনীতিক বক্তৃতা প্রদান করিবেন না। যাইবার পূর্ব্বেও প্রায় দুই মাস পূর্ব্ব হইতেই এদেশে তাঁহার উপর এই নিষেধাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল যে, তিনি জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ ভঙ্গ বক্তৃতা করিতে পারিবেন না।

নানারূপ প্রারম্ভিক ব্যবস্থার পর ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দের ১৯শে জানুয়ারী বিচারপতি ডার্লিং (Justice Darling) বিশেষ জুরির সাহায্যে এই মকর্দ্দমার বিচার আরম্ভ করিলেন। সারজন সাইমন (Sir John Simon) ও আর একজন ইংরেজ ব্যবহারজীবি তিলকের পক্ষ সমর্থন করিলেন এবং আয়র্লণ্ডের স্বায়ত্বশাসন আন্দোলনের বিখ্যাত বিরোধী নেতা সার এড্‌ওয়ার্ড কার্সন (Sir Edward Carson) সার ভ্যালেণ্টাইন ও উক্ত পুস্তকের প্রকাশক ম্যাকমিলাম কোম্পানীর পক্ষ সমর্থন করিলেন। প্রতিবাদীর পক্ষ হইতে তিলকের রাজদ্রোহাপরাধে যে সকল দণ্ড হইয়াছিল তাহাদের উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন যে তিলক সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য পুস্তকে করা হইয়াছে তাহা অমূলক নহে। বলাবাহুল্য বিচারে তিলকের পরাজয় হইল এবং তিনি বহু অর্থ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে বাধ্য হইলেন।

যদিও ইংলণ্ডে গমনের পূর্ব্বেই তিলককে তথায় বক্তৃতাদি প্রদান সম্পর্কে কয়েকটী সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল, সেখানে উপস্থিত হইয়া, তিনি স্বমতাবলম্বী ইংরেজ বন্ধুগণের সাহায্যে ঐ সর্ত্ত হইতে মুক্তি লাভ করেন। তিনি যতদিন ইংলণ্ডে ছিলেন ততদিন নানাভাবে ভারতের স্বায়ত্ব

শাসনের দাবী শিক্ষিত ইংরেজ জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে থাকেন। তাঁহার একাধিক বক্তৃতা বহু মনীষীর প্রশংসা লাভ করে। ইংলণ্ডের শ্রমিক দলের (Labour Party) মুখ-পাত্রদের সহিত তিনি বহু আলাপ আলোচনা করেন। প্রধানতঃ তাহারই চেষ্টাতে শ্রমিক দলের এক সম্মেলনে ভারতে স্বায়ত্ব শাসন লাভের আন্দোলন সমর্থন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাঁহার ইংলণ্ডে অবস্থান কালেই কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বহুকালকাঙ্খিত প্রতিনিধি সঙ্ঘ তথায় গমন করেন। তিলক যথাসাধ্য তাঁহাদের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া রাজনীতিক আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ভারতীয় স্বায়ত্বশাসন সঙ্ঘের (Indian Home Rule League) সভাপতি রূপে ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটির (Joint Parliamentary Committee)নিকট সাক্ষ্য দিতে হয়। উক্ত কমিটির সদস্যগণ তিলকের কার্য্যকলাপের সহিত পরিচিত ছিলেন। সেজন্য কেহ কেহ তাঁহাকে সাক্ষ্যদানের সুযোগ প্রদান করিতে সম্মত ছিলেন না। সেজন্য তাঁহার লিখিত মন্তব্য গ্রহণ করিয়া তাঁহারা সাক্ষ্যদানকালে তাঁহাকে প্রশ্নাদি করিয়া আর বেশী কিছু বলিবার সুযোগ প্রদান করেন নাই। এক বৎসরের অধিককাল ইংলণ্ডে থাকিয়া উক্ত বৎসর নবেম্বর মাসের শেষভাগে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরেই ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র প্রচলনের জন্য পার্লামেণ্টে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইল। উক্ত আইন সম্পর্কে ভারতীয় রাজনীতিকদিকের মনোভাব বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়িল। অধিকাংশ ব্যক্তিই, নূতন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী হইলেন। কেবল তিলক, মিসেস বেশান্ত (Mrs. Annie Beasant) প্রভৃতি কয়েকজন খুব উৎফুল্ল চিত্তে উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তথাপি তাঁহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিতেও প্রস্তাব করিলেন না। বরঞ্চ অমৃতসরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি উক্ত শাসনতন্ত্র গ্রহণের পক্ষে উত্থাপিত প্রস্তাব সমর্থন করেন। সেই সূত্রে অবশ্য একথা বলিতে ক্রটী করেন নাই যে, উক্ত শাসনতন্ত্র ভারতবাসীর মনঃপূত হয় নাই। তাহার পরেও তিনি ঐ শাসনতন্ত্র যাহাতে গ্রহণ করেন তাহার জন্য জনমত উদ্বুদ্ধ করিতে সময় ও শক্তি নিয়োগ করিয়া ছিলেন।

এই সময়ের মধ্যে তাঁহার স্বাস্থ্য দ্রুত খারাপ হইতেছিল। পরিশ্রমের অভাব ছিল না। নূতন শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত সামান্য ক্ষমতাগুলির যাহাতে

সদ্ব্যবহার হয় এবং সকল মতাবলম্বী রাজনীতিকেরা যাহাতে একমত হইয়া কাজ করিতে পারেন তজ্জন্য তিনি কংগ্রেস জনমতমূলক সঙ্ঘ (Congress Democratic Party) গঠন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে মহাত্মা গান্ধী রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহাত্মার রাজনীতির সহিত সম্পূর্ণ একমত না হইলেও, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ ছিল না। কাজেই মহাত্মা গান্ধীর প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে তিনি সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন।

১৯২০ খ্রীঃ অব্দের প্রথম হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি হইতে থাকে। জুলাই মাসে দুরন্ত ম্যালেরিয়া রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাঁহার পরই নিমোনীয়ার আক্রমণ হইল। এই শেষ রোগেই অল্প কয়েক দিন ভুগিয়া ৩১ শে জুলাই মধ্য রাত্রে (ইংরেজি হিসাবে ১লা আগষ্ট রাত্র প্রায় একটার সময়ে) তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইল। এত শীঘ্র যে তাঁহার মৃত্যু হইবে তাহা কেহই কল্পনা করে নাই। মৃত্যুর সাত দিন আগেও তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধুগণ তাঁহার জন্মতিথির উৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র ভারতে ও বোম্বাই অঞ্চলে যে গভীর শোকের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। যেরূপ সমারোহ ও গভীর শোকদ্দীপক ভাবের মধ্যে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা অভূতপূর্ব্ব বলিয়া সকলেই মনে করিয়াছিলেন। মৌলানা শৌকত আলি, ডাঃ কিচলু, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ বহু প্রসিদ্ধ নেতা তাঁহার শবানুগমন করেন এবং অনেকে শব বহনও করিয়াছিলেন। বোম্বাইএর পার্শী বণিক সম্প্রদায় তাঁহার দেহ সৎকারের জন্য চন্দন কাষ্ঠ প্রদান করেন।

তাঁহার মৃত্যুতে ভারতীয়দের মধ্যে যে শোকোচ্ছাস হইয়াছিল তাহার অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু শাসক কর্তৃপক্ষ, মৃত্যুতেও তিলকের বিরুদ্ধে তাঁহাদের বিদ্বেষ ভুলিতে পারেন নাই। বোম্বাই আইন পরিষদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সতেরজন সদস্য একযোগে বোম্বাই লাটকে অনুরোধ করেন যে তিলকের মৃত্যুর জন্য পরিষদের কার্য্য একদিনের জন্য বন্ধ রাখা হউক। লাট সাহেব (Sir George Lloyd) সে অনুরোধ রক্ষা করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। ভারতে প্রকাশিত ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্র সমূহের মধ্যে বোম্বাইএর (টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া) (Times of India) এবং কলিকাতার ষ্টেটসম্যান (The Statesman) পূর্ব্বক্রোধ স্মরণ করিয়া অতি নীচমনার ন্যায় মৃতের উদ্দেশ্যে কটূক্তি করেন।

কর্ম্মজীবনের প্রথম অংশেই তিনি

সংবাদপত্র পরিচালনার দায়ীত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি "কেশরী" পত্রিকার এবং ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে "মারহাট্টা" পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। জীবনের শেষ অবধি একান্ত নিষ্ঠা ও অসাধারণ যোগ্যতার সহিত তিনি উক্ত পত্রিকা দুইটি পরিচালনা করিয়াছিলেন। কেশরী মারাঠী ভাষার এবং মারহাট্টা ইংরেজি ভাষার সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। কেশরীর প্রতি তাঁহার আকর্ষণ বেশী ছিল। তিনি মনে করিতেন দেশীয় ভাষায় প্রচারিত পত্রিকা সকলের দ্বারাই দেশবাসীর মনে জাতীয়ভাব ভালরূপে জাগ্রত করা সম্ভব হয়। তাঁহার সম্পাদনার কৃতীত্বে কেশরী তৎকালে ভারতের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র সকলের অন্যতম হইয়াছিল।

১৮৯৯ খ্রীঃঅব্দে লক্ষ্ণৌ নগরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি বোম্বাইএর তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা লর্ড স্যাণ্ডহার্ষ্টের শাসন পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং প্রতিবাদ-মূলক একটি প্রস্তাব আনিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। সেই অধিবেশনের সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত এই বলিয়া নিরস্ত করেন যে তিলকের প্রস্তাব গৃহীত হইলে তিনি পদত্যাগ করিবেন।

এই সময়ের মধ্যে কংগ্রেসের এক অধিবেশনে দাবী করা হইয়াছিল যে যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর 'শান্তি-বৈঠক' (Peace Conference) হইবে তাহাতে লোকমান্য তিলক, মহাত্মা গান্ধী ও সৈয়দ হাসান ইমাম এই তিন জনকে ভারতের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করা হউক।

সমগ্র জীবন প্রধানতঃ রাজনীতি আন্দোলনে ব্রতী থাকিলেও উচ্চ অঙ্গের তত্ত্ব সকলের অনুশীলনেও তাহার বিশেষ আসক্তি ছিল। ভারতীয় দর্শন ও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। ইংরেজিতে তাঁহার 'ওরিয়ন' (The Orion) এবং প্রাচীন আর্য্যদিগের আদিম বাসস্থানের গবেষণামূলক (The Arctic Home of the Aryans) গ্রন্থদ্বয় তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও নিপুণ পর্য্যবেক্ষণশীলতার পরিচায়ক। প্রথম গ্রন্থে তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনার দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে বেদ খ্রীষ্টের জন্মের ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এইভাবে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্যে বেদের বয়স নির্ণয়ের চেষ্টা বিস্তৃতভাবে তিনিই প্রথম করেন। দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে তিনি বিচার করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে আর্য্যগণের মূল বাসস্থান উত্তর মেরুর সন্নিকটস্থ কোনও স্থানে ছিল। মারাঠী ভাষায় লিখিত তাঁহার 'গীতা-রহস্য' অতি উচ্চাঙ্গের

দার্শনিক গ্রন্থ। উহাতে তিনি কর্ম্ম-যোগের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা অতি গভীর জ্ঞানপূর্ণ। এই সকল বই-এর অনেক অংশ তিনি বিভিন্ন সময়ে সরকারী অতিথিশালায় থাকিবার সময়েই রচনা করিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর মহাত্মা গান্ধি-উদ্যোগী হইয়া তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি ধনভাণ্ডার (Fund) স্থাপন করেন। এই ধনভাণ্ডারের জন্য প্রায় এক কোটী টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। এত অধিক টাকা আর কোনও জাতীয় কার্য্যের জন্য সংগৃহীত হয় নাই। অর্থের দ্বারা তিলক-স্মৃতি স্বরাজ্য ধনভাণ্ডার (Tilak Memorial Swaraj Fund) স্থাপিত হইয়াছে।

তিলকের পত্নী ১৯১২ খ্রীঃ অব্দে গতায়ু হন। তিনি তখন মান্দালয় নগরে রাজবন্দী ছিলেন। তাঁহার ছয়টি সন্তানের (তিনটি পুত্র ও তিনটি কন্যা) মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই মারা যান।

বালগঙ্গাধর শাস্ত্রী— ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে এই মহাপ্রাজ্ঞ পণ্ডিত বোম্বাই প্রদেশে কহ্লাড় ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যেমন প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন তেমনি ধর্ম্মনিষ্ঠ, সচ্চরিত্র, সাধুপুরুষ, জনসাধারণের ভক্তিভাজন ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। একদিকে শিক্ষা বিভাগে তিনি উচ্চ পদারূঢ় কর্ম্মচারী, ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজে তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির সম্মান, অথচ তাঁহার শরীরে একটুকুও অহঙ্কার ছিল না। তাঁহার নম্র স্বভাব ও বিনয়ে তিনি জন সমাজে অতি আদরণীয় ছিলেন। তাঁহার সামান্য বেশভূষা দেখিয়া অনেকে প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন না। তিনি শিক্ষাব্রতী ও সমাজ সংস্কারপন্থী ছিলেন। কিন্তু সমাজে ধীরে ধীরে সংস্কার আনয়ন করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। তাঁহার বিশেষ যত্নে বোম্বাই নগরে একটি নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। মফঃস্বল হইতে বিদ্যার্থী আহরণ, তাহাদের পড়ার ও থাকার উপযোক্ত বন্দোবস্ত করা, তাঁহাদের যাহাতে পাঠে অনুরাগ জন্মে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। তিনি সমাজ সংস্কারী বলিয়া পরিচয় দিতেন না। আবার উগ্র সমাজ বিপ্লবী দলেও যোগ দিতেন না। তিনি বলিতেন ধর্ম্মভিত্তির উপর সমাজ সংস্কার স্থাপন কর, নতুবা সুফল পাইবে না। এবিষয়ে রাজা রামমোহনের সহিত তাঁহার ঐক্য ছিল। কিন্তু তাহাতেও গোঁড়া হিন্দুদের কটাক্ষ এড়াইতে পারেন নাই। নারায়ণ শেষাদ্রির ভ্রাতা শ্রীপদ শেষাদ্রি অকারণে জাতিচ্যুত হন। তিনি সমাজে উঠিবার চেষ্টা করিলে একদল ঘোর বিরোধী হয়। কিন্তু বালগঙ্গাধর শাস্ত্রী অনেক উৎপীড়ণ সহ্য করিয়াও তাঁহার পক্ষ

সমর্থন করিয়া কৃতকার্য্য হন। এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে ১৮০০ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই মে, মহাপ্রস্থান করেন। তিনি মারাঠী, কাণাড়ী, গুজরাটী, হিন্দী, বাঙ্গালা, ফারসী, লেটিন ও ইংরেজী ভাষায় একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মারাঠী ভাষায় 'দিগ্‌দর্শন' নামে একখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

বালগোবিন্দ—রামানুজচার্য্যের মাতৃ-ষসা মহাদেবীর গর্ভে গোবিন্দ ও বাল-গোবিন্দ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা উভয়েই রামানুজের শিষ্য ছিলেন। বালগোবিন্দের পুত্র পরাঙ্কুশ পূর্ণ।

বালচন্দ্র—জৈন আচার্য্য ও গ্রন্থকার। তিনি মহাভারতোক্ত শিবি চরিত অব-লম্বন করিয়া 'করুণাবজ্রায়ুধ' নামে একটি নাটক রচনা করেন। তিনি অনেক জৈন গ্রন্থের টীকাও রচনা করেন।

বালপণ্ডিত—একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। মহারাজ অশোকের আদেশে তিনি বধার্থ ঘাতক হস্তে অর্পিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঘাতকেরা তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া অশোকের নিকট তাহা জ্ঞাপন করে। অশোকও তাঁহার দৈব শক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন।

বালপুত্রদেব—তিনি সুবর্ণদ্বীপ বা যবদ্বীপের রাজা। তিনি নালন্দা বৌদ্ধ বিহারের খ্যাতি শ্রবণ করিয়া তথায় বৌদ্ধ বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। নালন্দা পালবংশীয় নরপতি দেবপালের রাজ্যভুক্ত থাকায় তিনি দূত পাঠাইয়া-দেবপাল দেবকে পাঁচখানি গ্রাম বৌদ্ধ বিহারে দান করিতে অনুরোধ করিয়া-ছিলেন। সম্ভবত রাজা বালপুত্রদেব, সেজন্য মূল্য প্রদান করিয়াছিলেন।

বালভ কায়স্থ—এই কবির রচিত 'উদয় সুন্দরী' নামক গ্রন্থ গুজরাটের অন্তর্গত পাটনে পাওয়া গিয়াছে। পাটনের ভিন্ন ভিন্ন মঠে চৌদ্দ হাজার গ্রন্থ আছে।

বালম্ভট বৈদ্যনাথ—প্রাচীন টীকা-কার। তিনি এবং তাঁহার বিদুষী পত্নী লক্ষ্মীদেবী মিতাক্ষরার ভাষ্য রচনা করেন।

বালশাস্ত্রী মহামহোপাধ্যায় — বোম্বাই প্রদেশের কঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অগ্নি-ষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

বালা—মহাত্মা নানকের একজন অনু-গামী শিষ্য। তিনি ছায়ার ন্যায় নান-কের অনুগমন করিতেন। তিনি জাতিতে জিৎ রাজপুত ছিলেন। বালা পরিচর্য্যা দ্বারা ও অন্যতম মুসলমান অনুচর মর্দ্দানা সঙ্গীত আলাপন দ্বারা গুরু নানকের সেবা করিতেন। বিদেশ ভ্রমণকালে তাঁহারা তাঁহার অনু-গামী হইতেন।

বালাজী বিশ্বনাথ—তাঁহার সম্পূর্ণ নাম ও উপাধি 'শ্রীমন্ত বালাজী বিশ্বনাথ পন্ত (পণ্ডিত) প্রধান।' সহ্যপর্ব্বত ব পশ্চিম ঘাট পর্ব্বত শ্রেণীর পশ্চিম অংশ কোঙ্কন নামে খ্যাত। এই কোঙ্কন প্রদেশের উত্তরাংশে 'জঞ্জীরা' নামে একটী দ্বীপ আছে। ইহা পূর্ব্বে হাবশীদের অধিকারে ছিল। তাঁহারা আবিসিনিয়া দেশের অধিবাসী বলিয়া আবিসিনীয় বা হাবসী নামে এবং দাক্ষিণাত্যে সিদ্দি নামে খ্যাত ছিল। জঞ্জীরা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান এই সিদ্দিদের অধিকারে ছিল। তাঁহাদের রাজধানী জঞ্জীরা নগরে ছিল। জঞ্জীরার ১২ মাইল দক্ষিণে বাণকোট নামক সাগর প্রণালীর উত্তর তীরে সাবিত্রী নদীর মোহানায় শ্রীবর্দ্ধন নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে জনার্দ্দন ভট্ট নামক এক ব্রাহ্মণ, খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র বিশ্বনাথ ভট্ট জঞ্জীরার সিদ্দিদের অধীনে শ্রীবর্দ্ধন নামে পরগণার দেশমুখ ও গ্রামলেখকের কার্য্য করিতেন। মহালের জমাবন্দির কাজ পর্য্যবেক্ষণ ও পরগণার রাজস্ব আদায় প্রভৃতি কার্য্যের ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত ছিল। এই কার্য্যে তাঁহাদের যথেষ্ট মান সম্ভ্রম ছিল। বিশ্বনাথ ভট্টের মৃত্যুর পরে তাঁহার তৃতীয় পুত্র জানোজী বা জনার্দ্দন ভট্ট পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং চতুর্থ পুত্র বালাজী বিশ্বনাথ ভ্রাতার গলগ্রহ না হইয়া অর্থোপার্জ্জনের স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করেন। ১৭৯৮ খ্রীঃ অব্দের কিছু পূর্ব্বে, তিনি সিদ্দিদের অধীনে নিকটবর্ত্তী চিপ্‌লুন তালুকের কর সংগ্রহের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তদ্ভিন্ন 'মীঠবন্দর' নামক স্থানের লবণের কারখানাগুলিও তাঁহার ইজারা ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে তিনিই ইতিহাসে বালাজী বিশ্বনাথ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার গুণবতী ভার্য্যা রাধা বাঈ বাজীরাও (প্রথম) পেশোয়ার জননী। সম্ভবতঃ ১৭৯৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়ে সিদ্দি কাশিম খাঁ জঞ্জীরার অধিপতি ছিলেন এবং কাহ্নোজী আংগ্রে মহারাঠা নৌসেনাধ্যক্ষ ছিলেন। উভয়ের মধ্যে সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থান সমূহের আধিপত্য লইয়া অনবরত বিবাদ ছিল। বালাজী বিশ্বনাথ, আংগ্রেকে গোপনে সাহায্য করিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া কাশিম খাঁ শ্রীবর্দ্ধনের ভট্টদিগকে ধৃত করিবার আদেশ দিলেন। প্রথমেই বালাজী বিশ্বনাথের অগ্রজ জনার্দ্দন ধৃত হইয়া মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাকে একটা বস্তায় পূরিয়া ১৭০১ খ্রীঃ অব্দে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। এদিকে বালাজী বিশ্বনাথ সপরিবারে পলায়ন

পূর্ব্বক বাণকোট প্রণালীর দক্ষিণ তীরস্থ ওয়েলাস গ্রামে, তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত হরি মহাদেব ভানু নামক এক ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের সকলের পরামর্শে সদ্দিদির পূর্ব্বাঞ্চলস্থিত কোন স্থানে যাইতে মনস্থ করিলেন। ভানু পরিবারও সিদ্দির রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বালাজী বিশ্বনাথের অনুবর্ত্তী হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের বিপদ তখনও শেষ হয় নাই। সিদ্দির লোকেরা পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে ধৃত করিয়া 'অঞ্জন বেল' দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিল। দুর্গাধিপতিকে বশীভূত করিয়া অতি কষ্টে তাঁহারা এই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনার নিকটস্থ সাসবড় গ্রামের অম্বাজী ত্র্যম্বক পুরন্দরে নামক এক ব্রাহ্মণের আশ্রয় লাভ করিলেন।

এই সময়ে পূর্ব্ব মহারাঠা দেশে খুব বিপ্লব চলিতেছিল। শিবাজীর মৃত্যুর পরে দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজীব বহু সৈন্য লইয়া মহারাঠাদেরে দমনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শিবাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সাম্ভাজী মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করেন। কিন্তু বুদ্ধি দোষে তিনি অকৃতকার্য্য হইয়া মুঘল হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার স্ত্রী যশোদা বাঈ ও পুত্র শাহু দিল্লীতে বন্দী হইলেন। এদিকে শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারাম সেতারায় রাজা হইয়া মুঘলদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু ১৭০০ খ্রীঃ অব্দে তিনিও পরলোকবাসী হইলেন। তাঁহার বীর্য্যবতী মহিষী তারা বাঈ মুঘলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন।

বালাজী বিশ্বনাথ যখন সাসবড়ে আগমন করেন। তখন রাণী তারা বাঈয়ের সেনাপতি রামচন্দ্র পন্থ, প্রতিনিধি পরশুরাম ত্র্যম্বক, সচিব শঙ্কর জী নারায়ণ, সেনাপতি ধনাজী যাদব প্রভৃতি মহারাঠা বীরগণের বিক্রমে সমস্ত দক্ষিণাপথ কম্পিত হইতেছিল। মুঘল সৈন্য মহারাঠাদের হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছিল। বুদ্ধিমান কার্য্যক্ষম ব্যক্তির পক্ষে এসময়ে কার্য্য ক্ষেত্রের অভাব ছিল না। বালাজীও উদ্যমশীল কার্য্যকুশল ব্যক্তি ছিলেন। সাতারায় মহাদেব কৃষ্ণযোশী নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার সহিত হরি মহাদেব ভানুর পরিচয় ছিল। তাঁহার সাহায্যে রাণী তারা বাঈয়ের প্রতিনিধি পরশুরাম ত্র্যম্বকের নিকট হইতে একটী তালুকের রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হইলেন। এই কার্য্যে তাঁহার দক্ষতা দেখিয়া ১৭০৬ খ্রীঃ অব্দে প্রতিনিধি মহাশয় তাঁহাকে বার্ষিক শত মুদ্রা বেতনে এক কারকুনের পদে নিযুক্ত করিলেন। সাতারার কার্য্যে প্রবেশ করিয়া বালাজী বিশ্বনাথকে প্রায় সমস্ত জীবনই যুদ্ধাভিযানে অতিবাহিত করিতে হইয়া-

ছিল। এই সব অভিযান সময়ে তাঁহার পুত্র বাজীরাও প্রায় সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন।

এই সময়ে মহারাঠাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বাঁধাইবার জন্য দিল্লীর সম্রাট সম্ভাজীর পুত্র শাহুকে মুক্তিদান করিলেন এবং এই সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের সর দেশমুখীর (রাজস্বের দশমাংশ) সনন্দও প্রদান করিলেন। শাহু দেশে আসা মাত্র, রাণী তারা বাঈয়ের সহিত রাজ্যাংশ লইয়া যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কতক লোক শাহুর পক্ষে যোগ দিলেন। এদিকে মুঘল আক্রমণ ক্ষান্ত হওয়ায় বালাজী রাজস্বের আয় বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিতে পারিলেন। তিনি কৃষি কার্য্যে উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক কৃষকদিগের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বের আয় বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার কার্য্য দক্ষতায় সেনাপতি যাদব রাও খুব সন্তুষ্ট হইলেন। মহারাজ শাহুও তাঁহার কর্ম্মকুশলতার বিষয় অবগত হইলেন। ১৭১০ খ্রীঃ অব্দে রাজস্ব সচিব ধনাজী যাদবের মৃত্যু হইলে, মহারাজ শাহু রাজস্ব বিভাগের সমস্ত ভার বালাজী বিশ্বনাথের উপর অর্পন করিলেন। ধনাজী যাদবের পুত্র চন্দ্রসেন কেবল সামরিক বিভাগের কর্ত্তা রহিলেন। ইহাতে চন্দ্রসেন অতিশয় দুঃখিত হইয়া বালাজী বিশ্বনাথের ঘোরতর শত্রু হইলেন। ১৭১১ খ্রীঃ অব্দে একটা তুচ্ছ কারণে চন্দ্রসেন বালাজী বিশ্বনাথকে আক্রমণ করেন। এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে বেশী সৈন্য ছিল না বলিয়া তিনি পলায়ন করিতে বাধ্য হন। প্রথমে সানবড় গ্রামে পরে ক্রমে পুরন্দর দুর্গে, পাণ্ডা গড়ে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই স্থানেও চন্দ্রসেনের সৈন্যদল, তাঁহার দুর্গ পরিবেষ্টন করিল। এদিকে মহারাজ শাহু ইহা অবগত হইয়া, বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী বালাজীকে অভয়দানপূর্ব্বক পত্র প্রেরণ করিয়া, সেনাপতি চন্দ্রসেনকে সাতারায় আহ্বান করিলেন। কিন্তু চন্দ্রসেন ইহাতে উত্তর করিলেন—'বালাজী বিশ্বনাথকে আমার হস্তে অর্পন না করিলে, আমি শত্রুপক্ষের সহিত মিলিত হইব।' মহারাজ শাহু তাঁহার এই ঔদ্ধত্য ব্যবহারে অতিশয় বিরক্ত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দুইজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। চন্দ্রসেন পরাস্ত হইয়া প্রথমে রাণী তারা বাঈয়ের ও পরে নিজামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বালাজী এই বিপদ অতিক্রম করিয়া সাতারায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে প্রধান সেনাপতি তারা বাঈয়ের পক্ষ অবলম্বন করায়, মহারাজা শাহুর সৈন্য সংখ্যা অনেক কমিয়া গেল। সুযোগ পাইয়া রাণী তারা বাঈও শাহুর পক্ষীয়দিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগি-

লেন। কিন্তু বালাজী বিশ্বনাথের বুদ্ধি কৌশলে সর্দ্দারেরা কেহই মহারাজ শাহুকে পরিত্যাগ করিলেন না। বরং তারা বাঈয়ের পক্ষীয় কেহ কেহ মহারাজা শাহুর অধীন হইল। বালাজী অন্য উপায়েও অনেক সৈন্য বৃদ্ধি করিলেন। মহারাজ শাহু বালাজীর কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ১৭১১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে 'সেনাকর্ত্তা' উপাধিদ্বারা সম্মানিত করেন। মহারাজ শাহুর সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়া রাণী তারা বাঈ কোহ্লাপুরে গমনপূর্ব্বক স্বীয় পুত্র সাম্ভাজীর (দ্বিতীয়) অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। কেহ কেহ সাম্ভাজীর পক্ষ কেহ কেহ শাহুর পক্ষ অপর কেহ কেহ মুঘল দলেও যোগ দিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ কোন পক্ষাবলম্বী না হইয়া স্ব স্ব প্রধান হইয়াছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দামাজী (দামোদর জী) থোরাত ও উদয় জী চৌহান প্রধান ছিলেন। উদয় জীর উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া শাহু তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যের একাংশের চৌথ আদায়ের স্বত্ব প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। কাহ্নোজী আংগ্রে কোহ্লাপুরপতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া শাহুর অধিকৃত কল্যাণ প্রদেশ অধিকার করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। বালাজী বিশ্বনাথ স্বয়ং কৃষ্ণরাও খটাওকর নামক এক বিদ্রোহীকে দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। আউন্ধ নামক স্থানের নিকটে বিদ্রোহী খটাওকরকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া তিনি বশীভূত করেন। মন্ত্রী ভৈরব পন্ত পিঙ্গলে কাহ্নোজী আংগ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করিয়া ছিলেন। আংগ্রে ভৈরবপন্তকে বন্দী করিয়া লোহগড় ও রাজমাচী প্রভৃতি স্থান অধিকারপূর্ব্বক সাতারা আক্রমণের উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময়ে বালাজী বিশ্বনাথ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া লোহগড় প্রভৃতি পুন অধিকার করিলেন এবং আংগ্রেকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। এই সময়ে আংগ্রেকে তিনি একখানা পত্রদ্বারা শাহুর শরণাপন্ন হইয়া মহারাঠাশক্তি বৃদ্ধির সহায়তা করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার এই পত্রের অতি সুফল ফলিল। আংগ্রে শাহুর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। এই সময়ে সচিব নারায়ণ শঙ্কর, দামাজী থোরাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া বন্দী হন।

মহারাজ শাহু বালাজী বিশ্বনাথের কৃতকর্য্যতায় সন্তুষ্ট হইয়া ১৭১৩ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই নবেম্বর, পূর্ব্ববর্ত্তী পেশোয়া ভৈরবপন্তকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে বালাজী বিশ্বনাথকে নিযুক্ত করিলেন। তখন তাঁহার উপাধি হইল শ্রীমন্ত বালাজী বিশ্বনাথ পন্ত প্রধান। বালাজীর বন্ধু অম্বাজী পন্ত পুরন্দরে সহকারী

মন্ত্রী বা পেশোয়া এবং হরি মহাদেব ভানু, বালাজীর বিপদের বন্ধু ফড়নবিশের কাজ পাইলেন।

এখন দামাজী থোরাতের দমন করিতে বালাজী মনোযোগী হইলেন। দামাজী এই কোহ্লাপুরের রাজা সাম্ভাজীর পক্ষে থাকিয়া, শাহুর রাজ্যে দস্যুতা করিতেন। তিনি হিঙ্গণদুর্গের অধিপতি ছিলেন, শাহুর যুদ্ধের আয়োজনে কপটতা পূর্ব্বক সন্ধি করিলেন। দামাজী দুর্গ সমর্পণ করিলেন। বালাজী বিশ্বনাথ সদলে দুর্গে প্রবেশ করিবামাত্র দামাজী তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন। নিষ্ক্রয়স্বরূপ বহু অর্থ দাবী করিলেন। মহারাজ শাহু উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রার্থিত অর্থ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে মুক্ত করিলেন। এই সময়ে বালাজী বিশ্বনাথের সঙ্গে তাঁহার বাজীরাও ও চিমনাজী আপ্পা নামক পুত্রদ্বয়ও বন্দী হইয়াছিলেন। সাতারায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বালাজী এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি সেনাপতি মানসিংহ মোরে ও সরলস্কর হৈবৎরাজ নিম্বলকরের সহযোগে আবার দামাজীর দমনার্থ গমন করিলেন। তৎপূর্ব্বে তিনি বন্দীসচিব নারায়ণ শঙ্করকে, অর্থ প্রদানপূর্ব্বক মুক্ত করিয়াছিলেন। বালাজী দুর্গ আক্রমণ করিয়াই তোপের দ্বারা ইহা ভূমিসাৎ করিলেন এবং দামাজীকে বন্দী করিয়া ১৭১৭ খ্রীঃ অব্দের জুন মাসে সাতারায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন:

এই সময়ে দিল্লীতে খুব গোলযোগ চলিতেছিল। দিল্লীর সম্রাট তখন ফররুখশিয়ার। তাঁহার মন্ত্রী সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ ও সৈয়দ হোসেন আলী খাঁ বলিতে গেলে রাজ্যের মালিক ছিলেন। তাঁহাদের আদেশ অনুসারেই কার্য্য চলিত। এই কারণে দিল্লীর সম্রাট ও তাঁহার বন্ধুবর্গ, সৈয়দ ভ্রাতৃযুগলের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। এদিকে মহারাঠারাও সমস্ত দাক্ষিণাত্যের চৌথ ও সরদেশমুখী পাইবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। বিশেষতঃ বালাজী যখন ভিতরের গোলমাল মিটাইয়া রাজ্যের শৃঙ্খলা বিধানে ব্যস্ত ছিলেন, ঠিক সেই সময়েই খণ্ডেরাও দাভারে প্রভৃতি সেনাপতিদের আক্রমণে সৈয়দ হোশেন আলী খুব ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া সৈয়দেরা মহারাঠাদের সহিত সন্ধি করিয়া দাক্ষিণাত্যে শান্তি স্থাপন ও আপনাদের বলবৃদ্ধি করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহ মহারাঠাদেরে চৌথ ও সরদেশমুখী দিতে সম্মত হইলেন না। এই মতভেদ হেতু বাদশাহের সহিত সৈয়দ ভ্রাতৃদের ১৭১৭ খ্রীঃ অব্দে যুদ্ধের সূচনা হইল। এই সময়ে সৈয়দ হোশেন আলী মহারাজ শাহুর নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, মহারাজ যদি এই সময়ে

১৫ হাজার সৈন্যদ্বারা সাহায্য করেন, তবে নর্ম্মদার দক্ষিণবর্ত্তী সমস্ত মুঘল রাজ্যের চৌথ ও সরদেশমুখীর সনদ তিনি বাদশাহের নিকট হইতে লওয়াইয়া দিবেন এবং সৈনিকের ব্যয় মাসিক ১৫ লক্ষ টাকা দিবেন। এই সময়ে শাহুর রাজ্যের সমস্ত অন্তর্বিপ্লব প্রশমিত হইয়াছিল, সুতরাং সৈন্য সাহায্যের কোনও অসুবিধা ছিল না। বালাজী বিশ্বনাথ মহারাজ শাহুর পক্ষে, মহারাঠাদের স্বীয় অধিকৃত প্রদেশে পূর্ণ স্বাধীনতা, মুঘল অধিকৃত প্রদেশে চৌথ ও সরদেশমুখী, মহারাজ শিবাজীর জন্ম স্থান শিবনেরী দুর্গ ও ত্রিম্বকদুর্গের অধিকার শাহুর জননী ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের মুক্তি ও অন্যান্য কয়েকটী প্রদেশের স্বামীত্ব দাবী করিয়া সৈয়দ হোশেন আলীর প্রার্থনা পূরণে সম্মত হইলেন। হোশেন আলী প্রায় সমস্ত সর্ত্তে সম্মত হইলে, সেনাপতি মানসিংহ মোরে, পরসোজী ভোসলে, সান্তাজী ভোসলে, বিশ্বাস রাও পবার প্রভৃতি সেনাপতিগণ ১৫ হাজার সৈন্যসহ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বালাজী বিশ্বনাথ এই বাহিনীর পরিচালক হইলেন। মহারাঠা বাহিনী দিল্লীতে পঁহুছিলে, তথাকার গোলযোগ আরও বৃদ্ধি পাইল। বাদশাহ ফররুখশিয়ার নিহত হইলেন, মোহাম্মদ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সৈয়দেরা মহারাঠাদেরে চৌথ দিতে চাহিলে দিল্লীবাসীরা ঘোরতর আপত্তি করিল। এতদ্ভিন্ন মহারাঠাদের উপর তাঁহাদের পূর্ব্ব হইতেই জাতক্রোধ ছিল। একদিন বালাজী বিশ্বনাথ সৈয়দের সহিত দিল্লীর দরবারে গমন করিলে, দিল্লী-বাসীরা হঠাৎ মহারাঠাদেরে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের ফলে সেনাপতি সন্তাজী ভোসলে, বালাজী মহাদেব ভানু প্রভৃতি দেড় হাজার মহারাঠা নিহত হয়। সৈয়দেরা অর্থদ্বারা সেই ক্ষতিপূরণ করিয়াছিলেন। ১৭১৯ খ্রীঃ অব্দের ৩রা মার্চ্চ দিল্লীর বাদশাহের এক সনদের বলে, মহারাঠারা স্বরাজ্যের সম্পূর্ণ স্বত্ব, দাক্ষিণাত্যে চৌথ প্রবর্ত্তন ও সরদেশমুখী স্বত্ব আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ শাহুর জননী ও অপর আত্মীয়গণ এই সময়ে মুক্তিলাভ করেন। গুজরাট ও মালব প্রদেশে চৌথ প্রবর্ত্তনের অধিকার সময়ান্তরে দিতে তাঁহারা প্রতিশ্রুত হইলেন। বালাজী বিশ্বনাথ, সেই সনন্দ আদায় করিবার জন্য দেবরাও হিঙ্গনে নামক একজন সুচতুর ব্রাহ্মণকে দিল্লীতে দূতস্বরূপ রাখিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে জয়পুর, যোধপুর উদয়পুর প্রভৃতি স্থানের রাজাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি, মহারাজ শাহুর সহিত তাঁহাদের মিত্রতাসূচক সন্ধি করিলেন।

দিল্লী হইতে সনন্দ লাভ করিয়া ১৭১৯ সালের ৪ঠা জুলাই তিনি সাতারায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মহারাজ শাহু তাঁহার বিজয়ী পেশোয়াকে অতি সমাদরে প্রত্যুদ্গমন করিয়া অভিনন্দিত করিলেন। ইহার পর হইতে মহারাঠাদের স্বরাজ্য মধ্যে যে সকল মুঘল ঘাটি ছিল, তাহা উঠিয়া গেল। মহারাজা শাহুর প্রতিপত্তি বহু গুণে বর্দ্ধিত হইল। তিনি পুরস্কারস্বরূপ বালাজী বিশ্বনাথকে পুনা জিলার অন্তর্গত পাঁচটি মহালের সরদেশমুখী স্বত্ব ও কয়েকটি গ্রামের সম্পূর্ণ স্বত্ব ভোগের অধিকার দান করিলেন। খান্দেশ ও বালাঘাট অঞ্চলের শাসনভার তাঁহার প্রতি পূর্ব্বাবধি অর্পিত ছিল।

এতদিন বালাজী বিশ্বনাথ মহারাঠা রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতি বিধানে মনোযোগ দিতে পারেন নাই। এখন সময় পাইয়া সেই বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। এতদিন পর্য্যন্ত রাজ্যের আয় ব্যয়ের সম্বন্ধে সর্দ্দারগণের প্রাপ্য অংশের কোনও নির্দ্ধারিত নিয়ম না থাকায় প্রায়ই অংশীদারগণের মধ্যে কলহ ঘটিত। তিনি তাহা নিবারণের জন্য, আয় ব্যয় সম্বন্ধে কতিপয় বিশেষ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিলেন। ইহার ফলে রাজকার্য্যের অনেক গোলযোগের অবসান হইল। রাজ্যের উন্নতি সাধনের দিকে সকলের স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মিল। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের হস্ত হইতে নিত্য নূতন প্রদেশ গ্রহণ করিবার আকাঙ্খাও প্রবল হইল। তিনি সর্দ্দারদের মধ্যে একজনের ক্ষতি বৃদ্ধির সহিত অপরের স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে একতা জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সুব্যবস্থায় প্রজাদের বিশেষ উন্নতি হয় এবং দেশ হইতে চোর ভয় একেবারে বিদূরীত হয়।

ইতিপূর্ব্বে দামাজী থোরাতের হস্ত হইতে সচিব শঙ্কর নারায়ণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার জননী বালাজী বিশ্বনাথকে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ স্বীয় অধিকারস্থিত পুরন্দর দুর্গ ও পুনা প্রদেশ দান করিয়াছিলেন। তিনি শাহু মহারাজের অনুমতি ও সনন্দপত্র লইয়া তাহা অধিকার করেন। এই সময়ে পুনা প্রদেশ বাজী বাদম নামক এক ব্যক্তির অধিকারে ছিল। তাঁহাকে বশীভূত করিয়া বালাজী ইহা অধিকার করেন। মহারাজ শাহু এই প্রদেশ বালাজী বিশ্বনাথকে পুরস্কার স্বরূপ দান করিলেন।

বালাজী বিশ্বনাথের এই সময়ে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। স্বাস্থ্য লাভের জন্য তিনি সাসবাড় গ্রামে গমন করেন এবং এই স্থানেই ১৭২০ সালের ২রা এপ্রিল পরলোক গমন করেন। বালাজী বিশ্বনাথ সমর কুশল বলিয়া খ্যাত না

হইলেও সাহসী যোদ্ধা ও রাজনীতি বিশারদ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি সরল প্রকৃতি, বিচক্ষণ ও অতিশয় প্রতিভাশালী ছিলেন। মহারাজা শাহু তাঁহার মত বিচক্ষণ পেশোয়া (মন্ত্রী) পাইয়াছিলেন বলিয়াই মহারাঠা দেশে এতটা প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরলোকগত বিচার-পতি মহাত্মা রাণাডে মহারাঠা ইতিহাসে তাঁহাকে শিবাজীর পরেই স্থান দান করিয়াছেন। তিনি বাজীরাও ও চিমনাজী আপ্পা নামে দুই পুত্র ও দুই কন্যা এবং পত্নী রাধা বাঈকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার পরে বাজীরাও পেশোয়ার পদ প্রাপ্ত হন।

বালাজী মোরে অথবা বালাজী-চন্দ্র রাও মোরে—মোরে বংশীয় মহারাঠারা বিজাপুরের অধীনে জেউলী দুর্গের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি জেউলের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাও মোরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এক সময়ে মহাবালেশ্বর তীর্থে বালাজী রাওয়ের রূপবতী তিন কন্যাকে দেখিয়া শিবাজী ছত্রপতির মাতা জিজি বাঈ তাঁহার পুত্রবধূরূপে একটীকে পাইবার জন্য বাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবাজী বংশ গৌরবে তাঁহাদের অপেক্ষা হীন বলিয়া বালাজী ইহাতে সম্মত হন নাই। শিবাজী একবার বালাজীকে বিজাপুরের পক্ষ ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শিবাজীর অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। পরন্তু বিজাপুরের পক্ষাবলম্বন করিয়া তিনি শমরাজ নামক এক সেনাপতির দ্বারা শিবাজীকে নিহত করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন। ইহার কিছু-কাল পরে পুনরায় শিবাজী স্বয়ং জেউল নগরে গমন করিয়া তাঁহাকে স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের নামে মুসলমান পক্ষ পরিত্যাগ করিতে বলেন; কিন্তু স্বজাতিদ্রোহী বালাজী, শিবাজীকে বন্দী করিয়া বিজা-পুরপতি মোহাম্মদ আদিল শাহের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক লাভবান হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিবাজী তাঁহার দুর-অভিসন্ধি বুজিতে পারিয়া পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন। ইহার পরেও শিবাজী, রঘুবল্লাল আত্রে নামক এক ব্রাহ্মণ যুবক ও শম্ভুজীকবাজী নামক এক সৈনিক পুরুষকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহারা বালাজীকে শিবাজীর আনুগত্য ও তাঁহার নিকট কন্যা সম্প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই বালাজী সম্মত না হওয়ায়, তাঁহারা বালাজীকে তরবারির আঘাতে নিহত করেন। শিবাজী তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া, অধিকার করেন, তাঁহার পুত্রকে বন্দী করেন এবং সেনাপতি হনুমন্তরাওকে নিহত করেন।

বালাদিত্য—কলিঙ্গদেশের প্রাচীন রাজা। তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া প্রথম

কামার্ণব কলিঙ্গদেশ অধিকার করেন এবং রাজধানী দন্তপুরে (জন্তবুরে) দীর্ঘ ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। কামার্ণব প্রথম দেখ।

বালীয়—বালীয় ও দেব নামে দুইজন ভিল সর্দ্দার রাণা বাপ্পা রাওয়ের আজীবন সঙ্গী ছিলেন। বাপ্পারাও চিতোরের সিংহাসনে আরোহণকালে বালীয় আপন শোণিতদ্বারা রাজতিলক প্রদান করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও বাপ্পার বংশধরগণ বালীয় ও দেবের বংশধর হইতে রাজতিলক গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে সম্মানিত মনে করেন।

বাল্মীক দাসজী—তিনি একজন দাদূপন্থী ভক্ত সাধক। তাঁহার অনেক বাণী দাদূপন্থী বাণী সংগ্রহ গ্রন্থে রক্ষিত আছে।

বাল্লক সর্দ্দার—রাজা সীতারামের নমশূদ্র জাতীয় অন্যতম সেনাপতি। প্রসিদ্ধ সেনাপতি মেনা ধনার তিনি ভগ্নিপতি ছিলেন। সীতারামের পতনের পরেও তিন বৎসর পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে নাটোরের রামজীবন রায়, তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে তাঁহার সেনাপতি হইতে অনুরোধ করেন। উভয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া পরস্পরের মিত্র হন। বাল্লক সর্দ্দার রামজীবনের সেনাপতি হইয়াও যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। একবার এক টাকিয়ার রাজা রূপেন্দ্র নারায়ণ নাটোর আক্রমণ করিয়াছিলেন। সেবার এই বাল্লক সর্দ্দারের বীরত্বেই রামজীবনের রাজধানী নাটোর নগরী রক্ষিত হইয়াছিল।

বাশিষ্ক—কনিষ্কের পরে কুষাণবংশজ বাশিষ্ক, হুবিষ্ক, দ্বিতীয় কণিষ্ক ও বাসুদেব প্রায় একশত বৎসর রাজত্ব করেন।

বাশিষ্ঠীপুত্র শ্রীপুড় মাবি, বাশিষ্ঠীপুত্র শিব শ্রীসাত কর্ণি ও ব পুত্র শ্রীচন্দ্র সাতি— অন্ধ্রদেশের কৃষ্ণ ও গোদাবরী জিলায় উক্ত নামের কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা কোন্ সময়ের কোথাকার রাজা তাহা জানা যায় নাই।

বাসব— অন্য নাম বসপ্পা (বৃষভ শব্দের অপভ্রংশ)। লিঙ্গায়তেরা তাঁহাকে নন্দীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিনি বিজাপুর অঞ্চলের এক শৈব ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, উপনয়নের সময়, বালক বাসব গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করিয়া উপবীত ধারণ করিতে, কিছুতেই সম্মত হইলেন না। বাসব বলিল—'ঈশ্বর ভিন্ন আমার আর কোন গুরু নাই।' এই অপরাধে তিনি গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। বাসব পলায়ন করিয়া বিজ্জল রাজার শরণাপন্ন হইলেন। বিজ্জলের রাজধানী কল্যাণ নগরে তাঁহার এক মাতুল

পুলিশাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার সহায়তায় রাজসরকারে একটী কর্ম্ম পাইলেন। এই কর্ম্মে থাকিয়া তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। পরে তাঁহার অর্থ দানাদি কার্য্যে ব্যয় করিয়া লোকের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। এইরূপে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, তিনি জৈন, বৈষ্ণব ও স্মার্ত্তধর্ম্মের বিরুদ্ধে অর্থাৎ এক কথায় প্রচলিত সকল ধর্ম্ম মতের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। লিঙ্গোপাসনা, শৌচাশৌচ অবমাননা, বেদ ব্রাহ্মণ নিন্দা, প্রভৃতি এই ধর্ম্মের অঙ্গীভূত। এই সকল কারণে, তিনি জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকদের বিদ্বেষভাজন হইলেন। তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ আনয়ন করিল। রাজার কোপানলে পড়িয়া অবশেষে তাঁহাকে কল্যাণ নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইল। কিন্তু বাসবকে নির্য্যাতন করিতে যাইয়া রাজা স্বয়ং বিপন্ন হইলেন। বাসবের এক শিষ্য কর্ত্তৃক তিনি নিজ প্রাসাদেই নিহত হইলেন। বাসব কল্যাণ নগর ছাড়িয়া কৃষ্ণা ও মলপ্রভা নদীর সঙ্গমস্থল সঙ্গমেশ্বরে বাস করিতে ছিলেন। সেই স্থলেই তিনি ১১৬৮ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

বৃষভ পুরাণ নামে একখানি পুরাণে বাসবের চরিত্রের বর্ণনা আছে। ইহাই লিঙ্গায়তদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থ। ইহাদের মতে জাতিভেদ, প্রায়শ্চিত্ত, তীর্থভ্রমণ, ব্রাহ্মণ ভোজন, উপবাস, শৌচাশৌচ বিচার, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পদ্ধতি, হিন্দু-ধর্ম্মের বহুবিধি অনুষ্ঠান ভ্রমাত্মক বলিয়া পরিত্যাজ্য। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু আচার ও ক্রিয়া কাণ্ডের অধিকাংশই তাঁহাদের সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছে। একমাত্র শিব পূজা তাঁহাদের শাস্ত্রীয় বিধান হইলেও, বর্ত্তমানে বহু দেব-দেবী ও সাধুভক্তের পূজা তন্মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে।

লিঙ্গায়ত পুরোহিতের নাম জঙ্গম। তাঁহাদের মধ্যে গৃহস্থ ও বিরক্ত দুই শ্রেণী বিদ্যমান। গৃহস্থ জঙ্গম বিবাহ করে আর বিরক্ত জঙ্গমেরা অবিবাহিত। লিঙ্গায়তেরা শব দাহ না করিয়া সমাহিত করে। মৃত্যু তাঁহাদের নিকট ভয়ের বস্তু নহে, প্রত্যুত মৃত্যুই কৈলাস শিখরে আরোহণ করিবার পথ মনে করিয়া, মৃত্যুকে অভিনন্দন করে। লিঙ্গায়তদের গৃহে কাহারও মৃত্যু হইলে, একদিকে মৃতের পরিবারস্থ লোকের বিলাপধ্বনি অপরদিকে বাদ্য সমারোহে জঙ্গমদের ভোজন ব্যাপার। মৃতদেহ পুষ্প চন্দন বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া সমাধিক্ষেত্রে আনা হয়, তৎপরে গুরুর পাদোদক শব দেহোপরি সিঞ্চিত হয়, মহাদেবের প্রতি গুরুর আজ্ঞাপত্র তাহাতে সংলগ্ন হয়। মহাদেব সেই পত্র পাইবামাত্র

প্রেতাত্মাকে স্বীয় দেবনিকেতনে ডাকিয়া লইয়া যান। সমাধিস্থলে কুল পুরোহিত উপস্থিত থাকিয়া মৃতাত্মার সদ্‌গতি সাধনের সহায়তা করিতে থাকেন।

কেহ কেহ বলেন, একোরাম, পণ্ডিতারাধ্য, রেবণ, মরুল ও বিশ্বারাধ্য এই পাঁচজন লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু তাঁহাদের বিশ্বাসযোগ্য প্রাচীন কোন ইতিহাস নাই।

হিমালয়ের অন্তর্গত কেদারনাথে, নান্দিয়ালের নিকটে শ্রীশৈলে, মহীশূর রাজ্যের পশ্চিম অংশে বেলহল্লি নামক স্থানে, মহীশূর রাজ্যের উজ্জিনী নামক স্থানে ও কাশীতে এই পাঁচ স্থানে তাঁহাদের প্রধান পাঁচটী মঠ আছে। ব্রাহ্মণের উপবীত ধারণের ন্যায় লিঙ্গায়তের গলদেশে লিঙ্গ ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য। লিঙ্গায়তেরা দিনে দুইবার উপাসনা করিয়া থাকে।

বাসব বোধ হয় লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের একজন সংস্কারক ছিলেন। কারণ তাঁহার আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। বাসব জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন এবং সকল বর্ণের পরস্পর বিবাহ অনুমোদন করিতেন। কিন্তু এখন তাহাদের মধ্যে কঠোর জাতিভেদের নিয়ম প্রচলিত এবং স্ববর্ণ বিবাহ মাত্র অনুমোদিত।

বাসব ক্ষত্রিয়া—কোশল রাজ্যের রাজা প্রসেনজিতের খুব ইচ্ছা হইয়াছিল যে শাক্য কুলে তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু শাক্যেরা বংশমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া গৌরব করিতেন। সেজন্য ছলনাপূর্ব্বক শাক্যেরা বাসব ক্ষত্রিয়া নাম্নী এক দাসী কন্যাকে রাজকুমারী বলিয়া প্রসেনজিতের সহিত পরিণীতা করেন। তাঁহার গর্ভে বিড়ূড়ভ জন্মগ্রহণ করেন। বিড়ূড়ভ দেখ।

বাসব দত্তা—অবন্তীদেশের রাজা প্রদ্যোতের কন্যা বাসবদত্তাকে, বৎসরাজ্যের পুত্র রাজা উদয়ন বিবাহ করিয়াছিলেন।

বাসুদেব—(১) একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। 'জাতকমুকুট' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত। ১৫৭৭ শকের (১৬৫৫ খ্রীঃ) পূর্ব্বে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

বাসুদেব—(২) একজন টীকাকার তিনি রুদ্রকৃত 'মেঘমালা' গ্রন্থের 'মেঘমালা মঞ্জুরী' নামে এক টীকা রচনা করেন।

বাসুদেব—(৩) একজন গ্রন্থকার। 'বাস্তুপ্রদীপ' নামক গ্রন্থ তাঁহার প্রণীত।

বাসুদেব—(৪) একজন গ্রন্থকার। 'বীরপরাক্রম' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

বাসুদেব—(৫) কুষাণবংশীয় একজন নরপতি। খুব সম্ভবতঃ মথুরায় তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার নামাঙ্কিত

মুদ্রা ও শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রাগুলির একদিকে গ্রীসদেশীয় ও অপরদিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে খোদিত লিপি আছে। তাঁহার সর্ব্বপ্রাচীন খোদিত লিপি ভোপাল রাজ্যের অন্তর্গত সাঁচি নগরে আবিষ্কৃত হয়। উহা ১৪৬ খ্রীঃ অব্দে খোদিত। এই সকল লিপিতে বাসুদেবের নাম তিন প্রকারে লিখিত আছে—বাসুদেব, বাসুষ্ক ও বসুষ্ক। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে পারদ আক্রমণে কপিশা, বাহ্লিক ও গান্ধার তাঁহার অধিকারচ্যুত হয়।

বাসুদেব—(৬) কুষাণরাজ দ্বিতীয় কনিষ্কের পর বাসুদেব নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। তিনি অতি অল্পকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজ্যের আয়তন মথুরার চারি পার্শ্বেই বিস্তৃত ছিল মাত্র।

বাসুদেব—(৭) বাসসুদেব নামে আর একজন কুষাণ নরপতির নাম পাওয়া যায়। তাঁহার বংশধরগণ পঞ্জাব ও উত্তর গান্ধারে রাজত্ব করিতেন।

বাসুদেব—(৮) তাঁহার পিতার নাম কেশীমষ্য। তিনি কলচুরি বংশীয় সবিদেবের সামন্ত নরপতি ছিলেন। (১১৭২ খ্রীঃ অব্দ)।

বাসুদেব ঘোষ—তাঁহার জন্মস্থান শ্রীহট্ট, কিন্তু কর্ম্মস্থান মেদিনীপুর জিলার তমলুক নগর। তিনি বৈষ্ণব যুগের একটী অমূল্য রত্ন। তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের একজন অনুরক্ত অনুচর হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পর হইতে তিনি তমলুকবাসী হন। এখানে স্থাপিত তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ আজও পূজিত হইতেছেন। তিনি 'গৌরাঙ্গ চরিত' ও 'নিমাই সন্ন্যাস' নামে দুইখানা গ্রন্থ সহজ, সুললিত ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় রচনা করিয়াছেন।

বাসুদেব তর্কালঙ্কার— প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। তিনি 'কীর্ত্তি-দীপিকা' নামক একখানি জাতক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বাসুদেব তালুকদার— পাবনা জেলার তারাশের প্রসিদ্ধ জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহাদের আদি নিবাস তারাশের পাঁচ ক্রোশ পূর্ব্বদিগে দেবচড়িয়া নামক গ্রামে ছিল। তাঁহার পিতা শ্রীরাম দেব। বাসুদেব তালুকদার নারায়ণ দেব চৌধুরী নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি ঢাকার নবাব সরকারে কার্য্য করিতেন। তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া নবাব ইসলাম খাঁ 'চৌধুরাই তারাশ' নামক সম্পত্তি তাঁহাকে জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেন। সেই সময়ে কাটার পরগণা রাজসাহী সাঁতৈলের রাজার জমিদারী ছিল। এই কাটার পরগণার অন্তর্গত দুইশত গ্রাম লইয়া, এই 'চৌধুরাই তারাশ' নামক জমিদারীর উৎপত্তি হয়। এই

জমিদারী প্রাপ্ত হইবার পর, তিনি তারাশে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় বাস করিতে থাকেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ দেব নামক বিগ্রহের নামানুসারে, তাঁহার বাসস্থান চড়িয়া স্থানের নাম চড়িয়া গোপীনাথপুর হইয়াছে। তিনি এই বিগ্রহের সেবার জন্য গোপীনাথপুর এবং চড়িয়া তালুক উৎসর্গ করেন। কথিত আছে নবাব সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালীন একদিন ঢাকায় গমনকালে তিনি তারাশ নামক স্থানে একটী অনাবৃত বাণলিঙ্গের উপর একটী কামধেনু দাঁড়াইয়া দুগ্ধ বর্ষণ করিতেছে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিবামাত্রই কামধেনু অন্তর্দ্ধ্যান হইয়া গেল। ঢাকা হইতে ফিরিবার পথে তিনি এই শিবলিঙ্গটী তাঁহার আদি নিবাস দেবচড়িয়া গ্রামে লইয়া যাইয়া, নিজ বাটীতে প্রতিষ্ঠা করিবেন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবলিঙ্গ উত্তোলন করিতে যাইয়া তিনি অকৃতকার্য্য হন। তারাশে বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার পর ১৬৩৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি বাণলিঙ্গে মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই বাণলিঙ্গ ঐ অঞ্চলে কপিলেশ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জয়কৃষ্ণ ও রামনাথ চৌধুরী নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল।

বাসুদেব দত্ত—বাসুদেব দত্ত ও মুকুন্দ দত্ত নামে দুই সহোদর চট্টলবাসী বৈদ্য সন্তান মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সহচর ছিলেন। বাসুদেব জ্যেষ্ঠ ছিলেন।

'বাসুদেব দত্তের মহিমা অপার।
জীবের লাগিয়া চায় নরক ভুগিবার।
নিত্যানন্দদাস বিরচিত-প্রেমবিলাস।'

বাসুদেব রথ সোমযাজী—তিনি একজন উৎকলবাসী কবি। গঙ্গবংশানুচরিতম্ কাব্য তাঁহার রচিত। এই কাব্য ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ।

বাসুদেব শর্ম্মা—বল্লাল সেনের নৈহাটী তাম্রশাসনের প্রতিগ্রহিতা সামবেদ কৌথুম শাখা চরণানুষ্ঠায়ী বাসুদেব শর্ম্মা রাজ মাতা বিলাসবতী দেবীর হেমাশ্ব মহাদানে আচার্য্য ছিলেন।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম—(১) এই অসাধারণ পণ্ডিত খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ ভট্টাচার্য্য। বিশারদ মহাশয় স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। বাসুদেব পিতার নিকটে প্রথমে ব্যাকরণ ও কাব্য অধ্যয়ন করিয়া পরে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ন্যায় শাস্ত্রে জ্ঞানলাভে সমুৎসুক হইয়া, মিথিলায় গমন করেন। সেই সময়ে পক্ষধর মিশ্র মিথিলার সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। বাসুদেব তাঁহারই চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করিয়া ন্যায়শাস্ত্র পাঠে মনোযোগী হইলেন। ন্যায়শাস্ত্রে যতই তিনি উন্নতি করিতে লাগিলেন, ততই অসীম আনন্দে তাঁহার

হৃদয় পূর্ণ হইতে লাগিল। কিরূপে এই অমূল্য রত্নদ্বারা তাঁহার মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করিবেন এই চিন্তা দিন দিন প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। মৈথিলী পণ্ডিতেরা তাঁহাদের কোন গ্রন্থ প্রতিলিপি করিয়া আনিতে দিতেন না। এই বিষয়ে তাঁহারা অত্যধিক সাবধান ছিলেন। সেইজন্য বাসুদেব, গঙ্গেশ উপাধ্যায় কৃত চিন্তামণি শাস্ত্রের চারিখণ্ড কুসুমাঞ্জলীর শ্লোক ভাগ একেবারে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ হইয়া পড়িলে, তিনি এই কার্য্যে আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। পক্ষধর মিশ্রের নিকট "সার্ব্বভৌম" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। দেশে প্রত্যাগত হইয়া ন্যায় শাস্ত্রের টোল স্থাপনকরেন। এই সময় হইতেই বঙ্গে ন্যায়ের পাঠ আরম্ভ হয়। 'অনুমান মণি ব্যাখ্যা' প্রণেতা কণাদ রঘুনন্দ ভট্টাচার্য্য,কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, শ্রীচৈতন্য, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি তাঁহারই ছাত্র। বাসুদেবের রচিত গ্রন্থ 'সার্ব্বভৌম নিরুক্তি' নামে খ্যাত।

বাসুদে সার্ব্বভৌম—(২) তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। মুসলমান রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচারের ভয়ে তিনি বঙ্গদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানেই অদ্বৈতবাদী সার্ব্বভৌমের সহিত দ্বৈতবাদী শ্রীচৈতন্যের বিচার হয়। এই বিচারে সার্ব্বভৌম পরাস্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই বাসুদেব সার্ব্বভৌম, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নামেই খ্যাত।

বাসুপূজ্য—জৈনদের মতে তিনি দ্বাদশ তীর্থঙ্কর। চম্পা নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং এই স্থানেই তিনি নির্ব্বাণ লাভও করেন।

বাসুরিনারায়ণ—একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। তিনি 'সভাকৌমুদী' নামক মুহূর্ত্ত বিবরণ বিষয়ে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বাহজাত—লক্ষ্ণৌ নগরের একজন কবি। তিনি ১৭৯৭ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১২১২) জীবিত ছিলেন।

বাহড় বর্ম্মা—তিনি ককরেড়ি স্থানের মহারাণক (রাজা) ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম সলখণ বর্ম্মা ছিল। তিনি ১২৪১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে ভ্রাতা হরিরাজ রাজত্ব করেন।

বাহদন্তীপুত্র—প্রাচীন অর্থশাস্ত্রকার। কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রে বৃহস্পতি, বাহদন্তীপুত্র, বিশালাক্ষ, উশনা প্রভৃতিকে অর্থশাস্ত্র ধুরন্ধর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বাহরাম— একজন ঐতিহাসিক পণ্ডিত। ১৫৯৯ সালে তিনি বোম্বায়ের ফারসীদের ইতিহাস রচনা করেন।

বাহরম খাঁ—তিনি মির্জা বাহরামের পুত্র এবং সম্রাট আওরঙ্গজীবের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। ১৬৯২ খ্রীঃ অব্দে তিনি প্রধান বক্সির পদ প্রাপ্ত হন। ১৭০২ খ্রীঃ অব্দে তিনি শমনের সমন প্রাপ্ত হন।

বাহরাম শাহ—(১) গজনীর সুলতান তৃতীয় মসায়ুদের পুত্র। ১১১৮ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৫১২) তাঁহার ভ্রাতা আর্সালান শাহকে নিহত করিয়া, সুলতান সঞ্জয়ের সহায়তায় তিনি গজনীর সিংহাসন লাভ করেন। দীর্ঘকাল রাজত্বের পর ১১৫২ খ্রীঃ অব্দে তিনি আলাউদ্দিন হোশেন ঘোরী কর্তৃক পরাজিত হইয়া লাহোর নগরে পলায়ন করেন এবং ঐ বৎসরই তিনি তথায় পরলোক গমন করেন। তৎপর তাঁহার পুত্র খসরু-শাহ গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বাহলুলী—একজন কবি। তাঁহার রচিত একখানা দেওয়ান টিপু সুলতানের লাইব্রেরীতে ছিল।

বাহাউদ্দিন জিকারিয়া শেখ—মুলতানের একজন মুসলমান দরবেশ। তিনি কুতবউদ্দিন মোহাম্মদের পুত্র ও কামালউদ্দিন কুরেশীর পৌত্র। তিনি মুলতানের অন্তর্গত কুতকারোয় নামক স্থানে ১১৭০ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৬৬৫) জন্ম গ্রহণ করেন। অধ্যয়ন সমাপনান্তে তিনি বোগদাদ প্রভৃতি স্থান ভ্রমণে গমন করেন এবং শেখ শাহাবউদ্দিন সুহারবর্দ্দির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অবশেষে তিনি মুলতানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১২৬৬ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৬৬১) তিনি তথায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র শেখ সদরউদ্দিন প্রভৃত পিতৃধনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ১৩০৯ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৭০৯) সদর উদ্দিনের মৃত্যু হয়।

বাহাউদ্দিন শেখ, জৌনপুরী—একজন মুসলমান ফকির। তিনি শেখ মোহাম্মদ ইসা সাহেবের শিষ্য এবং ঐ সময়ের একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। তিনি স্বার্থত্যাগ, সাধুতা, সত্যবাদীতা ও উন্নত ধর্ম্মজীবনের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। জৌনপুরের সুলতান হোশেন সারকি, তাঁহার জন্য একটী উৎকৃষ্ট বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তীর্থযাত্রীদের আহার ও অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রচুর ভূমি বৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রমে বহু ছাত্র ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি অবস্থান করিত। তাঁহার গুরু শেখ মোহাম্মদ ইসা মৃত্যুকালে তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—'মাণিকপুর হইতে একজন সৈয়দ আসিয়া তোমাকে খলিফা পদের অঙ্গাভরণ প্রদান করিবেন।' নির্দ্দিষ্ট দিনে সৈয়দ রাজি হামিদ আসিয়া তাঁহাকে সেই অঙ্গাভরণ প্রদান করিয়াছিলেন।

বাহাদুর খাঁ (প্রথম)—তিনি হিজলীর (মেদিনীপুরের অন্তর্গত) প্রথম মুসলমান শাসনকর্ত্তা সলিম খাঁর পুত্র। তিনিই প্রথম হিজলীর জমিদারী লাভ করেন। বাঙ্গালার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর (১৬১৮—১৬২২ খ্রীঃ) বিরুদ্ধে তিনি দণ্ডায়মান হইলে, ইব্রাহিম খাঁর কর্ম্মচারীকর্ত্তৃক তিনি বন্দী হন। পরে ইব্রাহিম খাঁকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিন লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া, তিনি পুন জমিদারী লাভ করেন। তাঁহার পরে ইখতিয়ার খাঁ হিজলীর অধিপতি হন। ইখতিয়ার খাঁ দেখ।

বাহাদুর খাঁ (দ্বিতীয়)—তিনি মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত হিজলীর নবাব তাজ খাঁ মসনদ ই-আলার পুত্র। পিতার মৃত্যুর পরে ১৬৫১ খ্রীঃ অব্দে তিনি হিজলীর নবাব হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুকালে তিনি ঢাকায় ছিলেন এবং এই সুযোগে তাঁহার ভগিনীপতি জৈন খাঁ হিজলীর সিংহাসন অধিকার করেন। তাজ খাঁর মহিষী, পুত্র বাহাদুরখাঁকে আনয়ন করিবার জন্য স্বীয় ভ্রাতা রহমান খাঁকে ঢাকায় প্রেরণ করিলে, বাহাদুর খাঁ হিজলীতে প্রত্যাগত হইয়া জৈন খাঁকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিমধ্যে দিল্লীতে শাহজাহানকে বন্দী করিয়া, আওরঙ্গজাব সম্রাট হন। বাহাদুর খাঁ শাহ-সুজার অনুমতি না লইয়া চলিয়া আসাতে, ঢাকার নবাব সৈন্য তাঁহাকে ধরিবার জন্য আসিল। জৈন খাঁ বাদশাহী সৈন্যের সেনাপতি হইলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। জৈন খাঁ ও রহমান যুদ্ধে নিহত হইলেন। বাহাদুর খাঁর সৈন্যেরা পলায়ন করিল। বাহাদুর খাঁ সপরিবারে বন্দী হইয়া শাহ-সুজার নিকট ঢাকায় নীত হইলেন। শাহ-সুজা তাঁহাকে তাঁহার নায়েবের পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি আর হিজলীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। বাহশানী দেওয়ান বাহাদুর খাঁর কর্ম্মচারী দিবাকর পণ্ডা ও দ্বারকাদাসকে হিজলী দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন। বাহাদুর খাঁ স্বীয় মাতুল রহমত খাঁর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বাহাদুর খাঁ হিজলীর আর কোন খবরাদিই রাখিতেন না। ইখতিয়ার খাঁ দেখ।

বাহাদুর খাঁ ফরোকী—১৫৯৬ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০০৫) তিনি পিতৃপ্রদত্ত (খান্দেশের শাসনকর্ত্তার পদ) প্রাপ্ত হন। সম্রাট আকবর দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য আগমন করিলে, তিনি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার না করিয়া, আসিরগড় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু পরিশেষে তিনি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বাহাদুর খাঁ রোহিলা—দরিয়া খাঁর

পুত্র। তিনি সম্রাট শাহজাহানের রাজ সভার একজন বড় আমির ছিলেন। রাজকুমার আওরঙ্গজীবের সহিত তিনি কান্দাহারে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায়ই ১৬৪৯ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৫৯) তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাহাদুর নিজাম শাহ—দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত আহম্মদ নগরের নিজামশাহী বংশের তিনিই শেষ সম্রাট। ১৫৯৫ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০০৩) তাঁহার পিতা ইব্রাহিম নিজাম শাহের মৃত্যুর পরে মির্জ্জা মঞ্জু, বাহাদুর নিজামশাহ উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাহাদুর নিজাম শাহ তাঁহার প্রতিপক্ষদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য সম্রাট আকবরের পুত্র তদানীন্তন গুজরাটের শাসনকর্ত্তা রাজকুমার মোরাদকে আহ্বান করেন, মোরাদ সসৈন্যে আহাম্মদ নগরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তথাকার বিদ্রোহ দমন হইয়াছিল। সুতরাং বাহাদুর নিজাম শাহ আর মুঘলদিগের বশ্যতা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। তাঁহার পিতৃব্য পত্নী চাঁদ সুলতানার অসাধারণ বীরত্বে মোরাদ পরাস্ত হইলেন এবং সামান্য মাত্র কর গ্রহণেই সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। অচিরকাল মধ্যেই বাহাদুর শাহের প্রতিপক্ষেরা পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিল, এই সুযোগে মুঘলেরা আহাম্মদনগর আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। বাহাদুর শাহ ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলে চিরদিনের জন্য গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী হইলেন। এই ঘটনা ১৬০০ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০০৯) সংঘটিত হইয়াছিল।

বাহাদুর শাহ—(১) একজন আফগান। শাসনকর্ত্তা সলিমশাহের সময়ে তাঁহার পিতা মাহমুদ খাঁর মৃত্যুর পরে তিনি বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তা হইয়া, পরে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। সলিম শাহের অপর কর্ম্মচারী সুলেমান কররাণী ১৫৪৯ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৫৬) তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া বাঙ্গালার মসনদ অধিকার করেন।

বাহাদুর শাহ—(২) গুজরাটের অধিপতি দ্বিতীয় মজাফর শাহের দ্বিতীয় পুত্র। ১৫২৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদরকে নিহত করিয়া, গুজরাটের সিংহাসনে আরোহণ করেন (হিঃ ৯৩২)। ১৫৩১ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৩৭) তিনি মালব দেশ অধিকার করেন। কিন্তু ১৫৩৬ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৪২) সম্রাট হুমায়ুন তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া মালব দেশ অধিকার করেন। বাহাদুর শাহ কাম্বে অভিমুখে পলায়ন করিলেন। ইতিমধ্যে সমুদ্রের উপকুলভাগে একখানা জাহাজ আসিয়াছে শুনিয়া তন্মধ্যস্থ ইউরোপীয়দিগকে নিহত করিয়া জাহাজ লুণ্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি তথায় গমন করেন। কিন্তু

ইউরোপীয়েরা তাঁহার দুরভিসন্ধি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল। তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে বাহাদুর শাহ ১৫৩৭ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৪৩) নিহত হন।

বাহাদুর শাহ (প্রথম)—তাঁহার অপর নাম কুতবউদ্দিন শাহ আলম (পূর্ব্ব নামময়াজ্জিম)। তিনি সম্রাট আওরঙ্গজীবের দ্বিতীয় পুত্র। ১৬৪৩ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০৫৩) তাঁহার জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুকালে তিনি কাবুলে ছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার ভ্রাতা আজিম শাহ সিংহাসন অধিকার করেন। এই সংবাদ শ্রবণে তিনি সসৈন্যে পঞ্জাবে আসিয়া উপস্থিত হন। উভয় ভ্রাতার মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া গেল, যুদ্ধে আজিম শাহ ও ও তাঁহার দুই পুত্র নিহত হইলেন। তৎপর বাহাদুরশাহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন; কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা কামবক্স দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহী হন। বাহাদুর শাহ তাঁহাকে দমন করিবার জন্য স্বয়ংই তথায় গমন করেন। কামবক্স অচিরেই মুনিমখাঁর কার্য্যদক্ষতায় বন্দী হইলেন এবং দুইদিন পরেই প্রাণত্যাগ করিলেন। আলমগীরের অত্যাচারে হিন্দু জাতির মুসলমান বিদ্বেষ বিশেষভাবেই বর্ত্তমান ছিল। রাজপুত জাতি ও পাঞ্জাবের শিখেরা ধীরে ধীরে মুঘলদিগের বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করিতেছিল। বাহাদুর শাহ এক সময়ে সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব নহে মনে করিয়া, প্রথমে রাজপুতদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। পরে মুনিম খাঁকে বিপুল বাহিনীসহ শিখদিগকে দমন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। মুনিম খাঁ শিখদিগকে দমন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না করিতেই সিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে মুনিম খাঁ পরলোক গমন করিলেন। অপরদিকে বাহাদুর শাহও শয্যাশায়ী হন এবং ১৭১২ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১২৪) লাহোর নগরে তিনি পরলোক গমন করেন।

বাহাদুর শাহ (দ্বিতীয়)— তাঁহার সম্পূর্ণ নাম আবুল মজাফর সিরাজউদ্দিন মোহাম্মদ বাহাদুর শাহ। ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি দিল্লীর নামমাত্র সম্রাট আকবরের (১৮০৬—৩৭ খ্রীঃ অব্দ) পুত্র। তিনিও তাঁহার পিতার ন্যায় ইংরেজের বৃত্তিভোগী ছিলেন। তিনিই মুঘল বংশের শেষ নরপতি। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহে তিনি লিপ্ত ছিলেন। এই কারণে তিনি রেঙ্গুন সহরে নির্ব্বাসিত হন এবং ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

কগতা ধরণীপালাঃ সসৈন্য-
বলবাহনাঃ।
বিয়োগ সাক্ষিণী যেষাং ভুমিরদ্যাপি
তিষ্ঠতি ।।

বাহাদুর সিংহ—তিনি কোটারাজের একটী প্রথম শ্রেণীর সর্দ্দার। তাঁহার ভূমি সম্পত্তি মোসাইনগর। তিনি ১৭৭৭ খ্রীঃ অব্দে কোটার অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাজা উমেদ সিংহের প্রতিনিধি জালিম সিংহকে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু পরাস্ত হইয়া পত্তন নগরে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য কিশোরীদেবের মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। সেখানে মন্ত্রী জালিমের সৈন্য যাইয়া তাঁহাকে হত্যা করে। জালিম সিংহ দেখ।

বাহার মল্ল—ঐশ কর্ণের পরে বাহার মল্ল অম্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দিল্লীর সম্রাট বাবরের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে সম্রাট হুমায়ুনের সময়ে পাঁচ হাজার সেনার সৈনাপত্য তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাহার মল্লের পরে তাঁহার পুত্র ভগবান দাস রাজা হইয়াছিলেন।

বাহুক ধবল—গুর্জ্জর প্রদেশের অধিপতি। তিনি খ্রীঃ নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। কথিত আছে যে তিনি ধর্ম্ম নামক জনৈক রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। বহু রাজাধিরাজ পরমেশ্বরকে জয় করিয়াছিলেন এবং কর্ণাট দেশীয় সেনাসমূহ ছত্রভঙ্গ করিয়াছিলেন।

বাহুবল—তিনি যশল্মীরের রাজা পৃথ্বীবাহুর পুত্র তিনি মালবের রাজা বিজয় সিংহের কন্যা কমলাবতীকে বিবাহ করিয়া যৌতুক স্বরূপ এক সহস্র খোরাসানী অশ্ব, একশত হস্তী প্রভৃত সুবর্ণ ও মণি মুক্তা এবং পঞ্চশত দাসী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রমার কুলোদ্ভুতা কমলাদেবী তাঁহার প্রধানা মহিষী ছিলেন।

বাহু বেগম—তিনি লক্ষ্ণৌয়ের নবাব আসফউদ্দৌলার জননী। তাঁহার প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে বলিয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংস অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বাহু সেন—তিনি বাঙ্গালার সেনবংশীয় নরপতিদের বংশধর। মুসলমান আক্রমণের সময়ে বাঙ্গালার সেন বংশীয় নরপতিদের কেহ পঞ্জাবে শিমলা পর্ব্বতের উত্তরে রাজ্য স্থাপন করেন। ১২০০ খ্রীঃ অব্দে রাজ ভ্রাতা বাহুসেন কুলুতে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইহার বংশধরেরা এখন মণ্ডির রাজা।

বাহ্বট—একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—শতশ্লোকী।

বিকা—১৪৫৯ খ্রীঃ অব্দে রাঠোর বীর যোধরাও মুন্দর হইতে স্বপ্রতিষ্ঠিত যোধপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সেই বৎসরই তাঁহার অন্যতম পুত্র বিকা। বিকানীর নগর স্থাপন করিয়া একটী নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বিকার বংশধরদিগের বিক্রম প্রভাবে বিকানীর রাজ্য অল্প সময়ের মধ্যেই উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির উচ্চতম সোপানে

আরূঢ় হইতে পারিয়াছিল। বিকা মারবারের বালিয়ারির মধ্যে রাঠোরের প্রভুতা বিস্তৃত করিবার জন্য স্বীয় পিতৃব্য কণ্ডুলের অধিনেতৃত্বে তিনশত রাঠোর লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বিদা নামে বিকার অপর একটী ভ্রাতা ছিলেন। তিনি কিছু পূর্ব্বে মোহিলাদিগের রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে বিকা তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। প্রথমেই বিকা তিনশত সৈন্য লইয়া জঙ্গলু নামক স্থানের শঙ্কলা জিতদের উপর আপতিত হইলেন। তাহারা সদলে নিহত হইল। এই ঘটনা সমস্ত দেশে বিস্তৃত হইবামাত্র পুগলের ভট্টিরাজ তাঁহার হস্তে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তৎপর তিনি করন্দশির নামক স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া রাজ্য বিস্তার করিতে গাগিলেন। বিকা যত্র রাজধানী স্থাপন করিলেন, তাহার চতুর্দ্দিকে জিত জাতির বিভিন্ন শাখায় রাজ্য। তন্মধ্যে পুনিয়া, গোদারা, সারণ আসিয়াগ, বেণীবল ও জোহিয়া এই ছয়টী রাজ্য প্রধান ছিল।

কয়েক বৎসর মধ্যেই বিকার তেজ ও জয়গৌরব এত বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি অচিরে ২৬৭০ খানি পল্লির অধিপতি হইলেন। এই জিত জাতির মধ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের রাজ্য সহজেই বিকার হস্তগত হইল। জিতেরা বুঝিতে পারিল যে, যদি তাহারা পরস্পর বিবাদ করে, তবে অচিরেই তাহারা নষ্ট হইবে। তাহাদের সর্দ্দারেরা মিলিত হইয়া বিকার প্রাধান্য স্বীকার করাই উচিত বলিয়া মনে করিলেন। এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া গোদারা ও রোণিয়ার সর্দ্দারদ্বয় বিকার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—আপনি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলে, আমরা আপনার আধিপত্য মানিয়া লইব। প্রথম প্রস্তাব জোহিয়া ও অন্যান্য যে যে উপনিবেশের সহিত আমাদের বিবাদ তাহাদের দমনে আপনি আমাদের সাহায্য করিবেন। দ্বিতীয় আপনি ভট্টিদিগের উপদ্রব হইতে আমাদের রাজ্যের পশ্চিম সীমাকে রক্ষা করিবেন। তৃতীয় জিত সম্প্রদায়ের স্বত্ব অব্যাহত রাখিতে হইবে। বিকা এই তিনটী প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। তখন তাহারা বলিল যে আমাদের প্রত্যেক গৃহস্থ হইতে এক টাকা 'ধুয়া' কর ও প্রতি শত বিঘা জমি হইতে দুই টাকা বার্ষিক কর সর্ব্বদা পাইবেন। আমরাও যথাসর্ব্বস্ব আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। এখন আপনি ও আপনার বংশধর আমাদিগকে স্ব স্ব স্বত্ব হইতে বঞ্চিত না করিতে পারে তাঁহার ব্যবস্থা করুন।' উদার হৃদয় বিকা তখন বলিলেন—তোমাদের কোন ভয় নাই। অদ্য আমি শপথ

করিয়া বলিলাম, গোদারা ও রোণিয়ার সর্দ্দারদ্বয় আমার অথবা আমার বংশধরের ললাটে রাজটীকা না দিলে কেহই রাজা বলিয়া গণ্য হইবে না। এই প্রথা এখনও বর্ত্তমান। বিকা যে স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন, সেই স্থান নীর নামক একজন জিতের ছিল। তাঁহার নাম স্বীয় নামের সহিত যুক্ত করিয়া বিকানীর নাম হইল।

পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে বিকা সসৈন্যে জোহিয়াদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাহাদের সর্দ্দার শের সিংহ নিহত হইলেন। তৎপরে ভট্টিদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের রাজ্য অধিকরিলেন।

বিকা পুগলের ভট্টিরাজের দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই রাজকুমারীর গর্ভে নুনকর্ণ ও গরসিংহ নামে দুই পুত্র জন্মে। ১৪৯৫ খ্রীঃ অব্দে বিকা পরলোক গমন করিলে জ্যেষ্ঠ নুনকর্ণ রাজা হইয়াছিলেন।

বিকু খাঁ নবাব বাহাদুর—১৭৭৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি শ্রীহট্টের ফৌজদার ছিলেন।

বিক্রম বা বিক্রমাদিত্য—ঈল দুর্গের নরপতি দ্বিতীয় চাবুণ্ড, পশ্চিম চালুক্যবংশীয় নরপতি তৃতীয় তৈলপের সামন্ত নরপতি ছিলেন। চাবুণ্ডের দ্বিতীয়া পত্নী কলচুরী রাজ বিজ্জল বা বিজ্জনের কন্যা সিরিয়া দেবীর গর্ভে বিজ্জল ও বিক্রমাদিত্য নামে দুই পুত্র জন্মে। তাঁহারা বিসুকাড়, বাগড়াগ ও কেলবাড়ী নামক স্থানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। অন্য একখানা শিলালিপিতে উল্লেখ আছে ১১৭৯ খ্রীঃ অব্দে বিক্রমাদিত্য কলচুরী রাজ সঙ্কমের সামন্ত নরপতি ছিলেন।

বিক্রম কেশরী—একজন হিন্দু রাজা। তিনি মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত দণ্ডভুক্তি প্রদেশের রাজা ছিলেন। অমরাবতীপুরীতে (বর্ত্তমান মোগলমারী গ্রাম) তাঁহার রাজধানী ছিল বলিয়া জানা যায়। তাঁহার কন্যা সখীসেনা বা শশিসেনা ও জামাতা অহিমাণিক সম্বন্ধে আজও এপ্রদেশে নানাপ্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান নিবাসী কবি ফকিররাম 'সখীসেনা' নামক কাব্যে বিক্রম কেশরীর কন্যা ও জামাতার প্রণয় কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ রাজা ধর্ম্মপাল, রাজেন্দ্রচোলকর্ত্তৃক নিহত হইলে পর উৎকলের কেশরীবংশীয় বিক্রম কেশরী অথবা তাঁহার কোন পূর্ব্বপুরুষ দণ্ডভুক্তি প্রদেশ পুনরায় অধিকার করিয়াছিলেন। উত্তরকালে রাজা রামপালের সময়ে তাঁহারই সামন্ত জয়সিংহ স্বাধীনতাবলম্বী রাজা কর্ণকেশরীকে পরাভূত করিয়া পালবংশের সামন্তরূপে দণ্ডভুক্তি প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

বিক্রম চন্দ—তিনি কমায়ুনের চন্দ-বংশীয় নরপতি হরিচন্দের পুত্র। তিনি ১৫২৪—১৪৩৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র ভারতী চন্দ রাজা হইয়াছিলেন।

বিক্রম চোড়—(১) অন্য নাম পর-কেশরী বর্ম্মা। তিনি পূর্ব্ব চালুক্য-বংশীয় নরপতি কুলতুঙ্গ চোড় দেবের পুত্র। তিনি ১১০৮ হইতে ১১২৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র, দ্বিতীয় কুলতুঙ্গ চোড়দেব রাজত্ব করেন।

বিক্রম চোড়—(২) অন্য নাম বিক্রম রুদ্র। তাঁহার পিতার নাম প্রথম রাজপরেণ্ডু। তিনি ১১২৮ খ্রীঃ অব্দে কণমণ্ডলের অধিপতি ছিলেন।

বিক্রম জিৎ— সাধারণতঃ তিনি বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত। তিনি মিবারের রাণা সঙ্গের অন্যতম পুত্র। রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহ ১৫৩০ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র রাণা রত্ন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়া ছিলেন। রাণা রত্নের মৃত্যুর পরে তাঁহার অনুজ রাণা বিক্রমাদিত্য ১৫৩৫ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাণা রত্নের ন্যায় সদ্‌গুণান্বিত ও বিচক্ষণ নরপতি ছিলেন না। তিনি ক্ষমাহীন ও প্রতিহিংসা পরায়ণ নরপতি ছিলেন। তিনি রাজপুত সর্দ্দারদের সঙ্গে না মিশিয়া, মল্ল ও লীলা যোদ্ধদের সহিত কালযাপন করিতেন। বিশেষতঃ রাজপুত অশ্বারোহীগণ দীর্ঘকাল যে সম্মান সম্ভ্রম ভোগ করিয়া আসিতে-ছিলেন বিক্রমাদিত্য সেই সম্মান ও সম্ভ্রম অপহরণ করিয়া হীনপদস্থ পাইক ও মল্লদিগকে অর্পণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে দিন দিন সর্দ্দারদের অসন্তুষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলে রাজ্যে দস্যুতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাণা তখন সর্দ্দারদেরে ডাকিয়া পার্ব্বত্য দস্যুদিগকে দমন করিতে বলিলেন। সর্দ্দারেরা সকলেই তাঁহার আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করিয়া বলিল—আপনার পাইকদিগকে প্রেরণ করুণ।

এই সময়ে গুজরাটের মুসলমান শাসনকর্ত্তা সুলতান বাহাদুর যোধপুর আক্রমণ করিলেন। তাঁহার মারবার আক্রমণের প্রধান কারণ, বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী রাণা পৃথ্বীরাজ গুজরাটের অধিপতি সুলতান মজফরকে পরাস্ত করিয়া স্বনগরে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সুলতান বাহাদুর যোধপুর আক্রমণ করিলেন। অচিরে চিতোরের অর্জ্জুন রাও প্রভৃতি বহু বীর স্বদেশ রক্ষার্থ সমর শয্যায় শয়ন করিলেন। বীরাঙ্গনা জবহর বাঈ অসংখ্য শত্রু সৈন্য নিপাত করিয়া সমর শায়িনী হইলেন। সুল-

তান বাহাদুর চিতুর ধ্বংস করিয়া উৎসবে মত্ত হইলেন।

ইতিমধ্যে এক অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হইল। রাজপুতদের মধ্যে 'রাখি বন্ধন' নামক একটী সুন্দর প্রথা আছে। কোন রমণী বিপদে পতিত হইয়া কাহাকেও 'ধর্ম্ম ভ্রাতা' সম্বোধন পূর্ব্বক রাখি প্রেরণ করিলে, সেই ধর্ম্ম ভ্রাতা তাহা গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম ভগিনীর বিপদে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হয়। এমনকি এই জন্য জীবন পাত করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কাহারও নিকট হইতে এইরূপ রাখি পাওয়া অতিশয় গৌরবজনক বলিয়া অভিহিত হয়। চিতোরের রাণী কর্ণবতী এই বিপদের সময় দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুনকে 'ধর্ম্মভ্রাতা' সম্বোধনপূর্ব্বক রাখি প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্রাট হুমায়ুন ধর্ম্ম ভগিনী রাণী কর্ণবতীর রাখি পাইয়া নিজেকে অতিশয় সম্মানিত বোধ করিলেন এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য অচিরে সসৈন্যে চিতোরে উপস্থিত হইলেন। সুলতান বাহাদুর সম্রাটের ভয়ে চিতোর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিলেন।

এই বিপদে পতিত হইয়াও বিক্রম জিতের স্বভাব কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইল না। তিনি সর্দ্দারদের সঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় ভাল ব্যবহার করিতে পারিলেন না। একদিন তিনি প্রমার চাঁদকে সভাস্থলেই প্রহার করিয়াছিলেন। ইহার ফলে সমস্ত সর্দ্দারেরা উত্তেজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সভাস্থল পরিত্যাগ করিল। অচিরেই তিনি সিংহাসনচ্যুত হইলেন এবং তাঁহার জীবন নাট্যের যবনিকাও পতিত হইল। তাঁহার স্থলে রাণা সংগ্রাম সিংহের এক উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্র বনবীর সিংহকে সর্দ্দারেরা কিছু-কালের জন্য সিংহাসনে স্থাপন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল ১৫৩২—১৫৩৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত।

বিক্রমজিৎ মল্ল উগালষণ্ড দেব বাহাদুর—মেদিনীপুরের অন্তর্গত ঝাড় গ্রামের একজন রাজা। ঝাড় গ্রামের দুই মাইল দূরে রাধানগর গ্রামে তাঁহার নির্ম্মিত 'মেলা বাঁধ' ও 'কেরেন্দার বাঁধ' নামে দুইটী বৃহৎ জলাশয় আছে। নিদারুণ গ্রীষ্মকালে যখন এই প্রদেশের চারিদিকেই ভয়ানক জলকষ্ট উপস্থিত হয়, তখনও ঐ দুইটী জলাশয়ে অগাধ জল থাকায় এই প্রদেশের অধিকাংশ লোক সেই জল পান করিয়া জীবন রক্ষা করে। ঝাড় গ্রামাধিপতিগণের স্থাপিত অনেক দেব দেবীর মন্দিরও আছে। তাঁহারা দেব সেবার জন্য অনেক ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। ঝাড় গ্রাম প্রাচীন মল্লভূম রাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত। বীর বিক্রম মল্লদেব ইহার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কথিত হন।

বিক্রমজা—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম —অনুপাণ মঞ্জরী।

বিক্রম পাণ্ড্য—পূর্ব্ব চালুক্যবংশীয় নরপতি কুলতুঙ্গ চোড়দেব দ্বিতীয়, বীর পাণ্ড্যকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া বিক্রম পাণ্ড্যকে ১১২১ খ্রীঃ অব্দে মদুরা নগরের আধিপত্য প্রদান করিয়া ছিলেন।

বিক্রমরাজ—দেবগ্রাম প্রতিবদ্ধ বাল-বলভী রাজ্যের তিনি অধিপতি ছিলেন। এই বালবলভী রাজ্যের অবস্থান এখনও নির্ণিত হয় নাই। ইহা বঙ্গদেশেরই একাংশ তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিক্রম শাহী—তিনি গোয়ালিয়রপতি মান শাহীর পুত্র ও কল্যাণ মল্লের পৌত্র। তৎপরে তাঁহার পুত্র রাম শাহী রাজা হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

বিক্রম শোলাঙ্কি—তিনি মিবারের একজন সামন্ত নরপতি। রূপনগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজীব মিবার রাজকে স্ববশে আনয়ন করিবার জন্য, তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজকুমার আকবর একদল মুঘল বাহিনীর অধিনায়ক হইয়াছিলেন। তিনি পরাজিত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। উদার রাজপুতেরা তাঁহাকে পরে ছাড়িয়া দেন। আর একদল মুঘল বাহিনীর নায়ক ছিলেন দেলির খাঁ। তাঁহাকে রাজপুত সেনাপতি বিক্রম শোলাঙ্কী এক গিরিবর্ত্মে আবদ্ধ করিয়া সদলে নিহত করেন। এই সব পরাজয়ের পরে সম্রাট, রাজপুতদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

বিক্রম সিংহ—তিনি যশল্মীরের অধিপতি মূল রাজের (১২৯৪ খ্রীঃ) অন্যতম বিখ্যাত সেনাপতি। আলাউদ্দিন খিলিজী যশল্মীর আক্রমণ করিলে, সমস্ত রাজপুতেরা প্রাণপনে যুদ্ধ করিয়াও নগর রক্ষা করিতে পারিল না। রমণীগণ জহর ব্রত অবলম্বন করিয়া, অনলে প্রাণবিসর্জ্জন করিল, আর পুরুষেরা সমস্ত নগর ভস্মীভূত করিয়া, অসি হস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণবিসর্জ্জন করিল।

বিক্রম সেন—বঙ্গের সেনবংশীয় নরপতিদের পূর্ব্ব পুরুষ দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁহাদের বংশধর বিক্রম সেন, বিক্রমপুর নগরের প্রতিষ্ঠাতা। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের কুল পঞ্জিকা 'বিপ্রকুল লতিকা' গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, বিক্রম সেনের পুত্র শুকদেব সেন মহারাজ আদিশূরের জামাতা ছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রদ্যুম্ন সেন ও বরেন্দ্র সেন।

বিক্রমাদিত্য—(১) তিনি হুন বিজয়ী মালবপতি যশোধর্ম্মা রাজাধিরাজের পুত্র। গোয়ালিয়রের প্রস্তর লিপি

হইতে জানা যায় যে, হুনবীর তোর-মানের মৃত্যুর পরে ৫১৫ হইতে ৫৩০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত হুনরাজ মিহিরকুল বার বার মালব আক্রমণ করেন। সেই সময়ে প্রাচীন গুপ্ত বংশীয় বালাদিত্য নরসিংহ গুপ্ত মালবে ছিলেন। তাঁহার সেনাপতি যশোধর্ম্মা, মিহিরকুলকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন। বালাদিত্যের মৃত্যুর পরে সেনাপতি যশোধর্ম্মা, রাজাধিরাজ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক উজ্জয়িনীতে রাজত্ব আরম্ভ করেন। এই রাজাধিরাজের পুত্র বিক্রমাদিত্য ৫৪০ খ্রীঃ অব্দের পরে উজ্জয়িনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই হুন বিজয়ী ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য। তাঁহার রাজসভায়ই কালিদাস প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারই সম্বন্ধে নানাপ্রকার গল্প কিম্বদন্তী আছে।

বিক্রমাদিত্য—(২) মগধের গুপ্তবংশীয় নরপতি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমুদ্র গুপ্তের মহিষী দত্তদেবী তাঁহার জননী।

বিক্রমাদিত্য—(৩) তিনি পীঠপুরস্থ পূর্ব্ব চালুক্য শাখার দ্বিতীয় নরপতি সত্যাশ্রয় উত্তম চালুক্যের অন্যতম পুত্র। *তাঁহার অগ্রজ দ্বিতীয় বিজয়াদিত্য ও* বিমলাদিত্যের পরে তাঁহার অনুজ প্রথম বিষ্ণুবর্দ্ধন রাজা হইয়াছিলেন।

বিক্রমাদিত্য—(৪) গোত্তন নামক স্থানের রাজা ছিলেন। তিনি আহবাদিত্য বা দ্বিতীয় বীর বিক্রমাদিত্যের পুত্র। খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেবগিরির যাদববংশীয়দের সামন্ত নরপতি ছিলেন।

বিক্রমাদিত্য, প্রথম—তিনি বাণ-বংশীয় নরপতি প্রভু মেরুদেবের পুত্র। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় বিজয়াদিত্য বা যুগল বিপ্রবর গণ্ড। তাঁহারা খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

বিক্রমাদিত্য, দ্বিতীয়—তিনি পূর্ব্ব চালুক্য বংশীয় প্রথম ভীমের পুত্র এবং চতুর্থ বিজয়াদিত্যের ভ্রাতা। তিনি তাড়পকে যুদ্ধে নিহত করিয়া রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৯২৫ খ্রীঃ অব্দে মাত্র ১১ মাস রাজত্ব করিয়া ছিলেন। তৎপরে তৃতীয় বিজয়াদিত্য তাঁহাকে অপসারিত করিয়া রাজা হইয়াছিলেন।

বিক্রমাদিত্য, তৃতীয়—পশ্চিম চালুক্য বংশের বাদামীর রাজা প্রথম তৈলের পুত্র। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীঃ নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার তনয় দ্বিতীয় ভীম রাজা হইয়াছিলেন।

***বিক্রমাদিত্য, চতুর্থ**—তিনি পশ্চিম* চালুক্য বংশের বাদামীর প্রথম অয্যানের পুত্র। তিনি খ্রীঃ দশম শতাব্দীর শেষ-

ভাগে খুব সম্ভব রাজত্ব করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার তনয় আহব মল্ল পুরমাড়ি তৈলপ ৯৭৩ খ্রীঃ অব্দে রাজা ছিলেন।

বিক্রমাদিত্য, পঞ্চম—তিনি পশ্চিম চালুক্য বংশের কল্যানের নরপতি আহব মল্ল পুরমাড়ি শৈলের পৌত্র। তিনি তাঁহার পিতৃব্য সত্যাশ্রয়ের মৃত্যুর পরে রাজা হইয়াছিলেন। তিনি ১০০৯—১০১৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। রাজ্য প্রাপ্তির অল্পকাল পরেই মালবপতি মুঞ্জের ভ্রাতৃ তনয় ভোজরাজ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। ১০১৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভোজরাজ হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা জয়সিংহ ভোজরাজের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় জয়সিংহ ১০১৮—১০৪০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজা ছিলেন।

বিক্রমাদিত্য, ষষ্ঠ—তিনি পশ্চিম চালুক্য বংশীয় কল্যানের নরপতি সোমেশ্বরের পুত্র এবং দ্বিতীয় সোমেশ্বরের ভ্রাতা ছিলেন। তিনি ১০৭৬—১১২৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে চালুক্য বংশের গৌরব সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালের মধ্যে তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। এমন কি বঙ্গদেশ ও মালবদেশেও অভিযান করিয়াছিলেন। উড়িষ্যা, গুজরাট, মালব ও দাক্ষিণাত্যের প্রায় সকলেই তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। তিনি নিজ নামে একটী অব্দও প্রচলন করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা মৈলন দেবীকে, জয়কেশী নামে তাঁহার এক সামন্ত নরপতি বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয় জয়কেশী গোয়া প্রদেশস্থ কদম্ব বংশজ রাজা ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের পরে তাঁহার পুত্র তৃতীয় সোমেশ্বর রাজা হইয়াছিলেন। বম্মরস এই বিক্রমাদিত্যের নোলাম্ববাড়ী নামক স্থানের রাজস্ব আদায়কারী ছিলেন। কাশ্মীরদেশীয় কবি বিহ্লন রাজা কলসের আশ্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক নানা রাজ্য পর্য্যটনান্তর অবশেষে এই বিদ্যানুরাগী রাজা বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বিক্রমাঙ্কদেব চরিত' রচিত হয়। তাঁহার অন্য গ্রন্থ চৌর পঞ্চাশিকা।

বিক্রমাদিত্য, প্রথম—তিনি বাদামীর পশ্চিম চালুক্য বংশজাত নরপতি দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র। তাঁহার পিতা পুলকেশীর মৃত্যুর পরে চোল, পল্লব, কেরল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্যের সামন্ত নরপতিরা বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। কিন্তু বিক্রমাদিত্য তাঁহাদের সকলকেই দমন করিয়াছিলেন। তিনি কালভ্রদিগকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। তিনি

৬৫৫—৬৮০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র বিনয়াদিত্য রাজা হইয়াছিলেন।

বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয়—তিনি বাদামীর পশ্চিম চালুক্যবংশীয় নরপতি বিজয়াদিত্যের পুত্র। তিনি হৈহয়-বংশীয়া চেদিরাজের হুলাক মহাদেবী ও ত্রৈলোক্য মহাদেবী নাম্নী দুই ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি অতি পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি নন্দীপট বর্ম্মা নামক পল্লব রাজকে পরাস্ত ও নিহত করিয়াছিলেন। তিনি তিন বার কাঞ্চীদেশ জয় করিয়া ছিলেন। এতদ্ব্যতীত পাণ্ড্য, চোল, কেরল ও কালভ্রদিগকে পরাস্ত করিয়া ছিলেন। তিনি ৭৩৩—৭৪৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কীর্ত্তিবর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন।

বিক্রমী—মির আবদুল রহমান উজিরাত খাঁর কবিজন সুলভ নাম। তিনি কাশিম খাঁর ভ্রাতা। তাঁহারই পৌত্র সমসমোদ্দল্লা শাহ নোয়াজ খাঁ। সম্রাট আলমগীর তাঁহাকে মালব ও বিজাপুরের দেওয়ানী পদ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি একজন কবিও ছিলেন। তাঁহার রচিত একখানা উৎকৃষ্ট দেওয়ান রহিয়াছে।

বিগ্রহ পাল, প্রথম—তিনি বঙ্গের পাল বংশীয় নরপতি দেব পালের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি হৈহয় বংশীয়া রাজকন্যা লজ্জা দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র নারায়ণ পাল রাজা হইয়াছিলেন।

বিগ্রহ পাল দ্বিতীয়—তিনি নাড়োলের চোহান বংশীয় চতুর্থ নরপতি। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীলক্ষ্মণের তিনি পুত্র ছিলেন।

বিগ্রহ রাজ, প্রথম--তিনি আজমীরের চৌহান বংশীয় তৃতীয় নরপতি। তাঁহার পিতার নাম জয়রাজ। তাঁহার পুত্র প্রথম চন্দ্ররাজ। খুব সম্ভব তিনি খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

বিগ্রহ রাজ, দ্বিতীয়—তিনি আজমীরের চৌহান বংশীয় একাদশ নরপতি সিংহ রাজের পুত্র। তিনি ৯৭৪ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় দুর্লভ রাজা হইয়াছিলেন।

বিগ্রহ রাজ, তৃতীয়—তিনি আজমীরের চৌহান বংশীয় ষোড়শ নরপতি বীর্য্যরামের অন্যতম পুত্র। তাঁহার ভ্রাতা উক্ত বংশের ১৭শ নরপতি তৃতীয় দুর্লভের পরে তিনি রাজা হইয়াছিলেন। খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

বিগ্রহ রাজ, চতুর্থ—তিনি আজমীরের চৌহান বংশীয় নরপতি অর্ণো রাজের পুত্র। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীঃ

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

বিগ্রহ স্তম্ভ—আসামের শালস্তম্ভ বংশীয় একজন নরপতি। শালস্তম্ভ দেখ।

বিঘ্নরাজ— একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। 'প্রশ্ন রহস্য', 'ভুবনদীপক বা গ্রহভাব প্রকাশক' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

বিচন—তিনি দেবগিরির যাদববংশীয় নরপতি দ্বিতীয় সিঙ্গনের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম চিক্ক এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মল্ল ও পুত্রের চৌণ্ডী থেট্টি নাম ছিল। বিচন কুহুণ্ডী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি রট্ট, নোয়ার, কদম্ব, গুত্ত, পাণ্ড্য ও হয়শালদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন।

বিচিত—একজন সিদ্ধাচার্য্য। গোরক্ষনান দেখ।

বিচিত্রবীর্য্য—তিনি উড়িষ্যার সোমবংশীয় নরপতি, মহাভব গুপ্ত জনমেজয়ের অন্যতম পুত্র। এই জনমেজয়ের পুত্র দীর্ঘরভস সূর্য্যবংশের এক শাখার রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র আপভার অপুত্রক গতায়ু হইলে, জনমেজয়ের অন্যতম পুত্র বিচিত্রবীর্য্য রাজা হইয়াছিলেন। বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র অভিমন্যু তৎপুত্র চণ্ডীহর, তৎপুত্র উদ্যোত কেশরী হয়। তাঁহারা পরপর রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশেষ বিবরণ অজ্ঞাত। মহাশিব তীবর দেখ।

—তিনি তানসেনের সমকালবর্ত্তী একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

বিজয়—(১) তিনি বুন্দেল খণ্ডের চান্দেল্ল বংশীয় দ্বিতীয় নরপতি বাক্‌পতির পরে রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার পরে রাহিল রাজা হইয়াছিলেন।

বিজয়—(২) তিনি মহীশূর রাজবংশের প্রথম রাজা। ১৩৯৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র হিরে বেট্টাদ চামরাজ ১৪২৩ খ্রীঃ অব্দে রাজা হইয়াছিলেন।

বিজয়কর্ণ—কান্যকুব্জরাজ জয়চন্দ্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর ভারতে মুসলমান রাজত্ব বিস্তৃত হয় নাই। গঙ্গার দক্ষিণ তীরেও কান্যকুব্জরাজের সামন্তগণ ১১৯৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত মুসলমানদের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। ১১৯৭ খ্রীঃ অব্দে চুণারের আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী বেলবরা গ্রামে কান্যকুব্জ রাজের সামন্ত বিজয়কর্ণ স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন।

বিজয়কুমার বসু—কলিকাতার একজন বিশিষ্ট নাগরিক ও কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে ১৮ই অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল 'একজিকিউ-

টিভ সার্ভিসের সভ্য অন্নদা প্রসাদ বসুর কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। প্রথমে তিনি ভবানীপুর সাউথ সুবার্ব্বন স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন এবং ঐ স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্স কলেজে প্রবিষ্ট হন। তথা হইতে ডিক্রী প্রাপ্ত হইয়া তিনি গণেশচন্দ্রের ফার্ম্মে (সলিসিটাস) শিক্ষানবিশী আরম্ভ করেন। তৎপর ১৯১১ খ্রীঃ অব্দে সলিসিটার হিসাবে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। প্রথমে জি, সি, চন্দ্রের এবং তৎপর তাঁহার পুত্র রাজচন্দ্র চন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনিই মেসাস জি, সি, চন্দ্র এণ্ড কোম্পানীর প্রধানতম অংশীদার হন। ১৯২১—২৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা কর্পারেশনের কমিশনাররূপে কার্য্য করেন। তৎপর ১৯২৫—২৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত কর্পোরেশনের কাউন্সিলার এবং ১৯২৭ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান ছিলেন। ১৯২৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতার মেয়র পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৩১ খ্রীঃ অব্দ হইতে তিনি সলিসিটর গণের পরীক্ষায় পরীক্ষকের কার্য্য করিতেছিলেন। ১৯৩১ সালে তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। একবার তিনি অস্থায়ীভাবে বাঙ্গালার সরকারের শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯৩২ খ্রীঃ অব্দে তিনি ইংরেজ সরকার কর্ত্তৃক সি-আই-ই (C.I.E.) উপাধি ভূষিত হন। তিনি এম্পায়ার পার্লামেণ্টারী কনফারেন্সের প্রতিনিধি হিসাবে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন এবং ঐ সময় ইউরোপের সমস্ত দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার রাজনীতিক্ষেত্রেও তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও অল্ডারম্যানদের মধ্যে তিনি বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি নরমপন্থী ছিলেন। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ৩১শে শ্রাবণ (১৬ই আগষ্ট, ১৯৩৭ খ্রীঃ অব্দ) বায়ান্ন বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—ভক্ত ধর্ম্মাচার্য্য ও ধর্ম্মপ্রচারক। ১২৪৮ বঙ্গাব্দের ১৯শে শ্রাবণ (১৮৪১ খ্রীঃ অব্দ ২রা আগষ্ট) নদীয়া জিলার অন্তর্গত দহকুল নামক গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম আনন্দকিশোর গোস্বামী এবং মাতার নাম স্বর্ণময়ী দেবী। গোস্বামী মহাশয়েরা মহাত্মা অদ্বৈতাচার্য্যের বংশসম্ভূত ছিলেন। আনন্দকিশোর পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান ধর্ম্মভীরুতা প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের ভোগ রাঁধিবার জন্য যে কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত

তিনি তাঁহার প্রত্যেকখানি পূর্ব্বেই গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া রাখিতেন। এইজন্য স্থানীয় লোকেরা তাঁহাকে লাকড়ী ধোয়া গোসাই বলিত। ভক্তি গ্রন্থ পাঠে তাঁহার একান্ত অনুরাগ ছিল। শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিতে করিতে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। তিনি সর্ব্বদাই গলদেশে শালগ্রামশীলা ধারণ করিয়া থাকিতেন। শান্তিপুর হইতে দণ্ডী দিয়া তিনি জগন্নাথ দর্শনে পুরী গমন করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণের মাতাও স্বামীর ন্যায় নানা সদ্‌গুণে ভূষিতা ছিলেন। জাতি নির্ব্বিশেষে দীন দুঃখীর অভাব মোচনে তিনি সর্ব্বদাই উদ্‌গ্রীব থাকিতেন। প্রত্যহ অন্ততঃ চার পাঁচজন পরিবারবহির্ভূত ব্যক্তিকে আহার করাইতে না পারিলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। দানে তিনি এরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন যে, কাহারও দুঃখ দেখিলে নিজের অভাব ভুলিয়া শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্তও দান করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না।

ছয় মাস বয়সেই বিজয়কৃষ্ণের অন্নারম্ভ ও নামকরণ হয়। আনন্দ কিশোরের অগ্রজ গোপীমাধব মৃত্যু-কালে অনুজকে অনুরোধ করিয়া যান যে, তিনি যেন তাঁহার একটী পুত্রকে বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে দত্তক প্রদান করেন তদনুসারে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য হস্তে বিজয়কৃষ্ণকে দত্তক প্রদান করা হয়। বিজয়কৃষ্ণের এক অগ্রজ ছিলেন। তাঁহার নাম ব্রজগোপাল। কয়েক বৎসরের মধ্যে আনন্দকৃষ্ণ ও তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃজায়া উভয়েই মৃত্যু-মুখে পতিত হওয়ায় বিধবা গর্ভধারিণীর উপরই তাঁহার লালন পালনের ভার পুন ন্যস্ত হইল।

শৈশবে শান্তিপুরের পাঠশালাতেই তাঁহার শিক্ষারম্ভ হয়। কিন্তু তাঁহার মাতা কখনও শান্তিপুরে কখনও বা পিত্রালয়ে থাকিতেন বলিয়া বিজয়কৃষ্ণের শিক্ষার বিশেষ ব্যাঘাত হইত। তিনি শৈশবাবধি অতিশয় চঞ্চল স্বভাব ও একগুঁয়ে ছিলেন। কিন্তু বাল-সুলভ চপলতার সহিত কোনওরূপ কপটতা বা অসদ্ বুদ্ধি ছিল না। মাতার পর-দুঃখকাতরতা শৈশবেই বিজয়কৃষ্ণের চরিত্রে পরিলক্ষিত হইত।

পাঠশালার শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি শান্তিপুরের গোবিন্দ গোস্বামীর টোলে প্রবেশ করেন। মেধাবী ও অধ্যয়নশীল ছাত্ররূপে তিনি গুরু মহা-শয়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন।

কৌলিক প্রথানুসারে বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার উপনয়ন ও দীক্ষা হয়। প্রচলিত ধর্ম্মে তাঁহার নিষ্ঠা ও গভীর বিশ্বাস ছিল। প্রতিদিন গভীর নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত পূজা-অর্চ্চনাদি করিতেন। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে টোলের পাঠ ত্যাগ করিয়া তিনি কলিকাতায়

আসিয়া সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ যখন কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন, তখন বাঙ্গালা দেশে যুগসন্ধি কাল। এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ, নীলকর হাঙ্গামা, সোমপ্রকাশ পত্রিকার অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্রের তিরোভাব ও মধুসূদনের সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা, হরিশচন্দ্রের পত্রিকা পরিচালনা, কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ প্রভৃতি বহু ঘটনায় ও আন্দোলনে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজ আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ। নূতন পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে শিক্ষিত যুবকগণ ধর্ম্মবিশ্বাসবিহীন উদ্ধত ও উন্মার্গগামী। এইরূপ যুগসন্ধিকালে যুবক বিজয়কৃষ্ণ অভিভাবকবিহীন হইয়া অধ্যয়নের জন্য কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। কৌলিক সংস্কার ও স্বাভাবিক ধর্ম্মনিষ্ঠা তাঁহাকে সেই ঘোর পরীক্ষার মধ্যে অতি প্রচলিত অনেক দুর্নীতির হইতে রক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু সঙ্গীগণের বিভিন্ন প্রকার ভাব ও ধর্ম্মবিশ্বাসহীনতা ক্রমে প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসে সংশয় এবং কৌলিক ক্রিয়া কলাপে অনাস্থা জন্মাইতেছিল।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের সময়ে তিনি হাবড়ার সন্নিকটস্থ সাঁতরাগাছী গ্রামে এক পরিচিতের গৃহে বাস করিতেন। তখন হাবড়ার পুল হয় নাই। প্রায় চার পাঁচ মাইল পথ পদব্রজে আসিয়া নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া তাঁহাকে কলেজে উপস্থিত হইতে হইত। এই সময়েই রামচন্দ্র ভাদুড়ীর কন্যা যোগমায়া দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। যোগমায়া দেবীর বয়স তখন ছয় বৎসর মাত্র।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতে করিতে সংস্কৃত হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়নে তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ জন্মে এবং তিনি বেদান্ত পাঠে ব্রতী হন। বেদান্ত চর্চ্চা করিতে করিতে অল্পদিন মধ্যেই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অনাস্থা জন্মিতে লাগিল। ক্রমে তিনি ঘোর বৈদান্তিক হইলেন। যিনি কিছুদিন পূর্ব্বে দেবার্চ্চনা না করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না, তিনিই এখন অদ্বৈতবাদের অহং ব্রহ্মবাদ গ্রহণ করিয়া পূজা অর্চ্চনার আবশ্যকতা অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইহার উপর কৌলিক ব্যবসায় গুরুগিরির উপরও তিনি ক্রমে বীতশ্রদ্ধ হইতেছিলেন। একবার এক শিষ্যের ভবনে উপস্থিত হইলে সেই পরিবারের এক বৃদ্ধা নারী তাঁহার পাদপূজান্তে অনুনয় করিয়া বলিতে থাকেন "প্রভো আমি অকুল ভবসাগরে নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছি; কিছুতেই উদ্ধার হইতে পারিতেছি না। আপনি দয়া

করিয়া আমায় উদ্ধার করুন।" এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে হঠাৎ তাঁহার মনে এইরূপ প্রশ্নের উদয় হইল "আমার কি এ ক্ষমতা আছে? আমি স্বয়ং কিরূপে পরিত্রাণ পাইব তাহার স্থিরতা নাই, অপরের পরিত্রাণ কিরূপে করিব।" এইরূপ সংশয়াত্মক প্রশ্ন উদিত হইবার পর গুরুগিরি ব্যবসায় তাঁহার নিকট কপটতা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এই সময়ে ঐ সকল কারণে কিছুকাল অতিশয় মানসিক অশান্তিতে তাঁহার কাল কাটিতেছিল।

কিছুকাল পরে তিনি কার্য্যব্যপদেশে বগুড়া গমন করেন। তথায় ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী কতিপয় ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি তাঁহাদের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। অতঃপর কলিকাতায় আসিয়া কিছুকাল তিনি অতিশয় আর্থিক কষ্ট ভোগ করেন। অনেক সুপ্রসিদ্ধ মহানুভব ব্যক্তির নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়া বিফল মনোরথ হন। ক্রমে নানা প্রতিকূল অবস্থায় যখন তাঁহার জীবন যাইতেছিল, তখন পূর্ব্বোল্লিখিত বগুড়ার ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণের পরামর্শের কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি একদিন ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দিতে গেলেন। সেইদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রাণস্পর্শী উপাসনা ও উপদেশ তাঁহার মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিল। তিনি ক্রমে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, শিবনাথ শাস্ত্রী সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা মিলিত হইয়া নিয়মিত ব্রাহ্ম সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দিতে যাইতেন। ক্রমে প্রচলিত প্রতিমা পূজা মূলক ধর্ম্মে তাঁহার আস্থা একেবারেই চলিয়া গেল এবং জাতিভেদের বিরুদ্ধে তাঁহার মনে প্রবল আপত্তি উপস্থিত হইল। শেষোক্ত বিষয়ে তাঁহার মনে এইরূপ গভীর বিরাগ উপস্থিত হইল যে, জাতিভেদের প্রতীকস্বরূপ উপবীত ধারণ করা তাঁহার নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

কৌলিক গুরুব্যবসায় পরিত্যাগ করাতে ভবিষ্যৎ জীবিকা সংস্থানের আশায় তিনি মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা বিভাগে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ পূর্ব্বাপরই অক্ষুণ্ণ ছিল। কিছুকাল পর বাল্যবন্ধু অঘোরনাথের সহিত একত্র হইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন। এক বৎসরের মধ্যেই উপবীত ধারণে জাতিভেদ সমর্থন করা হয়, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সম্পূর্ণভাবে উপবীত ত্যাগ করিলেন। এই ঘটনায় তাঁহার

উপর নানারূপ অত্যাচার হইতে থাকে। তাঁহার অগ্রজ ব্রজগোপাল গোস্বামী মহাশয় সমাজপতিদের উত্তেজনায় প্রকাশ্য সভা করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার এই কাজে দেশের লোক তাঁহার উপর এরূপ খড়্গহস্ত হইয়াছিল যে, পথে বাহির হইলে কেহ কেহ তাঁহাকে গালি দিত, কেহ ধূলি বা প্রস্তর নিক্ষেপ করিত কেহ বা পাগল মনে করিয়া গায়ে থুথু দিত। তাঁহার জননী তাঁহার এই কাজে মর্ম্মাহত হইয়া পুনরায় উপবীত ধারণের জন্য অনুনয় করিয়া ক্রন্দন করিতেন। একদিন জননীর শোকাকুল ক্রন্দন সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে মাতাকে বলিলেন "যদি আমাকে পুনর্ব্বার উপবীত ধারণ করিতে হয় তবে নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু হইবে। আমি আর এই অসত্য ধারণ করিতে পারিব না।" তখন তাঁহার জননী আর তাঁহাকে পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন না।

তখনকার দিনে উপবীত পরিত্যাগ ব্রাহ্মগণেরও অবশ্য করণীয় ছিল না। অনেক দেশে বিখ্যাত ব্রাহ্মও তখন উপবীত ধারণ করিয়া থাকিতেন। এরূপ অনেক লোকও তাঁহার কার্য্যের অনুমোদন করিলেন না। এইরূপে একাধারে ব্রাহ্ম ও প্রাচীন পন্থী, সকলেরই নিন্দা, তিরস্কার, গালি ও অত্যাচার তাঁহার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত এই সকল অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিলেন। "আমি সত্য হইতে ভ্রষ্ট হই নাই ; এই সত্য জয়যুক্ত হইবেই" এই দৃঢ় ও গভীর বিশ্বাসই তাঁহাকে সকল প্রকার অত্যাচার সহ্য করিতে বল প্রদান করিয়াছিল।

মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নের শেষ বর্ষে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রদের বিবাদ উপস্থিত হয়। কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের কোনও অন্যায় আচরণে তিনি ও আরও কয়েকজন ছাত্র কলেজ পরিত্যাগ করেন। পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যস্থতায় পুনরায় সদ্ভাব স্থাপিত হইলে অধিকাংশ ছাত্রই কলেজে ফিরিয়া গেলেন। গোস্বামী মহাশয় আর ফিরিলেন না। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যেই বিশেষভাবে নিজেকে নিযুক্ত করিলেন।

এই সময় হইতে প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল তিনি অসাধারণ উৎসাহ ও গভীর নিষ্ঠার সহিত দেশ বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। ১২৭০ বঙ্গাব্দে তিনি প্রথম ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যের পদে বৃত হন। প্রধানতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গেই তিনি প্রচারোদ্দেশে পর্য্যটন করেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল

রংপুর, সৈদপুর, কুচবিহার প্রভৃতি স্থানে তিনি একাধিকবার গমন করিয়াছিলেন। ঢাকাতে তিনি স্থানীয় প্রচারকরূপে কিছুকাল বাসও করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই এবং সকল সময়েই তাঁহার গভীর নিষ্ঠা, ঈশ্বরলাভের জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা, ব্রাহ্ম সমাজের উচ্চ আদর্শ দেশের সম্মুখে স্থাপন করিবার জন্য অদম্য উৎসাহ, সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার সমূলে বর্জ্জন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা, সকল সম্প্রদায়ের বিস্ময় ও প্রশংসার বিষয় হইয়াছিল। তখনকার দিনে মুষ্টিমেয় দুর দুরান্তরে বিক্ষিপ্ত ব্রাহ্মগণ তাঁহার সাহচর্য্য লাভে উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেন। কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী বাগআঁচড়া নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাইয়া গ্রামবাসীর অশেষ নৈতিক উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হন। বহু সময় তিনি ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য পদে বৃত ছিলেন। সে সময়ে তিনি ঢাকাতে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে বৃত ছিলেন। সেই সময়ে ঢাকাতে ব্রাহ্ম সমাজের অতুলনীয় প্রভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। সেই সময় ঢাকার প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ও জননায়ক আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয় ও গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয় উপবীত পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। গোবিন্দচন্দ্র তৎকালে ঢাকার উন্নতিশীল দলের মুখপাত্র ঢাকা প্রকাশ পত্রিকার অন্যতম পরিচালক ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশীয় যুবকগণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হওয়ায় হিন্দু সমাজপতিগণ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য ঢাকা প্রকাশের প্রতিযোগীরূপে হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিল। মধ্যে কিছুকাল ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সহযোগী হইয়া বহু স্থানে গমন করেন।

তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য অধিকাংশ সময় পূর্ব্ব বা উত্তরবঙ্গে হইলেও তিনি কয়েকবার বিহার ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশেও ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার সরল অমায়িক প্রকৃতি, অকপট অহৈতুক ভগবদ্ভক্তি, ব্রাহ্ম আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ জনসাধারণের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিত। মিথ্যার সহিত কোনওরূপ আপোষ করা তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল এবং যেখানে মনে করিতেন কোন ব্রাহ্মের কার্য্যদ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতেছে, তখনই সিংহ বিক্রমে তাহার প্রতিবাদ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের সহিত তাঁহার গভীর প্রেমের

যোগ ছিল এবং তাঁহারা উভয়ে একত্র হইয়া ব্রাহ্ম সমাজের এবং দেশের অনেক কল্যাণকর কার্য্য সম্পাদন করেন। কিন্তু সেই কেশবচন্দ্রেরই কোনও কোনও কার্য্যে ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতেছে বলিয়া যখন তিনি মনে করিয়াছিলেন, তখনই বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ না করিয়া সেই সকল কার্য্যের প্রবল প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। নিজ জন্মভূমি শান্তিপুর, ময়মনসিংহ, গয়া প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে তিনি ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রচারোদ্দেশে দেশ দেশান্তরে পর্য্যটনকালে কোনওরূপ শারীরিক কষ্টই তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতেন না। অনেক সময়ে অর্থাভাবে উপবাসে থাকিতে হইয়াছে, কখনও বা ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সমস্তদিন শুধু নদীর জল পান করিয়াই রহিয়াছেন; কিন্তু উৎসাহানল বিন্দুমাত্র প্রশমিত হয় নাই। প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে নিজের আবশ্যকে কখনও কাহারও অর্থ সাহায্য প্রার্থী হন নাই।

বাঙ্গালার ভক্তিতীর্থ নবদ্বীপের অধিবাসী এবং ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য্যের বংশধর ছিলেন তিনি। সুতরাং তাঁহার চরিত্রে ভক্তির প্রভাব যে বিশেষ দৃষ্ট হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। ব্রাহ্ম সমাজে বৈষ্ণব-প্রণালীর কীর্ত্তন ও সঙ্কীর্ত্তন প্রচলনে তিনি অতিশয় উৎসাহী ছিলেন। নবদ্বীপের চৈতন্যদাস বাবাজীর সহিত আলাপ করিয়া তিনি এবিষয়ে আরও উৎসাহীত হন। ধরিতে গেলে প্রধানতঃ তাঁহারই উৎসাহে ও পরামর্শে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজে সঙ্কীর্ত্তনের প্রচলন করিতে সম্মত হন। প্রচারোদ্দেশে তিনি যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই তাঁহার উদ্দীপনাময়ী সঙ্কীর্ত্তন পাষাণ প্রাণও দ্রব হইয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম দুইটি কীর্ত্তন গোস্বামী মহাশয়ের রচনা। নিজে যেরূপ কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে মাতোয়ারা হইতেন, অন্যের প্রাণস্পর্শী কীর্ত্তন শুনিয়াও তাঁহার সেইরূপ ভাবোন্মাদ হইত। তৎফলে তিনি অনেক সময়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ভূমিতে লুটাপুটি খাইতেন।

প্রচার ব্যপদেশে একবার তিনি লাহোরে গমন করেন। তথায় অবস্থান করিবার সময়ে এক রাত্রে তাঁহার একরূপ মানসিক বিকার উপস্থিত হয়। পাপচিন্তা একেবারে দূর করিতে পারেন নাই, এই অনুতাপে তিনি অতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং অনেক আত্মচিন্তা ও প্রার্থনার ফলেও তিনি আত্মহত্যা করিবার প্রয়াস পান। সুখের বিষয় যথাসময়ে এক সাধু অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ১২৭৭ সনে ইংলণ্ড হইতে ভারতে প্রত্যাগমন

করিয়া নানাবিধ সংস্কারমূলক এবং জনহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। গোস্বামী মহাশয় ঢাকা হইতে চলিয়া আসিয়া সেই সকল কার্য্যে কেশবচন্দ্রের একজন প্রধান সহযোগী হইলেন। নারীশিক্ষা প্রচার, সুরাপান নিবারণ, সুলভ সাহিত্য প্রচার, শ্রমজীবিদের শিক্ষা, দুঃস্থ ও পীড়িতদের মধ্যে ঔষধ বিতরণ প্রভৃতিই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। এই সকল কার্য্যে তাঁহাকে এত অধিক পরিশ্রম করিতে হইত যে তাহার ফলে অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়ে। এই সময়েই তাঁহার দুরারোগ্য হৃদরোগের সূত্রপাত হয় এবং জীবনের অবশিষ্টকাল তিনি ঐ রোগে বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে সাধু অঘোরনাথ প্রভৃতি কয়েকজন ধর্ম্মবন্ধুদের সহিত মিলিত হইয়া ভক্তিসাধন ব্রত গ্রহণ করেন এবং কয়েকটি বিশেষ নিয়মানুসারে ভক্তিসাধন ব্রত পালন করিতে থাকেন। এই ব্রত পালনের সময়ে কিছুকাল তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত বাগ আঁচড়া গ্রামে গমন পূর্ব্বক নির্জ্জন সাধন করেন।

কুচবিহারের নাবালক মহারাজার সহিত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহ লইয়া ব্রাহ্ম সমাজে যখন প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখন গোস্বামী মহাশয় ঐ বিবাহ সংঘটনের প্রবল প্রতিবাদ করেন। অতঃপর যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল তখন তিনি উহার উন্নতির জন্য প্রাণমন ঢালিয়া দিলেন। ১২৮৫ বঙ্গাব্দে তিনি পুনরায় ঢাকা গমন করিয়া পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যের পদ গ্রহণ করিলেন। যদিও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই গোস্বামী মহাশয় উহার একজন প্রচারকের কাজ করিয়া আসিতেছিলেন, তথাপি পরবৎসর তিনি, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন ও পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী বিধিপূর্ব্বক সমাজের প্রচারক পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার পর তিনি প্রধানতঃ কলিকাতাতেই থাকিয়া বাঙ্গালা ও বিহারের নানাস্থানে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। এই সকল সময়ের মধ্যেই তাঁহার বিশেষ চেষ্টায় গয়াতে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাধু সন্ন্যাসী ও উদাসীনদের প্রতি তাঁহার অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। এই শ্রদ্ধাবশতঃ তিনি সাধু সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইলেই তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করিতেন। একবার গয়াতে অবস্থান করিবার সময়ে অনেক ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও ধর্ম্মবিষয়ে অনেক আলাপ হয়। এই সকল আলাপ আলোচনার ফলে তাঁহার বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় এবং তিনি বহু-

কাল গয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে বিভিন্ন সাধুর সাহচর্য্যে যোগসাধন করেন। আকাশগঙ্গা পাহাড়ে অবস্থিত একজন সাধুর সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় হয় এবং তাঁহারা একত্রে কিছু-কাল নির্জ্জন সাধনও করেন।

গয়াতে সাধুসঙ্গ লাভের পর তাঁহার মনে কতকগুলি নূতন ভাবের সঞ্চার হয় এবং যোগ সাধনে তাঁহার বিশেষ আসক্তি জন্মে। তিনি যোগ সাধন বিষয়ে প্রশ্নোত্তর সম্বলিত একখানি পুস্তিকাও প্রকাশ করেন। কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে তখনও তাঁহার উৎসাহ পূর্ব্বেরই ন্যায় অদম্য ছিল। যোগসাধন গ্রহণের কিছুকাল পরে তিনি তাঁহার গুরুর অভিপ্রায় অনুসারে লোকদিগকে যোগসাধনে দীক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন। তখনও তিনি কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারকের এবং ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে, মন্ত্র দ্বারা শিষ্য গ্রহণ এবং তাঁহার আরও কোনও কোনও কাজ ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শের বিরোধী মনে হওয়ায় কোনও কোনও ব্রাহ্ম তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে থাকেন। গোস্বামী মহাশয় যখন বুঝিতে পারিলেন যে ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন প্রচলিত আদর্শের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হইতেছে এবং কোনও কোনও ব্রাহ্ম তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন, তখন তিনি স্বেচ্ছায় প্রচারকের পদ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার অনেক অনুরাগী বন্ধু একটা মীমাংসা করিবার চেষ্টা পান, কিন্তু সমাজের পরিচালকবর্গের সহিত মীমাংসা সম্ভব না হওয়ায় ১২৯৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি বাহ্যিক ভাবে ব্রাহ্ম সমাজের সহিত সংস্রব ছিন্ন করিতে লাগিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে প্রচারকের পদ পরিত্যাগ করিবার পর তিনি ঢাকাতে পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যের পদে মনোনীত হন এবং তথাকার প্রচার আশ্রমে বাস করিয়া নিয়মিতরূপে সামাজিক উপাসনা ও আলোচনা সহকারে প্রচার কার্য্য করিতে থাকেন। ঢাকায় তাঁহার প্রাণ-স্পর্শী উপাসনা ও বক্তৃতায় লোকের বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। মন্দিরে সামাজিক উপাসনায় দিন দিন উপাসক সংখ্যার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রচার আশ্রমেও সর্ব্বদা ব্যাকুল ধর্ম্মার্থীগণের সম্মেলন হইতে থাকে। ঢাকায় অবস্থান কালেও তিনি উৎসব ও প্রচার উপলক্ষে কাকিনা, ময়মনসিংহ, ধুবড়ী, বাঁকীপুর, বর্দ্ধমান, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। মধ্যে শরীর গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় এবং জননীর পীড়ার কথা শুনিয়া কিছু-কালের জন্য শান্তিপুরে গমন করেন।

কলিকাতায় যে আন্দোলনের জন্য তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারকের পদ ত্যাগ করেন, তাহার ঢেউ ঢাকাতেও পৌঁছে। তৎফলে তিনি স্বেচ্ছায় প্রচার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন। ঢাকাতে যাঁহাদের আন্দোলনের ফলে গোস্বামী মহাশয় প্রচার আশ্রম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম জনসাধারণকে এইরূপ বুঝাইবার প্রয়াস পান যে, গোস্বামী মহাশয়ের মত ব্রাহ্ম সমাজের মত হইতে স্বতন্ত্র। তিনি ইহা জানিতে পারিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মনস্বী রাজনারায়ণ বসুর মতামত জানিবার জন্য তাঁহাদিগকে পত্র লিখেন। তাঁহারা উভয়েই উত্তরে তাঁহাকে জানান যে গোস্বামী মহাশয়ের মতামত তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী বলিয়া মনে করেন না।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া তিনি কয়েক বৎসর ঢাকাতে অবস্থান করেন। প্রথমে কিছুকাল একরামপুরে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকিয়া গেণ্ডেরিয়া অঞ্চলে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ আশ্রমে তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্ম সাধনে নিরত থাকিতেন; কখনও কখনও প্রচারার্থ মফঃস্বলে গমন করিতেন। ব্রাহ্ম সাধারণের মধ্যে যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক যোগ ছিল, তাঁহাদের আহ্বানে সময়ে সময়ে উৎসবাদিতে নানাস্থানে গমন করিতেন। এই সময়ে ঢাকাতে অবস্থানকালেই তাঁহার একমাত্র পুত্র যোগজীবন ও কন্যা শান্তিসুধার বিবাহ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের তৎকালীন সম্পাদক রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয় পুত্রের বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং উভয় বিবাহই ১৮৭২ সনের তিন আইন মতে রেজিষ্টারী হয়। পুত্রের বিবাহের পর তিনি সপরিবারে বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন। সেইখানে তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিসূচিকা রোগে পরলোক গমন করেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি পত্নীর দাহাবশিষ্ট অস্থি গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে সমাধিস্থ করিয়া তদুপরি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

ইহার কিছুকাল পরে তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং কিছুকাল কলিকাতায় থাকিয়া তিনি হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় গমন করেন (১২৯১ বঙ্গাব্দ)। ইহার পরের দুই তিন বৎসর কখনও কলিকাতায় কখনও বা ঢাকায় অবস্থান করিয়া ধর্ম্মসাধন এবং শিষ্যদিগকে উপদেশ ও দীক্ষা প্রদান করিতেন। এই সময়ের মধ্যে ঢাকায় অবস্থানকালেই প্রায় দুইবৎসরকাল মৌনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঢাকাতেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তিনি

সন্ন্যাসাশ্রমের নিয়মে দানাদি সহকারে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন।

১৩০০ বঙ্গাব্দে তিনি পুনরায় এলাহাবাদের কুম্ভমেলায় গমন করেন। তাঁহার অকৃত্রিম ভগবদ্ভক্তি, প্রেমপূর্ণ ব্যবহার ও সরল শিশুসুলভ প্রকৃতিতে বহুলোক তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে আসিতেন। কয়েক-মাস কুম্ভ মেলায় দেশ দেশান্তর হইতে আগত সাধু ও ভক্তদিগের সাহচর্য্যে অবস্থান করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। এইবারে, নীলাচলে গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন বৎসরকাল, তিনি কলিকাতায় অবস্থান করেন। এই সময়ে মনস্বী সার গুরুদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়, সার রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিতেন। মধ্যে বৎসর খানেকের জন্য বৃন্দাবনে যাইয়া অবস্থান করেন। ১৩০২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে অসুস্থ হইয়া বৃন্দাবন হইতে পুনরায় কলি-কাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের শেষভাগে নীলাচলে উপস্থিত হইলেন।

পুরীতে, মহাপ্রয়াণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, তিনি একবৎসরের কিছু অধিককাল বাস করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে অনেকগুলি সংস্কার ও পরিবর্ত্তন সাধনে তিনি বিশেষ প্রয়াস পান। প্রধানতঃ তাঁহারই বিশেষ অনুপ্রেরণায়, শিষ্যগণ আন্দোলন করিয়া পুরীতে বানর বধ রহিত করান। পুরীতে তিনি যতদিন ছিলেন ততদিন মহাদান ব্রতের জন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন। এইভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া আব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলকে তাহা-দের আশার অতিরিক্ত দান করিয়া তিনি সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণ তাঁহার প্রতি ভক্তিবশতঃ যাহা কিছু তাঁহাকে দিতেন সবই তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে প্রার্থীকে দিয়া দিতেন। অথচ প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা হইতে আসিবে তাহা লইয়া কোনও দিন চিন্তিত হইতেন না। ভগবানের করুণার উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়া তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেন।

ধর্ম্মসাধনে কঠোর পরিশ্রম করিয়া পূর্ব্ব হইতে তাঁহার শরীর নিতান্ত ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। পুরীতে থাকিতে শরীর আরও অশক্ত হইয়া পড়ে। তথাপি নিয়মিত কার্য্যের বিরাম ছিল না। অধ্যয়ন, কীর্ত্তন, পাঠশ্রবণ, আলাপ-প্রসঙ্গ, আত্মীয় স্বজনের তত্ত্ব লওয়া, সাধন, জীব সেবা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য ঘড়ি ধরিয়া করা হইত। কিন্তু শরীর ক্রমশই অসমর্থ হইয়া পড়িতে-ছিল দেখিয়া শিষ্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কলিকাতায় আসিবার আয়ো-

জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠিল না। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ২২শে জ্যৈষ্ঠ সায়াহ্ন সময়ে আটান্ন বৎসর বয়সে, হিন্দুর পুণ্যতীর্থ নীলাচলে তিনি দেহরক্ষা করিলেন। তাঁহার আত্মীয় ও শিষ্যবর্গ নরেন্দ্র সরোবরের নিকটে ভূমি ক্রয় করিয়া তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিলেন। পরে সেই স্থানে তাঁহারই মর্য্যাদোচিত সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জীবনে অহেতুকী ভগবদ্ভক্তির উজ্জল নিদর্শন পাওয়া যায়। জীবে দয়া তাঁহার প্রকৃতির এক বিশেষ গুণ ছিল। পরবর্ত্তী জীবনে ব্রাহ্ম সমাজের সহিত সাক্ষাৎ যোগ ছিন্ন করিলেও কোনও দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম বা সমাজের বিরুদ্ধে কোনওরূপ বিরুদ্ধভাব মনে স্থান দেন নাই। ধর্ম্ম জীবনের প্রথমভাগে যে জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রভাব শেষকাল পর্য্যন্ত তাঁর জীবনে পরিলক্ষিত হইত। বৈষ্ণবোচিত বিনয়, সকল সম্প্রদায়ের সাধুসন্তদিগের প্রতি শ্রদ্ধা, ভগবদ্ নাম কীর্ত্তনে অদম্য উল্লাস, সর্ব্বভূতে প্রেম প্রদর্শন প্রভৃতি মহাপুরুষের জীবনোচিত সকল মহৎ গুণই তাঁহার জীবনে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইত।

বিজয় গুপ্ত—পদ্মপুরাণ রচয়িতা। তিনি বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ফুল্লশ্রী গ্রামে গুপ্ত উপাধিধারী বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পদ্মপুরাণ গ্রন্থে মনসা দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। মনসার গীতি রচয়িতাগণের মধ্যে তিনি একজন প্রাচীন কবি। কথিত আছে, মনসা দেবী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য এই পদ্মপুরাণ গ্রন্থ রচনা করেন। ১৪৮৪ খ্রীঃ অব্দের ২৬শে শ্রাবণ তিনি এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার অধিকাংশই পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত হইয়াছে। ফুল্লশ্রী গ্রামে একটি বৃহৎ বাটী অদ্যাপি বিজয় গুপ্তের বাটী বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। এই বাটীর নিকট একটী বৃহৎ সরোবর এবং উহার পূর্ব্ব পারে তাঁহার আরাধ্য মনসা দেবীর মন্দির অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত আছে। পর্ব্বোপলক্ষে এখনও এই স্থানে বহু লোক সমবেত হইয়া থাকে। তিনি গৌড়ের বাদশা হুসেন শাহের (১৪৯৪—১৫২৫ খ্রীঃ অব্দ) সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন।

বিজয়ঙ্কা—নবম খ্রীঃ অব্দের কবি রাজশেখর কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বিনী কার্ণাটী বিজয়ঙ্কা নামক এক মহিলা কবির নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

বিজয়চন্দ্র—তিনি কণৌজের রাঠের বংশীয় নরপতি গোবিন্দচন্দ্রের (১১১৫-১১৪৩ খ্রীঃ অব্দ) পুত্র। তিনি ১১৬৮-

৭০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র প্রসিদ্ধ জয়চন্দ্র শাহাবুদ্দিন ঘোরীকে ভারত বিজয়ের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন।

বিজয় চন্দ্র সিংহ— কলিকাতার প্রসিদ্ধ পরহিতব্রতী বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারী। তিনি মহাভারতের অনুবাদক মনস্বী কালীপ্রসন্ন সিংহের পোষ্য পুত্র ছিলেন। লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়াও তিনি আজীবন সরস্বতীর সেবায় ও পরের কল্যাণ সাধনে যত্নবান ছিলেন।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। নিজে বহু মূল্যবান্ পুস্তকাদি পাঠ করিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় যে গভীর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা খুব কম লোকই জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন। কেন না তিনি কখনও নাম কিনিবার জন্য ব্যস্ত হন নাই। নিজের গভীর চিন্তা, অধ্যয়ন ও গবেষণার দ্বারা তিনি বহু প্রচলিত অথচ অতি দুরারোগ্য রোগের যে চিকিৎসা প্রণালী উদ্ভাবন করেন, তাহা বস্তুতই বিস্ময়কর। উক্ত চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদ্ একাধিক বিশেষজ্ঞ বলিতেন, বিজয় বাবুর সাধনা প্রভাবে হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞান সমৃদ্ধ হইয়াছে। তিনি ঔষধ দিয়া ম্যাজিক দেখাইতেন। বহুমূত্র রোগের এলোপ্যাথিক ঔষধ ইনসুলিনের তিনি যে হোমিওপ্যাথী সংস্করণ আবিষ্কার করেন তদ্দ্বারা শত শত মুমূর্ষু রোগী প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছেন। নূতন চিকিৎসা প্রণালীর অথবা নূতন হোমিওপ্যাথী ঔষধ আবিষ্কার করিবার জন্য তিনি নিজের শরীরে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিতেন। অনেক খ্যাতনামা প্রবীণ চিকিৎসক ও দুরারোগ্য রোগী চিকিৎসা করিবার সময়ে, বিজয় বাবুর পরামর্শ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই চিকিৎসা করিয়া তিনি কখনও অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করেন নাই। অনেক অনুরোধ করিয়া সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিরাও চিকিৎসিত হইয়া তাঁহাকে অর্থ লওয়াইতে পারেন নাই। তাঁহার বাড়ীতে সমাগত রোগীদের ঔষধ বিতরণ করিবার জন্য দুইজন সহকারী নিযুক্ত থাকিতেন।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত বহুবিধ ভেষজকে বহু গবেষণায় তিনি হোমিওপ্যাথি ঔষধে পরিণত করেন। তাঁহার আবিষ্কৃত ঔষধ সমূহ পরীক্ষার জন্য তিনি সর্ব্বদা শরীর পবিত্র ও মন প্রফুল্ল রাখিতেন। কোনওরূপ মাদক দ্রব্য কখনও সেবন করেন নাই। হোমিওপ্যাথি ভিন্ন অপর কোনওপ্রকার ঔষধ কখনও সেবন করেন নাই। টীকা বা ইনজেকশন লন নাই। হোমিওপ্যাথি ঔষধ তাঁহার শরীরে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কাজ করিত। ভারতে তিনিই প্রথম উচ্চ 'ডাইলিউশনে'র

ঔষধ ব্যবহার করিয়া সাফল্য লাভ করেন। রসায়ণবিজ্ঞানেও তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল।. তাঁহার প্রাসাদোপম ভবনে তিনি নিজ বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য প্রকাণ্ড বিজ্ঞানাগার (Laboratory) সজ্জিত করিয়াছিলেন। প্রতিদিন প্রাতে পূজা অর্চ্চনার পর নিয়মিত তিন ঘণ্টাকাল রসায়ন চর্চ্চা করিতেন। তাঁহার সেই বীক্ষণাগার বহু মূল্যবান যন্ত্রাদিতে সমৃদ্ধ ছিল। পৃথিবীর যেখানে যা কিছু নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইত, তাহাই তিনি সাগ্রহে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বিজ্ঞানশালার পরিপূর্ণতা সাধন করিতেন। রঞ্জন রশ্মি (X-Ray) কলিকাতার মেডিকেল কলেজে ও তাঁহার বিজ্ঞানশালায় একই সময়ে আহৃত হইয়াছিল। কলিকাতার নাগরিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম নিজ গৃহে বেতার যন্ত্র স্থাপন করেন, নিজেও ঐরূপ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার জন্য বিশেষ গবেষণা করিয়া, অনেকটা সাফল্য লাভ করেন। তাঁহার আজীবন সংগৃহীত রাসায়নিক যন্ত্রপাতির সংখ্যা নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে। বহু যন্ত্র তিনি অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও বন্ধু বান্ধবকে উপহার দিয়াছিলেন। মৎস্যতত্ত্ব আলোচনার জন্য তিনি নিজের বাস ভবনে পুরু কাঁচের বৃহৎ জলাধার প্রস্তুত করাইয়া, বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে তাহাতে জলস্রোত আবর্ত্তিত ও প্রবাহিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই জলাধারে বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য সকল সন্তরণ করিত এবং তাহাতে অক্সিজেন গ্যাস সঞ্চালিত করিবার ব্যবস্থা ছিল। জ্যোতিষ শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং উহা সম্যকরূপে আলোচনা করিবার জন্য বাটীর ছাদে সু-উচ্চ লৌহমঞ্চ তৈয়ার করাইয়াছিলেন।

জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি প্রায় সকল প্রকার প্রধান প্রধান পত্রিকাদি ক্রয় করিতেন। তাঁহার নিজস্ব গ্রন্থাগার বহুমুল্য নানা বিষয়ক গ্রন্থে পূর্ণ ছিল। অসুস্থ শরীরেও তিনি অনেক রাত্র পর্য্যন্ত পড়াশুনা করিতেন। রসায়ন চর্চ্চা করিয়া তিনি কয়েকটী ঔষধ, কয়েক প্রকার শিশু-খাদ্য এবং তরল সাবান প্রস্তুত করেন। কিন্তু ব্যবসায় করিবার জন্য রসায়ন চর্চ্চা করিতেন না, জ্ঞানোপার্জ্জনের আনন্দেই করিতেন।

রোগবিজ্ঞান বিজ্ঞানেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। অনেক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক এ বিষয়ে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতেন। যক্ষ্মা চিকিৎসক রায় গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'এন্টি ম্যালেরিয়া সোসাইটী' (Anti Malaria Society) তাঁহার অর্থানুকুল্য লাভ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছিল।

পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনি

মহাভারতের একটি রাজসংস্করণ প্রকাশ করিয়া বিতরণ করেন। মনস্বী কালী-প্রসন্ন সিংহ প্রবর্ত্তিত সাপ্তাহিক হিন্দু পেট্রিয়টে (Hindu Patriot) পত্রিকার দৈন্য দশা উপস্থিত হইলে, তিনি উহার উন্নতি সাধনের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেন।

বহু ব্যবসায়ে তাঁহার অর্থ নিয়োজিত হইয়াছিল। কোনও কোনও ব্যবসায়ী তাঁহার অর্থ সাহায্যে উন্নতি লাভ করিয়া, পরে তাঁহাকে বিশেষরূপে বঞ্চনা করেন। কিন্তু তিনি তজ্জন্য কখনও ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন না। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের উপকারের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পাউরুটী প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার কারখানার পাউরুটী খাইবার লোভ লোকের যেরূপ ছিল, খাইয়া মূল্য দিবার ইচ্ছা তদনুরূপ না হওয়ায়, তিনি ঐ কারবার বন্ধ করিয়া দেন।

নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি যে সকল দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান এস্থলে সম্ভব নয়। বহু জনহিতকর কার্য্যের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সাক্ষাৎভাবে রাজনীতি চর্চ্চা না করিলেও, রাজনীতি আন্দোলনে তাহার বিরাগ ছিল না।

১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (মে, ১৯৩৩ খ্রীঃ অব্দ) এই বহু সদ্‌গুণান্বিত পুরুষ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার এক পুত্র ও এক (বিবাহিতা) কন্যা বর্ত্তমান ছিলেন।

বিজয়দেব সূরী—তিনি শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের একজন দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ হিরবিজয় স্যূরী ১৫২৬—১৫৯৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। হির বিজয় স্যূরীর শিষ্য বিজয় সেন স্যূরী এবং তৎশিষ্য বিজয়দেব স্যূরী ও বিজয়দেব স্যূরীর শিষ্য বিজয় সিংহ স্যূরী।

বিজয়ধ্বজ— তিনি একজন মাধ্ব সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট আচার্য্য। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'ভাগবত তাৎপর্য্য' অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা।

বিজয়নন্দী—তিনি একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার। ব্রহ্মগুপ্তের মতে লাটাচার্য্য, বশিষ্ঠ, বিজয়নন্দী ও আর্য্য ভটের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া শ্রীসেন রোমক সিদ্ধান্ত রচনা করিয়াছেন।

বিজয় নাথ—তিনি একজন জ্যোতিষী। 'গ্রন্থভাব' নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

বিজয়নারায়ণ—আসামের অন্তর্গত জয়ন্তিয়ার রাজা ছত্র সিংহের মৃত্যুর পরে ১৭৮০ খ্রীঃ অব্দে বিজয়নারায়ণ জয়ন্তিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এবং ১৭৯০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পরে রামসিংহ (২য়) ১৭৯০ হইতে ১৮৩২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

বিজয় পণ্ডিত—(১) 'বিজয় পাণ্ডব কথা' বা মহাভারত রচয়িতা। তিনি সাগর দীয়ার বন্দ্যবংশীয় ব্রাহ্মণকুলে খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন সপ্তদশ পুরুষ মহাভারতের অনুবাদকগণের মধ্যে তিনি একজন প্রাচীন কবি। তিনি অন্যান্য অনুবাদকগণের ন্যায় যথেচ্ছ স্বকল্পিত অদ্ভুত আখ্যায়িকাবলী সংযোজনা করিয়া মূল মহাভারতকে বিকৃত করেন নাই। 'বিজয় পাণ্ডব কথা' তিনি মূল সংস্কৃত মহাভারতের অনুসরণ করিয়া সংক্ষিপ্ত ভাবে পদ্যে রচনা করেন। গ্রন্থখানি আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক ও স্ত্রী পর্ব্ব এবং অভিষেক পর্ব্বাধ্যায় এই দ্বাদশ পর্ব্বে বিভক্ত। ইহাতে প্রায় ছয় হাজার শ্লোক আছে। তাঁহার রচিত বিজয় পাণ্ডব কথার সহিত অনেক স্থলে কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত মহাভারতের (পরাগলী মহাভারত) আক্ষরিক মিল দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বকালে মহাভারতাদি মুখে মুখে গীতাকারে বর্ণিত হইত এবং লেখক পরম্পরা ইচ্ছানুযায়ী সংযোগ বিয়োগ করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইতেন। সুতরাং গ্রন্থকারদিগের বিশুদ্ধ রচনার পরিবর্ত্তে নানারূপ মিশ্র রচনাই অধিক হইত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁহার 'বিজয়পাণ্ডব কথা' প্রকাশ করিয়াছে।

বিজয় পণ্ডিত—(২) বাদামীর চালুক্য বংশীয় নরপতি দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে (৭৩৩—৭৪৭ খ্রীঃ অব্দ) তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। নরপতি দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য জৈনধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন। তিনিই বিজয় পণ্ডিতকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। বিজয় পণ্ডিত অসাধারণ তার্কিক ছিলেন, সেজন্য একবাদী নামেও তিনি খ্যাত ছিলেন।

বিজয়পাণ্ড্য দেব—তিনি নোলাম্ব-বাড়ী নামক স্থানের রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজধানী উচ্চাঙ্গী নামক স্থানে ছিল। ১৩২৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি পশ্চিম চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় জগদেক মল্লের সামন্ত নরপতি ছিলেন।

বিজয়পাল—(১) মথুরার নিকটে মহাবলে ১১৫০ খ্রীঃ অব্দের রাজা বিজয় পালের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। জজ্জ নামে তাঁহার এক সামন্ত নরপতি ছিলেন। তিনি কোথাকার রাজা জানা যায় নাই।

বিজয়পাল—(২) তিনি বুন্দেলখণ্ডের চান্দেলবংশীয় নরপতি বিদ্যাধর দেবের পরে রাজা হইয়া ১০৩১—১০৫০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ তিনি বিদ্যাধরের পুত্র ছিলেন। তিনি ভুবনদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পরে তাঁহার পুত্র দেববর্ম্মা দেব রাজা হইয়াছিলেন।

বিজয়পাল—(৩) তিনি গিরনারের (জুনাগড়) চূড়াসমা বংশের রাজা হামীর দেবের পুত্র। তিনি ১০৫১ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। সম্ভবতঃ ১০৮৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তৃতীয় নবঘন দেব রাজা হইয়াছিলেন।

বিজয়পাল—(৪) তিনি কচ্ছোপঘাত বংশীয় নরপতি অভিমন্যুর পুত্র। তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র বিক্রমসিংহ ১০৮৮ খ্রীঃ অব্দে রাজা হইয়াছিলেন।

বিজয় পাল—(৫) কর্ণৌজের রাঠোর নরপতি বিজয় পাল দিল্লীশ্বর অনঙ্গ পালের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিয়া ছিলেন। তাঁহারই পুত্র দেশদ্রোহী জয়চাঁদ। জয়চাঁদ দেখ।

বিজয় পাল—(৬) চিতোরের রাণা বাপ্পারাওএর পৌত্র ও অশীদের পুত্র বিজয় পাল। তিনি দেবীবংশীয় যুদ্ধের হস্ত হইতে কাম্বোজ রাজ্য হস্তগত করিতে যাইয়া তৎকর্ত্তৃক নিহত হন।

বিজয় পাল—(৭) তিনি কর্ণৌজের ক্ষিতিপালের পুত্র। সীয়াডূণি শিলা-লিপি অনুসারে ক্ষিতিপালের পরে তাঁহার পুত্র দেবপাল রাজা হইয়া-ছিলেন। এই দেবপাল ও বিজয়পাল হয় একই ব্যক্তি, তাহা না হইলে দেব-পাল বিজয়পালের ভ্রাতা। গুর্জ্জর প্রতিহার বংশীয় মথনদেব তাঁহার সামন্ত *নরপতি ছিলেন।*

বিজয়বর্ম্মা—(১) তিনি ১১৭৫ খ্রীঃ অব্দে চম্বারাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে দিল্লীর পৃথ্বীরাজ মোহাম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া, তিনি স্বীয় রাজ্য সীমা বহুদূর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

বিজয়বর্ম্মা—(২) তিনি হাঙ্গনের কদম্ব বংশীয় নরপতি সত্যবর্ম্মার পরে রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার পরে প্রথম জয়বর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন। অনুমান খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে তিনি নরপতি ছিলেন।

বিজয়বর্ম্মা—(৩) তিনি গুজরাটের চালুক্য বংশের এক শাখার রাজা বুদ্ধ বর্ম্মণের পুত্র। তিনি ৬৪৩ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

বিজয়বাহু বিক্রমাদিত্য—তিনি বাণ বংশীয় সপ্তম নরপতি দ্বিতীয় বিজয়া-দিত্যের পুত্র। তিনি এই বংশের শেষ নরপতি। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিতেন।

বিজয় ভট্টারিকা—অথবা বিজয় মহাদেবী। চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় পুল-কেশীর অন্যতম পুত্র চন্দ্রাদিত্যের মহিষী বিজয় ভট্টারিকা ছিলেন। চন্দ্রাদিত্য সাবন্তবাড়ী নামক স্থানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

বিজয় মল্ল—তিনি কাশ্মীরের নরপতি কলসের তৃতীয় পুত্র। নরপতি কলসের *জ্যেষ্ঠ শ্রীহর্ষ পিতৃ বিরোধী ছিলেন।* সেজন্য কলস তাঁহাকে বন্দী করিয়া

রাখেন। কলসের মৃত্যুর পরে মন্দমতি মন্ত্রীরা কলসের অন্য পুত্র উৎকর্ষকে সিংহাসন প্রদান করেন। উৎকর্ষকে বিজয় মল্ল যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া হর্ষকে সিংহাসন প্রনান করিয়াছিলেন। হর্ষ ১০৮৯—১১০২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

বিজয় মাণিক্য—(১) শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড় এক সময়ে একটী স্বাধীন রাজ্য ছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজয়মাণিক্য গৌড়ের রাজা ছিলেন। ১১১৩ শকের (১১৯১ খ্রীঃ) তাঁহার নামীয় একটী মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার লক্ষ্মী ও শ্রী নামে দুই স্ত্রী ছিল। এতদ্ব্যতীত ইহার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না।

বিজয় মাণিক্য—(২) খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দির মধ্যভাগে আসামের অন্তর্গত জয়ন্তিয়া রাজ্যে বিজয়মাণিক্য রাজা ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে প্রথম বড় গোসাঞি এবং পরে প্রতাপ রায় রাজা হইয়া ছিলেন।

বিজয় মাণিক্য—(৩) ১৫৩৫ খ্রীঃ ত্রিপুরার সিংহাসনে ও বিজয়মাণিক্য নামে একজন রাজা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি অতিশয় পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। জয়ন্তিয়া রাজ তাঁহার সহিত মিত্রতা করিবার জন্য উপহারাদি পাঠাইয়া দেন। ত্রিপুরার রাজাও তাঁহাকে একটী হস্তী উপহার দেন কিন্তু মন্দমতি জয়ন্তিয়ারাজ, ত্রিপুরার রাজা ভীত হইয়া তাঁহাকে এই উপহার প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া প্রচার করেন। ত্রিপুরারাজ ইহা শুনিয়া তাঁহাকে অপদস্ত করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। জয়ন্তিয়া রাজ তখন অনন্যোপায় হইয়া কাছাড় রাজের শরণাপন্ন হন এবং তাঁহার মধ্যস্থতায় জয়ন্তিয়া রাজ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে যাত্রা রক্ষা পান। কামরূপ রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা ও সেনাপতি শুক্লধ্বজ জয়ন্তিয়া আক্রমণ করেন। বিজয়মাণিক্য তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া নিহত হন। তাঁহার পুত্র প্রতাপ রায় নরনারায়ণের বশ্যতা স্বীকার করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বিজয় রক্ষিত—একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকার। তিনি নিদান গ্রন্থের মধুকোশ নামে এক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি বাঢ়ীয় বৈদ্য সমাজের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা এখন রক্ষিত উপাধি ব্যবহার না করিয়া গুপ্ত উপাধি ব্যবহার করেন।

বিজয়রত্ন সেন, কবিরঞ্জন (মহামহোপাধ্যায়)—সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাঁচাদিয়া গ্রামে ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জগচ্চন্দ্র সেন।

জগচ্চন্দ্র সেন প্রথিতনামা কবিরাজ নীলাম্বর সেনের দ্বিতীয়া কন্যা ও সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কনিষ্ঠা ভগিনীর পাণি গ্রহণ করেন। নীলাম্বর সেনের চিকিৎসা নৈপুণ্য আজও পূর্ব্ব-বঙ্গে প্রবাদ বাক্যের ন্যায় চলিত আছে। পিতৃকুল মাতৃকুল হইতে আগত চিকিৎসা নৈপুণ্য বিজয়রত্নে পূর্ণ বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার মাতা স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা, স্বাবলম্বন প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিতা ছিলেন।

বিজয়রত্ন মাত্র দেড় বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। যথাকালে নিজ বাটী-স্থিত বাঙ্গালা বিদ্যালয়েই তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। দশ বৎসর বয়সে তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপর তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং মাতুলালয়ে থাকিয়া সংস্কৃত ভাষা ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পাঠে তিনি সর্ব্বদাই বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। নিজের পাঠ্য পুস্তকাদি এরূপ করিয়া রাখিতেন যে, অতি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্তও তাঁহার বর্ণপরিচয় পুস্তকখানি যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, বাদার্থ, সাংখ্য ও পাতঞ্জল প্রভৃতি অধ্যয়নকালে তিনি মাতুল গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও শিক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা করিতেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়নকালে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা মেডিকেল কলেজেও তাঁহার বন্ধুদিগের সাহায্যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যার কোনও কোনও অংশ বিশেষ-ভাবে আয়ত্ত করেন।

পাঠ্যাবস্থায়ই অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে বিক্রমপুরের বাড়াইল গ্রামের গুরুনাথ দাসগুপ্তের কন্যার সহিত বিজয়রত্নের বিবাহ হয়। এই পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ 'অষ্টাঙ্গ হৃদয়' নামক গ্রন্থ মূল ও টীকাসহ অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। পরবর্ত্তীকালে আচার্য্য মোক্ষমুলর (Max Mullr), মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহার ঐ অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সরকার তাঁহার এই কৃতিত্বে সন্তুষ্ট হইয়া গ্রন্থ প্রচারকল্পে সাহায্য করিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তৎপর তিনি কলিকাতা কুমারটুলীতে ঔষধালয় স্থাপন করেন। নানাপ্রকার কঠিন রোগ নির্ণয়ে তিনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃদযন্ত্র পরীক্ষা বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্‌ অনেক বিচক্ষণ চিকিৎসকের অপেক্ষাও অধিক হইয়াছিল। তাঁহার চিকিৎসা খ্যাতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল, এমন কি আমেরিকা, ইংলণ্ড

জার্ম্মানি প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশেও তাঁহার যশঃ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বহু রাজপরিবারে তিনি খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বরোদা, ইন্দোর, হাতোয়া, কাশী, অযোধ্যা, বর্দ্ধমান, দ্বারবঙ্গ, ত্রিপুরা, কাশ্মীর, নেপাল, নাটোর প্রভৃতি রাজ-পরিবারে তিনি সাদরে চিকিৎসার জন্য আহূত হইতেন।

১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসা নৈপুণ্যের জন্য সরকার কর্ত্তৃক মহামহোপাধ্যায় উপাধি ভূষিত হন।

তিনি দরিদ্রের উপকার করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না। বিনা পারি-শ্রমিকে চিকিৎসা করা তাঁহার একরূপ অভ্যাসের মত হইয়া গিয়াছিল। নিজের শরীর যখন রুগ্ন অথবা স্বাস্থ্য ভগ্ন তখনও, আত্মীয় স্বজনদের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও দরিদ্র রোগীর চিকিৎসার জন্য গমন করিতেন। শেষ জীবনে বেরিবেরি রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি নিতান্তই অশক্ত হইয়া পড়েন। খ্যাত নামা চিকিৎসকগণের চিকিৎসা, স্বাস্থ্য-কর স্থানে যাইয়া বিশ্রাম গ্রহণ, কিছুতেই আর নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল না। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে কলি-কাতা সহরে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

বিজয়রাজ—বঙ্গের পালবংশীয় নর-পতি রামপালের একজন সামন্ত নর-পতি। তিনি নিদ্রাবলী নামক স্থানের রাজা ছিলেন। এই নিদ্রাবলি বা নিদ্রাল রাজসাহী জিলার বোয়ালিয়া নগরের নয় মাইল পশ্চিমে ছিল। এখন তাহা পদ্মাগর্ভে। সামন্ত বিজয়রাজ, রামপালের বারেন্দ্র অভিযানে তাঁহার সহগামী হইয়াছিলেন। অনুমান ১০৫৭ —১০৮৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রামপালের রাজত্বকাল।

বিজয়রাম—তিনি ত্রিগর্ত্তদেশের রাজা ছিলেন। রাজা চন্দ্রভানের পরে ১৬৭০ খ্রীঃ অব্দে তিনি রাজা হইয়াছিলেন এবং ১৬৮৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে রাজা ভীম সিংহা-সনে আরোহণ করেন।

বিজয়রাম বিদ্যার্ণব—নদিয়া জিলার গৌতম গোত্র-সম্ভূত গণিতাচার্য্যের বংশ পাণ্ডিত্যের জন্য অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন। এই বংশে বিজয়রাম বিদ্যার্ণব প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্যাকরণ, ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে কৃতী ছিলেন।

বিজয় রায়—(১) তিনি ভাটিয়া নামক স্থানের রাজা ছিলেন। গজনীর সুলতান মামুদ ১০০৫ খ্রীঃ অব্দে ভাটিয়া রাজ্য আক্রমণ করেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তিন দিন প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য মুসলমান সৈন্য নিপাত

করিয়া চতুর্থ দিনে তাঁহারা পরাজিত হইলেন। রাজা বিজয় রায় পলায়ন করিলেন। কিন্তু শীঘ্রই শত্রু সৈন্য কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইলেন। পরিত্রাণের অন্য উপায় না থাকায়, তিনি আত্ম হত্যা করিয়া অপমানের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। ভাটিয়া বাসীরা সর্ব্বস্বান্ত হইল। বহু সংখ্যক নরনারী মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া প্রাণ বাঁচাইল।

বিজয় রায়—(২) যশল্মীরের অধিপতি তনুর মৃত্যুর পরে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয় রায় ৮১৪ খ্রীঃ অব্দে রাজা হইয়াছিলেন। ভট্টিরাজ বিজয়ের ঘোরতর শত্রু ছিল বারাহা ও লঙ্গাহা জাতি। তাহারা একবার ৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে ভট্টিরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু পরাজিত হইয়া তাহারা দূরে বিতাড়িত হইল। ভট্টিরাজ বিজয় রায়ের দেবরাজ নামে এক পুত্র ছিল। বারাহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া এই দেবরাজের সঙ্গে বারাহাপতির কন্যার বিবাহ স্থির করিল। বরপক্ষ কন্যাকর্ত্তার আলয়ে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা প্রতারণাপূর্ব্বক বড় পক্ষের বরের পিতা বিজয় রায় ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে হত্যা করিল। বর দেব রাজ অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ণ করিলেন। বলা বাহুল্য দেবরাজ এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।

বিজয়শঙ্কর—গুজরাটী গদ্য সাহিত্যের প্রথম শ্রেষ্ঠ লেখক নর্ম্মদা শঙ্কর। বিজয় শঙ্কর ও সবিতা নারায়ণ তাঁহার অনুসরণ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে গুজরাটী সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

বিজয় সিংহ—(১) তিনি যোধপুরের রাজা ভক্তসিংহের পুত্র। ১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পরে বিংশতি বৎসর বয়সে ১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি পিতৃ রাজ্যে অভিষিক্ত হন। তখন তাঁহার পিতৃব্য পুত্র রামসিংহ সিংহাসন লাভের জন্য মহারাট্টাদের সাহায্য গ্রহণ করেন। এই মহারাট্টদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। মহারাট্টারা এক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার দুর্গ অবরোধ করিয়া রাখে। কিন্তু ইহাতে বিজয় সিংহকে পরাজয় করা সম্ভব হইল না। তৎপরে রাজ্যের কোন কোন স্থান মহারাট্টাদেরে দিয়া তিনি সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। এই গোলমাল বিদুরিত হইতে না হইতেই দেবীসিংহ নামে তাঁহার এক পিতৃব্য কৌশলে সিংহাসন অধিকার করিতে উদ্যোগী হইলেন। ইহা বিজয়সিংহের ধাত্রী ভাই জগ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিয়া সৈন্ধবী সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। এই উপায়ে দেবীসিংহের কৌশল ব্যর্থ হইল বটে কিন্তু রাজ্যের অধিকাংশ সর্দ্দারেরা অতিশয় বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহী হইবার উদ্যোগ

করিলেন। এই সঙ্কটকালে বিজয়সিংহ গরধন নামক এক রাজপুতের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বলিতে গেলে তাঁহারই বুদ্ধি কৌশলে সর্দ্দারদের সহিত রাণা বিজয় সিংহের মনোমালিন্য সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল। কিন্তু যে কয়টী সর্ত্তে এই মিলন হইল, তাহার মধ্যে একটী সর্ত্ত ছিল যে পাট্টাবহিগুলি সর্দ্দারদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। ইহাদ্বারা রাজার স্বীয় প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইল। সেইজন্য তিনি মনে মনে অতিশয় জাতক্রোধ হইলেন। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য, তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার গুরু আত্মারাম পীড়িত হইয়া পরলোক গমন করিলেন। রাণা গুরুর শোকে অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছেনএই ভাব প্রকাশ করিলেন। গুরুর দেহ দুর্গের অভ্যন্তরেই সৎকার করা হইবে বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং সমস্ত সর্দ্দারদেরে তাহাতে যোগদান করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ইহার মধ্যে যে মন্দ অভিপ্রায় থাকিতে পারে ইহা কেহ কল্পনাও করে নাই। সর্দ্দারেরা গুরুর সৎকার উৎসবে দুর্গে প্রবেশ করিলে, অতি জঘন্য বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া তাঁহাদের অনেককে বধ করা হইল। কতক পলায়নপূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিল। রাণার পিতৃব্য দেবীসিংহ আত্মহত্যা করিলেন।

এই সময়ে দক্ষিণ ভারতে মহারাঠা জাতি প্রবল ছিল। তাঁহারা রাজপুতের শক্তি বৃদ্ধিতে বিচলিত হইলেন। মাধাজী সিন্ধিরা রাজপুতদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য অভিযান করিলেন। প্রথমেই মহারাঠা সেনাপতি যোধপুর আক্রমণ করিলেন। রাজপুত জাতির গৌরব রক্ষার্থ, জয়পুরের অধিপতি প্রতাপ সিংহ, যোধপুরপতি বিজয় সিংহের সহিত মিলিত হইলেন। টঙ্গা নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধে মহারাঠারা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। ইহার তিন বৎসর পরে সিন্ধিয়া বল সঞ্চয় করিয়া আবার যোধপুর আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে অম্বরপতি প্রতাপ সিংহ, বিজয়সিংহের সঙ্গে যোগ দিলেন না। অধিকন্তু এক গৃহ শত্রু দেখা দিল। সেই মন্দমতি বাহাদুর সিংহ বিজয় সিংহেরই একজন সর্দ্দার। এই সব কারণে পত্তনের যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় সিংহের পরাজয় হইল। সিন্ধিয়া রাজ জয়লাভ করিয়া আজমীঢ় অধিকার করিতে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। আজমীঢ় রক্ষা করা সম্ভবপর নহে মনে করিয়া, বিজয়সিংহ দুর্গাধ্যক্ষ দমরাজকে দুর্গ সমর্পণ করিতে লিখিলেন, তেজস্বী রাটোর বীর পরাজয়ের অপমান সহ্য করিতে কিছুতেই প্রস্তুত ছিলেন না। রাজার আদেশ অমান্য করাও সম্ভবপর নহে, সেইজন্য তিনি আত্মহত্যা করিয়া

এই অপমান অতিক্রম করিলেন। এইরূপে আজমীর মারবারের মুকুট হইতে খসিয়া পড়িল। এইখানেই দুর্গতির অবসান হইল না। রাজ মন্ত্রী-গণ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন। তাহার ফলে মৈরতা ক্ষেত্রে বিজয় সিংহ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। চির-কালের জন্য রাটোরের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। এখানেই রাণার দুঃখের অব সান হইল না। তিনি শেষ জীবনে অশোয়াল কুলের একটী সুন্দরী যুবতীর প্রতি অতিশয় আসক্ত হইয়া-ছিলেন। তাঁহার গর্ভজাত পুত্র নষ্ট হওয়ায় তিনি স্বীয় পৌত্র মানসিংহকে (গোমান সিংহের তনয়) সেই যুবতীর পোষ্য পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং সর্দ্দারদিগকে তাঁহাকেই ভাবী উত্তরাধিকারী স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। সর্দ্দারেরা দৃঢ়তার সহিত তাহা অস্বীকার করিলেন। এই পারি-বারিক গোলমালেই ১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জীবন লীলা শেষ হইল। মান সিংহ পিতামহের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন বটে; কিন্তু ১৮০৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতৃব্য পুত্র ভীম সিংহের মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভীমসিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

বিজয় সিংহ—(২) মেদিনীপুর জিলার শিলদা বা ঝাটিবনী প্রদেশে বিজয়সিংহ নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার বংশ পরিচয় সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। কথিত আছে এই প্রদেশে ডোমজাতীয় এক রাজা ছিলেন। এক্ষণে ডোমগড় নামক স্থানে যে মৃত্তিকাস্তূপ দৃষ্ট হয় তাহাই সেই রাজবংশের প্রাচীনগড়ের ধ্বংসাবশেষ। বিজয় সিংহের কোন পূর্ব্বপুরুষ ডোমরাজবংশের কোন রাজাকে পরাস্ত করিয়া এই রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। শিলদার দুই মাইল উত্তরে ওরগোঁদা গ্রামে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। রাজা মেদিনীমল্ল রায় দক্ষিণ দেশ হইতে আসিয়া ১৫২৪ খ্রীঃ অব্দে বিজয় সিংহকে পরাস্ত করিয়া ঝাটিবনী প্রদেশ অধিকার করেন।

বিজয়সিংহ—(৩) মধ্যপ্রদেশস্থ জব্বলপুরের কুলসুরীবংশীয় শেষ নৃপতি। বিজয়সিংহ পিতা জয়সিংহের পরে ১১৭৭—৮০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কোকল্ল্য (১ম) এই বংশের প্রথম রাজা। খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীতে পশ্চিম ভারতে এই বংশ গুজরাত ও অন্যান্য প্রদেশে রাজত্ব করিত। ইহাদেরও একটা অব্দ প্রচলিত ছিল। ২৪৮ খ্রীঃ অব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে এই অব্দ আরম্ভ হয়। কুলসুরী বংশের পূর্ব্বে জব্বলপুর গুপ্তবংশের করদরাজ্য ছিল। 'পরিব্রাজক মহারাজ' উপাধিধারী রাজা এই দেশ শাসন করিতেন। বিজয়াঘোগড়ের প্রান্তদেশে 'উচ্চকল্প মহারাজা' নামক এক বংশও জব্বল-

পুরের কিয়দংশ শাসন করিত। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে পরিব্রাজক মহারাজারা ও উচ্চকল্প মহারাজবংশ হীনবল হইয়া পড়েন। সেই সময় কুলস্থুরী বংশ এই রাজ্য অধিকার করিতে থাকে। কুলস্থুরী বংশের রাজধানী ত্রিতশৌর্য্য নামক স্থানে ছিল। উহার বর্ত্তমান অবস্থান নির্ণীত হয় নাই। শিলালিপির দ্বারা জানা যায় যে, ৯০০ খ্রীঃ অব্দে ত্রিপুরী নগরে তাঁহাদের রাজধানী স্থাপিত হয়। ৮৭৫ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে কুলস্থুরী বংশের ঐতিহাসিক তথ্য সঠিকভাবে কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না। এই সময়ের পর হইতে প্রায় তিনশত বৎসর কুলস্থুরীবংশ তেউরে (ত্রিপুরি) জব্বলপুর শাসন করেন। অনেকের মতে কুলস্থুরীবংশ মহাভারতোক্ত চেদীবংশের একটী শাখা।

বিজয়সিংহের সময়ের দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। একখানি কুলস্থুরী ৯৩২ অব্দ (১১৮০ খ্রীঃ) এবং অন্যটিতে ১২৫৩ বিক্রম সম্বত (১১৯৬ খ্রীঃ) আছে। বিজয়সিংহের পুত্রের নাম অজয়সিংহ দেব। কিন্তু তিনি রাজা হন নাই। বিজয়সিংহের পর কে রাজা হইয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে বিজয়সিংহের উর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ কর্ণদেবই প্রথমে ত্রিকলিঙ্গাধিপতি উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার পর হইতে বিজয়সিংহ পর্য্যন্ত সকলেই এই উপাধি গ্রহণ করিতেন। কিন্তু বিজয়সিংহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এত বড় রাজ্য হঠাৎ কিরূপে লুপ্ত হইল তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কটকের নরপতি দশম শতাব্দীতে ত্রিকলিঙ্গাধিপতি উপাধি গ্রহণ করেন। ইহাতে অনুমিত হয় যে ত্রিকলিঙ্গ (ত্রৈলিঙ্গ) কটকের রাজারাই শাসন করিতেন। কারণ তাঁহারা নিকটে ছিলেন। কর্ণদেব ব্যতীত ত্রিপুরির অন্য সকল নরপতিই উপাধি মাত্রই ধারণ করিতেন। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে কুলস্থুরী বংশের প্রাধান্য ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। মালবের পোমার, নাগোড়ের পরিহর, বুন্দেলখণ্ডের চন্দেলা ও দাক্ষিণাত্যের চালুক্যেরা ক্রমে কুলস্থুরীদের রাজ্য অধিকার করিয়া তাঁহাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। ক্রমে দুর্ব্বল দেখিয়া আরও কোন কোন রাজ্য হইতে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করা হইতেছিল। মোটের উপর কর্ণদেবের পর হইতেই এই রাজ্য ধ্বংসের পথে চলিয়াছিল এবং বিজয়সিংহদেবের পর এই রাজ্য একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। কোকল্লদেব (প্রথম) দেখ।

কুলস্থুরী রাজাদের বংশাবলী

(১) কোকল্ল প্রথম—৮৭৫ খ্রীঃ,

(২) মুগ্ধতুঙ্গ, প্রসিদ্ধ ধবল, কোকল্লের পুত্র ৯০০ খ্রীঃ, (৩) বালাহর্ষ, মুগ্ধতুঙ্গের পুত্র, (৪) কেয়ূরবর্ষ, যুবরাজদেব প্রথম, মুগ্ধতুঙ্গের পুত্র ও বালাহর্ষের ভ্রাতা ৯২৫ খ্রীঃ, (৫) লক্ষ্মণরাজ, কেয়ূরবর্ষের পুত্র ৯৫০ খ্রীঃ, (৬) শঙ্করগণ দেব, লক্ষ্মণ রাজের পুত্র ৯৭৫ খ্রীঃ, (৮) কোকল্লদেব দ্বিতীয়, যুবরাজদেব দ্বিতীয়ের পুত্র ১০০০ খ্রীঃ (৯) গাঙ্গেয়দেব বিক্রমাদিত্য কোকল্লদেব দ্বিতীয়ের পুত্র ১০৩৮ খ্রীঃ, (১০) কর্ণদেব, ৯ম-এর পুত্র ১০৪২ খ্রীঃ, (১১) যশঃকর্ণদেব, ১০ম-এর পুত্র ১১২২ খ্রীঃ, (১২) গয়াকর্ণদেব, ১১শ-এর পুত্র ১১৫১ খ্রীঃ, (১৩) নরসিংহদেব, ১২শ-এর পুত্র ১১৫৫ খ্রীঃ, (১৪) জয়সিংহদেব, ১২শ-এর পুত্র ১১৭৭ খ্রীঃ, (১৫) বিজয় সিংহ দেব, ১৪শ-এর পুত্র ১১৮০ খ্রীঃ অব্দ।

বিজয়সিংহ—(৪) শ্রীহট্টের একজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজা। শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত জগন্নাথ পুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। অতি প্রাচীনকালে কাত্যায়ন গোত্রীয় রমাকান্ত মিশ্র নামে রাঢ় দেশীয় একজন শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ নিজ দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীহট্টে আসিয়া উপস্থিত হন এবং এই জেলার নানা স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক অবশেষে লাউর পরগণাতে বাসস্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রের নাম কেশব মিশ্র ও রঘুপতি মিশ্র। অপর তিন জনের নাম অজ্ঞাত। প্রথম পুত্র কেশব মিশ্র শ্রীহট্টের ইটা পরগণার ব্রাহ্মণ রাজা সুবোধ নারায়ণের দুহিতাকে বিবাহ করিয়া ভূমিউড়া, পাঁচগাও প্রভৃতি পাঁচখানি গ্রাম যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং তথায় বাটী নির্ম্মাণ করিয়া ভট্টাচার্য্য উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক বাস করেন। বর্ত্তমান ভূমিউড়া প্রভৃতি গ্রামের ভট্টাচার্য্যগণ তাঁহারই বংশধর।

জ্যেষ্ঠ পুত্র কেশব মিশ্রের সানাইকুর নামক এক পুত্র ছিল। সানাইকুরের পুত্র প্রজাপতি, তদীয় পুত্র দুর্ব্বার খাঁ, তদীয় পুত্র রাজ পণ্ডিত, রাজপণ্ডিতের জয়সিংহ ও বিজয়সিংহ নামে দুই পুত্র জন্মে। এই বিজয় সিংহই মুরশিদাবাদের নবাব কর্ত্তৃক 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া রাজা বিজয় সিংহ নামে অভিহিত হন।

কেশব মিশ্রের অজ্ঞাতনামা তিন ভ্রাতার মধ্যে একজন শ্রীহট্টেরই কসবা বানিয়াচুঙ্গে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশে গোবিন্দচন্দ্র ঠাকুর বর্ত্তমান ছিলেন। এই গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুরই পরবর্ত্তীকালে কোন অন্যায় আচরণের জন্য মুরশিদাবাদের নবাবের রোষানলে পতিত হন। নবাব তাঁহার জাতি নাশ করিয়া তাঁহাকে মুসলমান হইতে বাধ্য করিলেন এবং হবিব খাঁ

নাম প্রদান করেন। তদবধি তাঁহার নাম গোবিন্দচন্দ্র ওরফে হব্বি খাঁ হইয়াছিল।

জয়সিংহ, বিজয়সিংহ এবং গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুরের একত্রে এজমালী জমিদারী ছিল। তাঁহাদের এই জমিদারী পূর্ব্ব পশ্চিমে পঞ্চাশ মাইল এবং উত্তর দক্ষিণে ষাট মাইল বিস্তৃত ছিল। এই জমিদারী মুরশিদাবাদ নবাবের করদ রাজ্য ছিল। কয়েক বৎসর পর জয়সিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, জয়সিংহের অজ্ঞাতসারে হব্বি খাঁ মুরশিদাবাদে যাইয়া নবাবের তুষ্টিবিধান পূর্ব্বক দেওয়ান হব্বি খাঁ উপাধি ও সমুদয় জমিদারীর সনদ প্রাপ্ত হন। তৎপর দেশে আসিয়া সমুদয় জমিদারী অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। অপরদিকে বিজয়সিংহ, হব্বি খাঁর এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানিতে পারিয়া, নবাব সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি হব্বি খাঁর বিশ্বাসঘাতকতার কথা জ্ঞাপন করিলে, নবাব হব্বি খাঁর চতুরতা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার সনদ রহিত করিয়া বিজয় সিংহকে রাজা উপাধি ও তাম্রখণ্ডে সমুদয় জমিদারীর সনদ প্রদান করেন। তৎপর রাজা বিজয়সিংহ মুরশিদাবাদ হইতে প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত জমিদারী অধিকার করিতে আরম্ভ করেন। অপরদিকে হব্বি খাঁ তাঁহাকে রাজ্য অধিকারে যথাসাধ্য বাধা দিতে লাগিলেন। ইহাতে অচিরেই উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। কিন্তু কেহই জয়ী হইতে পারিতেছেন না দেখিয়া, আপোশে সীমা নির্দ্ধারণের জন্য উভয় পক্ষ হইতে একটী তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইল। এই আপোশের সর্ত্ত এইরূপ ছিল যে, নির্দ্ধারিত তারিখ প্রাতঃকালে উভয়ই উভয়ের বাড়ী হইতে অশ্বারোহণে যাত্রা করিয়া, যে স্থানে আসিয়া মিলিত হইবেন, সেই স্থানই উভয় রাজ্যের সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে। তদনুযায়ী রাজা বিজয়সিংহ নির্দ্ধারিত দিনে প্রত্যুষে স্বীয় রাজধানী হইতে অশ্বারোহণে যাত্রা করিয়া কসবা বানিয়াচুঙ্গের নিকটবর্ত্তী সকুটী নদীর তীরে আসিলে, হব্বি খাঁর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই স্থানে সাক্ষাতের ফলে রাজ্যের বার আনা অংশই বিজয় সিংহের অধিকারে চলিয়া যায় দেখিয়া, হব্বি খাঁ এইরূপ সীমা নির্দ্ধারণে অস্বীকৃত হন এবং অন্যরূপ আপোশের প্রস্তাব করেন। বিজয় সিংহ তাঁহার অন্যরূপ আপোশের প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক নিজ রাজধানীতে চলিয়া যান। ইহাতে উভয়ের বিরোধ প্রবলতর হইয়া উঠিল। এইভাবে দীর্ঘকাল তাঁহাদের বিবাদ চলিবার পর রাজা সুবোধ নারায়ণ প্রভৃতি নিরপেক্ষ

জমিদারগণ মধ্যবর্ত্তী হইয়া হবিব খাঁকে ষোল আনা সম্পত্তির দশ আনা ও বিজয় সিংহকে ছয় আনা অংশ দিয়া উভয়ের বিবাদের নিষ্পত্তি করেন। সেই সময় হইতে খালিশা ও মুজরাইর সৃষ্টি হয়। দেওয়ান হবিব খাঁর দশ আনা হিস্যা মুজরাইর ও বিজয় সিংহের ছয় আনা হিস্যা খালিশা নামে অভিহিত হয়।

প্রবাদ আছে, বিজয়সিংহ রাজা হওয়ার পর প্রতিদিন এক একটী নূতন পুষ্করিণী খনন করাইয়া সদ্য উত্থিত জল দ্বারা স্নান করিতেন। সাত শত ঘর ব্রাহ্মণের প্রতিদিনের আহার প্রদান করিতেন। ঐ সকল প্রত্যেক ব্রাহ্মণ পরিবারের জন্য তিনি এক একটী বাড়ী ও এক একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ সকল বাড়ী ও পুষ্করিণী এখনও জগন্নাথপুরে রাজবাড়ীর নিকটবর্ত্তী স্থানে বিদ্যমান আছে। এতদ্ব্যতীত রাজা বিজয় সিংহের কৃত আরও অনেক বৃহৎ বৃহৎ সরোবর বর্ত্তমান আছে। তাঁহার আদি পুরুষ রমাকান্ত মিশ্র লাউরে যে বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, উহা এখনও বর্ত্তমান আছে এবং বিজয় সিংহের কাছারী বলিয়া বিখ্যাত। অন্যত্রও তাঁহার কাছারী বলিয়া বিখ্যাত প্রকাণ্ড বাড়ী বিদ্যমান আছে। রাজা বিজয়সিংহের বংশধরেরা চৌধুরী উপাধি ধারণপূর্ব্বক জগন্নাথপুর গ্রামে রাজবাড়ীতেই বাস করিতেছেন। হবিব খাঁ দেখ।

বিজয় সিংহ—(৪) তিনি জয়পুরের রাজা শোবে জয়সিংহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। জয়সিংহ ১৬৯৯—১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। বিজয় সিংহের জননী কীচিবারা নগরের রাজার কন্যা। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, দিল্লীর সম্রাটকে হস্তগত করিয়া অম্বরের সিংহাসনে স্বীয় পুত্র বিজয় সিংহকে স্থাপন করেন। তদর্থে বিজয় সিংহের জননী বিজয় সিংহের হস্তে প্রচুর অর্থসমর্পণপূর্ব্বক বলিলেন যে, এই অর্থ দ্বারা দিল্লীর সম্রাটের মন্ত্রী নবাব কমর উদ্দীনকে হস্তগতকরিয়া, অম্বরের (জয়পুরের) সিংহাসন লাভের চেষ্টা করেন। বিজয় সিংহ নবাব কমক উদ্দিনের নিকট গমনপূর্ব্বক স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। মন্ত্রী অর্থ পাইয়া বুসা নামক জনপদের স্বামীত্ব তাঁহাকে রাজা জয়সিংহ হইতে লওয়াইয়া দিলেন। কিন্তু বিজয়ের মাতা ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। বিজয় সিংহ সম্রাটকে পাঁচ কোটি টাকা অর্পণপূর্ব্বক অম্বর রাজ্য অধিকার করিতে অভিলাষী হইলেন। এই সংবাদ এক সর্দ্দার অবগত হইয়া রাজা জয়সিংহকে জানাইলেন। রাজা তখন সমস্ত সর্দ্দারদিগকে আহ্বান করিয়া এই ঘটনা জ্ঞাপন করিলেন। সর্দ্দারেরা তাঁহাকে আশ্বস্ত

করিয়া উপায় নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। জয়সিংহ বুসা নগরের জায়গীর বিজয় সিংহকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই স্থানে বিজয়ের অভিষেক উপলক্ষে সকলে মিলিত হইলেন। উভয় ভ্রাতার মিলন হইল। কিন্তু মন্ত্রীর বুদ্ধি কৌশলে বিজয় সিংহ বন্দী হইলেন। দিল্লীর মন্ত্রী নবাব কমর উদ্দিনের ছয় সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য বিজয় সিংহের সম-ভিব্যাহারী ছিল। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিল বিজয় সিংহ কোথায়? জয়সিংহ তাহাদিগকে উত্তর করিলেন—তাহা তোমাদের জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাও, নতুবা তোমাদের ঘোটকগুলি লইব। অগত্যা তাঁহারা সে স্থান ত্যাগ করিল। বিজয়সিংহ বন্দী হওয়ার পর হইতে তাঁহার বিষয় আর কিছু শুনা যায় নাই।

বিজয় সিংহ—(৬) তিনি একজন জৈন গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—'সঙ্গয়িণি বয়ণ'। এই আচার্য্য ১১৬১ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

বিজয় সিংহ—(৭) তিনি মারবার বা উদয়পুরের রাণা। তিনি মালবের উদয়াদিত্যের কন্যা শ্যামলা দেবীকে বিবাহ করেন। বিজয় সিংহের কন্যা অলহণ দেবীকে চেদী দেশের নরপতি গয়কর্ণদেব ১১৫১ খ্রীঃ অব্দে বিবাহ করেন

বিজয় সিংহ—(৮) তিনি চেদি দেশের অধিপতি জয়সিংহ দেবের তনয়। তিনি ১১৮০ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১১৯৫ খ্রীঃ অব্দের তাঁহার একখানা দানপত্র পাওয়া গিয়াছে।

বিজয়সিংহ—(৯) সিংহলের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, বঙ্গদেশে সিংহবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিজয়সিংহ সাত শত অনুচরসহ সমুদ্রপথে লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হইয়া তথাকার রাজাকে পরাস্ত করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। বিজয়সিংহের নাম হইতেই লঙ্কাদ্বীপের নাম সিংহল হয়। এই ঘটনার মূলে কতটুকু সত্য আছে বলা যায় না। তবে ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বঙ্গদেশের আর্য্য সভ্যতা খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীরও পূর্ব্ব-বর্ত্তী।

বিজয়সিংহ—(১০) তিনি বাঙ্গালার নবাব সরফরাজ খাঁর একজন সেনা-পতি। তিনি নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর সহিত যুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। আলীবর্দ্দী খাঁকে বিজয় সিংহ ভীষণভাবে আক্রমণ করেন। তিনি প্রাণনাশক বল্লমের আঘাতে আলীবর্দ্দী খাঁকে হস্তী পৃষ্ঠ হইতে ভূতল-শায়ী করিয়াছিলেন। এমন সময়ে তোপখানার দারোগা দাওয়ার খাঁ বিজয়সিংহকে পিস্তলের আঘাতে নিহত করেন। তৎপরে তাঁহার নবম

পুত্র জালিম সিংহ, রাজপুত জাতিসুলভ বীরত্বের সহিত তরবারী গ্রহণপূর্ব্বক পিতাকে রক্ষা করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। চারিদিক হইতে শত্রু সৈন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিল। নবাব আলী-বর্দ্দী খাঁ বিজয়সিংহের এই বালক পুত্রের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া, এই বালককে বধ করিতে সৈন্যদিগকে নিষেধ করিলেন। অধিকন্তু তাঁহার পিতার মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। বীরই বীরত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করে।

বিজয় সিংহ গণি—তিনি ভাসর্বজ্ঞ প্রণীত 'ন্যায়সার' গ্রন্থের 'ন্যায়সার টীকা' নামে এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার বই বিকানীর লাইব্রেরীতে আছে।

বিজয়সিংহ বাহাদুর—মধ্য ভারত বর্ষের বিচলি নামক স্থানের রাজা। ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতা নিজাম সিংহের মৃত্যুর পরে তিনি রাজা হন। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তাঁহার পিতা নিজাম সিংহ ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করিয়া বিশেষ প্রশংসা পত্র পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজ উপাধি বংশানুক্রমিক। তাঁহারা ৯২১ খ্রীঃ অব্দে গোণ্ডার অধিপতির সামন্ত নরপতি ছিলেন। বিজয় সিংহ বাহাদুরের পরে তাঁহার পুত্র লালসাহেব রাজা হইয়াছেন।

বিজয় সিংহ সূরী—(১) তিনি এক জন জৈন দার্শনিক পণ্ডিত। হির বিজয় সূরীর (১৫২৩—১৫৯৫ খ্রীঃ) শিষ্য বিজয় সেন সূরী, তৎশিষ্য বিজয়দেব সূরী, তৎশিষ্য বিজয় সিংহ সূরী।

বিজয় সিংহ সূরী—(২) তিনি এক জন জৈন আচার্য্য। তিনি সম্বত ১৩৬৫ সালে (খ্রীঃ ১৩০৯) 'ভুবন সুন্দরী কথা' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

বিজয় সূরী—'প্রশ্ন রত্নসাগর' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

বিজয় সেন—(১) তিনি রাঢ়ের সেন-বংশীয় নরপতি সামন্ত সেনের পৌত্র ও হেমন্ত সেনের পুত্র। বিজয় সেনই সেনরাজবংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি ছিলেন। বিজয় সেন প্রথমে রাঢ় দেশের সামান্য একটী অংশের এবং পরে সমগ্র রাঢ়ের অধিপতি হইয়াছিলেন। মদন পালের অষ্টম রাজ্যাঙ্কের পর বোধ হয় সমস্ত বরেন্দ্র ভূমি বিজয় সেনের করতলগত হইয়াছিল। তিনি কামরূপপতিকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি কলিঙ্গ দেশ জয় করেন। তিনি মিথিলার রাজা নান্যদেব এবং বীর, রাঘব ও বর্দ্ধন নামক রাজগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনি শূরবংশের দুহিতা বিলাস দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে বল্লাল সেনের জন্ম হয়। বিজয় সেন প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন।

বিজয় সেন—(২) তিনি মিবারের প্রতিষ্ঠাতা কণক সেনের প্রপৌত্র। তিনি বিজয়পুর নগর (বর্ত্তমান ধোলকা,) বল্লভীপুর ও বিদর্ভনগর প্রতিষ্ঠা করেন। বিদেশীদিগের আক্রমণে প্রাচীন বল্লভীপুর বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

বিজয় সেন—(৩) তিনি পশ্চিম ক্ষত্রপ নরপতি দামসেনের পুত্র। সম্ভবতঃ ২৩৮—২৫০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে ঈশ্বর দত্ত রাজা হইয়াছিলেন।

বিজয় সেন সূরী—তিনি একজন জৈন দার্শনিক পণ্ডিত। বিজয় সিংহ সূরী দেখ।

বিজয় স্তম্ভ—আসাম প্রদেশের শাল-স্তম্ভ বংশীয় একজন নরপতি। শাল স্তম্ভ দেখ।

বিজয়াদিত্য (প্রথম)—তিনি বাণ-বংশীয় নরপতি জয়নন্দীবর্ম্মার পুত্র। তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র মল্লদেব রাজা হইয়াছিলেন।

বিজয়াদিত্য (দ্বিতীয়)—তিনি বাণ-বংশীয় সপ্তম নরপতি। তাঁহার অপর নাম পুগলবিপ্পবর গণ্ড এবং তাঁহার পিতার নাম বিক্রমাদিত্য (প্রথম)।

বিজয়াদিত্য (প্রথম)— পূর্ব্বচালুক্য-বংশীয় নরপতি তৃতীয় বিষ্ণুবর্দ্ধনের পুত্র। তাঁহার অন্য নাম ভট্টারক। সম্ভবতঃ তিনি ৭৪৬—৭৬৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার তনয় চতুর্থ বিষ্ণুবর্দ্ধন রাজা হইয়া ৭৯৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বিজয়াদিত্য (দ্বিতীয়)—অন্য নাম নরেন্দ্র মৃগরাজ শ্রীত্রিভুবনাঙ্কুশ। তিনি পূর্ব্ব চালুক্যবংশীয় নরপতি চতুর্থ বিষ্ণু-বর্দ্ধনের পুত্র এবং ৭৯৯—৮৪৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র পঞ্চম বিষ্ণুবর্দ্ধন মাত্র দেড় বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বিজয়াদিত্য একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট ছিলেন। তিনি দ্বাদশ বৎসরে গঙ্গ (বেরগাম ও ধনবাড় জিলার মহা-মণ্ডলেশ্বর) ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের সঙ্গে একশত আটটী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া-ছিলেন। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা তৃতীয় গোবিন্দ ও প্রথম অমোঘবর্ষের রাজত্বকালে এই সকল যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। তিনি ভেঙ্গী রাজ্যেরও অধিপতি ছিলেন।

বিজয়াদিত্য (তৃতীয়)—তাঁহার অপর নাম গুণক। তিনি পূর্ব্ব চালুক্য বংশজ পঞ্চম বিষ্ণুবর্দ্ধনের পুত্র। তিনি ৮৪৪—৮৮৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি একজন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। গঙ্গবংশীয় নরপতিদিগকে ও মঙ্গীদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূট বংশীয় দ্বিতীয় কৃষ্ণকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজধানী দগ্ধ করিয়া ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রথম চালুক্য ভীম রাজা হইয়াছিলেন।

বিজয়াদিত্য, চতুর্থ—তাঁহার অন্য নাম কোল্লবীগণ্ড এবং তাঁহার পিতা প্রথম চালুক্য ভীম। বিজয়াদিত্যের মহিষীর নাম মেলাম্বা। তিনি মাত্র ছয়মাস রাজত্ব করিয়া ৩১৮ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র প্রথম অম্ম বা ষষ্ঠ বিষ্ণুবর্দ্ধন রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্ব চালুক্য বংশীয় নরপতি ছিলেন।

বিজয়াদিত্য, পঞ্চম—অন্য নাম বেত। তিনি পূর্ব্বচালুক্যবংশীয় নরপতি প্রথম অম্মের বা ষষ্ঠ বিষ্ণুবর্দ্ধনের পুত্র। তিনি পনর দিন মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি যুধামল্লের পুত্র তাড়পকর্ত্তৃক ৯২৫ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনচ্যুত হন। যুধামল্ল তৃতীয় বিজয়াদিত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। এক মাস রাজত্বের পর তাড়পও প্রথম চালুক্য ভীমের অন্যতম পুত্র বিক্রমাদিত্যকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। এই বিজয়াদিত্য একটী পৃথক রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। কয়েক শতাব্দী পরে তাঁহার বংশধরেরা বেঙ্গির সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

বিজয়াদিত্য, ষষ্ঠ--তিনি দ্বিতীয় অম্ম নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি পূর্ব্ব চালুক্যবংশীয় নরপতি দ্বিতীয় চালুক্য ভীমের পুত্র। তিনি ৯৪৫—৯৭০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি রাজকুমার কামার কন্যা নায়মাম্বাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পট্টবর্দ্ধিনী বংশীয় পদ্মবার পুত্র বল্লাল দেব বেলাভট (অন্য নাম বোড্ডিয়) তাঁহার অন্যতম সামন্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পরে তাঁহার ভ্রাতা দানার্ণব রাজা হইয়াছিলেন।

বিজয়াদিত্য প্রথম—অন্য নাম কণ্ঠিকা বেত। তিনি পূর্ব্ব চালুক্য বংশীয় বেঙ্গীর রাজাদের বংশধর। তিনি পিঠাপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বিজয়াদিত্যের পরে তৎপুত্র (২) সত্যাশ্রয় উত্তম চালুক্য, (৩) বিজয়াদিত্য দ্বিতীয় (৪) বিমলাদিত্য, (৫) বিক্রমাদিত্য, (৬) বিষ্ণুবর্দ্ধন প্রথম, (৭) মল্লপ প্রথম, (৮) কাম, (৯) রাজমার্ত্তণ্ড। ৩ নং হইতে ৯নং পর্য্যন্ত রাজারা সকলেই এই বংশের দ্বিতীয় নরপতি সত্যাশ্রয় উত্তম চালুক্যের পুত্র। (১০) বিষ্ণুবর্দ্ধন দ্বিতীয় বিজয়াদিত্যের পুত্র। (১১) দ্বিতীয় মল্লপ, দ্বিতীয় বিজয়াদিত্যের পুত্র। (১২) সামিদেব, দ্বিতীয় বিজয়াদিত্যের পুত্র ও দ্বিতীয় মল্লপের ভ্রাতা। (১৩) বিজয়াদিত্য তৃতীয়, তিনি দ্বিতীয় মল্লপের পুত্র। (১৪) মল্লপ তৃতীয়, তৃতীয় বিজয়াদিত্যের পুত্র পর পর রাজা হইয়াছিলেন।

বিজয়াদিত্য, দ্বিতীয়—তিনি পূর্ব্ব চালুক্য বংশজ পীঠাপুর শাখার দ্বিতীয় নরপতি সত্যাশ্রয়ের পুত্র। তাঁহার পরে তাঁহার ভ্রাতা বিমলাদিত্য রাজা হইয়াছিলেন। সম্ভবত তিনি একাদশ শতা-

ব্দীর শেষ অংশে অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম অংশে বর্ত্তমান ছিলেন।

বিজয়াদিত্য, তৃতীয়—তিনি পূর্ব্ব চালুক্য বংশজ পীঠাপুর শাখার একাদশ নরপতি দ্বিতীয় মল্লপের পুত্র। তিনি ১১৮৫খ্রীঃ অব্দে রাজা হইয়া ১২০২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৪৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র মল্লপ তৃতীয়, রাজা হইয়াছিলেন।

বিজয়াদিত্য, প্রথম—তিনি গোয়ার কদম্ব বংশজ নরপতি প্রথম জয়কেশীর তনয়। তিনি পট্টি পম্বচ্ছপুরের অধিপতি জগদ্দেবের মাতৃম্বসাকে বিবাহ করেন। খুব সম্ভব তিনি ১০৮৮—১১১৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র শিবচিত্ত পাড়মাড়ি রাজা হইয়াছিলেন।

বিজয়াদিত্য, দ্বিতীয়—তিনি গোয়ার কদম্ব বংশজ নরপতি দ্বিতীয় জয়কেশীর পুত্র ও শিবচিত্ত পাড়মাড়ির ভ্রাতা। তাঁহার অপর নাম বিকুচিত্ত। তিনি ১১৪৭—৮৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র তৃতীয় জয়কেশী রাজা হইয়াছিলেন।

বিজয়াদিত্য—(১)তিনি পূর্ব্ব চালুক্যবংশীয় বেঙ্গীর অধিপতি বিমলাদিত্যের অনুজ ভ্রাতা। বিমলাদিত্যের মৃত্যুর পরে তিনি তাঁহার পুত্র কুলতুঙ্গকে বঞ্চিত করিয়া বেঙ্গীর রাজপদ অধিকার করিবার জন্য চোলপতি বীর রাজেন্দ্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

বিজয়াদিত্য—(২)তিনি পূর্ব্ব চালুক্যবংশীয় বেঙ্গীর রাজা ছিলেন। (১০৬৩—১০৭৭ খ্রীঃ) সম্ভবতঃ তিনি কলিঙ্গের গঙ্গবংশীয়দের সামন্ত নরপতি ছিলেন।

বিজয়াদিত্য—(৩) তিনি উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নরপতি দ্বিতীয় গুণার্ণবের পুত্র। তিনি তিনবৎসর রাজত্ব করেন। কামার্ণব প্রথম দেখ।

বিজয়াদিত্য শিলহার—অপর নাম বিজয়ার্ক দ্বিতীয় অয্যন সিংহ। তিনি কোলাপুরের নরপতি গণ্ডরাদিত্যের পুত্র। তিনি ১১৪৩—১১৯০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। লক্ষ্মীদেব নামক রাজার কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে তিনি বিবাহ করেন। তিনি স্থানক নামক রাজ্যের রাজাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই প্রকার সাহায্য গোয়ার অধিপতিও পাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ভোজ রাজা হইয়াছিলেন।

বিজয়াদিত্য, সত্যাশ্রয়— তিনি বাদামির পশ্চিম চালুক্যবংশীয় নরপতি বিনয়াদিত্যের পুত্র। তিনি পট্টদকল স্থানে সঙ্গমেশ্বর নামক শিবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি ৬৯৬—৭৩৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার আত্মজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য রাজা হইয়াছিলেন।

বিজয়া মহাদেবী—তিনি উড়িষ্যার ভঞ্জবংশীয় নরপতি প্রথম রণভঞ্জের মহিষী। তাঁহার পিতা নারায়ণ একজন সামন্ত নরপতি ছিলেন। রণভঞ্জ প্রথম দেখ।

বিজয়ালয়— দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত চোল রাজ্যের সূর্য্যবংশীয় নরপতি বিজয়ালয় সম্ভবতঃ খ্রীঃ নবম শতাব্দীর শেষভাগে রাজা ছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র প্রথম আদিত্য রাজা হইয়াছিলেন। এই চোল রাজাদের নাম নীচে দেওয়া গেল—(১) বিজয়ালয়, (২) আদিত্য প্রথম—বিজয়ালয়ের পুত্র, (৩) পরান্তক প্রথম, বীর নারায়ণ, মদিরাইকুণ্ড, কোপরকেশরী বর্ম্মণ—প্রথম আদিত্যের পুত্র, (৪) রাজাদিত্য—পরান্তকের জ্যেষ্ঠ পুত্র, (৫) গণ্ডরাদিত্য—প্রথম আদিত্যের পুত্র, (৬) অরিঞ্জয়—প্রথম আদিত্যের পুত্র, (৭) পরান্তক দ্বিতীয় বা রাজেন্দ্র—অরিঞ্জয়ের পুত্র, (৮) আদিত্য দ্বিতীয় করিকাল—দ্বিতীয় পরান্তকের পুত্র, (৯) মধুরান্তক—প্রথম গণ্ডরাদিত্যের পুত্র, (১০) রাজরাজ বা রাজাশ্রয় বা রাজকেশরী বর্ম্মণ—দ্বিতীয় পরান্তকের পুত্র, (১১) পরকেশরী বর্ম্মণ বা প্রথম রাজেন্দ্র চোল—রাজরাজের পুত্র, (১২) রাজকেশরী বর্ম্মণ বা জয়কুণ্ড চোল—পরকেশরী বর্ম্মণের পুত্র, (১৩) পরকেশরী বর্ম্মা—রাজেন্দ্র দেব, (১৪) রাজকেশরী বর্ম্মা বীর রাজেন্দ্রদেব প্রথম, (১৫) পরকেশরী বর্ম্মা অধিরাজেন্দ্র দেব, (১৬) রাজেন্দ্র চোল দ্বিতীয়, রাজকেশরী বর্ম্মা বা কুলতুঙ্গ চোড়দেব প্রথম, (১৭) বিক্রম চোড় বা পরকেশরী বর্ম্মা, (১৮) কুলুতুঙ্গ চোড়দেব দ্বিতীয়, (১৯) ত্রিভুবন চক্রবর্ত্তী রাজ রাজ দেব দ্বিতীয়, (২০) ত্রিভুবন চক্রবর্ত্তী রাজেন্দ্র চোল দেব তৃতীয়, (২১) কণ্ডগোপাল দেব।

বিজলী খাঁ—(১)তিনি উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রের (১৪৯৭—১৫৪২ খ্রীঃ) অন্যতম মুসলমান সেনাপতি। ১৫১৫ খ্রীঃ অব্দে বিজয় নগরপতি কৃষ্ণদেব রায় উড়িষ্যা প্রদেশ আক্রমণ করিয়া প্রতাপ রুদ্রকে পরাস্ত করেন এবং তাঁহার সেনাপতি বিজলী খাঁকেও বন্দী করেন। কৃষ্ণদেব রায় দেখ।

বিজুলী খাঁ—(২)তিনি একজন পাঠান রাজ পুত্র। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রামদাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু ১৫১৫ খ্রীঃ অব্দের বিজয়া দশমীর দিন বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলেন। মাঘ মাস আরম্ভ হইলে (জানুয়ারী ১৫১৬ খ্রীঃ) বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া বরাহ ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। মাঘ মাসের দশ দিন থাকিতে প্রয়াগে আসিয়া ত্রিবেণী স্নান করিয়াছিলেন। অতএব জানুয়ারী মাসের শেষে কোনও স্থানে পাঠান রাজপুতের সহিত তাঁহার

সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভব। মথুরা ও বরাহ ক্ষেত্রের মধ্যে কোনও স্থানে তিনি পথ ভ্রান্ত হইয়া নিকটে এক বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমন সময়ে রাখাল বালকদের বংশীধ্বনী শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু ভাবাবেশে অজ্ঞান হইলেন। নিকট দিয়া এক অশ্বারোহী পাঠান সর্দ্দার অনুচরসহ যাইতেছিলেন। তিনি মনে করিলেন সঙ্গীরা সন্ন্যাসীর ধন অপহরণার্থ তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে অজ্ঞান করিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি সন্ন্যাসীর জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত, সঙ্গী-দিগকে আটক করিলেন। মহাপ্রভু জ্ঞান লাভ করিয়া বলিলেন—ইহাঁরা আমার সঙ্গী, আমি অসুস্থ, তাঁহারাই সেবা করিয়া আমাকে রক্ষা করে। ইহা শুনিয়া পাঠান সর্দ্দার তাঁহাদিগকে মুক্তি দিলেন। সেই সর্দ্দারের সঙ্গে এক পীর ছিলেন। মহাপ্রভুর সহিত বিচারে তিনি পরাস্ত হইয়া তাঁহার শরণ লইলেন। ইহার পরে রাজকুমার বিজলী খাঁও মহাপ্রভুর শরণ লইলেন এবং তিনি তাঁহার নাম রামদাস রাখিলেন।

বিজাম্বা—কৃষ্ণ তৃতীয় রাষ্ট্রকুট বংশীয় নরপতি ছিলেন। তিনি চেদীবংশীয় রাজা অর্জ্জুনের পৌত্রী ও অঙ্গন দেবের পুত্রী বিজাম্বাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

বিজিত নারায়ণ— কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা, প্রসিদ্ধ বীর শুক্লধ্বজ বিজনীর রাজা ছিলেন। ১৫৯৩ খ্রীঃ অব্দে শুক্লধ্বজের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র রঘু রায় রাজা হন। তাঁহার দুই পুত্র পরীক্ষিত নারায়ণ ও বলিত নারায়ণ। এই সময়ে রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগে পরীক্ষিতের পুত্র বিজিত নারায়ণ ও অপর ভাগে পরীক্ষিতের ভ্রাতা বলিত নারায়ণ রাজা হন। এই বলিত নারায়ণই বর্ত্তমান দরঙ্গ রাজবংশের আদি পুরুষ এবং বিজিত নারায়ণ বর্ত্ত-মান বিজনী রাজবংশের আদি পুরুষ।

বিজিল—তিনি যশলমীরের রাজা শালিবাহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শিরোহীর রাজা দেবরাজ মানসিংহের নিকট হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসাতে শালিবাহন তথায় গমন করিলেন। যাইবার পূর্ব্বে তিনি বিজিলের হস্তে রাজ্য ভার অর্পণ করিয়া গেলেন। মন্দমতি বিজিলের ধাত্রীভাই পিতার প্রস্থানের অল্পকাল পরেই প্রচার করিলেন যে, রাজা শালি-বাহন ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। শালিবাহন স্বরাজ্যে আগমন করিয়া পুত্রের সহিত অনেক বাদানুবাদ করি-লেন কিন্তু কোনও ফলোদয় হইল না। তিনি দুঃখে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া খারাল রাজ্যে গমন করিলেন এবং খারালপতির সহিত যুদ্ধে তিন শত অনুচর সহ নিহত হইলেন। এদিকে বিজিল একদিন ক্রোধভরে ধাত্রীভাইকে

প্রহার করিলেন এবং ধাত্রী ভাই বিজিলকে প্রতিপ্রহার করিলেন। এই অপমানে বিজিল আত্মহত্যা করিল। এইরূপে পিতৃদ্রোহী বিজিলের জীবনের অবসান হইলে, দ্বিতীয় শালিবাহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৈলুন ১২০০ খ্রীঃ অব্দে যশল্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বিজ্জকা—কর্ণাট দেশীয় মহিলা কবি। তিনি দণ্ডীর পরে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন। বিরহিনী নায়িকার অবস্থা বর্ণনে তিনি সিদ্ধহস্তা ছিলেন। তাঁহার স্বভাব বর্ণনা অতি স্বাভাবিক ও কষ্ট কল্পনা দোষ শূন্য। ভাষার লালিত্যে ও ভাবের মাধুর্য্যে তাঁহার কবিতা অতি উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।

বিজ্জল—তিনি বনবাসী নামক স্থানের অধিপতি ও চালুক্য রাজবংশের একজন সামন্ত নরপতি। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পরেই চালুক্য নরপতিদের অধীনস্থ সামন্ত নরপতিরা স্বাধীনতা অবলম্বনের চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় তৈলপ রাজার সময়ে বিজ্জল, বরঙ্গলের পার্ব্বত্য কাকতীয়দিগকে দমন করিয়া প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করেন। অবশেষে তৈলপকে বন্দী করিয়া স্বয়ং চালুক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময়ে বাসব মধিরাজ নামে একজন ধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন। তাঁহার ভগিনী পদ্মাবতীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া বিজ্জল বাসবকে তাঁহার মন্ত্রীর পদ প্রদান করিলেন। বাসব ছিলেন লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ভুক্ত আর বিজ্জল ছিলেন জৈন। উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাঁধিল। বিজ্জল বাসবকে মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করিলেন।

বাসব অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক বিজ্জলকে পরাজিত ও নিধন করিলেন। কিন্তু বিজ্জলের পুত্র সবিদেব বাসবকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। বাসব আত্মহত্যা করিয়া অপমানের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইলেন। বাসবের ভ্রাতুষ্পুত্র চেন্না বাসব সবিদেবের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া বিবাদের অবসান করিলেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় তৈলপের পুত্র চতুর্থ সোমেশ্বর এই গোলমালের সুযোগে চালুক্য সিংহাসন অধিকার করিয়া ১১৮৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন।

বিজ্জল দেব—১৬৪৮ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে পাটনা নগরে সুবেদার বিজ্জলদেব চৌহানের আদেশে জগন্মোহন পণ্ডিত 'দেশাবলী বিবৃতি' নামে ভারতবর্ষের একখানা ভূগোল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞানবতী—রাণী বিজ্ঞানবতী প্রাগ্-জ্যোতিষপুরের পুষ্যবর্ম্মার বংশীয় নরপতি মহাভূত বর্ম্মার মহিষী ছিলেন। তিনি গুণবতী বিদুষী মহিষী ছিলেন। পুষ্যবর্ম্মা ও মহাভূত বর্ম্মা দেখ।

বিজ্ঞান ভিক্ষু—খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ভিক্ষু উত্তর ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভাবগণেশের গুরু ছিলেন। তাঁহার নাম দেখিয়া তাঁহাকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু তিনি একজন বিষ্ণু ভক্ত হিন্দু সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহাকে সমন্বয়বাদী বলা যায়। কারণ তিনি সাংখ্য ও বেদান্তের সমন্বয় সাধনে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—সাংখ্যসার প্রবচন ভাষ্য, যোগসার, যোগবার্ত্তিক, ব্রহ্মসূত্রের বিজ্ঞানামৃত ভাষ্য প্রভৃতি।

বিজ্ঞানানন্দ স্বামী—তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের একজন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী। পূর্ব্ব আশ্রমের নাম হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। তিনি পুনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে পাশ করিয়া আগ্রা অযোধ্যা প্রদেশে সরকারী পূর্ত্ত বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই পরমহংস দেবের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি দীর্ঘকাল চাকুরি করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি এলাহাবাদের মুটিগঞ্জে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া, অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময়ে বেলুর মঠের অধ্যক্ষের পরলোক প্রাপ্তিতে তৎস্থান অধিকার করিবার জন্য ভক্ত মণ্ডলীর আহ্বান আসিল। তাঁহাদের সাদর আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন। অনতিকাল পরেই তিনি ১৩৩৫সালের ১২ই বৈশাখ দেহত্যাগ করিলেন।

তিনি বিদ্বান্ ব্যক্তি ছিলেন। 'সূর্য্য সিদ্ধান্ত' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদসহ একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ তিনি বাহির করিয়াছিলেন। সংস্কৃত রামায়ণের ইংরেজী অনুবাদও আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। অকালে তাঁহার জীবনকাল শেষ হওয়ায় কেবল রামকৃষ্ণ মিশন নহে, সমস্ত বাঙ্গালা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ইহা বলিয়া আর লোককে বুঝাইতে হইবে না।

বিজ্ঞানেশ্বর—(১) তিনি একজন জ্যোতিষের গ্রন্থকার। মাধবকৃত রত্নমালার টীকায় তাঁহার বিষয় উল্লেখ আছে।

বিজ্ঞানেশ্বর যোগী—তিনি দাক্ষিণাত্যের চালুক্যবংশীয় ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সময়ে কল্যাণ নগরে খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পদ্মনাভ ভট্ট। তিনি মিতাক্ষরা নামে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির এক টীকা রচনা করেন। বিজ্ঞানেশ্বর সেই সময়ের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

বিটল—তিনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। কল্পবল্লী পদ্ধতি নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত। এই গ্রন্থের আনন্দ কন্দ নামক টীকা জীবানন্দের পুত্র

দেবকীনন্দন করিয়াছেন। বিট্টলের একখানা জাতক পদ্ধতিও আছে।

বিট্‌টল দীক্ষিত—বুধশর্ম্মার পুত্র বিট্টল দীক্ষিত একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। ১৫৪১ শকে (১৬১৯ খ্রীঃ) তিনি কুণ্ডসিদ্ধি নামে একখানা ক্ষেত্র ব্যবহার গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৫৪৯ শকে (১৬২৭ খ্রীঃ) তিনি মুহূর্ত্ত কল্পদ্রুম নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার মুঞ্জরী নাম্নী টীকাও তাঁহার রচিত।

বিট্‌টল দেব—দাক্ষিণাত্যের শ্রীশৈল প্রদেশের রাজা। রামানুজাচার্য্য যখন শ্রীশৈলের পাদদেশে অবস্থান করিতে ছিলেন। তখন তিনি আচার্য্য দেবের শিষ্য শ্রেণীতে প্রবেশ করেন এবং নিকট বর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগ রামানুজকে দান করেন। রামানুজ আবার দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগকে সমস্ত দান করিয়া দেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী রাজা ছিলেন। তাঁহার কন্যাকে আরোগ্য করিয়া রামানুজাচার্য্য তাঁহাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার নাম বিষ্ণুবর্দ্ধন হইয়াছিল।

বিট্টল মিশ্র—তিনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। করণালঙ্কৃতি নামক একখানা করণ গ্রন্থ তাঁহার রচিত। তিনি রামচন্দ্র বাজপেয়ীকৃত সমর সার নামক গ্রন্থের এক টীকা রচনা করেন।

বিট্‌টল শুক্ল—এই জ্যোতিষী পণ্ডিত সুশ্লোক শতক নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিঠ্‌ঠল আচার্য্য—তিনি খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে প্রক্রিয়া কৌমুদীর উপর টীকা প্রণয়ন করেন।

বিঠলদাস দামোদর ঠাকুর্সী স্যার—তিনি বোম্বায়ের একজন প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে জন্ম হয়, তাহার পিতার নাম দামোদর ঠাকুর্সী মুলজী। তিনি বোম্বে নগরের এলফিন ষ্টোন কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তাঁহারা জাতিতে ভাটিয়া বনিক। তিনি বড় বড় পাঁচটী মিলের মালিক ছিলেন। তিনি বোম্বে পুরতন্ত্রের সভাপতি, বোম্বের গবর্ণরের ও বড় লাটের মন্ত্রী সভার সদস্য ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক বড় বড় সভা সমিতি ও প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত চিলেন। বানিজ্য নীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। তিনি যেমন একদিকে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন, তেমনি দেশের ও জাতির উন্নতি বিধানার্থ লক্ষ লক্ষ টাকা অকাতরে দানও করিয়াছেন। নারী জাতির কল্যাণের জন্য পুনা মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে পনর লক্ষ টাকা দানই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ইহাই তাঁহার একমাত্র দান নহে। আরও লক্ষ লক্ষ টাকা

তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কল্পে প্রদান করিয়াছেন। এই মাহাত্মা মাত্র উনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে ১৯২২ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিঠলনাথ দীক্ষিত—তিনি বল্লভাচার্য্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, বল্লভাচার্য্যের পুত্র। বল্লভাচার্য্যের মৃত্যুর পরে তিনিই মঠাধ্যক্ষ হন। তিনি সাধারণতঃ গোসাইজী নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার পিতা বল্লভাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের সুবোধিনী নামে এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি তাহার টিপ্পনি রচনা করেন। 'শ্রীবিদ্বন্মণ্ডলম্' গ্রন্থ তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি, এই গ্রন্থে তিনি বল্লভীয় শুদ্ধদ্বৈতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। ইহা শুদ্ধদ্বৈতবাদীদের একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। বিদ্বন্মণ্ডলের উপর পুরুষোত্তমজী সুবর্ণ সূত্র নামে ব্যাখ্যাও রচনা করিয়াছেন। বিঠল নাথের গিরিধর রায়, গোবিন্দ রায়, বালকৃষ্ণ, গোকুলনাথ, রঘুনাথ, যদুনাথ ও ঘনশ্যাম নামে সাত পুত্র ছিল। তাঁহাদের দ্বারা বল্লভাচারী সম্প্রদায় সাত শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সকলেরই পরস্পর সদ্ভাব আছে, কেবল গোকুল নাথের শিষ্যেরা অন্যদিগকে গুরু বলিয়া মানিতে সম্মত নহে। তিনি খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

বিঠলভাই প্যাটেল—প্রখ্যাতনামা রাজনীতিক নেতা ও দেশসেবক। গুজরাত প্রদেশের কয়রা জিলার অন্তর্গত করমসাদ গ্রামে অষ্টাদশ শতাব্দীর ৬ষ্ঠ দশকে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম বিঠলভাই ঝাভেরী ভাই প্যাটেল। তাঁহার অনুজ বল্লভভাই প্যাটেলও রাজনীতিক্ষেত্রে সুপরিচিত।

প্যাটেল ভ্রাতৃদ্বয়ের পিতা কৃষিজীবী ছিলেন। কিন্তু তিনি পুত্রদিগকে উচ্চ শিক্ষা দিতে অবহেলা করেন নাই। আহমদাবাদ নগরের ইংরেজি বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা লাভ হয়। শিক্ষা সমাপন করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। বল্লভভাই শীঘ্রই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অগ্রজ বিঠলভাই ততদূর সুবিধা লাভ করিতে পারেন নাই। বল্লভভাই ইংলণ্ডে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইবেন আশা করিয়া অর্থ সঞ্চয় করেন। কিন্তু কার্য্যকালে বিঠল ভাই প্রথমে গমন করিলেন। তিনি শিক্ষা সমাপন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বল্লভভাই ইংলণ্ডে গমন করিলেন। এইভাবে দুই সহোদর উচ্চশ্রেণীর ব্যবহারজীবী হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিলেন।

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা নানারূপ জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে থাকেন। ১৯১৮ খ্রীঃ অব্দে সমাপ্ত মহাযুদ্ধের পর যে নূতন শাসনতন্ত্র (Montford

Scheme) প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেই, উহার বিরোধী দলে যোগ দিয়া ভ্রাতৃদ্বয় রাজনীতিক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর হইলেন। সেই সময় হইতে মৃত্যুকাল অবধি তিনি গভীর নিষ্ঠা ও অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিয়া, সর্ব্বপ্রকারে দেশ সেবা করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘকাল তিনি বোম্বাই পুরতন্ত্রের সদস্য ছিলেন এবং একবার উহার "সর্ব্বাধ্যক্ষ" (Chairman) হইয়া ছিলেন। কিছুকাল বোম্বাই আইন পরিষদেরও সদস্য হইয়াছিলেন। ১৯২৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি বোম্বাই নগরী হইতে ভারতীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তাহার পূর্ব্বেই ১৯১৮ খ্রীঃ অব্দে বোম্বাই নগরীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যে রাজনীতিক প্রতিনিধি সংঘ (Deputation) ইংলণ্ডে গমন করে, তিনি তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ইংলণ্ডীয় পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক, ভারতের শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য, যে সমিতি (Joint Parliamentary Committee) গঠিত হয়, তিনি উহার সদস্যগণের নিকট বিশেষ তেজস্বীতার সহিত ভারতের দাবী উপস্থিত করেন। ১৯২৩—২৪ খ্রীঃ অব্দে, বোম্বাই নগরে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের বিস্তারিত ব্যবস্থা করিবার জন্য, যে কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়, তিনি উহার সভাপতিরূপে বিশেষ কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন। এই সময়েই, হিন্দুদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া যাহাতে গণ্য হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে একটি আইন প্রণয়ণের চেষ্টা করেন। কিন্তু দেশব্যাপী প্রবল প্রতিবাদের জন্য ঐ চেষ্টা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়।

মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতিক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, তিনি তাঁহার একজন প্রধান সহযোগীরূপে পরিগণিত হইলেন। সকল বিষয়ে একমত না হইলেও নিয়মানুবর্ত্তিতার জন্য কংগ্রেসের প্রায় সমুদয় সিদ্ধান্তই তিনি মানিয়া চলিতেন। পরে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যখন আইন সভা বর্জ্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয়, তখন তিনি ঐ প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিতে অসমর্থ বোধ করিয়া চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহরু প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া, স্বরাজ্য দলে প্রবেশ করেন এবং ঐ দলের অন্যতম মুখপাত্ররূপে আইন সভায় প্রবেশ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই স্বরাজ্য দলের ডেপুটী লিডার (Deputy Leader) হন। ১৯২৫ খ্রীঃ অব্দে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের তদানীন্তন সভাপতির (Sir Frederic White)

কার্য্যকাল সমাপ্ত হইলে, তিনি প্রথম ঐ পরিষদের নির্ব্বাচিত সভাপতি হন এবং দুই বৎসর পরে পুনরায় নির্ব্বাচিত নির্ব্বাচিত হইবার পর, পরিষদের সভা- পতির কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্য থাকা উচিত নহে, এই বিবেচনায় তিনি স্বরাজ্য দলের সদস্য পদ ত্যাগ করেন। পরিষদের সভা-পতিরূপে তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পূর্ণ পক্ষ-পাতশূন্য মন্তব্যাদি প্রদান, নির্ভিকতা প্রভৃতি গুণের জন্য সকল সম্প্রদায়ের প্রশংসা অর্জ্জন করেন। নিজের পদো-চিত মর্য্যাদা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদাই সচেতন থাকিতেন। তাঁহার প্রতাপে বড়লাটের কার্য্যকরী সমিতি (Executive Council) সদস্যগণ ও সরকারপক্ষীয় সদস্যগণ সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন। ইংরেজ সদস্যগণ তাঁহার প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহা-দের সকল চেষ্টাই বৃথা হয়।

১৯২৭ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের কার্য্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করি-বার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন এবং কয়েক মাস ইংলণ্ডে থাকিয়া অনেক ইংরেজ রাজনীতিবিদ্ ও মনস্বীগণের সহিত পরিচিত হন। সর্ব্বত্রই তিনি তেজস্বীতার সহিত ভারতবাসীর স্বায়ত্ত-শাসন লাভের ইচ্ছা ব্যক্ত করিতেন। মধ্যে কিছুকাল আয়র্লাণ্ডের পার্লা-মেণ্টের কার্য্য প্রণালী পরিদর্শন করিতেও গিয়াছিলেন।

পরিষদের সভাপতির পদে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে তিনি নিজ বেতন হইতে ব্যক্তিগত ব্যয় বাদে যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত তাহা মহাত্মা গান্ধির হস্তে দেশসেবার জন্য প্রদান করিতেন। বোম্বাই পুরতন্ত্র হইতে তিনি একবার কিছু অর্থ উপঢৌকন স্বরূপ প্রাপ্ত হন। সেই সমুদয় অর্থও তিনি মহাত্মা গান্ধীকে প্রদান করেন।

সভাপতিরূপে কার্য্য করিবার সময়ে তাঁহার কোনও কোন ব্যবস্থা ও নির্দ্দেশ, দেশময় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া-ছিল। ১৯২৯ খ্রীঃ অব্দের প্রথমভাগে মীরাট নগরে এক গুরুতর রাজনৈতিক মোকর্দ্দমা সরকার পক্ষ হইতে উপ-স্থিত করা হয়। উহা মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা নামে সমধিক পরিচিত। রুশীয়ার বলশেভিক দলের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া সন্দেহ ভাজন বহু লোকের বিরুদ্ধে এই মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা হয়। এই মোকর্দ্দমা চলিবার সময়েই সরকার পক্ষ হইতে বলশেভিক বাদ দমন করিবার উপযোগী এক আইন প্রণয়নের চেষ্টা হয়। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতিরূপে বিঠলভাই নির্দ্দেশ দেন যে, মীরাটের মোকর্দ্দমা চলিবার সময়েই ঐ আইন বিধিবদ্ধ

করা চলিতে পারে না। হয় মোকর্দ্দমা বন্ধ হউক নতুবা আইন প্রণয়ন স্থগিত থাকুক। বলা বহুল্য সরকার পক্ষ সভাপতি প্যাটেলের এই নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে একেবারেই সম্মত হইলেন না। স্বাভাবিকভাবে পরিষদে আইন প্রণয়নের প্রস্তাব আনা সম্ভব হইবে না বুঝিতে পারিয়া, বড়লাটের ব্যক্তিগত ক্ষমতার বলে আদেশ (Ordinance) জারী করিয়া ঐ আইন প্রবর্ত্তন করা হইল।

এই সকল ঘটনার মধ্যে একদিন, পরিষদের কার্য্য চলিবার সময় পরিষদ্ গৃহে এক তুমুল বিস্ফোরণ হয়। এইরূপ অপ্রত্যাশিত ঘটনার পরে সরকার পক্ষ হইতে পরিষদ গৃহ রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণের প্রস্তাব হয়। বিঠলভাই ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি পরিষদের সদস্যগণের নিরাপত্তার এবং পরিষদ গৃহ রক্ষণাবেক্ষণের দায়ীত্ব নিজের উপর লইয়া পরিষদের পক্ষ হইতে রক্ষীদলের ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন। এই বিষয় লইয়াও সরকার পক্ষের সহিত তাঁহার বিশেষ তর্ক ও কিছু মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। পরিশেষে বিঠলভাই-এর জিদই বজায় রহিল। সরকার পক্ষ হইতে রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হইল। এক্ষেত্রেও তিনি যেরূপ তেজস্বীতা ও নির্ভিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহা সাধারণতঃ দেখা যায় না।

১৯২৯ খ্রীঃ অব্দে লাহোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর ব্যবস্থাপরিষদের সমুদয় স্বরাজী সদস্যরা পদত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি পদত্যাগ করেন নাই। কারণ তিনি, পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার সময়েই স্বরাজ্য দলের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বৎসর মে মাসে তিনি কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বিপুল ভাবে অভ্যর্থনা করা হয়। সেই অভ্যর্থনার শোভাযাত্রার উপর পুলিশের অত্যাচার হইয়াছিল। সেই বৎসরই আগষ্ট মাসে দিল্লীতে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির (Working Committee) অধিবেশন হইবার কথা হয়। তখন নানাস্থানে পূর্ণ উদ্যমে আইন অমান্য (Civil Disobedience) আন্দোলন চলিতেছিল। সরকার পক্ষ হইতে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি অবৈধ-প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। তাহা সত্বেও, বিঠলভাই প্যাটেল প্রমুখ বহু বিশিষ্ট নেতা দিল্লী নগরীতেই ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন করিবেন স্থির করেন। ফলে তাঁহারা অধিবেশনের কার্য্যের জন্য উপস্থিত হইবা মাত্র সরকারী আদেশে বন্দী হন। ঐ সঙ্গে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, ডাঃ

আনসারী, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণও গ্রেপ্তার হন। তাঁহাকে যখন বন্দী করা হয় তখন তিনি বলিয়াছিলেন "এইবার আমি আমার সম্মান ও পুরস্কার পাইলাম।"

কয়েক দিন পরে দিল্লীর সেণ্ট্রেল জেলের (Central Jail) ভিতর তাঁহাদের বিচার হয় এবং বিটলভাই ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারাগারে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং এই সময়ে প্রধানতঃ অর্শ রোগে বিশেষ কষ্ট পাইতে থাকায় চিকিৎসক গণের পরামর্শে সরকার তাঁহাকে দণ্ডকাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মুক্তিদান করেন।

মুক্তি লাভের পর কিছু দিন তিনি স্বাস্থ লাভের জন্য বিশ্রাম করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু তাঁহার আরও নানারূপ পীড়ার উপসর্গ দেখা দিতে লাগিল। কিছুকাল বোম্বাই নগরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের অধীনে থাকিয়া পরে তাঁহাদেরই পরামর্শে ইউরোপে গমন করেন। ভিয়েনা প্রভৃতি নানা স্থানের বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শে তিনি চলিতে থাকেন। এই পীড়িত অবস্থাতে ও তিনি রাজনীতির চর্চ্চা হইতে একেবারে বিরত থাকেন নাই। এই সময়ের মধ্যে তিনি পুনরায় আয়র্লণ্ডে গমন করিয়া ডি ভেলেরার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং আয়ার্লণ্ড ও ভারতের মধ্যে রাজনীতিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য একটী সমিতি (Indo Irish Society) স্থাপন করেন ইহার পরে তিনি আমেরিকায় গমন করেন এবং বহু বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য শিক্ষিত জনসাধারণের সভায় বক্তৃতা প্রদান দ্বারা ভারতের রাজনীতিক আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা বিবৃত করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কবি রবীন্দ্রনাথ, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র, মনস্বী লালা লাজপত রায় প্রভৃতি খ্যাতনামা ভারতবাসীগণ আমেরিকায় গমনপূর্ব্বক যেরূপ সম্মান ও অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বিঠলভাইও তাহা অপেক্ষা কিছুই কম পান নাই, বরং কোন কোন বিষয়ে তাঁহার নির্ভীক ও তেজস্বী মন্তব্য আমেরিকাবাসীদের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এইরূপ অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে, তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পায় এবং চিকিৎসার জন্য ইউরোপে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। প্রথমতঃ ভিয়েনায় যাইয়া বিশেষজ্ঞগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাদের পরামর্শে জেনেভানগারে গমন করিয়া এক শুশ্রূষাগারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই স্থানেই তাঁহার পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এমন কি একবার অবস্থা শঙ্কটাপন্ন হওয়ায়, বিমানযোগে ভিয়েনা হইতে চিকিৎসক আনয়ন করিতে হয়।

কিন্তু কোনওরূপ চিকিৎসাই ফলপ্রসূ হইল না। কয়েকদিন অতি শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় থাকিয়া ১৯৩৩ খ্রীঃ অব্দের ২২শে আগষ্ট তিনি পরলোক গমন করিলেন। মৃত্যুকালে সুভাসচন্দ্র বসু প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার স্বদেশবাসী তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন।

বিঠলভাই প্যাটেল মহাশয় তাঁহার চরমপত্রে ব্যবস্থা করিয়া যান যে, তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির সমুদয়ই দেশ সেবার জন্য ব্যয় করা হইবে। এবং শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসুকে তাঁহার সম্পত্তির অছি (Trustee) নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মীয়স্বজনেরা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বোম্বাই হাইকোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া তাঁহার অন্তিম অভিলাষ পূর্ণ হইতে দেন নাই। বিমানপোতযোগে বিঠলভাইএর মৃতদেহ বোম্বাই নগরে আনা হয়। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল চৌপাটির সমুদ্র তীরে লোকমান্য তিলকের শেষ শয্যা পার্শ্বে, যেন তাঁহাকে সৎকার করা হয়। কিন্তু বোম্বাই সরকার বিরোধিতা করায়, তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে নাই। শোকমগ্ন বোম্বাইবাসীগণ বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে স্থানান্তরে তাঁহার দেহ সৎকার করেন। বিঠল ভাই পেটেল মনেপ্রাণে কিরূপ স্বদেশ বৎসল ছিলেন, তাহা একটী ঘটনা হইতেই উপলব্ধি হইবে। তিনি যখন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন, তখন বিদেশী বস্ত্র নির্ম্মিত সভাপতির পোষাক পরিধান করিতে অসম্মত হন। সেইজন্য সমস্যা ভাবে শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডুকর্ত্তৃক প্রদত্ত একটী বহু মূল্যবান কাশ্মীরী সাড়ী হইতে, তাঁহার জন্য পোষাক প্রস্তুত হয়।

বিডন, স্যার সিসিল (Sir Cecil Beadon)—বাঙ্গালার তৃতীয় শাসন-কর্ত্তা (Lieutant Governor)। ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দে বিলাতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রিচার্ড বিডন। স্যার সিসিল ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দে অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে বাঙ্গালার সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হইয়া ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। প্রথমে অধস্তন বিভিন্ন পদে কার্য্য করিয়া ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর পদে উন্নীত হন। তৎপর ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালা সরকারের সেক্রেটারী, ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে ভারত সরকারের হোম সেক্রেটারী এবং ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে ফরেন সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে তিনি স্যার (Knight) উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ঐ বৎসরই এপ্রিল মাসে বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি গবর্ণরের

পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার শাসনকালে ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালত উঠিয়া যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হাইকোর্টে কতকগুলি প্রধান প্রধান সিবিলিয়ান বিচারপতি এবং কতকগুলি বারিষ্টার বিচারপতি নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধান, তাঁহার উপাধি হইল চীফ জাষ্টিস বা প্রধান বিচারপতি এবং তিনি একজন বারিষ্টার হইবেন, এই নিয়ম হইল। এই নিয়ম অনুসারে সার বার্ণেস পিকক সাহেব কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি হইলেন। সিপাহী বিদ্রোহ ঘটনার পরে, রাজ্যের যে যে বিষয়ে সংস্কার ও নূতন বন্দোবস্তের প্রয়োজন ছিল, এতদিনে তাহা প্রায় প্রায় নিঃশেষ হইল।

১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী নূতনভাবে গঠিত হয় এবং তাঁহার বিশেষ চেষ্টায় কলিকাতায় কলের জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়। শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরই, তিনি বাঙ্গালার সাতটি জেলায় জুরির সাহায্যে বিচারের ব্যবস্থা করেন। তিনি সামরিক (Military) পুলিশ উঠাইয়া দেন এবং ডাকাইতী বিভাগের পরিবর্ত্তে গোয়েন্দা পুলিশ সৃষ্টি করেন। রথযাত্রা, মুমুর্ষুর অন্তর্জলী ও বহু বিবাহ প্রথা নিবারণের জন্য কতিপয় দেশহিতকামী ব্যক্তি আন্দোলন আরম্ভ করিলে, স্যার সিসিল আইন প্রবর্ত্তন দ্বারা, এই সকল কুপ্রথা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বড়লাটের অসম্মতির দরুণ তাহা হয় নাই। চৈত্র সংক্রান্তিতে সন্ন্যাসীদের কান ফোঁড়া ও লৌহাঙ্কুশে বিদ্ধ হইয়া চরক গাছে ঘুরা তিনি আইন দ্বারা বন্ধ করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালার হিতৈষী বলিয়া প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে দেশের আভ্যন্তরীণ আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। বিলাতের মাঞ্চেষ্টারে কাপড়ের কলের মালিকেরা, আমেরিকা হইতে তুলা কিনিয়া কাপড় তৈয়ার করিয়া, ভারতে কাপড় বিক্রয় করিত। এই সময়ে আমেরিকায় অন্তর্ব্বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায়, তুলার আমদানী বন্ধ হইয়া যায় এবং মাঞ্চেষ্টারের কলওয়ালাদের দুর্গতির একশেষ হয়। তাঁহাদের রক্ষার্থ এ দেশ হইতেও বার লক্ষ টাকা প্রেরিত হয়। ইহা স্থায়ী ফল দান করিতে পারে না বলিয়া, এদেশে তুলার চাষ আরম্ভ হয় এবং এই উৎপন্ন তুলা সমুদ্র উপকূলে প্রেরণ করিবার জন্য রেলপথ প্রভৃতিরও প্রসার বৃদ্ধি পায়।

বিডন সাহেবের পূর্ব্বেই ১৮৫৯—৬০ খ্রীঃ অব্দে, বাঙ্গালা দেশে সংক্রামক ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়। এই

ভীষণ জ্বর তাঁহার সময়ে আরও ভীষণ-তর হয়। এই জ্বরে হাজার হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেক গ্রাম প্রায় জনশূন্য হইয়া যায়। গবর্ণ-মেণ্ট ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য একজন ডাক্তার নিযুক্ত করেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দেন যে, দেশ মধ্যে বন জঙ্গল হওয়াতেই এইরূপ হইয়াছে। জলাশয়ে পানা প্রভৃতি জন্মিয়া জলাশয়ের জল দূষিত হওয়াও অন্যতম কারণ। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট এই রিপোর্ট পাইয়া বন জঙ্গল পরিষ্কার করিবার আদেশ দিলেন, এই আদেশ অমান্য করিলে অর্থদণ্ড হইবে ইহাও উল্লেখ থাকে।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হইতেই এদেশীয় জনগণ উচ্চ রাজ কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়াছিলেন। মহারাণী স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করার পর হইতেই তাঁহার প্রতীকার আরম্ভ হইয়াছিল। বিডন সাহেবের সময়েই আমাদের দেশীয় লোকদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রথম সিবি-লিয়ান হইয়া আসেন। কোন জাতির মধ্যে একজন উন্নত হইলে, তাহাদ্বারা সেই জাতি উন্নত হয়।

বাঙ্গালী সমাজেও বিডন সাহেব বিলক্ষণ যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি শিক্ষিত, সংস্কারপন্থী নব্য সম্প্রদায়ের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি শিক্ষানুরাগী বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইলেন। তাঁহারই চেষ্টায় পাটনা নগরে একটী কলেজ স্থাপিত হইল এবং অপরাপর কলেজগুলিতে উচ্চাঙ্গের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইল। সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার জন্যও বাঙ্গালা পাঠশালা সকল স্থাপিত হইতে আরম্ভ হইল। তিনি স্ত্রী শিক্ষারও পক্ষপাতী ছিলেন। সংস্কারপন্থীরা পুরুষদের বহু বিবাহ নিবারণ করিবার জন্য একটী আইন করিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি তাহাতে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যত্নে কাশীর রাজা দেবনারায়ণ সিংহ এই আইন ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিরোধী পক্ষের প্রবল আন্দোলনে ইহা উত্থাপিত হয় নাই।

বিডন সাহেবের সমকালে লর্ড এলগিন বড়লাট ছিলেন। ১৮৬৪ সালে তিনি এদেশে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পরে স্যার জন লরেন্স বড়লাট হইলেন। বড়লাটের কলিকাতায় অবস্থান কালে ১৮৬৪ সালে আলীপুর জেলে একটী কয়েদীর হত্যা হয়। ইহার অনুসন্ধান জন্য একটী কমিসন নিযুক্ত হয়। স্যারজন ষ্ট্রেচি এই কমিসনের সভাপতি ছিলেন। তিনি জেলের সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিয়া বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের প্রতি যথেষ্ট দোষা

রোপ করিলেন। জেলের স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে দৃষ্টি পড়িল, আর বাঙ্গালা সরকারের সহিত, ভারত সরকারের একটু মনোমালিন্যও সংঘটিত হইল। হাইকোর্টের সহিতও এই সময়ে বিডন সাহেবের মনান্তর উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য তিনি কিছু অপমানিত হয়েন।

তাঁহার সময়ে নীলকর সাহেবেরা আবার অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট নীলকরদের উপর বিরূপতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুতরাং নীলকর সাহেবেরাও তাঁহার উপর চটিয়া গেল। এই সময়ে বাঙ্গালীরাও তাহার উপর বিরক্ত হইল। কারণ বড়লাট গঙ্গাবক্ষে মৃতদেহ নিক্ষেপের বিরোধী হইলেন, বিডন সাহেবও গঙ্গাতীরে শব দাহের বিরোধী হইলেন। বাঙ্গালীদের এক সভায় ইহার প্রতিবাদ হইলে, ইহা উঠিয়া যায়।

১৮৬৪ সালের ৬ই অক্টোবর কলিকাতায় এক ভীষণ ঝটিকার উপদ্রব হইয়াছিল। তাহাতে প্রায় দুই কোটী টাকার সম্পত্তি ও অনেক লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়। সেই দিন কলিকাতার সমীপবর্ত্তী ভাগীরথী নদীতে ১৯৮ খানি জাহাজ ছিল। প্রবল ঝটিকায় ২১ খানি একেবারে বিনষ্ট, ১৩৯ খানি চূর্ণ প্রায়, এবং ৩৮ খানি কিয়ৎ পরিমাণে ভগ্ন হয়। কলিকাতার নিকট হইতে দক্ষিণে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত ভাগীরথীর উভয় কূলে অনুমান পঞ্চাশ হাজার লোক বিনষ্ট হইল। বাঙ্গালা দেশের এই বিপদে বোম্বাই নগরের লোকেরা চাঁদা করিয়া এক লক্ষ টাকা প্রেরণ করেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে অনুরূপ কোন চেষ্টা হয় নাই

১৮৬৫ সালের অনাবৃষ্টিতে উড়িষ্যার যে কি ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা কেহই প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। প্রায় শত বর্ষের মধ্যে এমন দুর্ভিক্ষ উড়িষ্যায় হয় নাই। ঐ দেশে ধান্য মাটীর নীচে পুতিয়া রাখার নিয়ম থাকায়, রাজকর্ম্মচারীরাও সহজে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কমিসনার রাভেনশা সাহেব রিপোর্ট করিয়াছিলেন যে, মাটীর নীচে ধান পুতিয়া রাখিয়া মহাজনেরা দুষ্টামি করিয়া দর বাড়াইয়াছে। জমিদারগণ দুর্ভিক্ষ জন্য খাজানা আদায় হইতেছেনা বলিয়া রাজস্ব মাপ চাহিল। রেভিনিউ বোর্ড তাহা অগ্রাহ্য করিল। যখন বাজারে শস্য বিক্রয়ার্থ আসা বন্ধ হইল, এমনকি জেলের কয়েদীদের সাহায্য সংগ্রহও সুকঠিন হইল, তখন রাজ পুরুষদের চৈতন্য হইল যে, দেশে শস্য একে বারে নাই। তখন উড়িষ্যায় শস্য পাঠানও সম্ভব হইল না। প্রবল দক্ষিণী বাতাসের প্রতিকূলে জাহাজ প্রেরণ অসম্ভব। আর তখন রেল পথও হয় নাই। এই অবস্থায় উড়িষ্যার প্রায় দশ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। এজন্য

ভারত সরকার বাঙ্গালার ছোট লাটকে দূষী করিয়াছিলেন।

লর্ড ক্যানিং যখন ভারতের বড়লাট তখন বিডন সাহেব তাঁহার সহকারী ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পরে এদেশীয়দের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন না করায়, বড়লাট যেমন অনেক সাহেবের অপ্রিয় হইয়াছিলেন, তেমনি তিনিও সাহেব মহলে অপ্রিয় ছিলেন।

ফৌজদারী কার্য্যবিধির ব্যবস্থানুসারে তিনি ১৮৬২ সালের ৭ই জানুয়ারী বাঙ্গালার ৭টী জিলায় কয়েকটী অপরাধ সম্বন্ধে জুরির বিচার প্রচলিত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ম্মত্যাগের পুর্ব্বে লিখিয়া রাখিয়া ছিলেন যে জুরির বিচার যেন বাঙ্গালার সকল জিলায়ই প্রচলিত হয়।

বিড়ূভূভ বা বিরূধক—তিনি কোশল দেশের রাজা প্রসেনজিতের পুত্র। খ্রীঃ পূঃ ৪৭৮ অব্দে তিনি পিতাকে সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিয়া, রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কপিলবস্তুর শাক্যবংশের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন।

বিত্তপাল—বঙ্গের পাল বংশীয় নরপতি রামপালের তিনি একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। কৈবর্ত্তরাজ ভীমকে পরাস্ত করিয়া রামপাল বন্দী করেন এবং এই বিত্তি পালের তত্বাবধানে রক্ষা করিয়াছিলেন।

বিত্তল দেব রায়—অন্যনাম বিষ্ণুবর্দ্ধন তিনি দাক্ষিণাত্যের হয়শাল বংশীয় নরপতি ইরিয়েঙ্গার পুত্র। তিনি ১১১৭-১১৫০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। দ্বার সমুদ্রে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। রাজা, রামানুজাচার্য্যকে রাজধানীতে আনয়নপূর্ব্বক, তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। রামানুজ রাজার সাহায্যে সেলুকোটে নারায়ণের মন্দির সংস্কার ও সংস্থাপন করেন। ১০৯৯খ্রীঃ অব্দে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্মবিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১১১৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি বেলুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বিত্তিদেব—তিনি হয়শাল বংশীয় ইরেয়াঙ্গার পৌত্র। চালুক্য বংশের দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের সময়ে হয়শাল দের ক্ষমতা বিশেষরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এমন কি বিত্তিদেব ১১৩০ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান মহীশূর, হঙ্গল, লক্ষ্মেশ্বর প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া অতিশয় প্রবল হইয়াছিলেন। যদিও তিনি চালুক্যদের সামন্ত নরপতি ছিলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হয়শালেরা স্বাধীন নরপতির ন্যায়ই ছিলেন। চালুক্য বংশের তৃতীয় সোমেশ্বর নরপতির পরলোক গমনের পর তিনি বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১১৪১ খ্রীঃ অব্দে বৃত্তিদেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র নরসিংহ রাজা হন।

বিত্তিদেব বিষ্ণুবর্দ্ধন নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি গঙ্গাবাড়ী নামক স্থানের অধিপতি ছিলেন। ১১১৮ খ্রীঃ অব্দে বেঙ্গীর অধিপতি কুলতুঙ্গ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। বীর কেশরী বিত্তিদেব তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। বিনয়াদিত্য হয়শাল দেখ।

বিত্তিমধ্য—হয়শাল বংশীয় দ্বিতীয় বীর বল্লালের তিনি সামন্ত নরপতি ছিলেন। ১১৭৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

বিত্তেশ্বর—নাগপুরের অধিবাসী দত্তের পুত্র বিত্তেশ্বর একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'করণসার' নামক একখানা গ্রন্থ ৮২১ শকে প্রণয়ন করিয়াছেন। বোধ হয় করণসারের গ্রন্থকার কাশ্মীরবাসী ছিলেন। কারণ তাঁহার গ্রন্থে কাশ্মীরের অক্ষাংশ দেওয়া হইয়াছিল এবং উহাতে সপ্তর্ষিগতি অনুসারে কাশ্মীরের লৌকিক কাল ছিল।

বিথোজী—তিনি ছত্রপতি শিবাজীর খুল্ল পিতামহ। তিনি অগ্রজ মালজী ভুসলের ন্যায় আহাম্মদ নগরের রাজ সরকারে সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। প্রথমে তাঁহারা ফলতানের মহারাষ্ট্রপতির অধীনে চাকুরী করিতেন। একবার বিজাপুর সৈন্য কর্ত্তৃক অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া তাঁহারা অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়া বিজাপুর সৈন্যকে বিশেষরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর তাঁহাদের বীরত্বের কাহিনী চারিদিকে ব্যাপ্ত হয় এবং আহাম্মদ নগরের অধিপতি মূর্ত্তজা নিজাম শাহ তাঁহাদিগকে স্বীয় সৈন্য শ্রেণীতে কর্ম্ম প্রদান করেন।

বিদগ্ধ—তিনি হস্তীকুণ্ডীর রাষ্ট্রকূট বংশীয় হরিবর্ম্মার পুত্র। তাঁহার পুত্র মম্মট ও পৌত্র ধবল ছিলেন। বিদগ্ধ ৯১৬ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

বিদগ্ধ বৈদ্য—এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত 'যোগ সত' নামে একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

বিদা—তিনি উদাবৎ বংশীয় রাজপুত ছিলেন। শিবান্তি নগরে তিনি বাস করিতেন। একদা তিনি বিদেশ গমনে উদ্যোগী হইয়াছেন, এমন সময়ে মিবারের রাণা সঙ্গ ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া, তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। সদাশয় বিদা তাঁহাকে অশ্ব হইতে অবতরণ করাইলেন। ইতিমধ্যে সঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অশ্বারোহণে তথায় উপস্থিত হইয়া সঙ্গকে আক্রমণ করিলেন। সদাশয় বিদা অগ্রবর্ত্তী হইয়া জয়মল্লের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু শরণার্থীকে রক্ষা করিতে যাইয়া স্বয়ং নিহত হইলেন। ইত্যবসরে সঙ্গ পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। সংগ্রাম সিংহ দেখ।

বিদেশ্বরী প্রসাদ—এই জ্যোতিষী

পণ্ডিতের বিরচিত একখানি স্ত্রীজাতক আছে।

বিদেহ—একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রণেতা। তিনি শালোক্য তন্ত্র রচনা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বেত্তা চন্দ্রাট তাঁহার যোগ রত্ন সমুচ্চয় গ্রন্থে বিদেহের বচন উদ্ধার করিয়াছেন।

বিদ্দন—কর্ণাট প্রদেশবাসী কৌণ্ডিন্য গোত্রীয় মল্লয়ের পুত্র বিদ্দন বার্ষিক তন্ত্র নামে এক তন্ত্র লিখিয়াছিলেন। এই তন্ত্র আধুনিক প্রচলিত সূর্য্য সিদ্ধান্তের মতে লিখিত। গ্রহণ মুকুর নামক গ্রন্থও তাঁহার রচিত। বুধসিংহ উক্ত গ্রন্থের প্রবোধিনী নামে এক টীকা রচনা করিয়াছেন।

বিদ্দল দীক্ষিত—তিনি একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার। তিনি ১৫৪৯ শকে (১৬২৭ খ্রীঃ) মুহূর্ত্তকল্প দ্রুম মঞ্জরী নাম্নী তাহার টীকা প্রণয়ন করেন।

বিদ্যজ্জন কোলাহল—খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে পাণ্ড্য রাজ্যে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিচারের সময় অতিশয় কোলাহল করিতেন বলিয়া সকলে ইহার নাম বিদ্বজ্জন কোলাহল দিয়াছিলেন। তিনি পাণ্ড্য রাজের সভায় পণ্ডিত ছিলেন।

বিদ্বেষমীর—তিনি একজন শৈব প্রধান ভক্ত ছিলেন। শঙ্করাচর্য্য সেতুবন্ধে অবস্থানকালে তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বীয় মতে আনয়ন করিয়াছিলেন। পরে তিনি একজন প্রধান অদ্বৈত বাদী হইয়াছিলেন।

বিদ্যাকর—এই জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ১৫৬০ শকে (১৬৩৮ খ্রীঃ অব্দ) 'গৃহ বিদ্যাধর' নামে এক সারণী প্রণয়ন করেন।

বিদ্যাকরপ্রভ—যে সকল ভারতীয় পণ্ডিত খ্রীঃ অষ্টম শতকের প্রারম্ভে তীব্বতে গমনপূর্ব্বক ভারতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থের তীব্বতী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

বিদ্যাতীর্থ—তিনি একজন অদ্বৈত বাদী সন্ন্যাসী। বৈয়াসিক ন্যায় মালা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা ভারতী তীর্থ তাঁহার শিষ্য ছিলেন। খ্রীঃ চতুর্দ্দ শতকে তাঁহারা বর্ত্তমান ছিলেন।

বিদ্যাদাসজী—তিনি একজন দাদূপন্থী সাধক। তাঁহার রচিত ভক্তবানী রহিয়াছে। ভক্তবানী সংগ্রহ গ্রন্থে তাহা পাওয়া যায়।

বিদ্যাধর—(১)'একাবলী' নামক অলঙ্কার শাস্ত্রের তিনি একখানা গ্রন্থ উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নরপতি প্রথম নরসিংহের সময়ে (১২৩৮—৬৪ খ্রীঃ অব্দ) রচনা করেন।

বিদ্যাধর—(২) মেদিনীপুরের অন্তর্গত নারায়ণগড়ের ত্রয়োদশ নরপতি রাজা শ্যাম বল্লভের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন।

শ্যাম বল্লভ শ্রীনন্দন পাল মারি সুলতান দেখ।

বিদ্যাধর—(৩) এই বিদ্যাধর উৎকলের রাজা মুকুন্দদেবের মন্ত্রী ছিলেন। কেহ বলেন দাতনের দীর্ঘিকা এই বিদ্যাধরেরই খনিত। এই বিদ্যাধরের একটী দীর্ঘিকা (দৈর্ঘ্য-১৬০০ ফিট, প্রস্থ ১২০০ ফিট) দাঁতন নগরে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার কীর্ত্তি কাহিনীর পরিচয় দিতেছে।

বিদ্যাধর—(৪) উৎকলের রাজা ইন্দ্র দ্যুম্নের, রাজা অনঙ্গভীমদেবের ও রাজ প্রতাপরুদ্রদেবের মন্ত্রীর নামও বিদ্যাধর ছিল।

বিদ্যাধর—(৫) তিনি চান্দেল্ল বংশীয় গণ্ড বা নন্দের পুত্র। তিনি কচ্ছোপঘাত অর্জ্জুনের ও ধারানগরীর ভোজরাজের সমসাময়িক ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ১০২৫—১০৩৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র বিজয়পাল দেব রাজা হইয়াছিলেন।

বিদ্যাধর—(৬) কনৌজের রাজা গোপাল দেবের মন্ত্রী জনকের পুত্র ছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা মদন দেবের মন্ত্রী বিদ্যাধর ছিলেন। বিদ্যাধর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্য অজাবুধ নগরে একটী বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাধর কবিরাজ—(১) তিনি একজন জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিত। 'কেরল রহস্য' গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

বিদ্যাধর কবিরাজ—(২) একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকার। তাঁহার গ্রন্থের নাম 'কেলি রহস্য'।

বিদ্যাধর ভঞ্জ—উড়িষ্যার ভঞ্জ বংশীয় নরপতি দ্বিতীয় শীল ভঞ্জের পুত্র, দিগ-ভঞ্জের পৌত্র ও রণভঞ্জের প্রপৌত্র। তাঁহাব পুত্র তৃতীয় নেত্রীভঞ্জ। বিদ্যাধরভঞ্জ ত্রিকলিঙ্গপতির কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত একখানা দানপত্র পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার মহিষীর নাম ত্রিকলিঙ্গ মহাদেবী ছিল। সুস্তদেব তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। শত্রুভঞ্জ দেখ।

বিদ্যাধর ভট্টচার্য্য—একজন নানা শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত। তাঁহার পিতার নাম সন্তোষরাম। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। গণিত, জ্যোতিষ, পূর্ত্তবিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি পারদর্শী ছিলেন। অম্বরপতি সওয়াই জয়সিংহ তাঁহার নানা গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নক্সা অনুযায়ীই বর্ত্তমান জয়পুর সহর নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহাত্মা টডের রাজস্থানেও ইহার উল্লেখ আছে।

বিদ্যাধিরাজ—বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখা মাধ্বের মঠের তিনি সপ্তম অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম কৃষ্ণভট্ট ছিল। তিনি গীতার এক টীকা রচনা করেন। ১৩৩২ খ্রীঃঅব্দে (১২৫৪ শকে) তিনি পরলোক গমন করেন।

বিদ্যানন্দ—একজন দিগম্বর জৈন পণ্ডিত। তিনি স্বীয় 'অষ্ট সাহস্রী' গ্রন্থে আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বর কৃত বৃহদারণ্যক ভাষ্য বার্ত্তিক হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই 'অষ্ট সাহস্রী' নামক গ্রন্থের রচয়িতা বিদ্যানন্দ প্রসিদ্ধ জৈন সন্ন্যাসী অকলঙ্কের শিষ্য ছিলেন। ৮১০ খ্রীঃ অব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

বিদ্যানন্দী—তিনি দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের সরস্বতী গচ্ছের একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। বিখ্যাত শ্রুতসাগর গণি তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। খ্রীঃ পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

বিদ্যানাথ—(১) তিনি ১৩০০খ্রীঃ অব্দে 'প্রতাপরুদ্র কল্যান' নামে তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থে যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে সেগুলি উৎকলরাজ মহাদেবের পুত্র প্রতাপ রুদ্রের (তাঁহার অন্য নাম বীর ভদ্র বা রুদ্র) প্রশস্তি সূচক। দক্ষিণ ভারতে আজও ইহা অতি প্রচলিত। সমস্ত চতুষ্পাঠীতেই ইহার অধ্যাপনা হইয়া থাকে। সাহিত্য দর্পনের ন্যায় ইহাও সংগ্রহ মাত্র। তিনি উৎকল দেশবাসী ছিলেন। প্রতাপরুদ্র যশোভূষণ গ্রন্থের রত্নাপণ নামক এক টীকা, মল্লিনাথের পুত্র কুমার স্বামী প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যানাথ—(২) জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। 'জ্যোৎপত্তি শিরোমণি সার' নামে এক খানা ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যানিধি তীর্থ—তিনি মাধ্ব সম্প্রদায়ের একাদশ গুরু। ১৩৪৮ খ্রীঃ (১৩০৬ শকে) পরলোক গমন করেন।

বিদ্যানিবাস—একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি ১৫৮৮ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারই পুত্র ভাষা পরিচ্ছেদ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ও রুদ্র বাচস্পতি।

বিদ্যাপতি—প্রাচীন মৈথিলী কবি, প্রেমিক, ভক্ত ও সুপণ্ডিত। তাঁহার জন্মস্থান ও জন্মকাল সুনিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নাই। অনুমান ১৩৭৪ খ্রীঃ অব্দে মিথিলার অন্তর্গত সীতামারী মহকুমার অধীন বিস্ফী নামক গ্রামে এক বিদ্বান্ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার জন্ম হয়।

বিদ্যাপতি মৈথিলী কবি হইলেও তাঁহাকে বাঙ্গালী বলা যাইতে পারে। বল্লাল সেন বাঙ্গালা দেশকে পাঁচভাগে বিভক্ত করেন; তন্মধ্যে মিথিলা একটী। বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের প্রবর্ত্তিত অব্দ (লক্ষ্মণ সম্বৎ) বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলায় প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমানেও আছে; কিন্তু বাঙ্গালায় তাহা প্রচলিত নাই। সুতরাং

দেশকে বাঙ্গালার অংশ এবং

তদ্দেশবাসিগণকে বাঙ্গালী বলা বোধ হয় অন্যায় হইবে না। অনেকে তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়াই উল্লেখ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত বিদ্যাপতির হৃদয় বাঙ্গালী হৃদয়। তিনি যে রসের রসিক, সে রস তিনি বাঙ্গালী কবি জয়দেবের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন এবং সে রস চৈতন্যদেব ও তদ্ভক্তদিগের সময়ে .ান হইয়া বাঙ্গালা প্লাবিত করিয়াছিল। বিদ্যাপতির কবিতা কুসুম ও সাদরে বঙ্গ কাব্যে গৃহীত হইয়া রহিয়াছে।

বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই বিদ্বান্ ও যশস্বী ছিলেন। বিদ্যাপতির পিতা গণপতি ঠাকুর মিথিলার রাজা গণেশ্বরের পরম সুহৃদ ছিলেন। বিদ্যাপতির পিতামহ জয়দত্ত সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তজ্জন্য তিনি 'যোগীশ্বর' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জয়দত্তের পিতা বীরেশ্বর স্বীয় পাণ্ডিত্য গুণে মিথিলারাজ কামেশ্বরের নিকট হইতে বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই বীরেশ্বর প্রণীত 'বীরেশ্বর পদ্ধতি' অনুসারে মিথিলার ব্রাহ্মণেরা আজিও তাঁহাদের দশকর্ম্ম করিয়া থাকেন। বিদ্যাপতির খুল্লপিতামহ চণ্ডেশ্বর মহারাজ হরিসিংহ দেবের মন্ত্রী ছিলেন। চণ্ডেশ্বর ধর্ম্মশাস্ত্রে সাতখানি রত্নাকর-কর্ত্তা এবং তাঁহার উপাধি ছিল 'মহামত্তক সান্ধিবিগ্রহিক'। এই বংশের আর একটী গৌরব এই যে, বিদ্যাপতির উর্দ্ধতন ৬ষ্ঠ পুরুষ ধর্ম্মাদিত্য (মতান্তরে কর্ম্মাদিত্য) হইতে সকলেই রাজমন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

বিদ্যাপতি হরিমিশ্রের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। যখন তাঁহার অধ্যয়ন সমাপন হয়, সেই সময় গণেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কীর্ত্তিসিংহ মিথিলার রাজা হন। কীর্ত্তিসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর বিদ্যাপতিকে তাঁহার সভাপতি নিযুক্ত করেন। কীর্ত্তিসিংহের রাজ্য লাভ বিষয়ে তাঁহার খুল্লপিতামহ রাজপদাকাঙ্ক্ষী ভবসিংহের সহিত গোলযোগ হইয়াছিল। বিদ্যাপতি এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া তাঁহার 'কীর্ত্তিলতা' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। কীর্ত্তি সিংহ ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীরসিংহ যথাক্রমে রাজত্ব করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে, পূর্ব্বোক্ত ভবসিংহের পুত্র দেবসিংহ রাজা হন এবং দেবসিংহের পরে তৎপুত্র শিবসিংহ রাজ্য লাভ করেন। বিদ্যাপতি, তাঁহাদের সকলেরই রাজসভায় সভাপণ্ডিত ছিলেন। শিবসিংহ রাজা হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন মানসে দিল্লীশ্বরের রাজস্ব বন্ধ করিয়া দেন। দিল্লীশ্বর তাঁহাকে দমন করিবার জন্য মিথিলা আক্রমণ করেন। শিবসিংহ পরাজিত ও বন্দী হইয়া দিল্লীতে নীত এবং কারাগারে

নিক্ষিপ্ত হন। শৈশবকাল হইতেই বিদ্যাপতি ও শিবসিংহের মধ্যে অতিশয় সদ্ভাব ছিল। বিদ্যাপতি শিবসিংহের এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ে অতিশয় ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য দিল্লীতে গমন করেন এবং স্বরচিত পীযূষবর্ষী সঙ্গীতদ্বারা দিল্লীশ্বরকে মুগ্ধ করেন। দিল্লীশ্বর তাঁহার গানে মোহিত হইয়া শিবসিংহকে মুক্তি প্রদান করেন। সেই সময় হইতে বিদ্যাপতির কবিত্বের যশ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কিছুকাল পর শিবসিংহ পুনরায় স্বাধীনতা অবলম্বনপূর্ব্বক মুসলমান সৈন্যগণকে পরাস্ত করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। শিবসিংহ রাজপদে অধিষ্ঠিত হইবার পরই (১৪০০ খ্রীঃ) কবি বিদ্যাপতি ঠাকুরকে তাঁহার স্বগ্রাম বিষয়িবার বিস্ফী (বিসফী) শাসনরূপে দান করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, শিবসিংহ মাত্র তিন বৎসর রাজত্ব করিবার পর দিল্লীশ্বর পুনরায় মিথিলা আক্রমণ করেন। যুদ্ধকালে শিবসিংহ মুসলমান নরপতির শিরস্ত্রাণ তরবারি অগ্রে নিক্ষেপ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, তাঁহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সম্রাট শিবসিংহের বৈরাগ্যের কথা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার মহিষী লছিমা দেবীর হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণপূর্ব্বক দিল্লী চলিয়া যান। শিবসিংহ ও লছিমা দেবীর রাজত্বকালেই বিদ্যাপতি তাঁহার সুবিখ্যাত গীতাবলী রচনা করেন।

বিদ্যাপতি রাজা কীর্ত্তিসিংহ, বীরসিংহ, দেবীসিংহ, মহারাজ শিবসিংহ, রাজ্ঞী লছিমা দেবী, রাজা পদ্মসিংহ, রাণী বিশ্বাসদেবী, রাজা বীরসিংহ, ভৈরবসিংহ ও রামভদ্র এই দশজন রাজার সময়েই সভাপণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, লছিমা দেবীর সহিত বিদ্যাপতির গূঢ় প্রণয় ছিল এবং মহিষীকে দেখিলেই তাহার কবিত্ব স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইত। রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ ও বৈদ্যনাথ বিদ্যাপতির বন্ধু ছিলেন। কারণ তাঁহার কোন কোন গীতে তাঁহাদের উল্লেখ আছে। তিনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক অনেকগুলি অতি সুন্দর ভাবময়, সুললিত ও মনোহর অতুল্য পদ রচনা করিয়া সাহিত্য জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় বহু হিন্দী শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। নিম্ন লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থগুলি তাঁহার রচিত। (১) কীর্ত্তিলতা—রাজা কীর্ত্তিসিংহের রাজ্য প্রাপ্তির বিষয় অবলম্বনে লিখিত। (২) পুরুষ পরীক্ষা-মহারাজ শিবসিংহের আদেশে রচিত। (৩) লিখনাবলী—ইহাতে সংস্কৃতে পত্রলিখিবার রীতি বর্ণিত হইয়াছে। (৪) শৈবসর্ব্বস্বসার—রাণী বিশ্বাসদেবীর

আজ্ঞায় এই গ্রন্থ রচিত হয়। (৫) গঙ্গা বাক্যাবলী—ইহাও রাণী বিশ্বাসদেবীর আজ্ঞায় রচিত। (৬) বিভাগসার—নরসিংহদেবের (দর্পনারায়ণ) উৎসাহে রচিত, ইহা একটী স্মৃতিগ্রন্থ। (৭) দান বাক্যাবলী—ইহাও একটী স্মৃতি গ্রন্থ। (৮) গয়াপত্তন—নরসিংহদেবের স্ত্রী রাণী ধীরমতির আদেশে রচিত। (৯) দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী—ইহাতে গদ্যে ও পদ্যে দুর্গোৎসব পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। (১০) কীর্ত্তিপতাকা।

বিদ্যাপতি ঠাকুর—মৈথিল কবি বিদ্যাপতি হিন্দী ভাষায় 'পারিজাত হরণ' ও 'রুক্মিণী পরিণয়' নামে দুই খানি নাটক রচনা করিয়াছেন। বোধ হয় ইহাই হিন্দী ভাষার প্রথম নাটক।

বিদ্যাভরণ— একজজন দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি শ্রীহর্ষ রচিত 'খণ্ডন খণ্ড খণ্ডম্' গ্রন্থের বিদ্যাভরণী নামে একটীকা রচনা করিয়াছেন।

বিদ্যাময়ী দেবী—ময়মনসিংহ মুক্তা গাছার দানশীল রাজা জগৎ কিশোর আচার্য্য চৌধুরীর জননী। এই পুণ্য বতী রমণী কাশীতে অনেক স্থায়ী পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। ময়মনসিং সহরের উচ্চ বালিকা বিদ্যা-লয় তাঁহারই পুণ্য নাম বহন করিতেছে

বিদ্যারণ্য—তিনি একজন জ্যোতিষ-শাস্ত্রের গ্রন্থকার। ১৪৬০ শকে (১৫৩৮ খ্রীঃ অব্দে) তিনি 'ভাবনির্ণয়' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। 'কালজ্ঞান' নামে তাঁহার আর একখানা গ্রন্থ আছে।

বিদ্যারণ্য স্বামী—একজন গুজরাটী সাহিত্যিক। তাঁহার অপর নাম মাধবা-চার্য্য। তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরবর্ত্তী কিষ্কিন্ধ্যা বা হর্ম্পাক্ষেত্র নিবাসী তৈত্তিরীয় শাখী এক গরীব ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মায়ণ ও মাতার নাম শ্রীমতী। সায়ন ও সোমনাথ নামে তাঁহার দুই অনুজ সহোদর ছিল। সম্ভবতঃ বিদ্যারণ্য ১২৬৭ খ্রীঃ অব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই বিদ্যারণ্যের ভ্রাতা সায়নই বেদের টীকাকার। আর সোমনাথ শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ শ্রীবিদ্যাতীর্থ স্বামীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভারতী তীর্থ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। কথিত আছে মাধবাচার্য্য এই বিদ্যাতীর্থের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। এবং বিদ্যারণ্য স্বামী নাম প্রাপ্ত হন (১৩৩১ খ্রীঃ)। ইহার দুই বৎসর পরে বিদ্যাতীর্থ পরলোক গমন করিলে, সোম নাথ ভারতীতীর্থ শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষের পদে আরোহণ করেন। ১৩৮০ খ্রীঃ অব্দে ভারতীতীর্থ পরলোক গমন করিলে, বিদ্যারণ্য স্বামী শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। মুসলমান সম্রাট দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহ তোগলকের প্রতাপে দাক্ষিণাত্যের জম্বুকেশ্বরের রাজ্য বিনষ্ট হইলে, তাঁহার মন্ত্রী হরি-

হর ও কোষাধ্যক্ষ বুক বিদ্যারণ্য স্বামীর উপদেশে উৎসাহিত হইয়া, দাক্ষিণাত্যে মুসলমান অভ্যুদয় প্রতিহত করিবার জন্য বিজয় নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া, ইহার নাম বিজয় নগর রাখা হয়।

সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে বিদ্যারণ্য স্বামীর যুগ অতিশয় গৌরবের যুগ। তাঁহার সময়ে, বৈদ্যক, জ্যোতিষ, ধর্ম্ম-শাস্ত্র, ব্যাকরণ, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। বিদ্যারণ্য স্বামী, সায়ন ও সোমনাথ বা ভারতী-তীর্থ এই তিন সহোদর বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। শেষ বয়সে বিদ্যারণ্য স্বামী কাশীতে গমন করেন। তাঁহার জন্ম ১২৬৭ খ্রীঃ অব্দ, চৌষট্টি বৎসর বয়সে ১৩৩১ খ্রীঃ অব্দে দীক্ষা, ১১৩২ বৎসর বয়সে শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ এবং ১৩৮৬ খ্রীঃ অব্দে ১১৯ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। হর্ম্পীর বিরূপাক্ষ দেবালয়ে এখনও বিদ্যারণ্য স্বামীর সমাধি বর্ত্তমান আছে।

বিদ্যাশঙ্কর তীর্থ—তিনি একজন বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিতও দাক্ষি-ণাত্যের শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ১২২৮-১৩৩০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত মঠাধ্যক্ষ ছিলেন।

বিধি চাঁদ—শিখ গুরু হরগোবিন্দ সিংহের শিষ্য। বিধিচাঁদ গুরুর আদেশে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্চর্য্য জ্ঞান ও ভক্তিতে বহু-লোক আকৃষ্ট হইয়াছিল। কথিত আছে সুন্দর শাহ নামে এক ফকির তাঁহার সঙ্গে বিচার করিতে আসিয়া, পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্য হইয়া-ছিল। বিধিচাঁদ দেবনগর নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করিয়া দেশে প্রত্যা-বর্ত্তন করেন। এই দেবনগর কোথায় তাহা এখনও নির্ণিত হয় নাই।

বিনয় কুমার দাস—বিখ্যাত বাঙ্গালী বৈমানিক ও ব্যবসায়ী। বাংলা ১২৯৮ সালের কার্ত্তিক মাসে, বারাকপুরের অন্তর্গত মণিরামপুর গ্রামে, মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার প্রপিতামহ মধুসূদন দাস মহাশয় প্রায় ১০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বালি উত্তর পাড়া হইতে আসিয়া বাঁটরাতে বসবাস আরম্ভ করেন এবং তদবধি তাঁহারা সেই-খানেই আছেন। তাঁহার পিতা বসন্ত-কুমার দাস মহাশয় আসাম অঞ্চলে বহুদিন কাজ করাতে বিনয়কুমার শৈশবে আসামের নানাস্থানে ছিলেন। তারপর হাওড়া বাঁটরা স্কুলে ও Ripon Collegiate schoolএ কিছুকাল পড়াশুনা করিয়া আমতার নিকটবর্ত্তী জয়পুর স্কুলে পড়িতে যান। ছোট বেলা হইতেই স্কুলের বাঁধা ধরা নিয়ম ও এক ঘেয়ে পড়াশুনার প্রণালী

তাঁহার মোটেই ভাল লাগিত না। সেইজন্য অনেক সময়ই স্কুল হইতে পলাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। পড়াশুনাতে মন বসিতেছে না দেখিয়া, তাঁহার পিতা তাঁহাকে ১৫ বৎসর বয়সে Apcar & Co তে apprentice রূপে নিযুক্ত করিয়া দেন। এই কোম্পানীর জাহাজের লাইন ছিল। এখানে থাকিয়া খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নিজের কর্ম্মপ্রবণতা ও উৎসাহের দ্বারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স অল্প হইলেও, তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় তাঁহার উর্দ্ধতন সাহেবদের এতখানি বিশ্বাস ও আস্থা ছিল যে, যখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৮ বৎসর, সেই সময় এই কোম্পানীর জাপানগামী একখানি জাহাজের চতুর্থ ইঞ্জিনিয়ার হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায়, ইয়ার্ডের ম্যানেজার তাঁহাকে ডাকিয়া সেই ভার দিতে চাহিলেন। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রস্তুত হইয়া বিনয় কুমার এই কাজের ভার লইয়া জাপান চলিয়া যান। ইহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালীকে জাহাজের এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া হয় নাই। এরূপ অল্প বয়সে তো দূরের কথা। যখন তিনি তাঁহাদের কোম্পানীর সাহেবের নিকট হইতে পরিচয় পত্র লইয়া, জাহাজের Chief Engineer এর সহিত দেখা করিলেন, তখন সেই ইংরাজ ভদ্রলোক অবাক হইয়া বার বার তাঁহার আপাদ মস্তক দেখিতে লাগিলেন এবং তারপর প্রায় ১৫ দিন পর্য্যন্ত সময় ও অসময়ে হঠাৎ আসিয়া দেখিতেন যে এই বাঙ্গালী বালক তাহার কাজ ঠিক করিতেছে কি না। কয়েকদিন তাঁহার কাজ দেখিয়া তিনি এত খুসী হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাহার পর জাপান পৌছান ও ভারতবর্ষে ফেরা পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও তাঁহার কোন কাজ পর্য্যবেক্ষণ করেন নাই। Apcar Coতে পাঁচ বৎসর শিক্ষানবিশী করিয়া বিখ্যাত বাঙ্গালী বালতি নির্ম্মাতা Messrs P N Dutt & Coতে সামান্য বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন। নিজের যোগ্যতা ও সততার গুণে ক্রমে এই কোম্পানীর Foreman এর পদে উন্নিত হইয়াছিলেন, এবং কোম্পানীরও প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া ১৯২১সালে তাঁহাকে P N Dutt কোম্পানীই পূরা বেতনে ছুটি দিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেন, এবং এই সময় তিনি ইংলণ্ড ও ইউরোপের বহুস্থানে ঘুরিয়া ও কারখানা দেখিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। P N Dutt কোম্পানীতে তিনি প্রায় ১০ বৎসর কাজ করিয়াছিলেন। ১৯২২ সালে ইউরোপ হইতে ফিরিয়া

আসিবার কয়েকমাস পরে তিনি P N Dutt কোম্পানীর কাজ ছাড়িয়া দেন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত B K Dass & Coতে (Bantra Engineerring Works) যোগদান করেন। অক্লান্ত পরিশ্রম, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও সততা দ্বারা এই কোম্পানীটী ক্রমে ক্রমে ব্যবসায় ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং গত কয়েক বৎসর ধরিয়া Bengal Nagpore Railway-এর একজন প্রধান Contractor রূপে অনেকগুলি বিদেশী ও ইংরাজ কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগীতা করিয়া বহু লক্ষ টাকার কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতের প্রায় সমস্ত প্রধান রেলওয়ে ও মিলের সহিতও ইহাদের কারবার আছে। বিলাতে অবস্থান কালে বার্মিংহামে তিনি প্রথম বিমানপোতে আরোহণ করেন এবং সেই সময় হইতে বৈমানিক হইবার প্রবল ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করে। পরবর্ত্তী জীবনে অর্থের স্বচ্ছলতার সহিত তিনি নিজের সমস্ত শক্তি দিয়া ইহার সাধনায় প্রবৃত্ত হন। Bengal Flying Club প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯২৯ সালে তিনি বিমানপোত চালনা শিক্ষা আরম্ভ করেন। মাত্র কয়েকঘণ্টা শিক্ষকের সহিত উড়িয়া তিনি একাকী বিমান চালনা করিতে সক্ষম হন এবং *সেই বৎসরেই বিমান চালকের License* পান। ইহার একবৎসর পরে তিনি নিজে একখানি Machine ক্রয় করেন ও তাহা করাচী হইতে নিজে উড়াইয়া কলিকাতায় লইয়া আসেন। বিমান চালনায় তাঁহার দক্ষতা ও যশের কথা সকলেরই জ্ঞাত। বাঙ্গালীর বৈচিত্রহীন গতানুগতিক জীবনের ধারাকে তিনি যে নিজের শক্তি ও প্রতিভার দ্বারা গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। নিজেদের বাটীতে স্থাপিত নমাজটিকে স্থায়ী করিয়া তাহার কার্য্য সুচারুরূপে চালাইবার জন্য তাঁহার স্বর্গীয়া জননীর নামে পাঁচ হাজার টাকার একটী ফণ্ড করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষত্ব ছিল, সমস্ত কাজ সুন্দর করিয়া, নিখুঁত করিয়া করিবার চেষ্টা। অতি সামান্য বিষয়টিও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না। তাঁহার কোম্পানীর আফিসে যেখানে তিনি বসিতেন তাহার সম্মুখে বড় বড় করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—'Quality and Service,' সত্য সত্য ইহাই তাঁহার জীবনের মন্ত্র ছিল। শুধু কোম্পানীর কাজেই ইহা করিতেন তাহা নহে, বাড়ীর সমস্ত কাজও যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় সে *দিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।* বাড়ীতে

বিবাহ, উৎসবাদি হইলে কি কি রান্না কি ভাবে হইবে নিজে তাহার Menu প্রস্তুত করিতেন, কি ভাবে বসিবার যায়গা করিলে কাহারও কোনও অসুবিধা হইবে না নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতেন। এমন কি যাহাতে নিমন্ত্রিতদের জুতাগুলি পর্য্যন্ত গোলমাল না হইয়া যায়, সেজন্য প্রত্যেকের জুতা নম্বর দিয়া সাজাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা তিনি করিতেন। আমাদের বাঙ্গালী চরিত্রে এইরূপ শৃঙ্খলাপ্রিয়তা ও নিপুণতা বড়ই বিরল। মাতৃদেবীর প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। মায়ের অনুমতি না লইয়া তিনি কখনও কোন কাজ করিতেন না।

স্কুল কলেজের ছাপমারা লেখাপড়া তিনি অতি সামান্যই করিয়াছিলেন। কিন্তু জ্ঞানের পিপাসা তাঁহার অত্যন্ত প্রবল ছিল। সময় পাইলেই পড়াশোনা করিতেন। বহু মূল্যবান বইও তিনি নিজ ব্যয়ে কিনিয়াছিলেন। বহু বিবিধ বিষয়ে তিনি জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন এবং নানা বিষয়ের খোঁজ রাখিতেন। বাংলা ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই তাঁহার অধিকার ছিল। নানা মাসিক পত্রিকাতে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধগুলি তাঁহার লেখার গুণে সরস হইয়া উঠিত ও খুব আদরের সহিত গৃহীত হইত। দেশের ও দশের সেবা তাঁহার জীবনের মহাব্রত ছিল। হাওড়া, কলিকাতা ও বিদেশীয় বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। তাহার মধ্যে বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাব, কলিকাতা ও লণ্ডন Y. M. C. A. বাঁ্যাটরা অনাথ-বন্ধু সমিতি, বাঁ্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী, বাঁ্যাটরা নৈশ বিদ্যালয়, বেলিলিয়াস কসমোপলিটান ক্লাব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত তিনি হাওড়া ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন। আমেরিকার The National Geographic Society (Washington U. S. A.) স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে তাঁহাদের সদস্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। প্রবল জ্ঞানপিপাসার সহিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি গভীর অনুরাগ ও দুঃসাহসিক কাজ করিবার একটা প্রবল ইচ্ছা তাঁহার ছিল। শৈশবেই তাঁহার চরিত্রের এইদিকটির আভাষ পাওয়া গিয়াছিল। ভ্রমণেও তাঁহার গভীর আসক্তি ছিল। ভারতবর্ষের দ্রষ্টব্য এমন খুব কম স্থানই আছে—যেখানে তিনি যান নাই। ইউরোপের বহু স্থানেই তিনি গিয়াছিলেন, চিরতুষারঢাকা আল্পসের শিখর হইতে আরম্ভ করিয়া কাশ্মীর ও বদরিকাশ্রমের বহু দুর্গম স্থানেও তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

১৯৩৫ খ্রীঃ অব্দের ২৮শে এপ্রিল

(১৩৪২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই বৈশাখ) দমদমার নিকটবর্ত্তী গৌরীপুর গ্রামের নিকট অপ্রত্যাশিত বিমান দুর্ঘটনায় শোচনীয়-ভাবে তিনি নিহত হন। এই দুর্ঘটনায় অপর বাঙ্গালী বৈমানিক দেবকুমার রায় এবং দুইজন যাত্রীও নিহত হইয়াছিলেন।

বিনয়কৃষ্ণ দেব, রাজা বাহাদুর— শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ নবকৃষ্ণের প্রপৌত্র ও মহারাজ কমলকৃষ্ণের পুত্র। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিনয়কৃষ্ণ দেব অল্প বয়সেই সাহিত্য ও রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতরণ করেন। তিনি বঙ্গ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। তাঁহারই বিশেষ যত্নে বঙ্গীয় 'সাহিত্য সভা' ও 'সাহিত্য পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি নিজ বাটীতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন, তৎপর ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে ইহা স্থানান্তরিত হইয়া এক বৃহৎ বাটীতে স্থাপিত হইয়াছে। তিনি ইংরেজী ভাষায় 'কলিকাতার ইতিহাস' (Early History and Growth of Calcutta) নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসার প্রভূত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সাহিত্য সভায় মধ্যে মধ্যে সারবান্ প্রবন্ধ পাঠে তাঁহার গভীর চিন্তাশীলতা ও বহু গ্রন্থ অধ্যয়নের পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি কলিকাতার ইতিহাস ব্যতীত 'পঞ্চপুষ্প' প্রভৃতি আরও কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সাধারণ হিতকর কার্য্যে তিনি বাল্যকাল হইতেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং দরিদ্রের দুঃখ মোচনেও বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। তিনি শোভাবাজারে 'বেনাভোলেণ্ট সোসাইটী' (Sobhabazar Benavolent Society) স্থাপন করেন। এই সভা হইতে বহু দরিদ্র ব্যক্তি সাহায্য লাভ করিত। অনেক নিরাশ্রয় রমণী এবং দরিদ্র ছাত্রগণও তাঁহার নিকট হইতে নানাভাবে সাহায্য লাভ করিত। তিনি সমাজ সংস্কারে সর্ব্বদা উদ্যোগী ছিলেন। হিন্দুর সমুদ্র যাত্রার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন এবং সে সম্বন্ধে তিনি একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। দেশীয় ও ইংরেজ সরকারের মিলনকল্পে তিনি মাঝে মাঝে সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করিতেন। সেই সকল সম্মিলনীতে ভারতের প্রধান সেনাপতি, বঙ্গের ছোট লাট প্রভৃতি উচ্চতম রাজকর্ম্মচারীগণও আগমন করিতেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের বিরুদ্ধে তিনি বিশেষ আন্দোলন করিয়াছিলেন। সহবাস সম্মতি আইন সৃষ্টির প্রস্তাবকালে সমগ্র হিন্দু সমাজকে জাগ্রত করিতে বঙ্গবাসীর সহিত তিনিও বিশেষ উৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি বাল্য বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। বাল্যবিবাহ রোধের

বিধি সম্বন্ধে তিনি স্বনামধন্য ডক্টার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত যোগদানপূর্ব্বক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রেও তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের সময় নেতৃবৃন্দের সহিত মতানৈক্য হওয়ায় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ভারতের বড়লাট লর্ড ডাফরিণের বিদায় কালে তাঁহার প্রতি ভারতীয়দের শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ যে আয়োজন হইয়াছিল, তিনি তাহার একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। রাজপুত্র এবং বিলাসের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াও তিনি বিলাসীতা বর্জ্জিত ছিলেন। তাঁহার লিখিত 'বিলাস' প্রবন্ধ বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, মেও হাসপাতালের অবৈতনিক ট্রাষ্টী, কেম্বেল হাসপাতালের অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক, আলিপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভ্য এবং কলিকাতার অনেকগুলি গ্রন্থাগারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া, জনহিতকর অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে তিনি গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক মনোনীত সদস্যরূপে কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি ইংরেজ সরকারকর্ত্তৃক 'রাজা' উপাধি ভূষিত হন। ১৯০২ খ্রীঃ অব্দে তিনি কৈশর-ই-হিন্দ পদক (Kai-ser-i- Hind Medal) পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'কলিকাতা ঐতিহাসিক সমিতি' (Calcutta Historical Society) নামক সভার সহকারী সভাপতি (Vice-President) মনোনীত হন। ১৯১০ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজ সরকার তাঁহাকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন। সেই বৎসরই তিনি ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি ভাণ্ডারে তিন সহস্র টাকা ও কলিকাতার বড় লাট লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপনার্থ ঐ ভাণ্ডারে এক সহস্র টাকা দান করেন। ১৯১১ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা সহরে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের অভ্যর্থনা কল্পে তিনি আড়াই হাজার টাকা চাঁদা প্রদান করেন। ১৯১২ খ্রীঃ অব্দে ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতার রাজ প্রাসাদে ভারত সম্রাট ও তৎপত্নীর এক মজলিশ বসিয়াছিল; তৎকালে ঐ অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর, বিনয়কৃষ্ণকে রাজসমীপে যথারীতি পরিচয় করাইয়া দেন। ১৯১২ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের রাজপ্রতিনিধি পত্নী লেডী হার্ডিঞ্জ মহোদয়া রাজা বিনয়কৃষ্ণের সহধর্ম্মিনী, রাণী শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর নিমন্ত্রণে শোভাবাজার রাজপ্রাসাদে গমন করিয়াছিলেন। রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী, অধ্যাপক

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের কন্যা। বিনয়কৃষ্ণ বিনয়ী, পরোপকারী, সদালাপী বলিয়া সাধারণ্যে সুপরিচিত ছিলেন। ফলতঃ শোভাবাজার রাজ-বংশের গৌরব বহু পরিমাণে তাঁহার-দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল। ১৯১২ খ্রীঃ অব্দের ১লা ডিসেম্বর (১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১৬ই অগ্রহায়ণ) তিনি বঙ্গমাতার ক্রোড় হইতে মহাপ্রস্থান করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার প্রফুল্লকৃষ্ণ, প্রমোদকৃষ্ণ, প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ প্রভৃতি আট পুত্র ও তিন কন্যা বর্ত্তমান ছিলেন।

বিনয় বিজয়—তিনি ১৬১৩ খ্রীঃ অব্দে গুজরাটের এক বৈশ্য পরিবারে জন্ম-গ্রহণ করেন। কীর্ত্তিবিজয় নামক এক জৈন দার্শনিক পণ্ডিতের নিকট তিনি জৈন ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। এই কীর্ত্তিবিজয় সম্রাট আকবরের সমকালবর্ত্তী হরিবিজয় সূরীর শিষ্য ছিলেন। বিনয়বিজয় স্বীয় গুরু কির্ত্তী-বিজয়ের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া বারাণসী নগরে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য গমন করেন। এই সময়ে যশোবিজয় নামক অন্য একজন জৈন সন্ন্যাসী তাঁহার সহগামী হইয়াছিলেন। বারাণসী নগরে দ্বাদশ বৎসর অধ্যয়নে যাপন করিয়া ভারতের তীর্থস্থান দর্শনাভিলাষে তিনি বহির্গত হন। বহু-স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি ১৬৫১ খ্রীঃ অব্দে কাথিবার উপদ্বীপে জুনাগর নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি সুরাট ও মারবার প্রভৃতি স্থানেও ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৬৮১ খ্রীঃ অব্দে গুজরাটের অন্তর্গত রাণ্ডের নামক স্থানে তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি স্বীয় গুরু কীর্ত্তিবিজয়ের প্রীত্যর্থে, 'ন্যায় কর্ণিকা' (ন্যায়ের কর্ণভূষণ) নামে এক-খানা জৈন ন্যায় শাস্ত্রের সুন্দর গ্রন্থ, ১৬৫১ খ্রীঃ অব্দে প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও গ্রন্থ আছে।

বিনয়শ্রী—যে সকল ভারতীয় পণ্ডিত খ্রীঃ অষ্টম শতকের প্রারম্ভে তীব্বতে গমনপূর্ব্বক ভারতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থের তীব্বতী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

বিনয়াদিত্য – কাশ্মীরপতি জয়া-পীড়ের অন্য নাম। জয়াপীড় দেখ।

বিনয়াদিত্য সত্যাশ্রয়—৬৮০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতা প্রথম বিক্রমা-দিত্যের মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৬৯৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি একজন পশ্চিম চালুক্যবংশীয় পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি পল্লব বংশজ নরপতি দ্বিতীয় নরসিংহ এবং কলভ্র, কেরল, হৈহয়, বিল, মালব, চোল এবং পাণ্ড্য দেশের রাজাদিগকে সমরে পরাস্ত করিয়া-ছিলেন। সিংহল দ্বীপের কাবের নর-পতি ও পারশিক নরপতি তাঁহার সামন্ত নরপতির শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত তিনি উত্তর দেশের একজন পরাক্রান্ত নরপতিকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। নিরবদ্য পণ্ডিত তাঁহার গুরু ছিলেন। বিনয়াদিত্যের পরে তাঁহার তনয় বিজয়াদিত্য সত্যাশ্রয় রাজা হইয়াছিলেন।

বিনয়াদিত্য হয়শাল—তিনি দ্বারবতীপুরে বা দ্বার সমুদ্রে (মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত বর্ত্তমান হলেবিদ) পশ্চিম চালুক্যবংশীয় বিক্রমাদিত্যের সামন্ত নরপতিরূপে ১০৪৮—১১০০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তিনি কেলয় দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ইরেয়ঙ্গা বোধ হয় পিতার জীবিতকালেই পরলোকগত হইয়াছিলেন। ইরেয়ঙ্গা হয়শাল উত্তরদেশ জয় করিয়াছিলেন। ধারানগরীর ভোজ রাজাদেরে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তিনি এচল দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তৎপরে ইরেয়ঙ্গার পুত্র প্রথম বল্লাল ১১০৩ খ্রীঃ অব্দে রাজা হইয়াছিলেন। পশ্চিম চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় জগদেক মল্লের সামন্ত নরপতি পট্টিপোম্বুচ্ছপুরের সাঁতরাপতি জগদ্দেবকে বল্লাল পরাস্ত করিয়াছিলেন। তিনি ১১১৭ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা ত্রিভুবন মল্ল বিষ্ণুবর্দ্ধন রাজা হইয়া ১১৫৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি শান্তলা দেবীকে (অন্য নাম লকোমা দেবী) বিবাহ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি গঙ্গবংশীয়দিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের রাজধানী তালকাড় বা তালবনপুর দগ্ধ করিয়া নষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি কাঞ্চী, কঙ্গু, হাঙ্গল, কোয়াটুর (কোয়ম্বাটুর) এবং সপ্তকঙ্কন দেশ জয় করিয়াছিলেন। তিনি পাণ্ড্য, তুলুদেশপতি, পট্টিপোম্বুচ্ছপুরের জগদ্দেব, গোয়ার কাদম্ববংশীয় দ্বিতীয় জয়কেশী, চেঙ্গিরিপতি, কলদেশপতি, পশ্চিম ঘাটস্থিত মালব জাতির অধিপতি, নরসিংহ নামক রাজা ও মলে জাতির অধিপতিকে যুদ্ধে পরাজিত ও বশীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার একটী শিলা লেখ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার রাজ্য উত্তরে সাবিমেল, পূর্ব্বে নিম্ন নঙ্গলিঘাট, দক্ষিণে কঙ্গু, চের ও অনমেল দেশ এবং পশ্চিমে কঙ্কনস্থ বারকনুরঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কদম্ব দেশ অতি অল্প সময়ই তাঁহার অধীন ছিল। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহারই রাজত্বকালে দ্বিতীয় বল্লালের সামন্ত নরপতি ইহা বার বার জয় করিয়াছিলেন। একবার ইয়েল দুর্গের সিন্দপতি দ্বিতীয় আচুগী এবং তাঁহার প্রথম পুত্র পারমাড়ি, দ্বার সমুদ্র অবরোধ করিয়াছিলেন এবং হয়শালদের রাজধানী বেলুপুর আক্রমণ করিয়া বিষ্ণু বর্দ্ধনের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। একখানা সিন্দ দেশীয়

শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, চেঙ্গিরি, চের, চোল, মলয়, মেল, তুলুদের সপ্তদেশ, কোল্ল, পল্লব, কঙ্গু, বনবাসী, কাড়ম্বেল, লোলম্ববাড়ী ও হয়বে দেশ বিষ্ণু বর্দ্ধনের রাজ্যান্তর্গত ছিল। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম উদয়াদিত্য ছিল। গঙ্গবংশীয় গঙ্গরাজ বিষ্ণু বর্দ্ধনকে রাজ্য জয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। গঙ্গরাজ, চোল রাজের সামন্ত নরপতি অড়িয়ম বা ইড়িয়মকে পরাস্ত ও বিতাড়িত করিয়া গঙ্গবাড়ী প্রদেশ বিষ্ণু বর্দ্ধনের রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। এই গঙ্গরাজ আর অরবল প্রদেশের শাসনকর্ত্তা গঙ্গরস বোধ হয় একই ব্যক্তি। হলেবিড় শিলালেখ অনুসারে গঙ্গরস ১১৩৩ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। ত্রিভুবন মল্ল বিষ্ণু বর্দ্ধনের পরে তাঁহার পুত্র ত্রিভুবন মল্ল প্রথম নরসিংহ রাজা হইয়াছিলেন। তিনি ১১৫৯ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১১৭৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম ত্রিভুবন মল্ল নরসিংহ ভুজবল বীরগঙ্গ হয়শালপতি। তিনি এচেল দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জৈন ধর্ম্মের উৎসাহ দাতা হুল্লময়, তাঁহার কর্ম্মচারী ছিলেন। লকময় তাঁহার সামন্ত নরপতি ছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র ত্রিভুবন মল্ল দ্বিতীয় বল্লাল বা বীর বল্লাল ভুজবল বীরগঙ্গ হয়শাল রাজা হইয়া ১১৭৩—১২২৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনিই প্রথম স্বাধীন নরপতির ন্যায় সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। পশ্চিম চালুক্যবংশীয় নরপতি চতুর্থ সোমেশ্বরের সেনাপতি ব্রহ্মকে, দেবগিরির যাদববংশীয়দিগকে ও ভিল্লমকে পরাজয় করিয়াছিলেন। ভিল্লমের পুত্র জৈত্রসিংহকে পরাজয় করিয়া কুন্তল প্রদেশে তিনি আধিপত্য স্থাপন করেন। লক্কুণ্ডি নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে বল্লাল কর্ত্তৃক ভিল্লম পরাজিত ও নিহত হন (১১৯১ খ্রীঃ)। বিত্তময্য, গড়দসিংহয্য, বনবাসীর এরেয়ঙ্গ, তাড়নাড়ের অরমতিবল, কদম্ববংশীয় কামদেব, বেলবোলার রায়দেব, কুন্তল দেশের জগদল ভট্টমদেব ও অমৃতেশ্বর, নাগরখণ্ডের কমঠদ মল্লিশেট্টি, মহাপ্রধান দণ্ডনায়ক মল্লন, মাধবয্য ও বল্লয্য তাঁহারা সকলেই দ্বিতীয় হয়শাল পতি বল্লালের সামন্ত নরপতি ছিলেন। ১১৯৬ খ্রীঃ অব্দে বল্লাল হাঙ্গন দেশ আক্রমণ করিলে কদম্ববংশীয় কামদেবের সেনাপতি সোহনি কর্ত্তৃক প্রথমে প্রতিহত হইয়াছিলেন; কিন্তু পরে জয়লাভ করিয়াছিলেন। ১১৮৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভিল্লমের পুত্র জৈত্রসিংহকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই সময়ে বল্লালের সহিত লক্কিগুণ্ডির যুদ্ধে তিনি নিহত হন। ১২১০ খ্রীঃ অব্দে বল্লাল, দেবগিরির যাদববংশীয় সিঙ্গন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ১২২৪ খ্রীঃ

অব্দে বীরবল্লালের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় নরসিংহ রাজা হইয়াছিলেন। তিনি তেমন যোগ্য ভূপতি ছিলেন না। তিনি কাললে দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া দেবগিরির যাদব-বংশীয়দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাণ্ড্য রাজ্য তিনি চোল নরপতিকে দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় নরসিংহের পরে তাঁহার পুত্র বীর সোমেশ্বর রাজা হইয়া ১২৩৪—৫৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা বিত্তরসের কন্যা সোমল দেবী, বিজ্জলারাণী ও দেবল মহাদেবী তাঁহার মহিষী। বিজ্জলারাণী হইতে তাঁহার পুত্র তৃতীয় নরসিংহ এবং দেবল মহাদেবী হইতে পুন্নম্বলা নামে এক কন্যা ও বীর রামনাথ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বীর রামনাথ খুব সম্ভব পাণ্ড্য রাজাদের সামন্ত নরপতি হইয়াছিলেন। সোমেশ্বরের পরে তাঁহার পুত্র তৃতীয় নরসিংহ ১২৫৪—১২৯২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে তাঁহার মহাপ্রধান (মন্ত্রী) পেরুমালে দেব রৌত্ত রায়, রত্নপাল নামক এক রাজাকে পরাস্ত ও নিহত করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র তৃতীয় বল্লাল রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ১৩১০ খ্রীঃ অব্দে আলা-উদ্দিন দ্বার সমুদ্র জয় করেন। তখন বোধ হয় তাঁহার ক্ষমতা অতি অল্পই ছিল। ১৩২৭ অব্দে তাঁহার রাজ্য দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে তিনি শ্রীরঙ্গপত্তনের নিকট তোণ্ডানুরে গমন করেন।

বিনয়েন্দ্রনাথ সেন—বাঙ্গালী মনীষী ও শিক্ষাব্রতী। তিনি ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর (৯ই আশ্বিন ১২০৫ সাল) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মধুসূদন সেন। তিনি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মপ্রচারক ভাই প্রসন্নকুমার সেনের কন্যা ও পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি ব্যারিষ্টার প্রশান্তকুমার সেনের ভগিনী শকুন্তলা দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ সালে যখন মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মহাপ্রস্থান করেন, তখন তিনি ষোড়শ বর্ষীয় যুবক। মহাত্মা কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মানুরাগ তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি ইতিহাসে ও পরবৎসর দর্শনশাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষায় কৃতীত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। অধ্যাপনা কার্য্যে তাঁহার অনন্যসাধারণ কৃতীত্ব ছিল। তিনি বহুকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সদস্য ও উহার একাধিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় কমিটির সভ্য ছিলেন। আচার্য্য প্রসন্নকুমার রায়ের স্থলে তিনি কিছুকাল কলেজ সমূহের পরিদর্শকের কাজও করিয়াছিলেন। কলিকাতা ইউনি-ভার্সিটি ইনষ্টিটিউট (Calcutta University Institute) নামে পরি-

চিত ছাত্রদিগের প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘকাল উহার কর্ম্মসচিবরূপে তিনি প্রতিষ্ঠানটির নানা বিষয়ে উন্নতির জন্য প্রভূত পরিশ্রম করেন। তাঁহার মধুর প্রকৃতি, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, সকল সদনুষ্ঠানে আন্তরিক যোগ প্রভৃতি গুণের জন্য ছাত্র সমাজের তিনি পরম প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে, জেনেভা নগরে অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক উদার ধর্ম্মাবলম্বীদের 'সম্মেলনে' (International Congress of Liberal Religions) তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি হইয়া গমন করেন। উক্ত সম্মেলনের অধিবেশনের পর, তিনি পাশ্চাত্য একেশ্বরবাদী বন্ধুগণের আমন্ত্রণে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় গমন করিয়া বক্তৃতাদি প্রদান করেন। ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে লাহোর নগরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় একেশ্বরবাদীদের সম্মেলনে তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯১৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বিনায়ক—(১) তিনি 'চক্রোদ্ধার' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বিনায়ক—(২)খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে এই ভারতীয় পণ্ডিত, ক্ষণভঙ্গ সিদ্ধি ব্যাখ্যা গ্রন্থ তীব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

বিনায়ক পণ্ডিত—তাঁহার অন্যনাম নন্দ পণ্ডিত। তিনি কাশীর রাম পণ্ডিত ধর্ম্মাধিকারীর পুত্র। রাম পণ্ডিতের উর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ, লক্ষীধর ভাগনগর হইতে (নিজাম, হায়দরাবাদ) কাশীতে আসিয়া বাস করেন। বিনায়ক পণ্ডিত মাদুরার কেশব নায়কের উৎসাহে কেশব বৈজয়ন্তী এবং বংশ বর্ম্মার উদ্যোগে সংস্কার নির্ণয় রচনা করেন। কেশব বৈজয়ন্তী বিষ্ণু স্মৃতি সংহিতার টীকা। তাঁহার রচিত কাশীপ্রকাশ তত্ত্ব, মুক্তাবলী, শ্রাদ্ধমীমাংসা, হরিবংশ বিলাস এবং দত্তক মীমাংসা খুব প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

বিনায়ক পাল—তিনি মহারাজ মহেন্দ্র পালের পুত্র ও মহারাজ দ্বিতীয় ভোজের অনুজ ছিলেন। তাঁহাদের রাজ্য শ্রাবস্তী (বর্ত্তমান সাহেত মাহেত) ও বারাণসীর মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে ছিল। বিনায়ক পালের ৭৯৪ খ্রীঃঅব্দের একখানা অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে।

বিনীততুঙ্গ (প্রথম)—তিনি উড়িষ্যার তুঙ্গবংশীয় একজন নরপতি। তাঁহার পুত্র খড়্গাতুঙ্গ ও পৌত্র দ্বিতীয় বিনীততুঙ্গ। জগত্তুঙ্গ দেখ।

বিনীততুঙ্গ (দ্বিতীয়)—তিনি উড়িষ্যার তুঙ্গবংশীয় রাজা ১ম বিনীততুঙ্গের পৌত্র ও খড়্গাতুঙ্গের পুত্র। জগত্তুঙ্গ দেখ।

বিনীত দেব—তিনি একজন বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত। রাজা গোবিচন্দ্রের পুত্র ললিতচন্দ্রের সময়ে খ্রীঃ সপ্তম শতকে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে

ছিলেন। অনেকগুলি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি প্রধান। (১) ন্যায় বিন্দু টীকা। (২) হেতুবিন্দু টীকা। (৩) বাদান্যায় ব্যাখ্যা। (৪) সম্বন্ধ পরীক্ষা টীকা। (৫) আলম্বন পরীক্ষা টীকা। (৬) সন্তানান্তর সিদ্ধি টীকা প্রভৃতি। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থই নানা পণ্ডিতকর্ত্তৃক তীব্বতীয় ভাষায় অনুদিত হইয়াছে।

বিনীত রুচি—উত্তর ভারতের উগ্যান নামক স্থানের একজন বৌদ্ধ শ্রমণ। বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় দুইখানা ধর্ম্ম গ্রন্থ তিনি ৫৮৩ খ্রীঃ অব্দে চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

বিনোদচন্দ্র মিত্র— প্রখ্যাতনামা বাঙ্গালী ব্যবহারজীবী। তিনি হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ বিচারপতি সার রমেশচন্দ্র মিত্রের তৃতীয় পুত্র ছিলেন। এদেশে ও ইংলণ্ডে উচ্চ শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তাঁহার সতীর্থ ছিলেন। আইন ব্যবসায়ে অল্পকাল মধ্যে তিনি বিশেষ কৃতীত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে হাইকোর্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউনসেল (Standing Councel) হইয়াছিলেন। কিছুকাল এডভোকেট জেনারেল'এর (Advocate General) পদেও তিনি নিযুক্ত ছিলেন। কয়েক বৎসর তিনি বাঙ্গালা সরকারের শাসন পরিষদের (Executive Council) সদস্যও হইয়াছিলেন।

১৯২৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি ইংলণ্ডে সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণ প্রিভি কাউন্সেলের (Privy Council) অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হন। মাত্র একবৎসর কাল ঐ বহু সম্মানিত পদে আসীন থাকিয়া ১৯৩০ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ শ্রাবন) ইংলণ্ডেই তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার পাচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারই কনিষ্ঠ সহোদর সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র।

বিনোদ চন্দ্র সিংহ বা রূপসিংহ— শ্রীহট্টের অন্তর্গত জগন্নাথপুরের রাজা বিজয়সিংহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পরমানন্দ সিংহের পুত্র।

বিন্দু—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত। তিনি স্বীয় 'রসপদ্ধতি' গ্রন্থে সংক্ষেপে চিকিৎসাবিধি প্রকটিত করিয়াছেন। মহাদেব পণ্ডিত এই গ্রন্থের এক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিন্দুকলস—যে সকল ভারতীয় পণ্ডিত খ্রীঃ অষ্টম শতকের প্রারম্ভে তীব্বতে গমনপূর্ব্বক ভারতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থের তীব্বতী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

বিন্দুনাথ—হঠযোগ প্রদীপিকা মতে চৌদ্দজন প্রধান হঠযোগী ছিলেন। তন্মধ্যে তিনি একজন।

বিন্দুভট—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকার। তাঁহার গ্রন্থ হইতে চন্দ্রাট স্বীয় গ্রন্থ যোগরত্ন সমুচ্চয়ে প্রমানাবলী উদ্ধার করিয়াছেন।

বিন্দুসার— মগধের মৌর্য্যবংশীয় বিখ্যাত নরপতি চন্দ্রগুপ্তের পুত্র। ২৯৭ খ্রীঃ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত পরলোক গমন করিলে, তিনি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ২৪ বৎসর রাজত্ব করেন। খ্রীঃ পূঃ ২৭২ অব্দে তিনি পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র অশোক রাজা হন। তাঁহার অন্যতমা পত্নী ব্রাহ্মণ কন্যা সুভদ্রাঙ্গীর গর্ভে অশোক ও সুশীম (অন্যনাম বীতশোক বা সুমন) নামে দুই পুত্র জন্মে। তাঁহার ষোড়শ পত্নীর গর্ভে শতাধিক পুত্র জন্মিয়াছিল।

বিন্ধ্য বর্ম্মা—তিনি মালবের পরমারবংশীয় নরপতি অজয় বর্ম্মার পুত্র ও যশো বর্ম্মার পৌত্র। যশো বর্ম্মার পরেই এই বংশ দুইভাগে বিভক্ত হয়। প্রধান শাখায় অজয় বর্ম্মা, বিট্ট বর্ম্মা, সুভট বর্ম্মা ও অর্জ্জুন বর্ম্মা পর পর রাজা হইয়াছিলেন। অপর পক্ষে লক্ষ্মী বর্ম্মা, হরিশ্চন্দ্র বর্ম্মা ও উদয় বর্ম্মা পর পর রাজা হইয়াছিলেন। ১১৬০ খ্রীঃ অব্দে বিন্ধ্য বর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন।

বিন্ধ্যবাসী—একজন দার্শনিক পণ্ডিত। দেবভদ্র তাঁহার রচিত ন্যায়াবতার বিবৃতি গ্রন্থে বিন্ধ্যবাসীর বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন।

বিন্ধ্যবাসিনী চৌধুরাণী— তিনি ময়মনসিংহের সন্তোষের প্রসিদ্ধ জমিদার দ্বারকানাথ রায় চৌধুরীর মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী। বাখরগঞ্জ জেলার গাভা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ঈশানচন্দ্র ঘোষ। সাত বৎসর বয়সের সময় দ্বারকানাথ রায় চৌধুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। দ্বারকানাথ অল্প বয়সেই প্রমথনাথ ও মন্মথনাথ নামে দুইটী শিশুপুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর বিন্ধ্যবাসিণী ইংরেজ সরকার হইতে জমিদারী পরিচালন ভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার সুব্যবস্থায় ও সুপরিচালনায় জমিদারীর উন্নতি হইয়াছিল। পুত্রদের তিনি সুশিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। প্রমথনাথ ও রাজা স্যার মন্মথনাথ উভয়েই বঙ্গদেশে সুপরিচিত। তিনি শিক্ষিতা, দানশীলা ও ধর্ম্মানুরাগিণী ছিলেন। টাঙ্গাইলের বিন্ধ্যবাসিনী উচ্চ ইংরেজী বালক ও বালিকা বিদ্যালয় তাঁহার শিক্ষানুরাগের পরিচয় প্রদান করিতেছে। অনেক দরিদ্র ছাত্র তাঁহার নিকট হইতে মাসিক সাহায্য লাভ করিত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার গোপন দানও অনেক ছিল। তিনি কাশী, গয়া, মথুরা, বৃন্দাবন, কামাখ্যা প্রভৃতি হিন্দুর বহু তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি সন্তোষে 'ধর্ম্ম-বিতরণী' নামে একটী হরিসভা স্থাপন

করেন। তাঁহার স্বামীর প্রতিষ্ঠিত টাঙ্গাইলের দ্বারকানাথ হাঁসপাতালের বাটী তিনি পাকা করিয়া দেন। তিনি সন্তোষে একটী বাটী ও তাহার এক প্রান্তে একটী মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দ্বারকানাথ নামে একটী শিবমূর্ত্তি ও বিন্ধ্যবাসিনী বিগ্রহ স্থাপন করেন। তিনি তাঁহার পিতা ঈশানচন্দ্র ঘোষের শ্মশানেও একটী স্মৃতি মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ঠাকুর বাড়ীতে তিনি একটী অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। দেশের শিল্প বাণিজ্য ও অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যের প্রতিও তাঁহার সহানুভূতি ছিল।

বিন্ধ্যশক্তি—তিনি বাকাটক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। সম্ভবতঃ তিনি ২৭৫ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার রাজ্যের উত্তরে মহাদেব গিরি, পশ্চিমে অজন্তা পর্ব্বত, পূর্ব্বে মহানদীর উৎপত্তি স্থল ও দক্ষিণে গোদাবরী নদী ছিল অর্থাৎ উত্তর মহারাষ্ট্র ভূভাগ তাঁহার রাজ্য ছিল। তাঁহারা বিষ্ণুবৃদ্ধ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজা ছিলেন। তাঁহারা স্বাধীন নরপতি ছিলেন। বিন্ধ্যশক্তির পরে তাঁহার পুত্র প্রথম প্রবর সেন রাজা হন। তাঁহার পুত্র গৌতমী পুত্র, ভবনাগভার শিবের কন্যাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি পিতার জীবিতকালেই পরলোক গমন করেন। তৎপরে প্রবর সেনের পৌত্র, গৌতমীপুত্রের অপত্য প্রথম রুদ্রসেন রাজা হইয়াছিলেন। তৎপরে রুদ্র সেনের পুত্র পৃথিবী সেন রাজা হইয়াছিলেন। ব্যাঘ্রদেব তাঁহার সামন্ত নরপতি ছিলেন। পৃথিবী সেনের তনয় দ্বিতীয় রুদ্রসেন তৎপরে রাজা হইয়াছিলেন। তিনি রাজধিরাজ দেবগুপ্তের কন্যা প্রভাবতী গুপ্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তৎপরে দ্বিতীয় রুদ্রসেনের পুত্র দ্বিতীয় প্রবর সেন রাজা হইয়াছিলেন। তৎপরে তৎপুত্র তৃতীয় রুদ্রসেন, রাজা হন, তাহার পরে তাহার পুত্র (নাম অজ্ঞাত) রাজা হন। তৎপরে তাঁহার পুত্র দেবসেন ও দেব সেনের পরে তাঁহার পুত্র হরি সেন রাজা হইয়াছিলেন। এই বংশের মাত্র দশজন রাজারই নাম পাওয়া গিয়াছে।

বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ—তিনি অন্নম ভট্ট বিরচিত তর্ক সংগ্রহের 'তর্কসংগ্রহ তরঙ্গিনী' নামে এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

বিপশ্যী—থেরবাদী বৌদ্ধ মতে, মহাত্মা শাক্যসিংহ বুদ্ধের পূর্ব্বে আরও ২৪জন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বিপশ্যী বুদ্ধ উনবিংশতম।

বিপিনকৃষ্ণ বসু, স্যার—নাগপুর প্রবাসী একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী। ১৮৫১ সালে কলিকাতার এক বিখ্যাত কায়স্থ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিশন হইতে প্রবেশিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে ২১ বৎসর বয়সে তিনি উক্ত কলেজ হইতে এম্-এ এবং বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। কিন্তু দীর্ঘকাল তিনি কলিকাতায় ছিলেন না। প্রথমে তিনি জব্বলপুরে গমন করেন এবং কিছুকাল স্থানীয় একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি জব্বলপুর হইতে নাগপুরে আগমন করিয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। তথায় অল্প কাল মধ্যেই তিনি আইন ব্যবসাক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি স্মলকজ কোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি নিযুক্ত হন। ইহার তিন বৎসর পরে ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি নাগপুরের গবর্ণমেণ্ট এডভোকেট নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ পদে কার্য্য করেন। ঐ সময় তিনি ইম্পিরিয়াল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের বেসরকারী সদস্য মনোনীত হওয়ায় উপরোক্ত পদ ত্যাগ করেন। মধ্যপ্রদেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন কোন দায়িত্ব সম্পন্ন পদ ছিল না যাহা তিনি অধিকার করেন নাই। তিনি নাগপুর মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যাধ্যক্ষ (Secretary) ছিলেন। নাগপুর জেলা কাউন্সিলের মনোনীত সদস্য, লেডী ডাফরিণ ফণ্ডের প্রাদেশিক সভার সদস্য প্রভৃতি অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নাগপুর উকীল সভার তিনিই অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে ভারতীয় দুর্ভিক্ষ কমিশনের তিনিই একমাত্র ভারতীয়সদস্য ছিলেন। ইম্পিরিয়েল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য সদস্য মনোনীত হইয়া ইউনিভারসিটি বিল, কো-অপারেটিভ সোসাইটি বিল প্রভৃতি অনেক বিল পাশ করাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি নাগপুর হাইকোর্টের অস্থায়ী জুডিশিয়াল কমিশনার নিযুক্ত হন। ঐ পদে তিনি আট মাস কাল কার্য্য করিয়াছিলেন। নূতন মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় তিনি মনোনীত সদস্য ছিলেন এবং তথায় তাঁহার বিশেষ প্রভাব ছিল। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের তিনি ষ্টেভিং কাউন্সেলও ছিলেন। শিক্ষা প্রচার বিষয়েও তিনি মধ্যপ্রদেশে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় ১৯২৩ সালে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস্চান্সেলর নিযুক্ত হইয়া ঐ পদে ১৯২৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি অনেক অর্থ দান

করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা শিশির-কুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ ও গোপাল লাল ঘোষ তাঁহাদের সহিত স্যার বিপিনকৃষ্ণের আন্তরিক ঘনিষ্টতা ছিল। তাঁহাদের অমৃতবাজার পত্রিকায় তিনি দাক্ষিণাত্যের জনসাধরণের দারিদ্রতা ও ভূমি রাজস্ব সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিতেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৯২৭ খ্রীঃ অব্দে উক্ত পত্রিকায় নক্ষত্র মণ্ডল সম্বন্ধে তাঁহার শেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে নাগপুরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সপ্তম অধিবেশনে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। ইংরেজ সরকার কর্ত্তৃক তিনি ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে সি-আই-ই, ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে নাইট এবং ১৯২০ খ্রীঃ অব্দে কে-সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯৩৩ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে (১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র) তিরাশী বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

বিপিনচন্দ্র পাল— প্রখ্যাতনামা রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও দেশসেবক। ১২৬৪ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে শ্রীহট্ট জিলার হবিগঞ্জ মহকুমার পৈল গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রামচন্দ্র পাল মহাশয় প্রথমে সেরেস্তাদার ছিলেন। মধ্যে কিছুকাল মুন্সেফী চাকুরী করিয়া পরে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ব্যবহার-জীবীরূপে তিনি বিশেষ বিত্তবান হন। ধর্ম্মভীরু, নির্লোভ ও চরিত্রবান লোক বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে কোনও সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি পত্নীরই সানুনয় অনুরোধে দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন। এই দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে বিপিনচন্দ্র ও এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবের প্রথম কয়েক বৎসর বিপিনচন্দ্র পিতার সহিত, তাঁহার কর্ম্মস্থল, ঢাকা বাখরগঞ্জ জিলার কোটের-হাট প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। শেষোক্ত স্থানেই গুরু মহাশয়ের নিকট তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। সাত বৎসর বয়সের সময়ে পৈতৃক বাস ভবনে তাঁহার চূড়াকরণ সম্পন্ন হয়। এই চূড়াকরণ প্রথা বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

বিপিনচন্দ্রের পিতা ওকালতী উপলক্ষে শ্রীহট্ট সহরে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলে, সেই খানেই প্রকৃত পক্ষে তাঁহার শিক্ষালাভ আরম্ভ হয়। সামান্য কিছুকাল এক মৌলবীর নিকট ফার্সী পড়িয়া তিনি ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। তখন শ্রীহট্টে যে দুইটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল, ঐ দুইটিই

ইংরেজ পাদ্রীদের পরিচালিত ছিল; উহাদের একটিতে বিপিনচন্দ্র প্রবেশ করেন। কিছুকাল পরে স্থানীয় হিন্দুরা পাদ্রীদের কোনও কোনও ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া নিজেরাই একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। একবার বিপিনচন্দ্র বাল্যসুলভ চপলতা বশতঃ এক মুসলমানের তৈরী লেমনেড খাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ইহা জানিতে পারিয়া প্রথমে তাঁহকে বিশেষ নিগ্রহ করেন এবং ইংরেজি শিক্ষার ফলে পুত্র এইরূপ স্ব-ধর্ম্ম-বিরোধী কাজ করিতে শিখিতেছে মনে করিয়া তাঁহকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। প্রায় ছয় মাস পরে পত্নীর পরামর্শে পুনরায় পুত্রকে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন। এই বিদ্যালয় হইতেই ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। কলিকাতায় তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়া ছাত্র জীবন শেষ করেন।

কলিকাতার ছাত্র জীবনের মধ্যেই বিপিনচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত আরম্ভ করেন। কলিকাতার প্রখ্যাত নামা ধাত্রী বিদ্যা বিশারদ ডাঃ সুন্দরী মোহন দাস মহাশয় বিপিনচন্দ্রের এক জিলা বাসী ছিলেন। সুন্দরী মোহনের সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীহট্টে থাকিতেই (১৮৬৬—৭০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে) তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি কেশবচন্দ্রের অনন্য সাধারণ প্রভাব জীবনে অনুভব করেন এবং ক্রমে ক্রমে বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সহিতও তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপিত হয়। বিপিনচন্দ্র ক্রমে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ স্নেহের পাত্র হন। তাঁহার জীবনে শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রভাব বিস্তৃত ভাবেই পড়িয়াছিল। ১৮৭৭ সালে তিনি শাস্ত্রীমহাশয়ের বিশিষ্ট সাধক দলে দীক্ষিত হন। এই সময়ে তাঁহাদের দীক্ষার একটী বিশেষ ঘটনা বিপিনচন্দ্র এই ভাবে বিবৃতি করিয়াছেন।

'তখনও তিনি (শাস্ত্রীমহাশয়) হেয়ার স্কুলে কাজ করিতেন এবং স্কুলের দোতলার একটা ঘরে রাত্রিকালে তাঁহার শোবার ব্যবস্থাও ছিল। এই খানেই আমাদের নূতন দীক্ষা হয়। নিরাকার ব্রহ্মোপাসক হইলেও শাস্ত্রীমহাশয় কবি মানুষ একেবারে বাহ্য ক্রিয়া কলাপের প্রতি বীতরাগ হন নাই। সুতরাং আমাদের এই দীক্ষাতে কতকটা প্রাচীন হিন্দু যজ্ঞের অনুকরণ করিয়াছিলেন। একটা গামলাতে আগুন জ্বালিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা,

পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, পরাধীনতা প্রভৃতি আমরা যে আদর্শ সাধনের জন্য এই ব্রত গ্রহণ করিতেছিলাম, তাহার পরীপন্থী যা কিছু নিজের প্রবৃত্তি এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সেগুলি অশ্বথ পাতায় লিখিয়া এই আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়াছিলাম। জনে জনে এইরূপ প্রথমে এগুলিকে এই আগুনে পোড়াইয়া সকলে মিলিয়া এই অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া একটা গাথা গাহিয়া, এই অগ্নির চারিদিকে নতজানু হইয়া, আমাদের প্রতিজ্ঞাগুলি পড়িয়া ঐ প্রতিজ্ঞা পত্রে নাম সহি করিয়াছিলাম। ব্রহ্মোপাসনা করিয়া এই ব্রতানুষ্ঠান আরম্ভ হয় এবং ব্রহ্মকৃপা স্মরণ করিয়া ইহার শান্তিবাচন হয়। শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।' তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা পত্রে প্রধানতঃ নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি ছিল—(১) আমরা প্রতিমা পূজা করিব না এবং প্রতিমা পূজার সহিত কোন প্রকার সংশ্লিষ্ট থাকিব না। (২) আমরা বাক্যে ও কার্য্যে জাতিভেদ মানিব না এবং যাহাতে এ কুপ্রথা দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া যায়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিব। (৩) আমরা পরিবারে ও সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করিব এবং প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিব। (৪) আমরা নিজেরা একুশ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করিব না; এবং কোন বালিকাকে তাহার ষোড়শ বৎসরের পূর্ব্বে পত্নীরূপে গ্রহণ করিব না এবং যে বিবাহে পুরুষের বয়স একুশের কম এবং বালিকার বয়স ষোল বৎসরের কম, সেরূপ বিবাহে কোনও প্রকারে সাহায্য করিব না ও তাহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিব না। (৫) আমরা যথাসাধ্য স্ত্রীলোক এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিব। (৬) আমরা নিজেদের এবং দেশের লোকের স্বাস্থ্য, শক্তি ও শৌর্য্য, বৃদ্ধির জন্য ব্যায়াম চর্চ্চার প্রচার করিব এবং নিজেরা অশ্বারোহণ ও বন্দুক চালনা অভ্যাস করিব এবং দেশমধ্যে যাহাতে এসকল বিদ্যার বহুল প্রচার হয়, তাহার চেষ্টা করিব। (৭) আমরা একমাত্র স্বায়ত্ব শাসনকেই বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট শাসন ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করি, তবে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া, এখন যে বিদেশীয় রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার আইন কানুন মানিয়া চলিব। কিন্তু দুঃখ, দরিদ্র, দুর্দ্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও এই গবর্ণমেণ্টের অধীনে কখনও দাসত্ব স্বীকার করিব না। এই দীক্ষা গ্রহণ ব্যাপারে যাঁহারা বিপিনচন্দ্রের সহকর্ম্মী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ভারত মঙ্গল, হেলেনা কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা আনন্দচন্দ্র মিত্র, হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল তারাকিশোর

চৌধুরী (যিনি পরে ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজী নামে খ্যাত হন) এবং পূর্ব্বোক্ত ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের সহিত বাঙ্গালী পাঠক খুব পরিচিত।

এইভাবে একরূপ ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হইবার সংবাদ বিপিনচন্দ্রের পিতার গোচর হইলে, তিনি মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করেন। কিন্তু অতি কঠোর প্রকৃতি ও সংযত চরিত্রের লোক ছিলেন বলিয়া, বাহিরে কোনওরূপ উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করিয়া, একবার বিপিনচন্দ্রের ছয় মাসের খরচের টাকা পাঠাইয়া ও তৎসঙ্গে একখানি বিষাদপূর্ণ পত্র লিখিয়া তখনকার মত তিনি পুত্রের সহিত সকল সংশ্রব ছিন্ন করিলেন।

ইহার পর হইতেই বিপিনচন্দ্র প্রকাশ্য ও ঘনিষ্ঠভাবে ব্রাহ্ম সমাজের সহিত যুক্ত হইয়া পড়িলেন। কুচবিহারের নাবালক মহারাজার সহিত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নাবালিকা কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ব্রাহ্ম সমাজে বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহারই ফলে আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস প্রভৃতির চেষ্টায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপিনচন্দ্র এই বিরোধী দলের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দের প্রথমভাগেই মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে, বিপিনচন্দ্র কটকের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া গমন করেন। তাহার পূর্ব্বেই কলিকাতায় আনন্দমোহন বসু প্রভৃতির চেষ্টায় ও যত্নে সিটি স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি ঐ বিদ্যালয়েই শিক্ষকতা-প্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের (বাঙ্গাল) নব্যযুবক মাত্র; তিনি কি কলিকাতার ছাত্রদিগকে বশ করিতে পারিবেন, এই আশঙ্কায় কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে উক্ত বিদ্যালয়ে কাজ দিলেন না। ইহাতে প্রকারান্তরে বিপিনচন্দ্রের মঙ্গলই হইয়াছিল; কারণ তিনি অল্পকাল মধ্যেই নিজের যোগ্যতার অনুরূপ কর্ম্মক্ষেত্র লাভ করিয়াছিলেন।

বিপিনচন্দ্র কটকের যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হইয়া গমন করিয়াছিলেন, উহার প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন প্যারীমোহন আচার্য্য নামক একজন উড়িষ্যা প্রবাসী বাঙ্গালী। তিনি প্রথম অজাতশ্মশ্রু বিপিনচন্দ্রকে দেখিয়া, তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় সন্দিহান হন; কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহার সন্দেহ দূর হয়। সেই বৎসর গ্রীষ্মের বন্ধে তিনি, ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হইবার পর, প্রথমবার স্বগ্রামে গমন করেন। রামচন্দ্র পাল মহাশয় পুত্রকে পূর্ব্বের ন্যায় আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ বোধ করেন। যতটা সম্ভব আচার মানিয়া তিনি পুত্রকে কিছুকাল স্বগৃহে থাকিবার সুযোগ প্রদান করেন।

কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া আসিয়া সেই বৎসরের শেষেই বিপিনচন্দ্র চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য তিনি যে সকল ছাত্রকে অনুপযুক্ত বিবেচনায় পাঠাইতে অসম্মত হন, সত্বাধিকারী প্যারীমোহন, বিপিনচন্দ্রের মীমাংসার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকেও পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করেন।

কটক হইতে ফিরিয়া আসিবার বৎসর খানেক পরে, কলিকাতাস্থ শ্রীহট্ট সম্মিলনীর অনুরোধে তিনি শ্রীহট্টে যাইয়া একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে "শ্রীহট্ট জাতীয় বিদ্যালয়" নামে নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হইল এবং বিপিনচন্দ্র উহার প্রধান শিক্ষক হইলেন। এই বিষয়ে রাজচন্দ্র চৌধুরী ও ব্রজেন্দ্রনাথ সেন নামক তাঁহার দুইটি সমবিশ্বাসী বন্ধু তাঁহার সহায় ছিলেন। তাঁহাদের প্রাণপণ যত্নে অল্পকাল মধ্যেই বিদ্যালয়টি বিশেষ উন্নতি লাভ করে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ভিন্ন তিনি স্থানীয় একাধিক জনহিতকর কাজের সহিত যুক্ত ছিলেন। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের তিনি একজন প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। তদ্ভিন্ন শ্রীহট্ট সমিতি (Sylhet Association) নামক একটি প্রতিষ্ঠানের তিনি সহঃ সম্পাদক ছিলেন এবং রাজচন্দ্র বাবু ব্রজেন্দ্র বাবু প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া তিনি "পরিদর্শক" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন। ধরিতে গেলে এই সময়েই তাঁহার জনসেবার হাতে খড়ি হয় এবং তাঁহার বিভিন্ন মুখী প্রতিভা ব্যাপ্ত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তিনি বেশী দিন শ্রীহট্টে থাকিতে পারেন নাই। অতিরিক্ত মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। চিকিৎকগণের পরামর্শে তিনি একরূপ স্থায়ীভাবেই শ্রীহট্ট হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হন।

এই সকল কাজে তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত অস্বচ্ছল ছিল। বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার মূল্য স্বরূপ তাঁহারা তিন বন্ধুতে যাহা পাইতেন তাহা অতি সামান্য। দুই বেলা উদরপূর্ত্তি করিয়া আহারের সংস্থান হইত না। তাঁহার পিতা, বন্ধুবান্ধবগণের পরামর্শে তাঁহাকে ভালরূপ অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু সেই সাহায্যের বিনিময়ে তিনি যে সকল সর্ত্তে আবদ্ধ করিতে চাহিয়া ছিলেন, বিপিনচন্দ্র তাহাতে সম্মত না হওয়ায়, অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় নাই। তদুপরি বিপিনচন্দ্রের পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া চরমপত্রের সাহায্যে তাঁহাকে সমুদয় সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত করিলেন।

এই সময়ের মধ্যে প্রসিদ্ধা মারাঠী মহিলা রমাবাঈ সরস্বতী শ্রীহট্টে গমন

করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত তথাকার ব্যবহারজীবী বিপিনবিহারী দাসের বিবাহের পূর্ব্ব সূচনা সংঘটিত হইয়াছিল (রমাবাঈ সরস্বতী দ্রষ্টব্য)।

১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যভাগে বিপিনচন্দ্র সিলেটের কর্ম্মজীবন ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বৎসরাধিককাল কলিকাতায় থাকিবার পর তিনি বাঙ্গালোরে একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ পাইয়া তথায় গমন করেন। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রায় বাহাদুর আর্কট নারায়ণ স্বামী মুদালিয়র অতি সামান্য অবস্থা হইতে বিপুল বিত্তের অধিকারী হন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রীর বিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহারই প্রার্থনায় শাস্ত্রী মহাশয় বিপিনচন্দ্রকে দূরদেশে যাইতে প্ররোচিত করেন।

বাঙ্গালোরে তিনি প্রায় দেড় বৎসর ছিলেন। বিদ্যালয়ের স্বত্বাধিকারীর কোনও আচরণে ক্ষুণ্ণ হইয়া তিনি চাকুরী ছাড়িয়া দেন। এই সময়ের মধ্যেই ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই নগরে ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে তিনি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পালিত কন্যা এলাহাবাদের এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বাল-বিধবা কন্যাকে বিবাহ করেন। সরকারী হিসাব-পরীক্ষা বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী (Assistant Accountant General) রজনীনাথ রায় মহাশয় তখন বোম্বাইতে ছিলেন। তাঁহারই বিশেষ উৎসাহে ও উদ্যোগে ঐ বিবাহ বোম্বাই নগরীতে সম্পন্ন হয়।

বাঙ্গালোরে বাস করিবার সময়েই বিপিনচন্দ্র দুর্গামোহন দাসের সহিত পরিচিত হন। দুর্গামোহন যখন জানিতে পারিলেন যে, বিপিনচন্দ্র ঐ চাকুরী পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন তিনি বিপিনচন্দ্রকে তাঁহার দুই পুত্র সতীশরঞ্জন ও জ্যোতিষরঞ্জনের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে বলিলেন। দুর্গামোহনের ইচ্ছা ছিল যে, পুত্রদ্বয়কে এদেশেই উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করিবেন। (দুর্গামোহনের পুত্রদ্বয়ের মধ্যে সতীশরঞ্জন (S. R. Das) ভারত সরকারের ব্যবস্থা সচিব (Law Member) হইয়াছিলেন এবং জ্যোতিষরঞ্জন রেঙ্গুনে আইন ব্যবসায় করিয়া তথাকার হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি হইয়াছিলেন) তদনুসারে ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দের প্রথমভাগেই বিপিনচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া সতীশরঞ্জন ও জ্যোতিষরঞ্জনের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে, দুর্গামোহনের ভ্রাতা ভুবনমোহন কর্ত্তৃক সম্পাদিত সাপ্তাহিক বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন (Bengal Public Opinion) এর সম্পাদক কার্য্যেও তাঁহাকে কিছু কিছু

সাহায্য করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত উপার্জ্জনের জন্য অন্যান্য সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশে একটা রাজনীতি ও ধর্ম্মমূলক বিপ্লব চলিতেছিল। খ্রীষ্টীয় ও ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, সনাতন হিন্দু ধর্ম্মকে উপলক্ষ করিয়া এক প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। বিপিনচন্দ্র এই আন্দোলনে, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে বক্তৃতাদি দিতে আরম্ভ করেন। তিনি যখন প্রথম ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন, তখন হইতে তাঁহার পিতা তাঁহার সহিত সকলপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তিনি বিপিনচন্দ্রের কোনও সংবাদই রাখেন নাই। ক্রমে বিরাগের তীব্রতা হ্রাস পাইলে ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে বিপিনচন্দ্র পিতার আহ্বানে শ্রীহট্টে গমন করেন। কিন্তু সামাজিক শাসনের জন্য তাঁহার সহিত একত্র থাকা সম্ভব হইবে না মনে করিয়া তিনি একটি পৃথক বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়া, স্বয়ং সেই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন, নিজের পৈতৃক গৃহ পুত্রকে বাস করিবার জন্য প্রদান করিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই রামচন্দ্র পাল মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করেন। পূর্ব্বে তিনি যে চরম পত্রের দ্বারা পুত্রকে বিষয়চ্যুত করিয়া গিয়াছিলেন, এইবার তাহা বাতিল করিয়া, নূতন চরম পত্র (Will) প্রস্তুত করিয়া প্রায় সমুদয় সম্পত্তি তাঁহাকেই দিয়া যান।

বাঙ্গালোর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি যখন কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন হইতেই তিনি দেশের রাজনীতি আন্দোলনের সহিত যুক্ত হন। মান্দ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসমিতির তৃতীয় অধিবেশনে (১৮৮৭ খ্রীঃ) তিনি প্রতিনিধি (Delegate) স্বরূপ উপস্থিত ছিলেন এবং অস্ত্র আইন প্রত্যাহারের দাবী সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। ইহার পর কিছুকাল লাহোরের প্রসিদ্ধ ট্রিবিউন (The Tribune) পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন। ঢাকার নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় উহার সম্পাদক ছিলেন। তাহার পর ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় আসিয়া তিনি কলিকাতা Public Libraryর (যাহা বর্ত্তমানে Imperial Library নামে পরিচিত) গ্রন্থাধ্যক্ষ (Secretary & Librarian) রূপে প্রায় তিন বৎসর কাজ করেন। তাহার পরে বৎসর খানেক কলিকাতা কর্পোরেশনে কাজ করিয়া তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে বৃত্তি লইয়া তুলনামূলক ধর্ম্মতত্ত্ব (Comparative Theology) অধ্যয়ন করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। দুই বৎসরকাল তিনি ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়া অক্সফোর্ডের ম্যানচেষ্টার কলেজে অধ্য-

মন করেন। এই সময়ের মধ্যে একবার এমেরিকাতেও গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় প্রধানতঃ হিন্দু ধর্ম্মতত্ত্ব ও মাদক নিবারণী আন্দোলনের সংশ্রবে বহু বক্তৃতা প্রদান করেন।

দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি নিউ ইণ্ডিয়া (New India) নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সতীশ-রঞ্জন দাস, সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ (যিনি পরে লর্ড সিংহ হন) প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই পত্রিকাতেই তিনি প্রথম কংগ্রেসের কার্য্য পদ্ধতির সমালোচনা করিতে আরম্ভ করেন।

কয়েক বৎসর পরে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে যখন 'স্বদেশী' আন্দোলন আরম্ভ হইল তখনই বিপিনচন্দ্রের জীবনের আর এক গৌরবময় যুগ আরম্ভ হইল। এই আন্দোলনে তিনি প্রথমে সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী ছিলেন। পরে মত বিরোধ হওয়ায় স্বতন্ত্রভাবে নিজ মত প্রচার করিতে থাকেন। স্বদেশী আন্দোলনের নব-জাতীয়তার অনেকখানি তাঁহারই যে সৃষ্টি সে কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। নিউ ইণ্ডিয়া ও বন্দেমাতরম্ পত্রিকার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার অনুপম তর্কযুক্তি দ্বারা যে অভিনব ভাব ধারা প্রচার করিয়াছিলেন, বাঙ্গালার অগ্রগামী চিন্তা তাহার দ্বারা আচ্ছন্ন, অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই অক্টোবর (১৩১৩ বঙ্গাব্দের ৩০শে আশ্বিন) যেদিন জাতীয় দিবস বলিয়া ধার্য্য হইয়াছিল, তখন তাহার প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিপিনচন্দ্র বন্দেমাতরম্ পত্রে লিখিয়াছিলেন "We dedicate this day to that Patriotism which finds its fulfilment in Humanity

বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনকালে বিপিনচন্দ্র দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ, অশ্বিনীকুমার, কৃষ্ণকুমারের সহিত এক যোগে মাতৃমন্ত্র প্রচারে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি একাধিকবার দুঃখ বিপদও বরণ করিয়াছিলেন। উহাই বিপিনচন্দ্রের রাজনীতিক জীবনের চরমোৎকর্ষের যুগ। সে সময়ে বাংলার সর্ব্বত্র তিনি শত শত সভায় স্বভাবসিদ্ধ উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় দেশের তরুণ গণকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে ধ্বনিত 'বর্জ্জন' এবং 'ভিক্ষা চাহি না' মন্ত্র তখন বাংলায় জাতীয় মন্ত্ররূপেই গৃহীত হইয়াছিল। সে উৎসাহ উদ্দীপনা যিনি প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তিনি বাংলার সে যুগের বিপিনচন্দ্রের ধারণা করিতে পারিবেন না। একাধিকবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াও তিনি একদিনও তাঁহার গৃহীত 'নিয়মানু-

বর্ত্তিতা নীতি হইতে বিচ্যুত হন নাই। তিনি লোকমান্য তিলকের 'স্বায়ত্বশাসন (Home Rule) আন্দোলনে একজন প্রধান সহায়ক ছিলেন। সে সময়ে দেশবাসী "লাল, বাল, পাল' অর্থাৎ লালালাজপৎ রায়, বালগঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পালের নাম রাজনীতি ক্ষেত্রে একই সূত্রে গ্রথিত করিত। লালালাজপৎ রায় ১৯২০ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসমিতির বিশেষ অধিবেশনের নেতৃত্বকালে মহাত্মা গান্ধীর 'অসহযোগ' (Non-cooperation) নীতির বিরুদ্ধবাদী হইয়াছিলেন। ১৯২১ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের (Bengal Provincial Conference) সভাপতিরূপে চিত্তরঞ্জন দাশের অসহযোগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। তিনি তাহার সেই অভিভাষণে যে মত ব্যক্ত করেন তাহা জনসাধারণের মনঃপূত হয় নাই। তদবধি বাংলার তরুণ সমাজের নিকট ও দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার পূর্ব্ব গৌরব ক্ষুণ্ণ হইতে আরম্ভ করে। দেশের তরুণসমাজ তাঁহার তথাকথিত অপরাধ ক্ষমা করেন নাই। তদবধি একাধিক ক্ষেত্রে তিনি 'দেশদ্রোহী' আখ্যাও লাভ করেন।

বিপিনচন্দ্র মনে প্রাণে দেশকে ভালবাসিতেন, তাই তিনি বাংলার বৈশিষ্ট ও স্বতন্ত্রের প্রচারক ছিলেন। যে বাংলা অন্য প্রদেশকে রাজনীতি শিক্ষা দিয়াছে, সেই বাংলা যে অপর কোনও প্রদেশের রাজনীতিককর্তৃত্ব স্বীকার করিবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এই কারণেই তিনি জীবনে কখনও ভিন্ন প্রদেশীয় কোনও নেতার নেতৃত্বই স্বীকার করেন নাই। সম্ভবতঃ মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ নীতির বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযানের মূলসূত্র এই খানেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। এই কারণেই রাজনীতিক বিপিনচন্দ্রকে তাঁহার যৌবনে ও প্রথম প্রৌঢ় অবস্থায় বাঙ্গালী যে ভাবে পাইয়াছিল বার্দ্ধক্যে সেই ভাবে পায় নাই। সম্ভবতঃ সেই কারণেই আজীবন দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া পরিণত বয়সে তিনি ভিন্ন জাতীয় সংবাদ পত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই স্বদেশী যুগেই (১৯০৭খ্রীঃ) "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনীত হয়। ঐ মকর্দ্দমায় বিপিনচন্দ্রকে সরকার পক্ষ হইতে সাক্ষ্য দিবার জন্য আহ্বান করা হয়, কিন্তু তিনি সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায়, আদালত-অবমাননার অভিযোগে ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন। তাঁহার ঐ কারাবাস গ্রহণ দেশের উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

তাঁহার কার্য্যে সহানুভূতি প্রদান করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হয় এবং দেশের যুবকগণই প্রধানতঃ উদ্যোগী হইয়া এক সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পত্নীকে প্রদান করেন।

স্বদেশীর বার্ত্তা এবং "বর্জ্জন" ও "ভিক্ষা চাই না" নীতি প্রচারের জন্য তিনি বাঙ্গালা দেশের বাহিরেও বহু স্থানে গমন করিয়াছিলেন। ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে তিনি মাদ্রাজে গমন করেন। তথায় উপর্য্যুপরি ছয় দিন মাদ্রাজের সমুদ্রতটে ছয়টি সভায় তিনি যে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা ভারতের রাজনীতি আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য। প্রতিদিনের বক্তৃতায় প্রায় ত্রিশ সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। সমগ্র মাদ্রাজ নগরী তাঁহার বক্তৃতার উন্মাদনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ টাইম্‌স (The Times) এবং স্পেক্টেটর (The Spectator) পত্রিকায় বিপিন বাবুর বক্তৃতা সংশ্রবে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। ঐ সময়ে তিনি মাদ্রাজ প্রদেশের আরও কয়েকটি স্থানে গমন ও বক্তৃতা করেন। রাজমহেন্দ্রী নগরের সরকারী ট্রেনিং কলেজে (Training College) এর ছাত্রগণ তাঁহাকে একটী অভিনন্দন প্রদান করে। তাহার ফলে কতকগুলি ছাত্র বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত হয়। তাঁহার উৎসাহে নগরবাসীরা একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ বিদ্যালয় অদ্যাবধি বিপিনচন্দ্রের প্রতি অন্ধ্রদেশবাসীর কৃতজ্ঞতার প্রতীক স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সময়েই প্রধানতঃ বাঙ্গালা দেশে বিপ্লবী দলের আবির্ভাব হয় এবং সরকার পক্ষ হইতে তীব্রভাবে দমননীতি অনুসৃত হইতে আরম্ভ করে। লালা লাজপত রায় ও সর্দ্দার অজিৎ সিং নির্ব্বাসিত হন। এইরূপ অবস্থায় ভারতে থাকিয়া স্ব মত প্রচার করা নিরাপদ হইবে না মনে করিয়া এবং ইংলণ্ডবাসীদিগের নিকটও নবজাতীয়তার দাবী উপস্থাপিত করিবার জন্য আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া বিপিনচন্দ্র ইংলণ্ডে গমন করিলেন (আগষ্ট, ১৯০৮ খ্রীঃ)। পর বৎসর ইংলণ্ড হইতেই "স্বরাজ" নামে একখানি ইংরেজি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে রাজাদেশে উহার প্রচার বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু বোম্বাই নগরীতে পদার্পণ করিবামাত্র, পূর্ব্বোক্ত স্বরাজ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের (Tne Aetiology of Bomb in Bengal, বাঙ্গালাদেশে বোমার নিদান) জন্য বোম্বাই সরকার তাঁহাকে গ্রেপ্তার

করেন। বিচারে তাঁহার এক মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ড হয়।

দণ্ড ভোগান্তে তিনি বাঙ্গালার প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং "দি হিন্দু রিভিউ" (The Hindu Review) নামে একটি উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সম্পাদনার কৃতীত্বে অল্পকাল মধ্যেই উহা শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ আদর লাভ করে। কিন্তু উহাও বেশী দিন চলে নাই। এই সময়ে চিত্তরঞ্জন দাস সম্পাদিত "নারায়ণ", "বিজয়া" ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের "সন্ধ্যা" প্রভৃতি পত্রিকাতেও তাঁহার বহু সার-গর্ভ রচনা প্রকাশিত হইতে থাকে।

১৯২৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতা বাসীর প্রতিনিধি স্বরূপ বড়লাটের আইন পরিষদের সভ্য হন। সেখানেও তিনি তাঁহার বাগ্মীতা ও সূক্ষ্ম যুক্তি প্রয়োগ-পারদর্শিতার বলে অনন্য সাধারণ সাফল্য লাভ করেন।

১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কলিকাতা নগরে জাতীয় মহাসমিতির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি, লোকমান্য তিলক প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া, ইংলণ্ড জাত সমুদয় দ্রব্যের ব্যবহার বর্জ্জনের আন্দোলন যাহাতে কংগ্রেসের অন্যতম কার্য্য সূচী-রূপে গৃহীত হয় তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তাঁহাদের চেষ্টা অবশ্য আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় নাই। কিন্তু তাঁহারা আন্দোলন চালাইতে বিরত হয় নাই (বাল গঙ্গাধর তিলক দ্রষ্টব্য)। ১৯১৬ খ্রীঃ অব্দে, প্রায় দশ বৎসর পরে তিনি পুনরায় লক্ষ্ণৌ নগরে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হন। তখন হইতে লোকমান্য তিলকের স্বায়ত্ব শাসন সঙ্ঘের (Home Rule League) তিনি একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী হন এবং উক্ত সঙ্ঘের কার্য্যে ভারতের নানাস্থানে পর্য্যটন করেন। ১৯১৪—১৮খ্রীঃ অব্দের মহাযুদ্ধের সময়ে সরকারী আদেশে লোকমান্য তিলক ও তাঁহার পঞ্জাব ও দিল্লী প্রদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় (১৯১৭খ্রীঃ)। দুই বৎসর পরে তিলকের সহকর্ম্মীরূপে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং বিঠলভাই প্যাটেল, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, সৈয়দ হাসান ইমাম প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হইয়া ইংলণ্ডে ভারতের রাজনীতিক দাবী উপস্থিত করিবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করেন।

১৯২০ খ্রীঃ অব্দে লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বে কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত "অ-সহযোগ নীতি"র (Non-Co-operation) তীব্র প্রতিবাদ করেন। ঐ অধিবেশনে উপ-স্থাপিত মহাত্মা গান্ধীর মূল প্রস্তাবটির তিনি একটি সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন

করেন, কিন্তু তাহা বহু জনমতে বর্জ্জিত হয়। তদবধি তিনি, তাঁহার নিজের বহু অভিজ্ঞতালব্ধ মতানুযায়ী অসহযোগ নীতির প্রবল প্রতিবাদ করিতে থাকেন। কিন্তু তখন তাঁহার সমস্ত যুক্তি, বিচার, আলোচনা অরণ্যে ক্রন্দনের স্থায় নিষ্ফল হইল। দেশ তখন নূতন নেতার অধীনে নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল—নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যেই তিনি কিছুকাল এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত, পণ্ডিত মতিলালের "ডিমোক্রাট" (The Democrat) এবং "ইণ্ডেপেণ্ডেণ্ট" (The Independent) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু অসহযোগ নীতি উপলক্ষে মতভেদ হওয়ায় তিনি সম্পাদনকার্য্য পরিত্যাগ করেন। এই সময় হইতেই দেশের জাতীয় আন্দোলনের নূতন আদর্শের সহিত তিনি এক মত হইতে না পারিয়া, উহার সহিত প্রত্যক্ষ যোগ ছিন্ন করিতে বাধ্য হন এবং প্রধানতঃ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধের দ্বারা স্বীয় মতামত প্রকাশ করিতে থাকেন। নব ভারতের দেশপ্রেমিক, চিন্তাশীল রাজনীতিগণের মধ্যে তিনি অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজনীতির সহিত কূটবুদ্ধি স্বার্থান্বেষীর উচ্চ পদ কামনা বা দল গঠনের সম্পর্ক ছিল না। দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত বিপিনচন্দ্রের রাজনীতি গভীর চিন্তামূলক ছিল। বর্ত্তমান ভারতের জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের উন্মেষ সাধনে তাঁহার দান অনন্য সাধারণ।

বিপিনচন্দ্র সে যুগের একজন উচ্চ শ্রেণীর বাগ্মী ছিলেন। ইংরেজি ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই তিনি অসামান্য কৃতীত্বের সহিত ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তাঁহার বজ্রনির্ঘোষ তুল্য কণ্ঠস্বর বহুবিস্তৃত সভামণ্ডপের প্রান্ত হইতেও সুস্পষ্ট শ্রুত হইত। তাঁহার অপূর্ব্ব বাক্যবিন্যাশ ও বলিবার প্রণালী শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিত।

সাহিত্যিকরূপেও তাঁহার খ্যাতি অনন্য সাধারণ ছিল। ইংরেজি ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই তিনি সমানভাবে লেখনী পরিচালনা করিতে পারিতেন। রচনাবিন্যাসের কৃতীত্বে, যুক্তির গভীরতায়, ভাবের অভিনবত্বে, বিচার প্রণালীর নৈপুণ্যে তাঁহার প্রবন্ধাবলী সর্ব্বত্রই উচ্চ প্রশংসা লাভ করিত।

সাহিত্য, দর্শন, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ইতিহাস, পুরাণ—সর্ব্ব বিষয়েই বিপিনচন্দ্রের প্রতিভা সমানভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একাধিক বাংলা ও ইংরাজী সাময়িক পত্রিকাতে তাঁহার বহু জ্ঞানগর্ভ রচনা পাঠককে বিমল আনন্দ দান করিত। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। বৈষ্ণব

রস সাহিত্যের আলোচনায় তিনি যে গূঢ় রসানুভূতির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা বাংলা সাহিত্যে সুলভ নহে।

আদর্শবাদী, রাজনীতির তত্ত্ব-বিশ্লেষণকারী, ভাবুক, অপরূপ বাক্‌-বিভূতি সম্পন্ন, বিপিনচন্দ্র প্রথম যৌবন হইতেই সত্যের অনুসন্ধানী, সত্যের পূজারী, দরিদ্র অথচ স্বাধীন মতাবলম্বী। সুতরাং কর্ম্মজীবনে দুঃখ কষ্ট তাঁহার চির সহচর ছিল। আপোষ রক্ষা করা তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল এবং স্বীয় স্বভাবের বিরুদ্ধে তিনি কদাচিৎ কাজ করিয়াছেন।

বিপিনচন্দ্রের রচিত বিবিধ ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তক সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি উল্লেখযোগ্য। শোভনা (বাঙ্গালা উপন্যাস); ভারত সীমান্তে রুষ (রাজনীতিমূলক); মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনী; জেলের খাতা (বন্দীদশায় লিখিত প্রবন্ধাবলী); সত্যমিথ্যা (ছোট গল্পের সমষ্টি); চরিত কথা (কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙ্গালীর অনুপম চরিত্র বিশ্লেষণ); ভক্তি সাধনা (মার্কিন সাধু থিয়োডোর পার্কারের উপদেশের অনুবাদ); প্রমদাচরণ সেনের জীবনী); The New Spirit; Studies of Hinduism; Sree Krishna; The Soul of India Nationlity and the Empire; Indian Nationalism; its Principle and Personalities; Annie Beasant. A Character Sketch; Sir Ashutosh Mukherjee. A character Sketch; Nationality and Empire; The World Situation; Non-Co operation; Swaraj the Goal and the Way; Bengal Vaisnavism; Responsible Government; The New Economic Menace to India; The Basis of Social Reform; Swaraj and the Present Situation; Swaraj: What it is and How to Attain it; The People of India. এই গুলি ভিন্ন তিনি রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজি গ্রন্থাবলীর এক সংস্করণও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে, কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে অনুষ্ঠিত উনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

১৯৩২ খ্রীঃ অব্দের ২০শে মে (৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) এই বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন বঙ্গ জননীর সুসন্তান কলিকাতা নগরে দেহত্যাগ করেন।

বিপিনচন্দ্র রায়, সাহিত্য শাস্ত্রী —একজন অনন্য সাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ২৫শে আষাঢ় ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত ধিতপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিম্ন

প্রাইমারী হইতে আরম্ভ করিয়া এম্.এ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পরীক্ষায়ই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'যতীন্দ্রচন্দ্র স্বর্ণ পদক', 'জয়নারায়ণ পুরস্কার' এবং সরকার হইতে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহের গুণগ্রাহী মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর তাঁহার এই সাফল্যের জন্য পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে একটী পদক প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ্.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং সরকারী প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি, 'গোয়ালিয়র স্বর্ণ পদক', 'দৌলতচন্দ্র জুবিলী স্বর্ণ পদক', ডাফ বৃত্তি প্রভৃতি আরও অন্যান্য বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দে ঢাকা সংস্কৃত কলেজ হইতে তিনি সংস্কৃত ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স সহ বি-এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া 'ঈশান স্কলারশিপ' এবং 'রাধাকান্ত' ও 'পোপ' স্বর্ণপদক দ্বয় প্রাপ্ত হন। তৎপর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম্.এ পরীক্ষা দেন, তাহাতেও সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার স্বরূপ 'সোনামণি' বৃত্তি ও পদকাদি লাভ করেন। অতঃপর ১৯১০ খ্রীঃ অব্দে তিনি বি.এল পরীক্ষায়ও কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। ঐ বৎসরই ইংলণ্ডে যাইয়া উচ্চ শিক্ষা লাভার্থ তাঁহাকে রাজকীয় বৃত্তি (States Scholarship) দেওয়া হয়; কিন্তু পিতামাতার অসম্মতির জন্য তিনি ঐ বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার এরূপ প্রতিভা দর্শনে দেশীয় ও বৈদেশিক অনেক খ্যাতনামা মনীষী তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ সিটি কলেজে (বর্ত্তমান আনন্দমোহন কলেজ) তিনি কিছুকাল অধ্যাপকের কার্য্য করেন। তৎপর ময়মনসিংহ বারে যোগদান করেন; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য কোন কার্য্যই দীর্ঘকাল করিতে পারেন নাই। তিনি একজন কবিও ছিলেন। তাঁহার রচিত 'মুকুলাঞ্জলি', 'মৃত্যুঞ্জয় স্তোত্রম্', 'সারস্বত কবিতা' প্রভৃতি গ্রন্থ যথেষ্ট কবিত্ব শক্তির নিদর্শন স্বরূপ। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ৬ই পৌষ তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

বিপিন বিহারী গুপ্ত—প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কেদারনাথ গুপ্ত। অল্প বয়সেই বিপিন বিহারীর পিতৃবিয়োগ হওয়াতে তাঁহাকে বহু দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিতে হয়। ব্যারাকপুরের

সন্নিকটে মণিরামপুরে থাকিয়া তিনি বাল্যকালে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি রিপণ কলেজ হইতে ডবল অনার্স লইয়া বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি মেট্রো-পলিটান ইনষ্টিটিউশনে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। অধ্যাপনা করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সিপ পরীক্ষায় পাশ করেন, কিন্তু অধ্যাপকের বৃত্তিই তিনি শ্রেয় মনে করিয়া ঐ চাকুরী আর গ্রহণ করেন নাই। ১৮৯৯খ্রীঃ অব্দে তিনি ইংরেজী সাহিত্যে ও ইতিহাসে এম্-এ পাশ করেন এবং শ্রীহট্ট মুরারীচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় তিনি দক্ষতা ও খ্যাতির সহিত অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। পরে ঐ বৎসরই তিনি রিপণ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপকের কাজ গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন। সাহিত্যিক ও সমালোচক হিসাবে বাঙ্গালা দেশে তিনি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও 'পুরাতন প্রসঙ্গ' বাঙ্গালা সাহিত্যে দুইখানি অপূর্ব্ব রত্ন। এতদ্ব্যতীত 'ভারতবর্ষ' 'মানসী ও মর্ম্মবানী' এবং 'সবুজপত্র' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় নিয়মিত তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। ইতিহাসে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দে ৬১ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

বিপিন বিহারী ঘোষ—একজন স্বনাম খ্যাত জমিদার, বিশিষ্ট রাজ-কর্ম্মচারী ও জনহিতকামী। ১২৭৮ বঙ্গাব্দের ১৪ই আষাঢ় (জুন, ১৮৭১খ্রীঃ) চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বন্দিপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হীরালাল ঘোষ ও মাতার নাম সিদ্ধেশ্বরী, তাঁহারা দুই ভ্রাতা ছিলেন, জ্যেষ্ঠের নাম আশুতোষ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ।

প্রথম জীবনে তিনি গৃহশিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করেন। পরে বারাক-পুর সরকারী বিদ্যালয়ে আসিয়া ভর্ত্তী হন এবং ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে সেখান হইতে প্রবেশিকা (Entrance) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উচ্চস্থান অধিকার করিয়া ১৫ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তৎপর তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। শির পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ডাক্তারের নির্দ্দেশমত অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সুস্থ হইবার পর কলিকাতা মিলিটারী একাউন্টস্ অফিসে কর্ম্মে নিযুক্ত হন। সেখানে কিছুকাল কর্ম্ম করিবার পর তিনি বেরিলি বদলী হন এবং ক্রমে তথা হইতে মৌ, জব্বলপুর, কোয়েটা, এডেন প্রভৃতি নানা স্থানে

পরিভ্রমণ করিয়া, শেষ জীবনে পুনরায় কলিকতায় বদলী হন। কলিকাতায় কয়েক বৎসর Asstt. Director, Supply and Transport Office Presidency and Assam Dristrict এর কলিকাতা অফিসে প্রধান সহকারীর (Head Assistant) পদে সুনাম ও সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়া ১৯২৭ খ্রীঃ অব্দে চাকুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবসর বৃত্তি(Pension) গ্রহণ করেন। তৎপর তিনি নানা জনহিতকর কার্য্যে আত্ম নিয়োগ করেন। তাঁহার পিতৃদের প্রতিষ্ঠিত বন্দিপুর বঙ্গবিদ্যালয়কে ১৯২৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মিলিত হইয়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করেন এবং উহার পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। তিনি দরিদ্র নারায়ণ ভাণ্ডার (সহকারী সভাপতি), বঙ্গীয় সদগোপ সভা (কার্য্যানির্ব্বাহক সমিতির সদস্য), ডিষ্ট্রীক্ট চেরিটেবল সোসাইটী, কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট, বয়েজ ওন লাইব্রেরী এণ্ড ইয়ংমেনস্ ইনষ্টিটিউট (আজীবন সদস্য) প্রভৃতি অনেক প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ৩২শে জ্যৈষ্ঠ(১৯৩৪খ্রীঃ) তিনি পরলোক গমন করেন।

বিপিন বিহারী ঘোষ, স্যার—খ্যাতনামা আইনজ্ঞ ও উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী। ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বহরমপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জগবন্ধু ঘোষের পাঁচ পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন। জগবন্ধু ঘোষ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। দেশ বিখ্যাত ব্যবহারজীবী স্যার রাসবিহারী ঘোষ বিপিন বিহারী ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশচন্দ্র ঘোষও একজন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী ছিলেন। তাঁহাদের আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত তোরকোনা গ্রামে ছিল।

বিপিন বিহারী ঘোষ প্রথমে কলিকাতার ভবানীপুরস্থ সাউথ সুবারবান স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। তৎপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং উক্ত কলেজ হইতে এম্-এ পাশ করেন। ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি চন্দননগরে যদুনাথ পালিতের কন্যা মনোজ মহিলা ঘোষকে বিবাহ করেন। ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। তিন বৎসর হাইকোর্টে আইন ব্যবসা করিবার পর তিনি বর্দ্ধমানের জিলা আদালতে যোগদান করেন। ১৯১০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় আইন ব্যবসা করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরই তিনি পুনরায় কলিকাতা হাইকোর্টে

আসিয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। ১৯২১ খ্রীঃ অব্দে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি (Puisne Judge) নিযুক্ত হন। ১৯২৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই পদে প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯৩০ খ্রীঃ অব্দে তিনি বোম্বাইতে বি, বি ও সি-আই রেলওয়ের শ্রমিক গোলযোগের মিটমাট সভার চেয়ারম্যানের কার্য্য করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরই ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি বাঙ্গালা সরকারের কার্য্যকরী সমিতির (Executive Council) অস্থায়ী সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ১৯৩১ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত তিনি উক্ত পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩১ খ্রীঃ অব্দেরই ডিসেম্বর মাসে পুনরায় তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া ১৯৩২ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন। ইংরেজ সরকার কর্ত্তৃক তিনি ঐ বৎসরই নাইট (Knight) উপাধি ভূষিত হন। ১৯৩৩ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে তিনি ভারত সরকারের কার্য্যকরী সমিতির (Executive Council of the Governor of India) আইন সদস্য নিযুক্ত হন এবং নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২৬ খ্রীঃ অব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য (Fellow) ছিলেন। ১৯২৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ডিন (Dean) এবং President of the Board of Studies (Law) নিযুক্ত হন। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বেলতলা উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়, কমলা উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় এবং কলিকাতা ও তোরকোনার জগবন্ধু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের (National Council of Education) তিনি অন্যতম ট্রাষ্টী (Trustee) ছিলেন। কলিকাতার বেথুন কলেজের Governing Bodyর তিনি একজন সদস্য ছিলেন। অনেক সভা সমিতি তাহার নিকট হইতে অর্থানুকুল্য লাভ করিত। কিছুকাল তিনি কলিকাতার কবিতা সভা (Poetry Society), কলিকাতা ক্লাব এবং সাউথ ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের এবং ইউরোপের বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। স্যার রাসবিহারী ঘোষ প্রণীত "ব্রিটিশ ভারতে বন্ধকী আইন" (Law of Mortgage in British India) নামক গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৯২৪ খ্রীঃ অব্দ হইতে তিনি অত্যধিক রক্তের চাপে ভুগিতেছিলেন। মাঝে অনেকটা আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই মে তিনি স্যার আর,

এন মুখার্জ্জির সহিত দেখা করিতে গিয়া, দেখা না হওয়ায় ঢাকুরিয়া লেকে বেড়াইতে যান এবং হঠাৎ সেখানে অসুস্থ হইয়া পড়েন। সেখান হইতে তাঁহাকে বাড়ীতে আনা হয়। কিন্তু অবস্থা ক্রমে মন্দের দিকে আসে, অবশেষে ২২শে মে মঙ্গলবার তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর ৮ মাস হইয়াছিল। তিনি চারি পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণ সকলেই কৃতবিদ্য।

বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী— তিনি খাঁটুরার প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক পণ্ডিত ভগবান বিদ্যালঙ্কারের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি অতিশয় সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার প্রণীত 'অদ্ভুত দিগ্বিজয়', 'সৈনিক সীমান্তিনী', 'কুশদ্বীপ কাহিনী' প্রভৃতি গ্রন্থ অতিশয় প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া তিনি 'মিষ্ট্রেজ অব লণ্ডন', 'মিষ্ট্রেজ অব কোর্ট' প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

বিপিনবিহারী রায়—তিনি ফরিদপুরের অন্তর্গত মানিকদহের জমিদার মহিমচন্দ্র রায়ের পোষ্য পুত্র ছিলেন। তাঁহার জনক ফরিদপুরের অধীন জগদিয়া গ্রামবাসী রামনারায়ণ পাল। পাঁচ বৎসর বয়সে বিপিনবাবু মানিকদহে পোষ্য পুত্ররূপে আগমন করেন। ১২৫৮ বঙ্গাব্দের ২রা জ্যৈষ্ঠ তাঁহার জন্ম হয়। ফরিদপুর জিলা স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর পর্য্যন্ত পড়াশুনা করেন। তৎপরে জমিদার পুত্রের অবস্থা সাধারণতঃ যেমন হয়। অনেক কুসঙ্গী জুটিল এবং জীবনের যতদূর দুর্গতি হইবার হইল। দেশে তখন প্রবল ব্রাহ্ম আন্দোলন। কোন একজন ব্রাহ্মের সংশ্রবে আসিয়া তাঁহার জীবন-স্রোত ফিরিয়া গেল। ধীরে ধীরে কুঅভ্যাস সকল তিনি পরিত্যাগ করিলেন। এমন কি পরবর্ত্তী সময়ে আমরা তাঁহাকে পরোপকারী, দাতা প্রজাহিতৈষী জমিদাররূপে দেখিয়াছি। তাঁহাকে তখন দেখিয়া কখনও কেহ মনে করিতে পারিতেন না যে, তাঁহার প্রথম জীবন অতিশয় কলুষিত ছিল। এই পরোপকারী বিনয়ী, ধার্ম্মিক জমিদার ১৩০৮ সালের ৪ঠা আশ্বিন পরলোক গমন করেন।

বিপিনবিহারী সেন—একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা। তিনি বরিশাল জিলার অধিবাসী ছিলেন। ১৯০১ খ্রীঃ অব্দে তিনি ময়মনসিংহে গমন করেন এবং অল্পকাল মধ্যে তথায় সুপরিচিত হন। ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে যখন স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয় সেই সময় তিনি আন্দোলনে যোগদান করিয়া নেতৃস্থানীয় হইয়া

উঠেন। সেই হইতেই মৃত্যু পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ জেলায় যে কোনও আন্দোলন হইয়াছে, তিনি তাহাতে নেতৃত্ব করিয়াছেন। তিনি দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। ধনীদের নিকটও তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ময়মনসিংহের অনেক বড় বড় জমিদার ও ধনী ব্যক্তি তাঁহার অনুরোধে শত শত টাকা নানা সৎকার্য্যে তাঁহার হাতে দান করিতেন। তিমি সকলেরই অতিশয় বিশ্বাসভাজন ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন, স্বরাজ্য দলের আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি পুরোভাগে ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি কিছুদিন বাঙ্গালার ডিক্টেটার ছিলেন এবং সেই সময় তাঁহাকে কিছুকাল কারাবাস করিতে হইয়াছিল। তিনি তিনবার ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালটির চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং পাঁচশ বৎসর যাবৎ মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন। তিনি কর্ম্মবীর ছিলেন। সরকারী বা বেসরকারী কোনও অত্যাচারেই তিনি অভীষ্ট কার্য্য হইতে পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। পরোপকারে তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। বহু দরিদ্র ছাত্র তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিত। দীন দরিদ্রকে তিনি বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার অমায়িক ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত। একবার পূজার ছুটিতে ময়মনসিংহ সহরে ভয়ানক বসন্ত দেখা দিয়াছিল। ঐ সময় তিনি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিজ দায়ীত্ব পালনের জন্য অসুস্থ অবস্থায়ও বসন্তের প্রতিরোধকল্পে যাহা যাহা করা প্রয়োজন সমস্ত সহরে ছুটাছুটি করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই পরিশ্রমের ফলেই তিনি আরও অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং কিছুকাল রোগ ভোগের পর ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তী—বীরভূম জেলার হেতমপুর রাজবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে তাহারা জমিদার বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পৌত্র রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে রাজা এবং ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি এই বংশের নাম হেতমপুর রাজবংশ হইয়াছে।

বিপ্রচরণের পিতা রাধানাথ চক্রবর্ত্তী ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, উনপঞ্চাশ বৎসর বয়সের সময় তিনি পিতৃসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার পিতা রাধানাথ চক্রবর্ত্তী রাজনগরে মুসলমান রাজগণের অধীনে কার্য্য করিয়া প্রভুত অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং নানাবিধ সুকৌশলে কয়েকটী পরগণার জমিদারী সত্ব ক্রয়

করিয়াছিলেন। বিপ্রচরণও ১৮৩৭—১৮৪২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজনগরাধিপতি দাওর ওজমান খাঁর দেওয়ান পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা বাহাদুর তাঁহাকে সম্মানসূচক 'হুজুর' উপাধি প্রদান করেন। তিনি রাজনগরের রাজবংশ-সম্ভূতা বেগম রজবন্নেসার নিকট হইতে ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে মহম্মদাবাদের জমিদারী সত্ব প্রায় এক লক্ষ টাকা দিয়া ক্রয় করেন। তৎপর তিনি লাটসাহ-আলমপুরের জমিদারী সত্ব ক্রয় করেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি একটী আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় তিনি ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি ধার্ম্মিক ও কীর্ত্তিমান পুরুষ ছিলেন। হেতমপুরের কয়েকটী দেবমন্দির ও সরোবর তাঁহার কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি গোবিন্দ সায়ের নামক বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া স্বীয় কন্যা দোলগোবিন্দমনির নামে, বিরজা সায়ের নামক বৃহৎ সরোবর বিধবা ভ্রাতৃবধু বিরজা সুন্দরীর নামে, সুখ সায়ের নামক পুষ্করিণী স্বীয় ভগিনী সুকুমারীর নামে, মান সায়ের নামক পুষ্করিণী ভাগিনেয়ী মানমোহিনীর নামে এবং নূতন পুষ্করিণী নামক সরোবর স্বীয় ভগিনী রুক্মিণীর নামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত লাল্‌দিঘী নামক সরসী, তাহার তীরস্থ পাঁচটি শিবমন্দির ও 'বারদুয়ারী' নামক ভবন তাঁহার এক প্রধান কীর্ত্তি। তাঁহার পৌত্র রাজা বাহাদুর রামরঞ্জন উহা সুন্দররূপে সংস্কার করাইয়া 'রোজিভিলা' নাম প্রদান করেন। বিপ্রচরণ হেতমপুরে মনোরম বাংলা, রাসমঞ্চ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রাজ্যের প্রজাদের কল্যাণের জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। দেবদ্বিজে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। হরিনাম সংকীর্ত্তনের তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁহার নিজের রচিত অনেক সংকীর্ত্তন গানও রহিয়াছে ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের ১০ই নবেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন। তৎপর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন।

বিপ্রদাস—তিনি 'ভাস্বত তত্ত্ব প্রকাশিকা চক্র' নামক একখানা করণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বিপ্রদাস পাল চৌধুরী—নদীয়া জেলার অন্তর্গত নাটদহের একজন শিক্ষিত জমিদার, সমাজ সংস্কারক ও স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি। তিনি বিদ্যা শিক্ষার জন্য যৌবনের প্রারম্ভে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি পিতলের কারখানা স্থাপন করেন। এই কার্য্যে তাঁহার বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। তৎপর তিনি

বহু টাকা ব্যয়ে চর্ম্ম পরিষ্কারের কারখানা স্থাপন করেন। এই কারখানা হইতে অতি সুন্দর মসৃন চর্ম্ম ও জুতা প্রস্তুত হইত। তিনি স্বদেশী দ্রব্য নির্ম্মাণের জন্য সর্ব্বদাই পরিশ্রম করিতেন। প্রজাদের উন্নতির জন্য নানা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি একজন নীরব কর্ম্মী ছিলেন। সমাজ সংস্কারের জন্যও তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি আপনার কন্যা-দিগকে সুশিক্ষাদান করিয়া কায়স্থ যুবকদের সহিত তাহাদের বিবাহ দান-পূর্ব্বক সৎসাহসের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে ২৫শে অক্টোবর লণ্ডন নগরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়— একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। 'পাকপ্রণালী', 'জননী জীবন', 'শুভ বিবাহতত্ত্ব', 'দেদারমজা' প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্গ-বাসী এবং অন্যান্য সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। তিনি সরল, অমায়িক এবং সকলের প্রীতিভাজন ছিলেন। ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দের ৩০শে নভেম্বর বাহাত্তর বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র অপরেশবাবু একজন নাট্যকার ও বিশিষ্ট অভিনেতা।

বিবাদল খাঁ—দিল্লীর সম্রাট শাহ-জাহান পাতশাহের তিনি মণিমুক্তা স্বর্ণ রৌপ্যাদির ভাণ্ডার রক্ষক ছিলেন। সমস্ত স্বর্ণকারেরা তাঁহার অধীন ছিল। প্রসিদ্ধ ময়ূর সিংসাহন তাঁহারই তত্ত্বাব-ধানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সিংহাসন প্রস্তুত করিতে সাত বৎসর সময় লাগিয়াছিল ও এক কোটি টাকায় কর্ম্মচারীদের বেতন ব্যয় হইয়াছিল। সিংহাসনের মূল্য পাঁচ কোটী টাকার উপর ছিল।

বিবিজিন্দা আবাদি— সৈয়দ জালালের অন্যতমা বংশধর। তিনি মুলতানের অন্তর্গত উচ্ছা নামক স্থানে সমাহিত হন।

বিবি দৌলত সাদ বেগম—সম্রাট আকবরের অন্যতমা মহিষী। তাঁহারই গর্ভে শুকুরুন্নিছা বেগম জন্মগ্রহণ করেন।

বিবি বাঈ—দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহ আদিলের ভগিনী। সলিম শাহ সুরের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহারই গর্ভে ফিরোজ জন্মগ্রহণ করেন। সলিম শাহের মৃত্যুর পরে বিবি বাঈয়ের ভ্রাতা মোহাম্মদ শাহ স্বীয় ভগিনীর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। বিবি বাঈ স্বীয় শিশু পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া যুদ্ধার্থ উপস্থিত হন। নিষ্ঠুর মোহাম্মদ শাহ স্বীয় ভগিনীর ক্রোড় হইতে ফিরোজকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ

করিয়া মাতার সম্মুখেই পুত্রের মস্তক ছেদন করেন। ১৫৫৪ খ্রীঃ অব্দে ইহা সংঘটিত হয়।

বিবেকনারায়ণ সিংহ—ছোট নাগপুরের পূর্ব্ব প্রান্তবর্ত্তী অরণ্যময় প্রদেশ, বরাহ ভূম, ধলভূম, মানভূম, অম্বিকানগর, সুপুর প্রভৃতি বহুতর স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত। এই অরণ্যময় প্রদেশের রাজারা কখনও কাহারও অধীন হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্তির সময়ে বিবেকনারায়ণ সিংহ ৬৪২ বর্গ মাইল পরিমিত বরাহভূম রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। এই বরাহভূম রাজ্যের অনেক স্থান পর্ব্বত ও গভীর অরণ্যে সমাবৃত। কলনিনাদিনী গিরিনদী উন্নত পর্ব্বতমালা ও শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম অরণ্যানি, বরাহভূম পরগণার প্রধানতঃ দৃশ্যবস্তু। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বরাহভূমের জল বায়ু নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল। দেশের মধ্যে যাতায়াতের রাস্তা ছিল না। রাজা বা সর্দ্দারগণ দুর্গম পর্ব্বতমালা বেষ্টিত উপত্যকায় বাস করিতেন। অধিবাসীগণ প্রধাণতঃ ভূমিজ ও সাঁওতাল তাহারা অনেকেই বৎসরের অধিকাংশ সময় মহল, জোনার, কদুয়া প্রভৃতি আহার করিয়া জীবন ধারণ করে।

তরফ সতেরখানি পরিমাণে প্রায় এক শত বর্গ মাইল স্থান ব্যাপীয়া অবস্থিত। বরাহভূম রাজ্যের ও মানভূম জেলার দক্ষিণভাগে সতেরখানি তরফ অবস্থিত। খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ত্রিভুবন সিংহ সতেরখানির রাজা ছিলেন। তিনি নিকটবর্ত্তী শ্যামসুন্দরপুর, সুপুর, অম্বিকানগর, ধলভূম, এমনকি বরাহভূম রাজ্য পর্য্যন্ত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতেন। তাঁহার উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়া পূর্ব্বোক্ত রাজ্যের অধিপতিগণ বরাহভূমের রাজা বিবেকনারায়ণের নেতৃত্বে সকলে এক যোগে ত্রিভুবন সিংহকে আক্রমণ ও পরাস্ত করিয়া নিহত করেন।

এই সময়ে বঙ্গের মুসলমান রাজশক্তি নির্ব্বাণোন্মুখ, ইংরাজ রাজশক্তি তখনও সমধিক আত্ম প্রকাশে সমর্থ হয় নাই। জঙ্গল মহলের রাজগণ কখনও মুসলমান রাজশক্তির নিকট মস্তক অবনত করেন নাই। রাজা বিবেকনারায়ণ বিশেষ শক্তিশালী ও যুদ্ধবিশারদ বীর ছিলেন। সুতরাং তিনি সহজে ইংরেজ শক্তির নিকটে মস্তক অবনত করিতে সম্মত হইলেন না। যাঁহারা চিরকাল স্বাধীনতার সুখ ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ কখনও কোন বিদেশীয় চরণতলে স্বীয় শির ভূষণ স্থাপন করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে পরের বশ্যতা স্বীকার করা বড়ই কঠোর পীড়াদায়ক। তিনি ইংরেজকে কর দিতে অসম্মত হইয়া

বিদ্রোহী হইলেন। দীর্ঘকাল বিবাদের পর বিবেকনারায়ণ পরাস্ত হইয়া রাজ্যচ্যুত হন। তৎপরে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্র রঘুনাথ সিংহ ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া পুন রাজ্য প্রাপ্ত হন। তদবধি তাঁহারা জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হন। বিবেকনারায়ণ বিরক্ত হইয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

রাজ্যের নিয়ম অনুসারে প্রধানা রাণীর গর্ভজাত পুত্রই রাজ সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। প্রধানা রাণীর গর্ভজাত পুত্র লছমন (লক্ষ্মণ) রঘুনাথ সিংহের কনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি বলপূর্ব্বক রাজ্য অধিকার করিতে প্রয়াসী হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রঘুনাথের পক্ষ অবলম্বন করিয়া লছমনকে বন্দী করেন। এই বন্দী অবস্থায়ই তিনি কারাগারে প্রাণত্যাগ করেন।

বিবেকানন্দ, স্বামী—বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মনেতা ও দেশসেবক। কলিকাতা নগরীর উত্তরাংশে সিমুলিয়া পল্লীর প্রসিদ্ধ দত্ত বংশোদ্ভব বিশ্বনাথ দত্ত তাঁহার পিতা। তাঁহার মাতার নাম ভুবনেশ্বরী। বিশ্বনাথের পিতা দুর্গাচরণ সাধু-সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি পত্নী ও একমাত্র পুত্রকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। বিশ্বনাথ আইন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং উহাতে তাঁহার যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন হইত। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোনও পুত্র সন্তান লাভ হয় নাই বলিয়া ভুবনেশ্বরী দেবী বিশেষ মনোকষ্টে ছিলেন এবং পুত্র সন্তান লাভের জন্য দেবতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেন।

১৮৬২ খ্রীঃ অব্দের ১২ই জানুয়ারী রবিবার (১২৬৮ বঙ্গাব্দ ২৯শে পৌষ) মকর সংক্রান্তি দিনে, কলিকাতা নগরে বিশ্বেশ্বরের ভবনে, যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন, তিনিই পরবর্ত্তীকালে জগদ্বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ নামে প্রসিদ্ধ হন। নামকরণ দিবসে জননীর ইচ্ছানুসারে তাঁহার নাম হয় বীরেশ্বর। পরবর্ত্তীকালে তিনি নরেন্দ্রনাথ নামেও পরিচিত হন। প্রথমটি তাঁহার রাশি নাম। আত্মীয়স্বজন, তাঁহার জননী প্রদত্ত বীরেশ্বর নামকে সংক্ষেপ করিয়া 'বিলে' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

নরেন্দ্রনাথ বাল্যকালে শৈশবসুলভ চাপল্যে, মাতার ও আত্মীয়স্বজনের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া, বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু সাধারণ দুরন্তপনার সহিত কোনওরূপ অসাধু আচরণ করা তাঁহার প্রকৃতিতে ছিল না। বরং প্রচলিত ধর্ম্ম ও সামাজিক অনেক রীতিনীতে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। রামায়ণ মহাভারতাদির উপাখ্যানগুলি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। মধ্যাহ্নকালে গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া

মহিলাবৃন্দ যখন প্রাত্যাহিক বিশ্রাম গ্রহণ ও তৎসঙ্গে ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতেন, তখন অশান্ত বালক শান্তশিষ্টভাবে বসিয়া গভীর মনোযোগের সহিত অতীত যুগের ধর্ম্মবীরগণের পূত চরিত গাথা শ্রবণ করিতেন। বাল্যকাল হইতেই সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি তাঁহার একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কোনও সাধু সন্ন্যাসী বাটীতে আসিলে তিনি সর্ব্বদাই তাঁহাদের প্রার্থনা পূরণ করিতে উদ্‌গ্রীব হইতেন এবং দান করিবার উৎসাহে গৃহস্থালীর নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি, এমন কি নিজের পরিধেয় বসন পর্য্যন্ত দান করিয়া ফেলিতেন।

তিনি অতি সুকণ্ঠ ছিলেন। ভিক্ষুক গায়কগণের নিকট হইতে নানারূপ পরমার্থ বিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া, তিনি সহজেই শিখিয়া ফেলিতেন এবং নিজের সুললিত কণ্ঠে উহা গান করিয়া সকলের মনোহরণ করিতেন।

পৌরাণিক চিত্রগুলির মধ্যে বীরভক্ত হনুমানের চরিত্র তাঁহাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। একদিন বাটীতে এক কথক ঠাকুরের মুখে, হনুমান কদলী বাগানে অবস্থান করেন; এই কথা শুনিয়া সরল বিশ্বাসী বালক নরেন্দ্রনাথ হনুমানের সাক্ষাৎ লাভ করিবার জন্য বাসভবনের সন্নিকটবর্ত্তী কদলীবাগানে যাইয়া সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়াছিলেন। উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণাভিলাষী, পরার্থে আত্মত্যাগে কৃতসংকল্প শিষ্যবৃন্দকে দাস্যভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ স্বরূপ, হনুমানের চরিত্র আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে বলিতেন।

পিতৃগৃহে গুরু মহাশয়ের নিকটেই তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। গুরু মহাশয় তাঁহার সনাতন প্রথা প্রয়োগে এই দুরন্ত বালককে বশ করিতে পারিতেন না। ক্রোধ প্রকাশ বা প্রহারের দ্বারা তিনি বালককে স্ব-মতানুযায়ী কার্য্য সম্পাদনে নিরত করিতে অসমর্থ হইয়া, তিনি তাঁহার চিরাবলম্বিত প্রথার পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। তাড়নার পরিবর্ত্তে আদর ও মিষ্ট ব্যবহারের দ্বারাই, তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র ছাত্রকে বশ করিতে সমর্থ হন। গৃহশিক্ষকের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন হইলে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রপলিট্যান ইনষ্টিটিউশনে (Metropolitan Institution) প্রেরিত হন। স্বভাব-চঞ্চল বালক সেখানেও শিক্ষকগণকে বিব্রত করিয়া তুলিতেন। কঠোর ব্যবহারে কোনও ফল হইবে না বুঝিতে পারিয়া, তাঁহারা মিষ্ট ব্যবহারে তাঁহাকে বশ করিতে চেষ্টা করিতেন। সমবয়সী সতীর্থগণের মধ্যে তিনি সহজেই নিজের নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিতে সমর্থ হন। দৈহিক শক্তিতে শক্তিমান, প্রতিভাশালী নির্ভিক বালক অল্পকাল

মধ্যেই সহপাঠীগণের নেতৃত্ব লাভ করিলেন।

পাঠ্য বিষয় সমূহের মধ্যে গণিত শাস্ত্রে তাঁহার আদৌ মন বসিত না। ইংরেজী, ইতিহাস, সংস্কৃত প্রভৃতি বিষয়গুলি তিনি বিশেষ আগ্রহ সহকারে অধ্যয়ন করিতেন। "পিতার অনুকরণে ঘৃণাভরে নাসিকা কুঞ্চন করিয়া অঙ্ক শাস্ত্রকে 'দোকানদারের জুয়াচুরী বিদ্যা' বলিয়া উপহাস করিতেন।'

চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। দীর্ঘকাল পীড়াক্রান্ত থাকিয়া শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়াতে, চিকিৎসকগণের পরামর্শে তাঁহার পড়াশুনা বন্ধ রাখিতে হয়। তাঁহার পিতা তখন কর্ম্মোপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রায়পুরে অবস্থান করিতেছিলেন। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তথায় গমন করিলে, তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে অনুমান করিয়া বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় পরিবারবর্গকে তথায় লইয়া গেলেন। তখনকার দিনে রায়পুর যাইতে হইলে এলাহাবাদ ও জব্বলপুর হইয়া নাগপুর পর্য্যন্ত রেলপথে যাইতে হইত এবং তথা হইতে প্রায় পনের দিন গো-শকটে যাইয়া রায়পুর পৌছিতে হইত। রায়পুরে যাইবার সময়ে মধ্যপ্রদেশের গভীর বনরাজী এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের উচ্চ শিখর সমূহের গম্ভীর সৌন্দর্য্য তাঁহার মনে যে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা তিনি শেষজীবন পর্য্যন্ত অনুভব করিতেন।

রায়পুরে বালক নরেন্দ্রনাথ পিতার নিকটে বিদ্যাভ্যাস করিতেন। পুত্রের প্রতিভার পরিচয় বিশ্বনাথ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। সেজন্য তিনি পুত্রের প্রতিভা অধিকতর পরিস্ফুটনের অনুকূল করিয়া, স্বয়ং তাহাকে গৃহে শিক্ষা দিতে থাকেন।

প্রায় দুই বৎসর রায়পুরে অবস্থানের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করে। কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অনুমতি লইয়া প্রবেশিকা শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেন এবং দুই বৎসরের পাঠ্য সমুদয় বিষয় এক বৎসরেই অধ্যয়ন করিয়া প্রশংসার সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে, কোন একজন শিক্ষকের অবসর গ্রহণ উপলক্ষে আহূত সভায়, ছাত্রগণের পক্ষ হইতে, ইংরেজীতে বক্তৃতা করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করেন। সভাপতি দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথও কিশোর নরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা করিবার শক্তির পরিচয় পাইয়া, বিশেষ সাধুবাদ প্রদান করেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। কিন্তু রায়পুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন

করিয়া প্রবেশিকার পূর্ব্বে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করিতে হওয়ায় তাঁহার স্বাস্থ্যহানী হয় এবং কিছুকাল পরেই পুনরায় তাঁহাকে পাঠ স্থগিত রাখিতে হয়। পর বৎসর তিনি জেনারেল এসেমব্লী ইনষ্টিটিউশনে (General Assembly Institution—বর্ত্তমান স্কটিশচার্চ্চ কলেজ) প্রবেশ করেন। এই খানে জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। যথাসময়ে পরবর্ত্তী এফ্-এ (First Arts) পরীক্ষায় কৃতীত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বি-এ পরীক্ষার জন্য পাঠ করিতে লাগিলেন এবং প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী (Attorney) নিমাই-চরণ বসুর নিকট আইন ব্যবসায়ের শিক্ষানবীশি করিতে লাগিলেন। কলেজেও তিনি স্বীয় প্রতিভার সম্যক পরিচয় প্রদান করেন। দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক মহাশয় তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। দর্শনশাস্ত্রে যুবক নরেন্দ্র-নাথের অনন্য সাধারণ অধিকার এবং অসাধারণ বিচার ক্ষমতা অধ্যাপক মহাশয়ের পরম বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের (B. A) পরীক্ষার কিছুকাল পরেই হঠাৎ বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় হৃদ্‌রোগে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কিছুকাল নরেন্দ্রনাথের বিশেষ অর্থকষ্ট উপস্থিত হয়। জ্ঞাতিগণের অসৎ চেষ্টার জন্য সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত আদালতের আশ্রয় গ্রহণও করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে হাইকোর্টের বিচারে তাঁহারই পক্ষে মীমাংসা হইলে, কিয়ৎ পরিমাণে বৈষয়িক দুশ্চিন্তা হইতে তখনকার মত মুক্ত হইলেন।

নরেন্দ্রনাথ যখন কলেজের ছাত্র তখন হইতে ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার গতি-বিধি আরম্ভ হয়। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইলে, তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন সভ্য হন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের নিরাকার ঈশ্বরবাদে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মসমাজের সকল কার্য্যে যোগদান করিতেন। "ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান করিবার পূর্ব্বেই, তিনি রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ সমূহের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াও তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশববাবুর নিকট তত্ত্বালোচনার জন্য গমন করিতেন। অদ্বিতীয় বক্তা ও শক্তিশালী পুরুষ কেশবচন্দ্রের অনুরাগী হইয়াও নব-প্রতিষ্ঠিত নববিধান সমাজে যোগদান না করিয়া তিনি কেন সাধারণ সমাজে যোগদান করিলেন। তৎসমন্ধে তিনটি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়—(১) বাল্যকাল হইতেই তিনি জাতিগত অধিকার বৈষম্যকে ঘৃণা করিতেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকবৃন্দ এই কালে জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ সাধন কল্পে, প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহাতে তাঁহার পূর্ণ সম্মতি ছিল। (২) নারীগণকে ধর্ম্ম কার্য্যে ও সমাজ জীবনে পুরুষের সমান অধিকার প্রদানপূর্ব্বক সুশিক্ষিত করিয়া তোলার সঙ্কল্পও তাঁহার হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। (৩) নববিধান সমাজের ব্রাহ্মগণের ভাবাবেশ, ক্রন্দন ও ভক্তির আতিশয্যে কেশবচন্দ্রকে 'প্রেরিত পুরুষ' ইত্যাদি বলা তাঁহার ভাল বোধ হয় নাই।

ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া তিনি যদিও সর্ব্ব বিষয়ে সমাজস্থ অন্যান্য সভ্যগণের সহিত একমত হইতে পারেন নাই, তথাপি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে সমধিক স্নেহ করিতেন। রবিবাসরীয় উপাসনাকালে তাঁহার মধুর সঙ্গীত উপাসকগণের আনন্দ বিধান করিত।

এই সময়ে কলেজে এফ্-এ পাঠ করিবার সময়ে তিনি কলিকাতায় একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সাক্ষাৎ পান। পরমহংস দেব যুবক নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া, অতিশয় প্রীত হন এবং প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া যান।

এই সময়েই নরেন্দ্রনাথের মনে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ উপলক্ষ করিয়া নানারূপ প্রশ্ন উঠিতেছিল। তাঁহার স্বাভাবিক বৈরাগ্যপ্রবণ মন, ত্যাগের ও জ্বলন্ত ধর্ম্ম বুদ্ধির অভাব বোধে কোনও বিশেষ প্রণালীবদ্ধ উপাসনায় যেন তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছিল না। ফলে একদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের গৃহী ভক্তদের অন্যতম ডাঃ রামচন্দ্র দত্তের অনুরোধে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সেই সাক্ষাৎই তাঁহার জীবনের এক মহাপরিবর্ত্তন আনয়ন করে। পরমহংসদেব তাঁহাকে অতি সাদরে গ্রহণ করেন এবং তখন হইতে যখনই তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন প্রতি বারই শ্রীরামকৃষ্ণকর্ত্তৃক উত্তরোত্তর স্নেহ ও সাদর আপ্যায়ন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। তখন পর্য্যন্তও তিনি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদিতে নিয়মিত যোগদান করিতেন এবং ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসবান ছিলেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের ফলে তাঁহার আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ক্রমে তিনি পরমহংস দেবের একজন বিশেষ অনুরাগী ভক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহার বিবিধ দার্শনিক মতাশ্রিত মন যেন ধীরে ধীরে সংশয়বিহীন হইয়া অভীপ্সিত লাভজনিত বিমল আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। এই সময়েই বিশ্বনাথ দত্ত

মহাশয় পুত্রের বিবাহের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের দৃঢ় আপত্তির জন্য কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত আধ্যাত্মিক যোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে, নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। পরমহংসদেব নরেন্দ্রের মধ্যে মহাপুরুষোচিত লক্ষণ দেখিতে পাইয়া, তাঁহাকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার উপযোগী নানারূপ উপদেশ দিতে থাকেন। নরেন্দ্রনাথও তাঁহার সরল বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচয় পাইয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে তাঁহারই নিকট সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষা লইলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর কিছুকাল তিনি দুইজন ধর্ম্মভ্রাতাদের (পরবর্ত্তীকালের স্বামী শিবানন্দ ও অন্য একজন সন্ন্যাসীর) সহিত বুদ্ধগয়ায় গমন করিয়া কিছুকাল বাস করেন। তথায় সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথ তিনদিন গভীর ধ্যানমগ্ন থাকিয়া আকাঙ্ক্ষিত সত্য উপলব্ধির জন্য প্রয়াস পান। তাহাতেও তাঁহার মনের সন্দেহ সত্যলাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল না। তখন তিনি গাজিপুরের সিদ্ধপুরুষ পাওহারী বাবার চরণপ্রান্তে উপনীত হইলেন এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে গুরুর নিকট প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার মন সম্পূর্ণরূপে সমাহিত হয় নাই। কিছুকাল দক্ষিণেশ্বরেই ধ্যানমগ্ন, তপস্যায় নিরত থাকিয়া তিনি নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। তখন হইতেই তাঁহার মনের সকল প্রকার অশান্তি একরূপ বিদূরিত হইয়া, সমগ্র মন প্রাণ এক অপূর্ব্ব আনন্দে পরিপ্লুত হইল। ইহারই কিছুকাল পরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কাশীপুর বাগান বাটীতে কঠিন গলক্ষত রোগে দেহরক্ষা করিলেন।

এই ঘটনার পর বিবেকানন্দের উপর এক গুরুতর দায়ীত্ব পতিত হইল। যে সকল ধর্ম্মভ্রাতা একত্র থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত পথে চলিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া বরাহনগরে এক মঠ স্থাপন করিলেন। পরমহংসদেবের পূর্ব্বতন গৃহীভক্তগণের অনেকে তাঁহাদিগকে নানারূপে সাহায্য করিতেন। তাহা সত্ত্বেও মঠনিবাসী সংসার বিরাগী যুবকগণকে নানারূপ দৈন্যকষ্টের মধ্যেই বাস করিতে হইত। সকল সময়ে তাঁহাদের উদরপূর্ত্তি করিয়া আহারও জুটিত না। কিন্তু তাঁহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া ধ্যান ধারণা, গীতা, ভাগবতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, কীর্ত্তন ও ভজনে রত থাকিয়া, পরম তৃপ্তির সহিত পরস্পরের সঙ্গসুখ উপভোগ করিতেন।

কিছুকাল পরে, মনে এক বিশেষ-ভাবের উদয় হওয়ায় শ্রীনরেন্দ্র-নাথ পরিব্রাজক বেশে বরাহনগরের মঠ পরিত্যাগ করিয়া, তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন।

বিহার ও যুক্তপ্রদেশের নানাস্থানে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি কাশীধামে উপনীত হইলেন। তথায় শ্রীত্রৈলঙ্গস্বামী শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। শ্রীমৎ-স্বামী ভাস্করানন্দের কোনও মন্তব্যে তিনি বিচলিত হইয়া, তাঁহার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কারণ তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, ভাস্করানন্দজী যেন প্রকারান্তরে তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের নিন্দা করিয়াছিলেন।

কাশী হইতে তিনি অযোধ্যা হইয়া বৃন্দাবনধামে গমন করেন। এই সময়ের মধ্যে হাথরাস রেলওয়ের ষ্টেশন মাষ্টার শরৎচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁহার প্রথম মন্ত্র শিষ্য হন। বিবেকানন্দ এই শিষ্য সদানন্দকে লইয়া হৃষিকেশে গমন করেন। তথায় সদানন্দ অনভ্যস্ত কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে অসুস্থ হইয়া পড়াতে, তিনি শিষ্যকে লইয়া পুনরায় হাথরাসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এখানে স্বামিজী স্বয়ংও পীড়িত হইয়া পড়েন। কিছুকাল পরে আরোগ্য লাভ করিয়া বরাহনগরের মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পুনরায় কিছুকাল পরে তিনি দেশ পর্য্যটনের বাহির হন। এইবার প্রথমে গাজীপুরে যাইয়া দীর্ঘকাল পূর্ব্বোক্ত পাওহারী বাবার সন্নিধানেই বাস করেন। এই সময়েই পাওহারী বাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁহার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়। অল্প-কাল পরে অবশ্য তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ইহার পর আরও কিছুকাল তিনি উত্তর ভারত পঞ্জাবের নানাস্থানে পর্য্যটন করেন। মধ্যে কিছুকাল আলমোড়ায় অবস্থান করিয়া ধ্যান ধারণা ও তপস্যায় অতি-বাহিত করেন এবং কিছুকাল মীরাট নগরে এক ধনী ব্যক্তির উদ্যানবাটিকায় অন্যান্য ধর্ম্ম ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করেন।

মীরাট হইতে তিনি রাজপুতানায় গমন করেন এবং আলোয়ার, জয়পুর, আবুপর্ব্বত, ক্ষেত্রী, গুজরাটের অন্তর্গত আহম্মদাবাদ, লিম্‌ড়ি, জুনাগড়, প্রভাস প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া পোর-বন্দরে উপনীত হন। জয়পুরে তিনি রাজসভাপণ্ডিতের নিকট কিছুকাল থাকিয়া অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। আলোয়ারের মহারাজার সহিত তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ে যে সকল আলোচনা হয়, তাহাতে মহারাজা তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রীত হন। ক্ষেত্রীর রাজসভাপণ্ডিত

নারায়ণ দাসের নিকট তিনি পতঞ্জলির মহাভাষ্য অধ্যয়ন করেন। পোরবন্দরে থাকিবার সময়ে পুনরায় প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরংএর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। সেই সময়ে গোবর্দ্ধন মঠের অধ্যক্ষ জগদ্গুরু শ্রীমং শঙ্করাচার্য্য মহারাজ পোরবন্দরে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত স্বামিজীর আলাপ হয়। এই সময়ে কয়েকজন পণ্ডিতের সহিত শাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার বিচারও হইয়াছিল। লিম্‌ড়ি হইতে তিনি পুণাতে গমন করেন। এই সময়ে অতি অপ্রত্যাশিতভাবে বাল গঙ্গাধর তিলকের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে এবং তিনি তিলকের আহ্বানে পুণাতে তাঁহারই গৃহে মাসাধিককাল অবস্থান করেন। পুণা হইতে তিনি বেলগাঁও, মারমাগোয়া প্রভৃতি স্থান হইয়া মহীশূরে উপনীত হন। মহীশূরের মহারাজাও স্বামিজীর পাণ্ডিত্যে ও উদার ধর্ম্মভাবে বিশেষ মুগ্ধ হন। তাঁহার আগ্রহে রাজপ্রাসাদে একদিন শাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা সভা আহুত হইয়াছিল। মহারাজার মন্ত্রী শেষাদ্রী আইয়ার তাঁহাকে নানারূপে সম্মান প্রদর্শন করেন এবং মহীশূর হইতে কোচীন যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। কোচীন রাজ্যেও তিনি বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হন এবং রাজানুগ্রহে তথা হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত যাইবার সুবিধা লাভ করেন। পথে রামনদের রাজা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কন্যাকুমারীতে কয়েকদিন ধ্যান ধারনা ও আত্মচিন্তায় অতিবাহিত করিয়া মাদ্রাজে গমন করেন। মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যেও অল্প কিছুকাল অবস্থান করেন তথায়, সরকারী হিসাব বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী (Accountant General) মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

মাদ্রাজে তিনি কিছুকাল অবস্থান করিয়া ধর্ম্মালোচনা, বক্তৃতা প্রভৃতির দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন। বহু উচ্চ শিক্ষিত যুবক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ সমগ্র দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে মাদ্রাজ নগরেই তাঁহার সর্ব্বাধিক সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ হয়। এই সময়ে আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের শিকাগো (Chicago) নগরে এক বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন হইতেছিল। স্বামিজীর মাদ্রাজ-বাসী শিষ্যগণ তাঁহাকে, হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি স্বরূপ, তথায় গমন করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা এই কার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেও আরম্ভ করেন। কিন্তু স্বামিজী তখন পর্য্যন্তও এবিষয়ে মনস্থির করিতে পারেন নাই। মাদ্রাজ হইতে আহুত হইয়া তিনি হইদ্রাবাদে

উপস্থিত হন। তথায় নিজাম দরবারের বহু সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ কর্ত্তৃক অতি সম্মানের সহিত গৃহীত হন। নিজাম বাহাদুরের শ্যালক নবাব সার খুঁরসিদজঙ্গ বাহাদুর তাঁহাকে বিশেষ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করেন। তিনিও স্বামিজীকে পাশ্চাত্যদেশে গমন করিতে উৎসাহ প্রদান করেন। কিছুদিন তথায় থাকিয়া স্বামিজী মাদ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহাকে আমেরিকায় প্রেরণ করিবার জন্য মাদ্রাজবাসী শিষ্যগণ বিশেষ উৎসুক হওয়াতে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্ম্মিনী সঙ্ঘজননী সারদা দেবীর অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। উত্তরে অনুমতি লাভ হইলে, স্বামিজীও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন।

ইতিমধ্যে রাজপুতনার অন্তর্গত ক্ষেত্রীর মহারাজার সানুনয় প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, তিনি আমেরিকায় যাত্রা করিবার পূর্ব্বে পুনরায় ক্ষেত্রী গমন করিলেন। তথা হইতে বোম্বাই নগরে উপনীত হইয়া ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দের ৩১শে মে শিকাগোর ধর্ম্মসভায় যোগদান করিবার জন্য জাপানের পথে আমেরিকায় যাত্রা করিলেন।

তিনি যখন আমেরিকায় উপস্থিত হইলেন, তখনও ধর্ম্মসভার অধিবেশনের তিন মাস বাকী ছিল। পরিচয় পত্রের অভাবে এবং যথেষ্ট অর্থ হাতে না থাকাতে প্রথম কিছুকাল তাঁহাকে বিশেষ কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল। পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক বর্ষীয়সী মহিলার সহিত তাঁহার পরিচয় হইল এবং তাঁহারই সাহায্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের সহিত তাঁহার পরিচয় লাভ ঘটে। এই অধ্যাপক মহাশয় স্বামিজীর সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহারই নিকট হইতে পরিচয় পত্র ও অর্থ সাহায্য লাভ করিয়া স্বামিজী শিকাগো নগরে উপনীত হন। প্রথমে সেখানেও ঠিকানা খুজিয়া পাইতে অসুবিধা হওয়ায়, তিনি বিশেষ কষ্টে পড়েন। এবারেও অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহার অসুবিধা দূর হয় এবং তিনি যথা সময়ে শিকাগোর ধর্ম্মসভায়, হিন্দু ধর্ম্মের প্রতিনিধি স্থানীয়রূপে বক্তৃতা করিবার সুযোগ লাভ করেন।

উক্ত সভার প্রথম দিনের অধিবেশনেই তাঁহার বক্তৃতা অভূতপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করে এবং তখন হইতেই তাঁহার খ্যাতি আমেরিকার সর্ব্বত্র দ্রুত পরিব্যাপ্ত হইতে আরম্ভ করে। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁহার প্রশংসা প্রকাশিত হইতে থাকে, অনেক স্থলে তাঁহার চিত্র ও জনসাধারণ সাগ্রহে সংগ্রহ করিতে থাকে। শিকাগো ধর্ম্মসভা সংস্রবে স্বামিজী অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন।

ঐ সকল বক্তৃতায় তিনি বেদান্ত প্রতিপাদ্য অদ্বৈতবাদই হিন্দু ধর্ম্মের মূল, ইহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করেন।

ধর্ম্মসভার অধিবেশন শেষ হইবার পর প্রায় একবৎসর কাল আমেরিকায় থাকিয়া বোষ্টন, ডিট্রয়েট, নিউইয়র্ক, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, ব্রুকলীন, প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ নগরে বক্তৃতাদি করেন। এই সকল বক্তৃতার সংস্রবে তিনি আমেরিকার বহু খ্যাতনামা পণ্ডিতের সহিত পরিচিত হন। অনেক শিক্ষিত মার্কিন ভদ্রলোক ও মহিলা বেদান্ত অধ্যয়ন করিবার জন্য তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনিও নিউইয়র্কে বেদান্ত অধ্যাপনা করিবার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান ও তৎসঙ্গে নানারূপ আলোচনা করিতে থাকেন। বহু ধনী ব্যক্তি বিশেষতঃ মহিলাগণ নানা ভাবে এই সকল কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতে থাকেন।

এইভাবে বৎসরাধিক কাল আমেরিকায় বেদান্ত প্রতিপাদ্য হিন্দু ধর্ম্ম প্রচার করিয়া স্বামিজী কতিপয় অনুরাগী ব্যক্তির অনুরোধে ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে ইংলণ্ডে উপনীত হন। এইবারে তিনি তিনমাস কাল ইংলণ্ডে প্রচার, বক্তৃতাদি করিয়া আমেরিকাবাসী অনুরক্ত ব্যক্তিদিগের অনুরোধে পুনরায় তথায় গমন করিলেন। আমেরিকায় তাঁহার যে যশ বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার প্রতিধ্বনী ইংলণ্ডেও পৌছিয়াছিল। সুতরাং এখানেও তিনি যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা প্রাপ্ত হইলেন। এইবারে, ইংলণ্ডে বাসকালে তিনি মিস নোবুল (Miss Noble) নাম্নী মহিলার সহিত পরিচিত হন। এই মহিলাই পরবর্ত্তীকালে ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচিতা হন।

দ্বিতীয় বার আমেরিকায় গমন করিয়া ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। এবারও পূর্ব্বের ন্যায় অসাধারণ সাফল্যের সহিত বেদান্ত প্রতিপাদ্য হিন্দুধর্ম্মের প্রচার, হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা, বিশিষ্ট পণ্ডিতদের সহিত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা, এবং মার্কিন পুরুষ ও নারীদিগকে বেদান্ত অধ্যাপনা প্রভৃতি কার্য্যে তিনি নিরত থাকেন। দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে উপনীত হইয়া তিনি পূর্ব্বের ন্যায় বক্তৃতা প্রদান, আলোচনা, বেদান্ত প্রচার প্রভৃতি কার্য্যেই ব্যস্ত থাকেন। ঃ সময়ে জগদ্বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মোক্ষ মূলারের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। পূর্ব্বেই তাঁহারা পরস্পরের নাম শ্রুত ছিলেন। সাক্ষাতে আলাপ পরিচয়ে তাঁহারা বিশেষ প্রীত হইলেন। মোক্ষমূলার

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের একখানি জীবন চরিত রচনা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে স্বামিজী তাঁহাকে গ্রন্থ রচনার নানাবিধ উপকরণ প্রদান করেন।

অতঃপর একটি ধনী ইংরেজ ভক্ত পরিবারের সহিত, বিশ্রামের জন্য তিনি শুইজারল্যাণ্ড গমন করিয়া কিছুকাল তথায় বাস করেন। সুইজারল্যাণ্ডের অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে তিনি বিশেষ প্রীতি ও আনন্দ লাভ করেন। সুইজারল্যাণ্ড হইতে প্রসিদ্ধ জর্ম্মন দার্শনিক পণ্ডিত ডয়সেনের (Deussen) এর আমন্ত্রণে তিনি জর্ম্মনীর অন্তর্গত কিল (Kiel) নগরীতে গমন করেন। যাইবার পথে জর্ম্মনীর রাজধানী বার্লিন এবং আরও কয়েকটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানও পরিদর্শন করিয়া যান। কিলে যতদিন অবস্থান করিয়াছিলেন, ততদিন তিনি অধ্যাপক প্রবর ডয়সেনের সহিত বেদান্তের আলোচনাতেই তাঁহার সময় আনন্দে অতিবাহিত করিতেন। কিছুকাল পরে তিনি যখন পুনরায় লণ্ডনে প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন অধ্যাপক ডয়সনও তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন। এযাত্রা প্রায় ছয়মাস কাল ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তাঁহার ভক্ত ও অনুরাগী ব্যক্তিগণ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন প্রদান করেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তিনি ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া স্থল পথে ইটালীদেশে উপনীত হন এবং ইটালীর ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগরগুলি পরিদর্শন করিয়া ৩০শে ডিসেম্বর নেপ্‌লস হইতে অর্ণবপোত যোগে ভারতাভিমুখে যাত্রা করিয়া সতের দিন পরে, ১৮৯৭ খ্রী অব্দের ১৫ই জানুয়ারী তিনি সিংহল দ্বীপের রাজধানী কলোম্বো নগরীতে উপনীত হইলেন। ইতিপূর্ব্বেই ইয়োরোপ ও আমেরিকায় তাঁহার অসামান্য সাফল্যের কথা ভারতবাসীর গোচরে আসিয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশে তিনি যে অসাধারণ সম্মান ও অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন সে সকল বৃত্তান্ত দেশবাসী পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা পাশ্চাত্যদেশে প্রথম হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক সন্ন্যাসীকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন। সিংহলবাসীরা প্রথমেই সেই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ উৎফুল্ল হন। স্বামিজী সিংহলে যে কয়দিন ছিলেন, সে কয়দিন আদর অভ্যর্থনার আর সীমা ছিল না। কলম্বো নগরে এক মহতী সভায় তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করা হয়। তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আহুত সভা সমূহে বিপুল জনসমাগম হইত। সিংহলবাসীদের অনুরোধে তিনি অনুরাধাপুর, জাফনা, কাণ্ডি প্রভৃতি প্রাচীন নগরী সমূহ পরিদর্শনে গমন করেন

এবং সর্ব্বত্র বিপুল সম্বর্দ্ধনা প্রাপ্ত হন।

সিংহল হইতে অর্ণবপোত যোগে সেতুবন্ধ রামেশ্বরের নিকট পাম্বান নগরে উপস্থিত হন। তথায় রামনদের ভূস্বামী তাঁহাকে রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। রামেশ্বরের মন্দির দর্শন করিতে যাইয়াও তিনি বর্ণনাতীত অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি রামনদে গমন করেন এবং সেই স্থানেও পূর্ব্বের ন্যায় রাজোচিত অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন। ক্রমে মাদুরা, ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর প্রভৃতি নগর পরিদর্শন এবং সর্ব্বত্রই সমভাবে রাজোচিত সম্মান লাভ করিয়া ৬ই ফেব্রোয়ারী মাদ্রাজে উপনীত হইলেন। তথায় যে অতুলনীয় অভ্যর্থনা হইয়াছিল, তাহা বলাইবাহুল্য। তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন বা অভ্যর্থনা করিবার জন্য যেন বিভিন্ন সভা সমিতির মধ্যে প্রতিযোগীতা উপস্থিত হইয়াছিল। মাদ্রাজবাসীদের পক্ষ হইতে যে অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছিল, তাহাতে সংস্কৃত, ইংরেজি, তামিল ও তেলুগু ভাষায় প্রায় কুড়ি খানি অভিনন্দন পত্র পঠিত হইয়াছিল। স্বামিজী কয়েকদিন মাদ্রাজে অবস্থান করিয়া যে কয়টি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই কয়টিতেই বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। কলিকাতাবাসীগণও তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। তজ্জন্য তিনি দীর্ঘকাল মাদ্রাজে অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। মাত্র আট দশ দিন মাদ্রাজে অপেক্ষা করিয়া অর্ণবপোত যোগে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানেও তিনি যোগ্য সমাদর ও অভ্যর্থনা লাভ করেন। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে মিছিল করিয়া তাঁহাকে প্রথম বাগবাজারে পশুপতি বসু মহাশয়ের বাটীতে লইয়া যাওয়া হইল। প্রায় এক সপ্তাহ পরে, রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শোভাবাজারস্থ প্রাসাদের মণ্ডপে এক সভা আহ্বান করিয়া কলিকাতাবাসীদিগের পক্ষ হইতে তাঁহার বিরাট সম্বর্দ্ধনা করা হয়। কিছুকাল পরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় তিনি এক বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহার পর তিনি আর অভ্যর্থনা উৎসবে যোগদান বা সভা সমিতিতে বক্তৃতা প্রদান দ্বারা সময় নষ্ট করিতেন না, গঠনমূলক কার্য্যেই প্রধানতঃ আত্মনিয়োগ করেন। এই উদ্দেশ্যে কখনও বরাহনগর আলমবাজারের মঠে, কখনও কখনও বাগবাজারে বলরাম বসু মহাশয়ের ভবনে বাস করিয়া শাস্ত্র পাঠ, অধ্যাপনা প্রভৃতি কাজের সহিত কতিপয় উৎসাহী সন্ন্যাসী যুবককে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করিবার যোগ্য শিক্ষা দান করিতে থাকেন।

কোনও সৎকাজ ব্যাপকভাবে করিতে হইলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে করা আবশ্যক, অন্যথা তাহা সফল হইতে পারে না, ইহা তিনি পাশ্চাত্যদেশ সমূহে দীর্ঘ প্রবাসের ফলে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই অনুভূতির বশবর্ত্তী হইয়া ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দের ১লা মে "রামকৃষ্ণ মিশন" নামে একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঐ সঙ্ঘের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন "আমাদের মত দেশে প্রথম হতে সাধারণ তন্ত্রে সঙ্ঘ তৈয়ারী করা বা সাধারণের সম্মতি (ভোট) নিয়ে কাজ করাটা তত সুবিধাজনক বলে মনে হয় না। এদেশে শিক্ষা বিস্তারে যখন ইতর সাধারণ লোক সমধিক জ্ঞানবান্ হবে, যখন মত ফতের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে চিন্তা প্রসারিত করিতে শিখিবে, তখন সাধারণ তন্ত্র মতে সঙ্ঘের কার্য্য চলতে পারবে। এই জন্য এই সঙ্ঘের একজন Dictator বা প্রধান পরিচালক থাকা চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে, তারপর কালে সকলের মত নিয়া কার্য্য করা যাবে।" উক্ত "রামকৃষ্ণ মিশন" প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এইরূপ স্থির হইয়াছিল—"মানবের হিতার্থে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্বব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং কার্য্যেও তাঁহার জীবনে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহার প্রচার' এবং মনুষ্যের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতি কল্পে যাহাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে তদ্বিষয়ে সাহায্য করা এই "প্রচারের (Mission) উদ্দেশ্য।"

এই সময়ে মধ্যে একবার কয়েকজন বেদ ও দর্শন শাস্ত্রবিদ্ গুজরাটি পণ্ডিত স্বামিজীর খ্যাতি ও পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতা আগমন করেন। স্বামিজার সহিত তাঁহাদের ধর্ম্মতত্ত্ব লইয়া নানারূপ আলোচনা ও বিচার হয়। তাহাতে পণ্ডিতবৃন্দ প্রীত হইয়া স্বামিজীকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি কিছুকাল কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্যসহ দারজিলিংএ যাইয়া অবস্থান করেন। কিন্তু তাহাতে স্থায়ী ফল কিছু না হওয়াতে কিছুদিন কলিকাতায় অবস্থান করিয়া চিকিৎসগণের পরামর্শে আলমোড়া গমন করিলেন।

আলমোড়ায় প্রায় আড়াই মাসকাল অবস্থান করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইল। তখন অনুরাগী ভক্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অনুরোধে তিনি পুনরায় উত্তর ভারত, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে পর্য্যটন করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। এইবার বেরিলি, আম্বালা, লাহোর, অমৃতসর, মুলতান রাওয়ালপিণ্ডি, কাশ্মীরের রাজধানী

শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। প্রত্যেক স্থানেই বিভিন্ন ধর্ম্মতত্ত্ব উপলক্ষে আলোচনা, বক্তৃতা প্রদান, শাস্ত্র বিচার প্রভৃতির দ্বারা স্বীয় মত প্রচার করিতে থাকেন। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আচার্য্য ও দার্শনিক পণ্ডিতগণের সহিত আলাপ আলোচনা হয়। কাশ্মীরের মহারাজা রাম সিংহ তাঁহাকে বিশেষ সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন। মহারাজার অনুগ্রহে তিনি কাশ্মীরের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করেন। পঞ্জাবের ভ্রমণ শেষ করিয়া তিনি পুনরায় রাপুতানার জয়পুর, আলোয়ার, ক্ষেত্রী প্রভৃতি রাজ্যে গমন করেন। প্রত্যেক স্থানের নরপতিগণ তাঁহাকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা ও সম্মান প্রদর্শন করেন। এইভাবে ক্রমান্বয়ে দেশ ভ্রমণ ও তৎসঙ্গে বক্তৃতাদি প্রদান জনিত পরিশ্রমে পুনরায় তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল। সেইজন্য বরোদা, গুজরাট প্রভৃতি স্থান হইতে আমন্ত্রণ আসিলেও তিনি চিকিৎসকগণের পরামর্শে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বহুদিন হইতে ভাগীরথী তীরে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের বাসোপযোগী একটি স্থায়ী মঠ স্থাপন করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে প্রবলভাবে বর্ত্তমান ছিল। এইবার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করেন। দক্ষিণেশ্বরের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পশ্চিমে ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে বেলুড় নামক গ্রামে মঠ নির্ম্মাণোপযোগী ভূমি সংগৃহীত হইলে, কতিপয় আমেরিকান ভক্ত শিষ্যগণের অর্থানুকূল্যে তথায় সুবিশাল মঠ ও অন্যান্য কার্য্যোপযোগী ভবনাদি নির্ম্মিত হইল। একজন মার্কিণ মহিলা শিষ্যা মঠের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রায় এক লক্ষ মুদ্রা প্রদান করেন।

মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুকাল পরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে তিনি প্রায় পঞ্চাশজন ভক্ত শিষ্যকে উপবীত প্রদান করেন। তাঁহার এই সাধারণ হিন্দু সংস্কারোচিত কাজের দ্বারা চারিদিকে আন্দোলন উপস্থিত হইলেও তিনি তাহাতে বিচলিত হন নাই।

১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে পূর্ব্বোক্ত (১৭৫৪ পৃঃ) মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল (Miss Margaret Noble) বেলুড় মঠে আসিয়া উপস্থিত হন এবং কিছুকাল পরে স্বামিজীর নিকট ব্রহ্মচারিণী-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচিতা হইলেন।

পরবর্ত্তী মার্চ্চ মাসে পুনরায় বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যের উন্নতি লাভের জন্য তিনি দারজিলিং গমন করেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই কলিকাতায় দুরন্ত মহামারী রোগের ব্যাপক আক্রমণ হওয়ায়, তিনি কলিকাতায় আগমন করেন এবং শিষ্য ও অনুরাগী ব্যক্তিগণকে সেবা কার্য্যে উৎসাহিত করিয়া রোগ প্রতিরোধ ও

পীড়িতের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাঁহার এই অসমসাহসিক কার্য্যে ক্রমাগত অর্থ সাহায্য লাভ হইতে লাগিল। কয়েক মাস তাঁহার নেতৃত্বে উৎসাহী কর্ম্মীবৃন্দ' সেবাধর্ম্মের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন করেন।

কলিকাতায় প্লেগের প্রকোপ কমিলে স্বামিজী তাঁহার কয়েকজন ধর্ম্মভ্রাতা ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণকে লইয়া নৈনিতাল, আলমোড়া প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণের জন্য গমন করেন। এই ভ্রমণের মধ্যে কিছুকাল তিনি আলমোড়া অবস্থান করেন, তৎপরে কাশ্মীরের মধ্যদিয়া হিমাচলের অভ্যন্তরস্থ অমরনাথ, ক্ষীরভবানী প্রভৃতি তীর্থ স্থান দর্শনে গমন করেন। এই ভাবে কয়েক মাস অতিবাহিত করিয়া অক্টোবর মাসে বেলুড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ডিসেম্বর মাসে বেলুড়ের নবনির্ম্মিত মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেহাবশেষ রক্ষিত পবিত্র তাম্রাধার ও তাঁহার প্রতিকৃতির প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হয়। অতঃপর তিনি কিছুকালের জন্য বৈদ্যনাথে যাইয়া পুনরায় বেলুড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ইহার পর বৎসর জুন মাসে ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দে স্বামী তুরিয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতাকে লইয়া স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জাহাজ মাদ্রাজে উপনীত হইলে, তাঁহার অনুরাগী ভক্তগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তীরে উপনীত হন। কিন্তু সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের নিষেধের জন্য স্বামিজী অবতরণ করিবার অনুমতি পাইলেন না। কিন্তু পরে যখন কলম্বোতে জাহাজ উপস্থিত হয় তখন স্বামিজী জাহাজ হইতে নামিয়া পূর্ব্ব পরিচিত ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। ক্রমে ৩১শে জুলাই তারিখে সানুচর স্বামিজী ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন। এইবার তিনি বেশীদিন ইংলণ্ডে অবস্থান করেন নাই। মাত্র পনেরদিন পরেই আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভগিনী নিবেদিতা এসময়ে তাঁহার সহিত গমন করিলেন না। তিনি একমাস পরে যাইয়া স্বামিজীর সহিত আমেরিকায় মিলিত হইলেন। এযাত্রা স্বামিজী প্রায় এক বৎসর কাল আমেরিকায় ছিলেন। এই সময়ের প্রায় সবটাই বক্তৃতা প্রদান, বেদান্ত প্রচার, বেদান্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠার আয়োজন এই সকল কার্য্যে অতিবাহিত হয়।

আমেরিকা হইতে তিনি ফরাসীদেশে গমন করেন। ফরাসীদেশের রাজধানী প্যারী নগরীতে তখন এক বিশ্বশিল্প প্রদর্শনী ও তাহার সঙ্গে একটি বিভিন্ন ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনার জন্য সম্মেলন হয়। স্বামিজী ঐ সম্মেলনে উপস্থিত থাকিয়া হিন্দুধর্ম্ম কি, তৎসম্বন্ধে

বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় তিন মাসকাল প্যারীতে থাকিয়া তিনি সমগ্র ইয়োরোপ পরিভ্রমণে বাহির হইলেন। সর্ব্বত্রই যাহাতে তাঁহার থাকা এবং দর্শনীয় স্থান ও বস্তুগুলি দেখিবার সুবিধা হয় তজ্জন্য তাঁহার পাশ্চাত্য বন্ধু ও ভক্তগণ সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তুরস্কদেশের প্রাচীন রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল হইয়া তিনি মিশরে গমন করেন এবং তথা হইতে একরূপ অপ্রত্যাশিত-ভাবে ১৯০০ খ্রীঃ অব্দের ৯ই ডিসেম্বর বেলুড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েক দিন বেলুড়ে থাকিয়া তিনি মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমে গমন করেন। উক্ত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা একজন ইংরেজ শিষ্য পরলোকগত হওয়ায় আশ্রমের কার্য্যকলাপ কিরূপ চলিতেছিল তাহা জানিবার জন্যই তিনি মায়াবতী গমন করেন। কিছু-কাল মায়াবতীতে থাকিয়া পুনরায় বেলুড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর তিনি পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে গমন করেন। প্রথমে ঢাকায় উপনীত হন। বলা বাহুল্য এখানে তাঁহার আদর অভ্যর্থনা ও সম্বর্দ্ধনার বিন্দুমাত্র ক্রটী হয় নাই। ঢাকায় যে কয়দিন ছিলেন পূর্ব্বের ন্যায় বক্তৃতা প্রদান, আলোচনা, ধর্ম্মোপদেশ দান প্রভৃতি কাজেই ব্যস্ত ছিলেন। ঢাকা হইতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ গৃহী শিষ্য সাধু নাগ মহাশয়ের জন্মভূমি দেওভোগে গমন করেন। নাগ মহাশয় বৎসরাধিককাল পূর্ব্বেই গত হইয়া-ছিলেন। ঢাকা হইতে গোয়ালপাড়া ও গৌহাটী হইয়া আসামের রাজধানী শিলং গমন করিলেন। সেখানে আসামের শাসনকর্ত্তা (Chief Commissioner) সার হেনরী কটন সাহেব তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। শিলংএও তাঁহাকে একটি বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল এইভাবে মস্তিষ্ক পরিচালনা করার ফলে, তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিল। শিলংএর অত্যুৎকৃষ্ট আবহাওয়া তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ উপকার করিতে পারিল না। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম ভ্রমণে অসুস্থ হইয়া স্বামিজী কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এখানে তাঁহার যথাসাধ্য চিকিৎসা চলিতে লাগিল কিন্তু খুব ভাল ফল দেখা গেল না। বিশ্রামের আবশ্যক খুবই ছিল, কিন্তু বিশ্রাম একে-বারেই ছিল না। পাঠ, আলোচনা অধ্যাপনা কোনওটারই বিরাম ছিল না। এইভাবেই দিন কাটিতে লাগিল। সেই বৎসর (১৯০১ খ্রীঃ) আশ্বিন মাসে তিনি বেলুড় মঠে যথাযোগ্য সমারোহ সহকারে দুর্গোৎসব সমাপন করিলেন। ইহাতে যে সকল গোঁড়া হিন্দু তাঁহার অ-হিন্দুজনোচিত আচার ব্যবহারের জন্য তাঁহার প্রতি বিরূপ

হইয়াছিলেন, তাঁহারাও কতকটা সন্তুষ্ট হইলেন। দুর্গা পূজার পর যথাসময়ে লক্ষ্মী ও শ্যামা পূজাও বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হইল। পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা নগরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিতে আগত প্রতিনিধিগণের অনেকে স্বামিজীকে দেখিবার জন্য বেলুড়ে আগমন করেন। এই সময়েই দুইজন জাপানী পণ্ডিত স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বেলুড়ে উপস্থিত হন। শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের ন্যায় একটি সম্মেলন যাহাতে জাপানে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহার জন্য স্বামিজীর সহিত পরামর্শ করিবার জন্যই তাঁহারা বেলুড়ে আগমন করেন। তাঁহারা স্বামিজীকে জাপানে যাইবার জন্য অনুরোধও করেন। কিন্তু শারিরীক অসুস্থতার জন্য তিনি যাইতে সম্মত হইলেন না। পরবর্ত্তী বৎসর পূর্ব্বোক্ত বন্ধুদ্বয়ের অন্যতমের আমন্ত্রণে তিনি বুদ্ধ গয়ায় গমন করিলেন। গয়ার মোহন্ত তাঁহাকে বিশেষ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। জাপানী বৌদ্ধ বন্ধুদের সহিত আলাপ আলোচনায় কয়েক দিন আনন্দে অতিবাহিত করিয়া স্বামিজী কাশী গমন করিলেন। কিছুকাল কাশীতে থাকিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হয়। কিন্তু বিশ্রাম লাভের অবকাশ না পাওয়ায় সম্পূর্ণরূপে সারিতে পারেন নাই। যাহা হউক তিনি বেলুড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু শরীর ক্রমশঃ অধিক অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিল। এইভাবে কয়েক মাস অতিবাহিত হইলে ১৯০২ খ্রীঃ অব্দের ৪ঠা জুলাই রাত্রি ৯টার সময়ে এই বিশ্ববিখ্যাত সন্ন্যাসী, বাগ্মী ও কর্ম্মী অকালে নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া গেলেন।

বিবেকিধ্বজ— একজন সিদ্ধাচার্য্য। গোরক্ষনাথ দেখ।

বিভব—তিনি একজন বাস্তু শিল্পকার ঋষি। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'বৈভব তন্ত্র'। উহা এখন দুষ্প্রাপ্য।

বিভবৎ—একজন সিদ্ধাচার্য্য। গোরক্ষনাথ দেখ।

বিভাকরাচার্য্য— 'প্রশ্ন কৌমুদী' নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

বিভাণ্ড—রাজা প্রতাপাদিত্যের সময় কবিরাম নামক এক পণ্ডিত 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' নামে একখানা সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে অহিপালের পুত্র কেশীধ্বজ সপ্ত গ্রামের রাজা ছিলেন। এই অহিপালের দ্বিতীয় পুত্র বিভাণ্ড, বাণ রাজার মন্ত্রী ছিলেন। সম্ভবতঃ এই বাণ রাজাই নরপতি বাণ পাল।

বিভূতিচন্দ্র—একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মহাভিক্ষু। বাঙ্গালার জগদ্দল বৌদ্ধ মহাবিহারের ভিক্ষুগণের মধ্যে তিনিই প্রধান। রামপাল রামাবতী নামে যে

নগর স্থাপন করেন, 'জগদ্দল মহাবিহার' তাহারই নিকট গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গমের উপরেই ছিল। তেঙ্গুরে ইহার অবস্থিতি সম্বন্ধে সুনির্দ্দিষ্টভাবে কিছুই জানা যায় না। তেঙ্গুরে কোথাও লিখিত আছে উহা বরেন্দ্রে ছিল, কোথায় লিখিত আছে বাঙ্গালায়, আবার কোথায় লিখিত আছে পূর্ব্ব ভারতে। রামপালই যে এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা তাহাও সঠিকভাবে কিছু জানা যায় না। বিভূতিচন্দ্র 'অমৃত কর্ণিকা' নামে 'নামসংগীতির' একখানি টীকা রচনা করেন, ঐ টীকা কালচক্র-যানের মতে লিখিত হইয়াছিল। তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থেরও টীকা টিপ্পনী লিখিয়াছিলেন। যে সময়ে তীব্বতে এই সকল বৌদ্ধ গ্রন্থের তর্জ্জমা হয়, তখন তিনি অনেক গ্রন্থের তর্জ্জমায় সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তিনি নিজেও কয়েকখানি পুস্তক তর্জ্জমা করিয়াছিলেন। জগদ্দলের আর এক-জন মহাভিক্ষু দানশীলও এইরূপ অনেক পুস্তক অনুবাদে সাহায্য করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে তীব্বতীয়দের এক সময়ে জগদ্দলের ভিক্ষুদের উপর নির্ভর করিতে হইত। মগধের নালন্দা, পেশোয়ারের কণিষ্ক বিহার ও কলম্বোর দীপদত্তম বিহারের ন্যায় বাঙ্গালার জগদ্দল মহা-বিহারও সুপ্রসিদ্ধ।

বিভূতিশেখর মুখোপাধ্যায়—একজন সংবাদপত্র সেবী। তিনি 'অভিষেক' নামক একখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

বিমকদফিস—কুষাণবংশীয় একজন প্রসিদ্ধ রাজা। তিনি পরাক্রমশালী রাজা কুজুলক দফিসের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি রাজা হন। তিনি ভারতবর্ষের কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত বহু স্বর্ণ ও তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মুদ্রায় শিব ও তাঁহার বাহন বৃষ অঙ্কিত আছে। ইহা দ্বারা অনেকে অনুমান করেন যে, বিমকদফিস হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া শৈব মতের প্রতিপোষক ছিলেন। তিনি তাঁহার বিজিত ভারতীয় রাজ্য-সমূহ প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া শাসন করিতেন। তাঁহার পর সুপ্রসিদ্ধ কনিষ্ক রাজা হইয়াছিলেন।

বিমল—মহাত্মা রামানন্দের শিষ্য কবীর। কবীরের শিষ্য, তাঁহার পুত্র কমাল, কমালের শিষ্য জমাল, এই জমালের শিষ্য বিমল একজন শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন। বিমলের শিষ্য বুঢ়নে (বৃদ্ধানন্দ) এবং তৎ শিষ্য দাদু। কবীর ও দাদু দেখ।

বিমলকান্তি ঘোষ—একজন সংবাদ পত্রসেবী। তিনি 'অমৃত বাজার' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক গোপাল-লাল ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি

এম-এ ও বি-এল ডিগ্রী লাভের পর কিছুদিন যশোহরে ওকালতী করেন; কিন্তু আইন ব্যবসায় তাঁহার উপযোগী নহে মনে করিয়া, তিনি ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা রাধা বাজারে কাগজের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। শেষ পর্য্যন্ত কাগজের ব্যবসায়ে তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া তিনি তাঁহাদের পারিবারিক পেশা সংবাদপত্র সেবা আরম্ভ করেন এবং অমৃতবাজার পত্রিকার ব্যবস্থা সম্পাদক (Managing Editor) হন। তিনি অতি অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। যিনি তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন তিনিই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। ১৩৪২ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

বিমলচন্দ্র—নালন্দার রাজা। তাঁহার পুত্র গোবিচন্দ্র ও পৌত্র ললিতচন্দ্র। তাঁহারা খ্রীঃ সপ্তম শতকে বর্ত্তমান ছিলেন।

বিমলচন্দ্র সূরী—এই জৈন পণ্ডিত 'প্রশ্নোত্তর রত্নমালা' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্র মুণীশ্বর নামক জৈন সন্ন্যাসী ১৩৭৩ খ্রীঃ অব্দে উহার এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

বিমলনাথ—তিনি চতুর্ব্বিংশতি জৈন তীর্থঙ্করের অন্যতম। সমেত শিখরে (পার্শ্বনাথ পর্ব্বত) তিনি নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

বিমল মিত্র—যে সকল ভারতীয় পণ্ডিত খ্রীঃ অষ্টম শতকের প্রারম্ভে তীব্বতে গমনপূর্ব্বক ভারতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থের তীব্বতী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

বিমল শাহ—অনহিলবার পত্তনের একজন বিখ্যাত জৈন বণিক। তিনি ১০৩২ খ্রীঃ অব্দে দৈলবাড়া নামক স্থানে জৈন তীর্থঙ্কর বৃষভদেবের একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

বিমলশ্রী—যে সকল ভারতীয় পণ্ডিত খ্রীঃ অষ্টম শতকের প্রারম্ভে তীব্বতে গমনপূর্ব্বক ভারতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থের তীব্বতী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

বিমলাক্ষ—কিপিন নামক স্থানের একজন বৌদ্ধ শ্রমণ। কুমারজীব তাঁহার শিষ্য ছিলেন। ৪০৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি চীনদেশে গমন পূর্ব্বক বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

বিমলাচরণ রায় চৌধুরী—একজন সংবাদ পত্র সেবী। তিনি 'মোহিনী' নামক একখানি মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন।

বিমলাদাস—একজন বাঙ্গালী মহিলা ভ্রমণকারী। তিনি সত্যরঞ্জন দাস মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। বঙ্গ রমণীর মধ্যে তিনিই সর্ব্ব প্রথম নরওয়ে ভ্রমণে গমন করেন এবং পৃথিবীর আরও অনেক দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

মাসিক 'ভারতবর্ষে' তাঁহার 'নরওয়ে ভ্রমণ কাহিনী' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার লিপি চাতুর্য্য ও বর্ণনা কৌশল অতি চমৎকার ছিল। তিনি অন্যান্য স্থানের ভ্রমণ কাহিনীও প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সেই অভিলাষ পূর্ণ করিয়াই যাইবার সুযোগ পান নাই। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে অকালে তিনি পরলোক গমন করেন।

বিমলাদিত্য—(১) তিনি চালুক্যবংশীয় বল বর্ম্মার পৌত্র ও যশোবর্ম্মার পুত্র ছিলেন। রাষ্ট্রকূটবংশীয় তৃতীয় গোবিন্দের সামন্ত নরপতি গঙ্গাবংশীয় চাকিরাজ বিমলাদিত্যের মাতুল ছিলেন। ৮১৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি বিদ্যমান ছিলেন।

বিমলাদিত্য—(২) তিনি পূর্ব্ব চালুক্যবংশীয় নরপতি দানার্ণবের দ্বিতীয় পুত্র ও শক্তি বর্ম্মার ভ্রাতা ছিলেন। তিনি ১০১৫—১০২২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র প্রথম রাজরাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিমলাদিত্য, রাজা রাজেন্দ্রচোলের কনিষ্ঠা ভগিনী কুণ্ডাবা মহাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু বর্দ্ধন প্রথম দেখ।

বিমলাদিত্য—(৩) তিনি পীঠাপুরের পূর্ব্ব চালুক্যবংশীয় নরপতি প্রথম বিজয়াদিত্যের পৌত্র ও সত্যাশ্রয় উত্তম চালুক্যের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় *বিজয়াদিত্যের পরে রাজা* হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার অনুজ ভ্রাতা বিক্রমাদিত্য রাজা হইয়াছিলেন।

বিমলাদিত্য—(৪) তিনি বেঙ্গীর চালুক্য বংশীয় নরপতি ছিলেন। তিনি চোল রাজ্যেশ্বর রাজরাজের কন্যা কুণ্ডবৈবয়ারকে বিবাহ করেন। তিনি চোল রাজ্যের সামন্ত নরপতি ছিলেন।

বিমলানন্দ নাগ, রেভারেণ্ড—প্রসিদ্ধ বাগ্মী, দেশসেবক ও ভারতীয় খ্রীষ্টান সমাজের নেতা। তিনি ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাজা নগরের প্রসিদ্ধ নাগবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বি, এ নাগ নামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে তিনি তদানীন্তন বিখ্যাত মিশনারী রেভারেণ্ড রাইট হের নিকট খ্রীঃ ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯০০ খ্রীঃ অব্দ হইতে তিনি ব্যাপটিষ্ট মিশনের কার্য্যে যোগদান ও সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য ছিলেন এবং ১৯০৬—১৯১৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত কংগ্রেসে থাকিয়া দেশের সেবায় আত্ম নিয়োগ করেন। ১৯১৭ খ্রীঃ অব্দে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের সময় তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ছিলেন (আনিবেশান্ত ঐ অধিবেশনের সভানেত্রী ছিলেন)।

১৯১৯ খ্রীঃ অব্দে মডারেটরা কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে তিনিও সেই সময় কংগ্রেস ত্যাগ করেন। তৎপর তিনি বাঙ্গালার নেশন্যাল লিবারেল লীগের প্রথম সম্পাদক (Secretary) নিযুক্ত হন। মণ্টেগু চেম্‌সফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে তদানীন্তন ভারত সচিব মণ্টেগু ভারতে আসিলে স্যার সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বাঙ্গালার যে পচিশ জন প্রতিনিধি দিল্লীতে গমন করিয়া মণ্টেগুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। ভারতীয় খ্রীষ্টান সমাজের নেতৃগণের মধ্যে যাঁহারা রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেভারেণ্ড বি, এ নাগের নামই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। রেভারেণ্ড নাগ ভারতীয় খ্রীষ্টান কনফারেন্স, বঙ্গীয় খ্রীষ্টান কনফারেন্স এবং ভাতীয় খ্রীষ্টান সমিতির (Indian Christian Association) সভাপতি ছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি (Vice President) ছিলেন। তের বৎসর কাল তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের সরকার মনোনীত কাউন্সিলর ছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা (Bengal Council), বোর্ড অব সেন্সাস, মেডিক্যেল কলেজ এডভাইসরী বোর্ড, বেঙ্গল সিভিল সার্ব্বিস কমিশন প্রভৃতির সদস্য ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও বহুজন হিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রীঃ অব্দে বার্লিনে ওয়ারল্ড ব্যাপটিষ্ট কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তিনি তাঁহার সহঃ সভাপতি মনোনীত হইয়া তথায় গমন করেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম উক্ত সম্মানিত পদে মনোনীত হইয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ২সরা চৈত্র (১৯৩৭ খ্রীঃ, ১৬ই মার্চ্চ) তিনি পরলোক গমন করেন।

বিমলানন্দ, স্বামী—একজন শক্তি সাধক ও সিদ্ধপুরুষ। কোটালী পাড়ার প্রসিদ্ধ শুনক গোত্রীয় ব্রাহ্মণ জমিদার বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার লৌকিক নাম ছিল সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী। তিনি নির্লোভ, নিরহঙ্কার, সত্যনিষ্ঠ ও মহানন্দময় যোগী মহাপুরুষ ছিলেন। কথিত আছে মাত্র ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার অভীষ্ঠ মহাদেবী প্রত্যক্ষে আবির্ভূতা হন। তাঁহার কৃত শ্রীশ্রী কর্পূরাদি কালিকা স্তোত্রের বিমলানন্দ দায়িনী নাম্নী স্বরূপ ব্যাখ্যা দ্বারভাঙ্গার স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের আগ্রহাতিশয্যে মহামতি হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার জন উড্‌রফ 'আগমানুসন্ধান সমিতি' হইতে প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থ পাঠে

বিমলানন্দ স্বামীর সাধন লব্ধ অপূর্ব্ব জ্ঞানের কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। তাঁহার ধ্যানলব্ধ অপূর্ব্ব দেবী মূর্ত্তী তিনি স্বহস্তে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তাহা "শ্রীশ্রী কালিকা" বা "ষোড়শী কালী" নামে প্রকাশিত আছে। তাঁহার সিদ্ধাসন বেলুর মঠের দক্ষিণে ভাগীরথী তীরে কালিকাশ্রমে অবস্থিত। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে তিনি নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া মহাদেবীর পাদপদ্মে বিলীন হইয়াছেন। তিনি অতীব গোপনে তাঁহার সাধনা ও জ্ঞানের চর্চ্চা করিতেন। বিশেষ অন্তরঙ্গ বা ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ভিন্ন তাঁহর পরিচয় কেহ পান না।

বিমান—ত্রিপুরা রাজ্যের একজন প্রাচীন রাজা। তাঁহার অন্যনাম পাইমারাজ। তিনি মহারাজ ইন্দ্রকীর্ত্তির পুত্র এবং চন্দ্র হইতে ১০৯ ও ত্রিপুর হইতে ৬৪ স্থানীয় রাজা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বীয় পুত্র যশোরাজকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরলোক গমন করেন।

বিমার—ত্রিপুরা রাজ্যের একজন রাজা। তিনি মহারাজ সুরেন্দ্রের পুত্র এবং চন্দ্র হইতে ১০০ ও ত্রিপুর হইতে ৫৫ স্থানীয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র কুমার রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন।

বিম্বিসার—তিনি ৫১৩ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে মগধের রাজা ছিলেন। তাঁহার অন্যনাম ছিল শ্রেণ্য বা শ্রেণীক। তাঁহার পিতার নাম ছিল ভট্টিয়। সিংহলের প্রসিদ্ধ ইতিহাস মহাবংশ মতে ৫২ বৎসর রাজত্বের পর তাঁহার পুত্র অজাত শত্রু তাঁহাকে বিনাশ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। অঙ্গ দেশের রাজা ব্রহ্মদত্ত, ভট্টিয়কে পরাস্ত করিয়াছিলেন। বিম্বিসার ব্রহ্মদত্তকে পরাস্ত করিয়া অঙ্গ দেশের রাজধানী চম্পানগর অধিকার করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহার পাঁচ বৎসরের জ্যেষ্ঠ ছিলেন।

বিমোক্ষপ্রজ্ঞ ঋষি—উদয়ন নামক স্থানের একজন বৌদ্ধ শ্রমণ। ৫৪১ খ্রীঃ অব্দে তিনি তাঁহার সহকর্ম্মী প্রজ্ঞা রুচির সাহায্যে পাঁচখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

বিয়া বাণী, শেখ রাজা—বাঙ্গালার নবাব হাজি ইলিয়াস শাহের রাজত্ব কালে (১৩৩৯—১৩৫৯ খ্রীঃ) শেখ রাজা বিয়া বাণী নামে এক ফকির বাস করিতেন। বিয়াবন শব্দের অর্থ জঙ্গল, বোধ হয় তিনি জঙ্গলে বাস করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম বিয়া বাণী হইয়া থাকিবে। তাঁহার অন্যনাম খেরকা পোষ ছিল। নবাব ইলিয়াস শাহ তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। ১৩৫৩ খ্রীঃ অব্দে ফকিরের মৃত্যু হয়।

বিরহ বল—জৈন সন্ন্যাসী জগচন্দ্রের শিষ্য দেবেন্দ্র সূরী, উজ্জয়িনীর জীন চন্দ্রের পুত্র বিরহ বল ও ভীম সিংহকে

জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। বিরহ বল, 'শ্রাদ্ধকৃত্য সূত্রবৃত্তি' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। ১২৭১ খ্রীঃ অব্দে মালব দেশে তিনি পরলোক গমন করেন।

বিরাজ—ত্রিপুরা রাজ্যের একজন প্রাচীন রাজা। নামান্তর রবিকীর্ত্তি বা বীররাজ। তিনি পিতা মহারাজ দুরাশার মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি চন্দ্র হইতে ৯৩ ও ত্রিপুর হইতে ৪৮ স্থানীয় রাজা। তাঁহার পর তৎপুত্র সাগর ফা পিতৃ সিংহাসন অধিকার করেন।

বিরাজমোহিনী দাসী—এই মহিলা কবির 'কবিতাহার' নামক গ্রন্থ, ৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিরাম—তিনি গোয়ালিয়রের রাজা বীর সিংহের পৌত্র ও উদ্ধরণ দেবের পুত্র। তাঁহার পুত্র গণপতি দেব ১৪৪০ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

বিরাম দেব—(১) তিনি ধোলকার রাজা বীর ধবলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বীর ধবলের ১২৩৫ খ্রীঃ অব্দে মৃত্যুর পরে, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বিশাল দেব, মন্ত্রী বস্তু-পালের সাহায্যে রাজ-সিংহাসন বল-পূর্ব্বক অধিকার করেন। বিরাম দেব পলায়ন পূর্ব্বক জাবালীপুরের অধিপতি স্বীয় শ্বশুর উদয় সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মন্ত্রী বস্তু পালের কৌশলে বিরাম দেব নিহত হন।

বিরাম দেব—(২) তিনি যোধপুরের রাণা শঙ্কের পুত্র। ১৩৮১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পুত্র চণ্ড রাজা হইয়াছিলেন।

বিরুআ—একজন সিদ্ধাচার্য্য। তাঁহার 'চর্য্যাপদ' বা কীর্ত্তনের গান পাওয়া গিয়াছে। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বেই সিদ্ধাচার্য্যগণের ঐ সকল পদ দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছিল, সেইজন্য সহজিয়া মতে উহার সংস্কৃত টীকা করিতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও বহু অসংখ্য দোহা-কোষ ছিল। ঐ সকল দোহা-কোষের সংস্কৃত টীকা ছিল। অনেকগুলি দোহা-গীতিকা ছিল, তাহারও সংস্কৃত টীকা ছিল। এই সমস্তেরই ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা আছে। সিদ্ধাচার্য্যগণের মধ্যে লুই, কুকুরী, বিরুআ, গুড়রী প্রভৃতি অনেকেরই গ্রন্থও আছে, সমস্তই ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা হইয়া গিয়াছে। ভুটিয়া ভাষা গ্রন্থ, বিশেষ তেঙ্গুর গ্রন্থ খুজিলে বাঙ্গালীদের ধর্ম্মমত এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী ইতিহাস পাওয়া যায়। বাঙ্গালী নিজেদের পূর্ব্বপুরুষের কথা কিছুই জানে না, তাঁহাদের শিষ্য ভুটিয়াগণ বিশেষ যত্নসহকারে তাঁহাদের ইতিহাস রক্ষা করিতেছে।

বিরূপ—একজন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্য ও যোগীশ্বর। তিনি বজ্রযান ও কালচক্র-যানের পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহার রচিত একখানি গ্রন্থের নাম 'ছিন্নমস্তা-সাধন,' আর একখানির নাম 'রক্ত-

যমারি সাধন'। এতদ্ব্যতীত বিরূপ-গীতিক, বিরূপ পদ চতুরশীতি, কর্ম্ম-চণ্ডালিকা-দোহাকোষগীতি ও বিরূপ-বজ্রগীতিকা নামে তাঁহার রচিত চারিখানি গানের পুস্তকও আছে। তাঁহার একটি মাত্র গান পাওয়া গিয়াছে।

বিরূপা— খ্রীঃ১৪শ শতকে মিথিলাধিপ হরিসিংহ দেবের রাজত্বকালে কবি-শেখরাচার্য্য জ্যোতিরীশ্বর রচিত বর্ণ-রত্নাকরে ৮৪ সিদ্ধের নাম আছে। বিরূপা তাঁহাদের অন্যতম।

বিরূপাক্ষ—তিনি বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় হরিহরের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম মল্ল দেবী। তিনি পিতার আদেশে তুণ্ডির, চোল, পাণ্ড্য ও সিংহল রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। ১৩৮৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

বিরূপাক্ষ (প্রথম)—তিনি বিজয় নগরের রাজা দ্বিতীয় দেব রায়ের পুত্র এবং মল্লিকার্জ্জুনের ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী। তিনি ১৪৭০—১৪৭৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা মল্লিকার্জ্জুনের পুত্র রাজ শেখর রাজা হইয়াছিলেন।

বিরূপাক্ষ (দ্বিতীয়)—তিনি বিজয় নগরের রাজা মল্লিকার্জ্জুনের দ্বিতীয় পুত্র ও রাজ শেখরের ভ্রাতা। তিনি এই বংশের শেষ রাজা এবং ১৪৮৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি রাজা হইয়াছিলেন।

বিরূপাক্ষ বল্লাল—তিনি হয়শাল বংশীয় নরপতি বীর বল্লালের পুত্র। তিনি মুসলমান অধীনতা ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইয়াছিলেন। মাদুরার মুসলমান শাসন কর্ত্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে করিতে ১৩৪৬ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

বিলবিধর—তিনি রাঠোর রাজপুত বংশীয় ছিলেন। আকবর তাঁহাকে তিনশত সৈন্যের অধিনায়ক করিয়াছিলেন।

বিলাল কোবার—দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের অন্যতমা স্ত্রী ও সম্রাট শাহ আলমের মাতা। তাঁহার জিন্নত মহল উপাধি ছিল।

বিলাস দেবী—বঙ্গের সেনবংশীয় রাজা বিজয় সেনের মহিষী ও সুবিখ্যাত বল্লালসেনের জননী। তিনি শূররাজ-বংশের কন্যা ছিলেন।

বিলাস বজ্রা—একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুণী। জ্ঞানডাকিনী নিগু, লক্ষ্মীঙ্করা, বিলাস-বজ্রা প্রভৃতি বৌদ্ধ ভিক্ষুণীগণ বৌদ্ধ শাস্ত্র রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। বৌদ্ধাচার্য্যগণ ও এই সকল বিদুষী রমণীগণ পালরাজগণের অধিকারকালে গৌড়মণ্ডল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এই সকল ভিক্ষুণীদিগের রচিত বৌদ্ধশাস্ত্রও তীব্বতে নীত এবং তথায় অনুবাদিত হইয়াছিল।

বিলুনদেব—তিনি আজমীরের চৌহান বংশীয় নরপতি। তাঁহারই সময়ে

গজনীর সুলতান মাহমুদ শেষবার ভারতবর্ষে অভিযান করিয়াছিলেন। অনুমান ১০২৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি শেষবার ভারতবর্ষে আগমন করেন। বিলুনদেব (অন্য নাম ধর্ম্মগজ) সুলতান মাহমুদের সৈন্যগণকে আজমীর হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। কিন্তু এই যুদ্ধে তিনি সমর শয্যায় শয়ন করেন। তাঁহারই পুত্র বিখ্যাত বিশালদেব।

বিলোলা— বঙ্গের নরপতি বিজয় সেনের মহিষী বিপুলাদেবী (অন্যনাম মালতী) মল্লবর্ম্মা ও শামল বর্ম্মা নামে দুই পুত্র প্রসব করেন।

বিল্লণ—তিনি মঙ্গল বেষ্টক নামক স্থানের অধিপতি ছিলেন। ১১৮৭ খ্রীঃ অব্দে যাদববংশীয় কর্ণদেবের পুত্র ভিল্লম তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন।

বিল্লমদেব যাদব—তিনি যাদব বংশের একজন নরপতি। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা চালুক্যবংশের সামন্ত নরপতি ছিলেন। চালুক্যবংশের প্রতিপত্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইলে তাঁহারা স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। ১১৮৯ খ্রীঃ অব্দে যখন চালুক্য বংশীয় চতুর্থ সোমেশ্বর তাঁহাদের পূর্ব্ব-গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য, রাজ্যাপ-হারী বিজ্জলের পুত্র সবিদেবকে বিতা-ড়িত করেন। তখনও বিল্লমদেব স্বাধীন ছিলেন। বীরবল্লাল হয়শাল, সোমেশ্ব-রের সেনাপতি বোম্মাকে পরাস্ত করিয়া কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ দিকস্থ সমুদয় প্রদেশ অধিকার করিলেন। আর কৃষ্ণানদীর উত্তর দিকস্থ সমুদয় প্রদেশ বিল্লমদেব যাদব অধিকার করিয়া, ১১৯১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার রাজধানী দেবগিরিতে আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এইরূপে চালুক্য বংশের ধ্বংসের পরে তাঁহাদের সামন্ত নরপতি যাদব ও হয়শাল বংশীয়েরা স্বাধীন ও পরাক্রমশালী নরপতি হই-লেন। বিল্লমের পরে তাঁহার পুত্র জৈত্রপাল রাজা হন।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর—একজন প্রসিদ্ধ ভক্ত সাধু। দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণা নদীর তীরে তাঁহার নিবাস ছিল। প্রথম জীবনে তিনি অতিশয় লম্পট ছিলেন। তাঁহার চিন্তা নাম্নী এক পতিতা প্রণয়িনী ছিল। একদা তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ বাসরে মেঘাচ্ছন্ন গাঢ় অন্ধকার রাত্রিতে নদীতে ভাসমান এক গলিত শবাশ্রয়ে তিনি নদী উত্তীর্ণ হন এবং রজ্জুভ্রমে এক অজগর সর্পের পুচ্ছ ধারণ পূর্ব্বক পতিতা প্রণয়িনীর গৃহে উপনীত হন। পতিতা ভয়ানক দুর্য্যোগপূর্ণ এত অধিক রাত্রিতে বদ্ধগৃহে তাঁহার আগমনে অতিশয় বিস্মিত হইল। সেই সময় বিল্বমঙ্গলের গাত্র হইতে দুর্গন্ধ ছড়াইতে ছিল। পতিতা তৎপর অন্বেষণে সমুদয় ঘটনা জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে অতিশয় তিরস্কার পূর্ব্বক এইরূপ বলিল,

"আমার নিকট আগমনে তুমি যেরূপ একাগ্রতা দেখাইয়াছ, তোমার তদ্রূপ একাগ্রতা যদি ভগবানে থাকিত, তবে তুমি মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে।" পতিতার এই তিরস্কার বিল্বমঙ্গলের জীবনে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। তাঁহার মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তিনি গৃহ-ত্যাগ করিয়া, সোমগিরি নামক সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক সন্ন্যাসীদিগের গিরি, পুরি প্রভৃতি উপাধি প্রবর্ত্তিত হয়। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' ও 'বিল্বমঙ্গল' নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক মনোরম গ্রন্থ রচনা করার জন্য তিনি 'লীলাশুক' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। স্বরচিত গ্রন্থে তিনি অদ্বৈতবাদ ব্যক্ত করেন। এই জন্য অনুমিত হয় যে, তিনি শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী লোক।

বিল্‌হন—তিনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। 'কর্ম্মরত্নাবলী' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

বিশাখদত্ত— 'মুদ্রারাক্ষস' গ্রন্থ প্রণেতা। খ্রীঃ নবম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। পৃথুদত্তের বা ভাস্করদত্তের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। বটেশ্বরদত্ত তাঁহার পিতামহ ছিলেন। তাঁহারা মগধের (মতান্তরে দাক্ষিণাত্যের চন্দ্রগুপ্ত নগরের) অধিবাসী। তিনি মৌখরীরাজ অবন্তিবর্ম্মার সমসাময়িক। অবন্তিবর্ম্মা ৮৫৫—৮৮৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিশাখদত্ত প্রণীত মুদ্রারাক্ষস একটী প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তাঁহার আর কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই।

বিশাখা— বৌদ্ধ যুগের একজন সুশিক্ষিতা থেরী। তিনি বিনয় গ্রন্থ বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে উপদেশ প্রদান করিতেন।

বিশাজী পণ্ডিত—তিনি পেশোয়াদের একজন বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। তিনি ভরতপুরের রাজা নেওয়াল সিংহের সহিতও অন্যান্য স্থানে যুদ্ধ করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

বিশারদ—তিনি ১৫৫৪ শকে মহাভারতের রচনা করেন। তাঁহার বিরাট-পর্ব্ব ও বনপর্ব্ব পাওয়া গিয়াছে। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বিশালদেব—চৌহান রাজ দুর্ল্লভের পুত্র। দুর্ল্লভকে চিতোরের রাণা বীর সিংহ বধ করেন। কিন্তু এই মহাপ্রাণ বিশাল হৃদয় বিশালদেব স্বদেশ প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া পিতৃশত্রু বীর সিংহের পুত্র তেজসিংহের সহিত মিলিত হইয়া স্বদেশ শত্রু মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমর ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন। মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মান, অভিমান, এমন কি পিতৃহন্তাকেও ক্ষমা করিয়া তিনি ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার জীবন দান সার্থক হইয়াছিল।

বিশালদেব বিগ্রহরাজ— রাজপুতনার চৌহমান বা চাহমান বংশীয় একজন পরাক্রমশালী রাজা। ১১৫৩—১১৬৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি যমুনা এবং শতদ্রু নদীর মধ্যবর্ত্তী সমুদয় প্রদেশ এমন কি শিবালিক গিরি শ্রেণী পর্য্যন্ত নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। এই রাজ্য বিস্তৃতির জন্য কাশী ও কনৌজের গাহড়বাল নৃপতিদের সহিত এবং তুর্কমিনীবংশীয় লোহোরের সুলতানদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়।

বিশালাক্ষ—একজন প্রাচীন শিল্প শাস্ত্রকার।

বিশিষ্ঠা দেবী— ভুবন বিখ্যাত শঙ্করাচার্য্যের জননী। শঙ্করাচার্য্য দেখ।

বিশুদ্ধানন্দ, স্বামী—প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ও সন্যাসী। তিনি ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দে (মতান্তরে ১৮২০ খ্রীঃ) দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কল্যাণী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সঙ্গমলাল ও মাতার নাম যমুনা দেবী। বিশুদ্ধানন্দের পিতৃদত্ত নাম বংশীধর। তিনি শৈশবে ফারসী ও উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করিয়া হায়দরাবাদে নিজামের অধীনে এক কর্ম্মে নিযুক্ত হন। নিজামবাহাদুর তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি অশ্বচালনায় সুনিপুন ছিলেন। একবার অশ্ব সম্বন্ধীয় একটী বিবাদে তাঁহার পরাজয় হওয়াতে তিনি সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া সতর বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেন এবং কঠোর ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রথমে নাসিক, উজ্জয়িনী গোয়ালিয়র প্রভৃতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগরী সকল পরিদর্শন করেন। তৎপর হরিদ্বার, কনখল প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া বদরিকাশ্রমে গমন করেন এবং বদরি নারায়ণের নিকটবর্ত্তী বিষ্ণুপ্রয়াগ ও হৃষীকেশ নামক তীর্থে দীর্ঘকাল অবস্থান পূর্ব্বক দুইজন সিদ্ধ পুরুষের নিকট নানা দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন ও যোগশাস্ত্রের নিগূঢ় বিষয় অবগত হন। অতঃপর তিনি কাশীধামে আগমন করেন। ঐ সময় কাশীধামের দশাশ্বমেধ ঘাটে গৌড়স্বামী নামে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও যোগী বাস করিতেন। বংশীধর তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন এবং গুরু তাঁহাকে বিশুদ্ধানন্দ স্বামী নাম প্রদান করেন। ১৭৮১ শকে গুরু দেহত্যাগ করিলে বিশুদ্ধানন্দ গুরুর আসন পরিগ্রহ করিয়া আমরণ এই আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার নিকট নানা শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তাঁহার বহু শিষ্য কাশীধামে আগমন করিত। বিখ্যাত দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত তাঁহার একবার বিচার হইয়াছিল। (দয়ানন্দ সরস্বতী দেখ)। কাহারও কাহারও মতে দয়ানন্দ এই

বিচারে পরাজিত হইয়াছিলেন। নানা শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও ধর্ম্মভাবের জন্য সকল শ্রেনীর লোকই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। তিনি এদেশে ইংরেজ শাসন সমর্থন করিতেন ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল্ মাসে তিনি দেহত্যাগ করেন।

বিশুদ্ধি সিংহ—যে সকল ভারতীয় পণ্ডিত খ্রীঃ অষ্টম শতকের প্রারম্ভে তীব্বতে গমনপূর্ব্বক ভারতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থের তীব্বতী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছিলেন। তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

বিশ্বকতাত—বঙ্গের দুইজন বল্লালসেন ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বল্লাল সেন নরপতির পিতা।

বিশ্বকর্ম্মা—তিনি একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার। উৎপল স্বীয় টীকায় তাঁহার বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি ১১৮৫ শকের (১২৬৩ খ্রীঃ অব্দে) পূর্ব্বে 'বিশ্বকর্ম্মা প্রকাশ' নামে বাস্তুবিদ্যা বিষয়ে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন।

বিশ্বনাথ—(১) দিবাকরের পঞ্চম পুত্র বিশ্বনাথ জ্যোতিষ শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদর বিষ্ণুদৈবজ্ঞ কৃত 'সৌরপক্ষ গণিত' নামক গ্রন্থের উদাহরণ ১৬২৩ খ্রীঃ অব্দে (১৫৪৫ শক) লিখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ১৬২২ খ্রীঃ অব্দে (১৫৪৪ শক) মকরন্দের উদাহৃতি, ১৬১২ খ্রীঃ অব্দে (১৫৩৪ শক) গ্রহলাঘবের উদাহৃতি, এবং সিদ্ধান্ত শিরোমণি, নীলকণ্ঠীতাজক, শ্রীজাতক পদ্ধতি প্রভৃতি বহু গ্রন্থের তিনি উদাহরণ লিখিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বিশ্বনাথের উদাহরণ নাই এমন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বড় নাই। নন্দীগ্রামবাসী কেশবের তাজিক পদ্ধতির উপরে, বিশ্বনাথ ও মল্লারির টীকা অতি প্রসিদ্ধ।

বিশ্বনাথ—(২) বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণস্থিত সগর নগরেরর চন্দ্রভট্ট পুত্র গঙ্গাধর ১৪৩৪ খ্রীঃ অব্দে (১৩৫৬ শক) প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্তানুসারে 'চান্দ্রমান' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গঙ্গাধরের পুত্র বিশ্বনাথ চান্দ্রমান কঠিন দেখিয়া তাহাকে সরল পদ্যে রচনা করিয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ—(৩) শ্রীনিবাসের পুত্র সামবেদী বিশ্বনাথ 'গ্রহচক্রসার' নামক গ্রন্থ ১২২০ শকের (১২৯৮ খ্রীঃ অব্দ) পরে রচনা করেন।

বিশ্বনাথ—(৪) এই বিশ্বনাথ 'শকুনাবলী' গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ—(৫) তিনি 'মিতাঙ্ক' (পঞ্চাঙ্ক) নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ—(৬) এই বিশ্বনাথ 'মুহূর্ত্তমণি' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বিশ্বনাথ—(৭) তিনি বিষ্ণুদৈবজ্ঞ বিরচিত 'বিষ্ণুকরণ' বা 'সৌরপক্ষশর' নামক গ্রন্থের ১৫৩৪ শকে (১৬১২ খ্রীঃ অব্দ) এক টীকা রচনা করেন।

বিশ্বনাথ—(৮) রামপুত্র বিশ্বনাথ

পণ্ডিত শকের পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'সিংহোদয়' বা 'হোরাস্কন্ধ নিরূপণ' নামক জাতক গ্রন্থ রচনা করেন।

বিশ্বনাথ—(৯) তিনি নদিয়া কৃষ্ণনগরের রাজবংশের স্থাপন কর্ত্তা। তাঁহার পিতার নাম কাম দেব। তিনি খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতকে দিল্লীতে গমন-পূর্ব্বক, তোগলকবংশীয় নরপতিদের নিকট হইতে রাজোপাধি ও পৈতৃক অধিকার ব্যতীত, নির্দ্দিষ্ট করদানে সম্মত হইয়া অনেকগুলি গ্রাম খেলায়ৎ পান।

বিশ্বনাথ—(১০) সূর্য্য সিদ্ধান্তের উপর ১৫৫০ শকে (১৬২৮ খ্রীঃ অব্দ) রচিত বিশ্বনাথের 'গহনার্থ প্রকাশিকা' নামক টীকা অতি প্রসিদ্ধ।

বিশ্বনাথ কবিরাজ—একজন প্রাচীন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। 'সাহিত্য দর্পণ' নামক সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ তাঁহার রচিত। ১৫শ খ্রীঃ শতাব্দীতে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—একজন দ্বৈতাদ্বৈতাবাদী। ১৬৬৪ খ্রীঃ অব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিম্বার্ক মতাবলম্বী ছিলেন। সংস্কৃতে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। গৌড়ীয় মতের ভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভাগবতের 'সারার্থদর্শনী' নামে এক টীকা রচনা করেন। তৎপ্রণীত এই টীকাই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রামাণিক ব্যাখ্যা। অদ্বৈত মতে 'শ্রীধরী' রামানুজ সম্প্রদায়ে 'বীররাঘবীয়' মধ্বসম্প্রদায়ে 'বিজয়ধ্বজী' বল্লভীয় সম্প্রদায়ে 'সুবোধিনী' এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে 'ক্রমসন্দর্ভ' যেমন প্রামাণিক, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে আচার্য্য বিশ্বনাথের টীকাও সেইরূপ প্রামাণিক। সারার্থদর্শনীর রচনা কার্য্য ১৭০৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি সমাপ্ত করেন। তাঁহার কৃত ভগবদ্গীতারও একখানি টীকা আছে। এই টীকা ভক্তি প্রধান এবং ভক্ত বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ সমাদৃত। ভগবদ্গীতার টীকায় তিনি জীব গোস্বামীর মত খণ্ডন করিয়াছেন, তজ্জন্য ঐ মতাবলম্বীগণ বৃন্দাবনের রাধা দামোদরের মন্দিরে বিশ্বনাথের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া সাম্প্রদায়িকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার ভাগবতের টীকা বৃন্দাবনের বনমালী রায় মহাশয়ের ভাগবতের সংস্করণে এবং গীতার টীকা কলিকাতার দামোদর মুখোপাধ্যায়ের গীতার সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্ন লিখিত সংস্কৃত বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিও তাঁহার রচিত। শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত, মাধুর্য্যকাদম্বিনী, রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, গুণামৃত লহরী, প্রেমসম্পুট, স্বপ্নাবিলাসামৃত, অনুরাগবল্লী, রূপচিন্তামনি, সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, সুরথ কথামৃত, গৌরগণচন্দ্রিকা, চমৎকারচন্দ্রিকা প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত তিনি ব্রহ্মসংহিতা,

গোপলতাপনী, অলঙ্কারকৌস্তভ, চৈতন্য-চরিতামৃত, বিদগ্ধ মাধবী প্রভৃতি বহু গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। জয়পুরের রাজসভায় তিনি চৈতন্য সম্প্রদায়ের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তিনি বৃন্দাবনেই বাস করিতেন। তাঁহার ও বলদেব বিদ্যাভূষণের পর এইরূপ প্রতিভাশালী পণ্ডিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে আর গৌরবান্বিত করেন নাই।

বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন—তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের সমসাময়িক নবদ্বীপের একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। তাঁহার পিতা কাশীনাথ বিদ্যানিবাসও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

বিশ্বনাথ তর্কবাচস্পতি— খ্রীঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মাইজখার গ্রামে এই অসাধারণ নৈয়ায়িক পণ্ডিত বর্ত্তমান ছিলেন।

বিশ্বনাথ দাস চৌধুরী—মেদিনীপুরের অন্তর্গত বালীসাহীর ভূঞা বংশের আদি পুরুষ। তিনি কটক জিলার অন্তর্গত বালিবিশু হইতে এখানে আসিয়া এখানকার খণ্ডাইৎ জাতীয় সর্দ্দারকে বিতাড়িত করিয়া, তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। ইহা উড়িষ্যার রাজার অধিকার ভুক্ত ছিল। খণ্ডাইত সর্দ্দার নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করিতেন না। সেই জন্য উড়িষ্যাপতি তাঁহার দমনার্থ বিশ্বনাথকে প্রেরণ করেন এবং তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেই তৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার উপাধি হইল 'ভূঞা চৌধুরী কানুনগো বিলায়তী'।

বিশ্বনাথের পরে ক্রমান্বয়ে তাঁহার অধস্তন অষ্টম পুরুষ পদ্মনাভ পর্য্যন্ত প্রত্যেকের জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। পদ্মনাভের জ্যেষ্ঠ পুত্র কাপুলী পিতার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র অঙ্কুরী বলপূর্ব্বক ইহার ছয় আনা অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। অতঃপর বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই বংশে জ্যেষ্ঠাধিকার চলিয়া আসিতেছে। কাপুলী হইতে পর পর পরীক্ষিত, কজলী, সামন্ত সিংহ, নন্দকিশোর, শ্যামসুন্দর, পদ্মনাভ, উৎসবানন্দ, বীরচন্দ্র, পরমানন্দ, জয়দেব, রামকেশব, জগদীশ, চন্দ্রশেখর, নীলাম্বর, গজেন্দ্র, মধুসূদন, জগন্নাথ, শম্ভুনারায়ণ, অক্ষয়নারায়ণ ও বসন্তকুমার সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। বসন্তকুমারের মৃত্যুর পরে তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র বিক্রমাদিত্য বর্ত্তমানে সম্পত্তির মালিক। পূর্ব্ব বাসস্থান দেউলি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা এখন বাড়রাঁকুয়গড়ে বাস করিতেছেন।

বিশ্বনাথ ধর—শ্রীহট্টের নবাব হরকৃষ্ণ রায়ের তিনি মীর মুন্সী ছিলেন। হরকৃষ্ণ দেখ।

বিশ্বনাথ নারায়ণ মাণ্ডলিক, রাও সাহেব—১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি জিলায় তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহারা চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। পুনার পেশোয়ারা তাঁহার সমশ্রেণীস্থ। শেষ পেশোয়া বাজীরাও তাঁহার এক পিসীমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে নিজ গ্রামে মাতৃভাষা মহারাঠী ও পরে রত্নগিরিতে আসিয়া ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন। তৎপরে ১৪ বৎসর বয়সে বোম্বাই নগরে আসিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। সেই সময়ে বোম্বাই নগরে উচ্চ শিক্ষার জন্য এলফিনষ্টোন ইনষ্টিটিউসন স্থাপিত হইয়াছিল। পরে ইহা কলেজে পরিণত হয়। ৪।৫ বৎসর শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন। এই কর্ম্ম উপলক্ষে তাঁহাকে বহু দেশের মধ্যে ভোজ, করাচী, হিন্দু দেশস্থ হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে হইয়াছিল। দশ বৎসর চাকুরী করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করিয়া ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি খুব বৃদ্ধি পাইল। এমন কি তিনি হাইকোর্টের একজন প্রধান উকিল বলিয়া খ্যাত হইলেন। স্বীয় ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজনীতি, সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। রাজনীতি চর্চ্চার জন্য Native Public Opinion নামে একটী সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। উক্ত পত্রিকায় তিনি ইংরেজী ও মহারাঠী ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতেন। লণ্ডনের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর বোম্বাইস্থিত শাখার পত্রিকায় ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি কতকগুলি আইনের স্কুল পাঠ্য গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। বোম্বাই ও ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই সকল কার্য্যে তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও দক্ষতার পরিচয় পাইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাও সাহেব এবং C. S. I. উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোকে প্রস্থান করেন।

বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন—প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। তিনি নবদ্বীপের সুবিখ্যাত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতির পুত্র বিদ্যানিবাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহারা তিন সহোদর ছিলেন। 'ভাববিলাস' প্রণেতা রুদ্র বাচস্পতি তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তিনি জয়রাম তর্কালঙ্কারের শিষ্য ও গদাধর ভট্টাচার্য্যের প্রশিষ্য ছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব এবং জীবনের অধিকাংশ কাল বৃন্দাবনে

অতিবাহিত করেন। বৃন্দাবনে বাস কালেই তিনি গৌতম সূত্রের শিরোমণির মতানুসারী এক গবেষণা পূর্ণ টীকা প্রণয়ন করেন (১৬৫৪ খ্রীঃ)। এতদ্ব্যতীত তিনি 'ন্যায় তন্ত্রবোধিনী' 'ন্যায় সূত্রবৃত্তি' 'পদার্থ তত্ত্বাবলোক' 'সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীর টীকা' এবং ভাষা পরিচ্ছেদ' নামক ন্যায় শাস্ত্রের এক সংক্ষিপ্ত উৎকৃষ্ট সুন্দর টীকা প্রণয়ন করেন। এই ভাষা পরিচ্ছেদ দ্বারা তিনি ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়া রহিয়াছেন। ভারতের সর্ব্ব প্রদেশেই আদরের সহিত এই গ্রন্থ অধীত হইয়া থাকে। গদাধর ভট্টাচার্য্য দেখ।

বিশ্বনাথ ন্যায়লঙ্কার—উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বাউরখণ্ড গ্রামে এই বিখ্যাত নৈয়ায়িক পাণ্ডিত্যের একটী প্রসিদ্ধ টোল ছিল।

বিশ্বনাথ পটনকার মাধব রাও, সি, আই, ই—বর্ত্তমানকালের সুবিখ্যাত ভারতীয় রাজনীতিবিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে বিশ্বনাথ পটনকার মাধব রাও একজন। তিনি ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর এবং বরোদা এই তিনটি শ্রেষ্ঠ দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রীত্ব করিয়া অতুল যশ অর্জ্জন করিয়া ছিলেন। ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা দেশস্থ মহারাঠা ব্রাহ্মণ। মারাঠাদেশস্থ কোন প্রাচীন ব্রাহ্মণ পরিবারে মাধব রাও জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ বহুকাল তাঞ্জুরে বাস করিয়াছিলেন এবং মারাঠাগণ কর্ত্তৃক তাঞ্জুর অধিকারকালে তাঁহারা সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ ভারতে বাসস্থান স্থাপন করেন।

১৮৫০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি সুশিক্ষিত মিঃ ডবলিও, এ, পর্টারের (W. A. Porter) অধীনে কুম্বাকনাম্ কলেজে পাঠাভ্যাস করিয়া অবশেষে ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজে পাঠাভ্যাসকালে প্রিন্সিপাল মহাশয় তাঁহার স্বাধীন চিন্তা ও ব্যক্তিগত উন্নত চরিত্রের পরিচয় পাইয়াছিলেন।

১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে মাধব রাও মহীশূরের রাজসরকারে সামান্য কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। অবশেষে তিনি রয়েল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। মহীশূর তখন বৃটিশ শাসনাধীনে ছিল। তাঁহার চাকুরী প্রাপ্তির অল্পদিন পরেই তিনি বৃটিশের অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের দৃষ্টিপথে পতিত হন। প্রথমে তাঁহারা তাঁহাকে সাধারণ শাসকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রথম হইতেই তিনি মহীশূরের জনপ্রিয় সুদক্ষ দেওয়ান মিঃ রঙ্গচারলোর সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। মিঃ রঙ্গচারলো ধীশক্তিসম্পন্ন কয়েকজন

যুবককে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মাধব রাও সর্ব্ব কনিষ্ঠ কিন্তু বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন। অপর প্রসিদ্ধ ব্যক্তি যিনি মিঃ রঙ্গচারলোর পর মহীশূরের দেওয়ানী পদ পাইয়াছিলেন, তিনি শেষাদ্রি আয়ার। মিঃ রঙ্গচারলো তাঁহাদিগের নিকট অনেক আইনের বিষয় আলোচনা করিতেন। ইহাতে মাধব রাও শাসন বিভাগের কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বেই, শাসন বিষয়ক কার্য্য আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে দেওয়ানী বিভাগের জন্য, যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করিয়া তিনি শাসনকর্ত্তাদের ও জনসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। মিঃ রঙ্গচারলোর মৃত্যুর পর, শেষাদ্রি আয়ার মহীশূরের দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। মাধব রাও তখন বিচার বিভাগের কার্য্য ছাড়িয়া রাজস্ব আদায়ের কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং অল্পকাল পরেই সিমগা জিলার ডিপুটি কমিশনারের পদ লাভ করেন। সেই কার্য্যে তিনি অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেন। সহরের ও গ্রামের লোকদিগের নানা প্রকার সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত করিয়া তিনি লোকের, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তৎকালীন বৃটিশ রেসিডেণ্ট সার অলিভার সেণ্ট জন, তাঁহাকে অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। যখন তিনি বাঙ্গালোরে ডিপুটি কমিশনার ছিলেন তখন তিনি দুর্ভিক্ষের উৎপীড়ন হইতে লোকদিগকে বাঁচাইবার জন্য, সরকারী কার্য্যের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রায় সাত বৎসর জিলার শাসনকর্ত্তার কার্য্য করিয়া, পরে তিনি ভারতীয় পুলিশ বিভাগের পরিদর্শকের পদ প্রাপ্ত হন এবং সেই কার্য্যে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা দেখাইয়া যশ অর্জ্জন করেন। পুলিশ ইনিস্পেক্টারের কার্য্য পাইয়া তিনি পুলিশ বাহিনীকে পুনরায় সুশৃঙ্খল করেন এবং বাঙ্গালোরে একটি পুলিশ স্কুল স্থাপন করেন।

বুদ্ধিসাপেক্ষ কার্য্যে উচ্চতম কর্ম্মচারীগণের অপারগতা দেখিয়া, তিনি তথায় একটি ট্রেণিং স্কুল স্থাপন করেন এবং কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহাদের নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। যদি বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ হইত তবে তিনি তাহাকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিতে নিষেধ করিতেন, কারণ ইহা অব্রাহ্মণ, হিন্দুদের জন্য এবং মুসলমানেরা সামান্য লিখাপড়া ও পাটীগণিতের অঙ্ক জানিলেই তিনি পরিতৃপ্ত হইতেন।

এইরূপে যখন মাধব রাও একজন যোগ্য শাসনকর্ত্তারূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন, তখন মহীশূরে প্লেগের উৎপাৎ আরম্ভ হইয়াছিল। তখন বৃটিশ রেসি-

ডেণ্ট ছিলেন সার ডনেল্ড রবার্টসন (Sir Donald Robertson) তিনি তখন মাধব রাওকে প্লেগ দমন কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই কার্য্য গ্রহণ করিয়া তিনি শাসন কার্য্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াছিলেন। প্লেগের উৎপাৎ নিবারণ করিয়া তিনি অতুল যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্লেগ কমিশনারের কার্য্য করিবার সময়েই তিনি রাজকীয় পরিষদের সভ্য হইয়া, রাজস্ব আদায় কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৯০১ খ্রীঃ অব্দে যখন মহীশূরের বর্ত্তমান রাজা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি রাজস্ব বিভাগের কমিশনারের পদে নিযুক্ত হন। এই দায়ীত্ব পূর্ণ কার্য্যে মাধব রাওই প্রথম কমিশনার রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দুই বৎসর রাজস্ব বিভাগের কমিশনার ও পরিষদের সভ্যের কার্য্য করার পর, ১৯০৪খ্রীঃ অব্দে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজের দেওয়ানের কার্য্য করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হন।

দুই বৎসর ত্রিবাঙ্কুরে দেওয়ানের কার্য্য করিয়া, মিঃ মাধব রাও যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা অন্য একজন লোকের পক্ষে সমস্ত জীবনেও করা সম্ভব হইত না। প্রথমেই তিনি ভূমির রাজস্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতি অল্প ব্যয়ে তিনি এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ানী পদ লাভ করিবার অল্প কয়েক মাস পরেই, মিঃ মাধব রাও সেখানে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মত প্রাত্যহিক হিসাব পরিস্কার করিবার প্রণালী অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অন্যান্য বিভাগীয় কার্য্যেও মিঃ মাধব রাও তাঁহার যোগ্যতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, ইহার পর তিনি আবগারী বিভাগ পরিচালনা করিবার ক্ষমতা লাভ করেন এবং লবণ, আফগারী, তামাক প্রভৃতি দ্রব্য যথারীতি পরিচালনা করিয়া প্রতি বৎসরে প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা আয়ের বন্দোবস্ত করেন।

তিনি ত্রিবাঙ্কুরে বিদ্যা শিক্ষার অতি উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং আইন করিয়াছিলেন যে, ত্রিবাঙ্কুরে কোন বালকই মূর্খ থাকিতে পারিবে না। অনুন্নত জাতিদের জন্য তিনি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপে বিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

তৎকালে মন্দিরের পুরোহিতেরা তীর্থ যাত্রীদের প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিত। সময় সময় তাঁহারা কোন উৎসব উপলক্ষে লোকের বাড়ীতে গিয়া অন্যায় রূপে অর্থ সংগ্রহ করিত। তাঁহাদের এই অত্যাচার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত কোন রাজপুরুষই তাঁহাদের এই

অত্যাচারের প্রতীকার করেন নাই। কিন্তু মিঃ মাধব রাও পুরোহিতদিগের এই অত্যাচার দমন করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। এই কার্য্য পরিদর্শনের জন্য তিনি একজন কমিশনার নিযুক্ত করেন এবং ভবিষ্যতে পুরোহিতেরা যাহাতে এইরূপ অত্যাচার করিতে না পারে, তাহার বন্দোবস্ত করেন।

ভূমির রাজস্ব কতক শস্য দ্বারা এবং কতক নগদ টাকা দ্বারা দিতে হইত। শস্যের পরিমাণ রাজসরকার হইতে নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইত এবং প্রজারা তন্নির্দ্দিষ্ট শস্য রাজসরকারে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিত। তাহাদিগকে শতকরা ত্রিশ (৩০) ভাগ শস্য প্রদান করিতে হইত।

মিঃ মাধব রাও ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ানের পদ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় মহীশূরের দেওয়ানের পদ লাভ করেন। এই স্থানেই তিনি তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। মিঃ মাধব রাও ত্রিবাঙ্কুরে কেবলমাত্র তিন বৎসর দেওয়ানীর কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই তিনি তথায় অনেক উন্নতিকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। মহীশূর রাজ্যে তিনিই প্রথমে ব্যবস্থা পরিষদ সভা স্থাপন করেন। জিলার বিচার কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক আইন প্রণয়ন করিতে হইয়াছিল। কৃষি-প্রদর্শনী আহ্বান করিয়া, তিনি এমন কি গ্রামদেশেও বিজ্ঞান সম্মত কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৯০৬—১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি দুর্ভিক্ষের সময়ে দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিবার জন্য একটি রিলিফ ফাণ্ড (Relief fund) গঠন করেন এবং প্রতি বৎসর রাজসরকার হইতে দুই লক্ষ টাকা দিবার ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে মহীশূরে দাঙ্গা আরম্ভ হয়, এই দাঙ্গা দমন করিবার জন্য মাধব রাওকে অনেক কঠোর আইন প্রণয়ন করিতে হইয়াছিল। সহরে পানীয় জল সরবরাহ করিবার জন্য তিনি অতি উত্তম বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। জনসাধারণের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি একজন কমিশনার নিযুক্ত করেন ও কয়েকটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ছাড়া তিনি মহীশূরে কয়েকটি আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ স্থাপন করেন। এইরূপে মাধব রাও, শিক্ষা, যাহা শাসন কার্য্যের অঙ্গ স্বরূপ, তাহা বিস্তারের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই অবৈতনিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রচলন আরম্ভ হয় ও গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা কম পক্ষে দশ টাকা করিয়া বেতন পাইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। মিঃ মাধব রাওয়ের স্বাবলম্বন গুণই তাঁহাকে

অন্য সকল ভারতীয় শাসনকর্ত্তা হইতে উচ্চে আসন প্রদান করিয়াছে। মহীশূর রাজ্যের উন্নতির জন্য মিঃ মাধব রাও যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

মহীশূরের দেওয়ানী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া মিঃ মাধব রাও সমগ্র ভারতসাম্রাজ্য পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালোরে "ভারতীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়" নামে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে বিদ্যার্থীদিগকে প্রাচীন প্রথা অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হইত। তিন সর্ব্বদাই ভারতীয় আদর্শ অনুসারে চলিতেন। তিনি অনেক পণ্ডিত একত্র করিয়া এক সভা গঠন করেন। তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া, তিনি অনেক সামাজিক আইনের সংস্কার করিয়াছিলেন।

তিনি তাঁহার মাতৃ ভাষাকে কেন্দ্র করিয়া, অনেক তথ্যপূর্ণ উপদেশ বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মাতৃভাষাকে শিক্ষার প্রধান অঙ্গস্বরূপ করিবার জন্য, তিনি যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই চেষ্টা অনেকটা ফলপ্রসূ হইয়াছিল। এইরূপে যখন তিনি মহীশূরের হিত সাধনার্থ মগ্ন ছিলেন, তখন বরোদার গাইকোবারের নিকট হইতে ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে এক নিমন্ত্রণ পত্র আসিল। ইহাতে মিঃ মাধবরাওকে বরোদার দেওয়ানী পদ গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। বরোদায় দেওয়ানী কার্য্য-গ্রহণ করিবার অল্পকাল পরেই, সেখানে একটি ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন হয় এবং ইহাতে 'পুরোহিত বিল' সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য একটি পরিষদের প্রয়োজন, ইহা ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ সভ্যগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল। এইরূপে যে 'পুরোহিত বিল' নামক আইন পাশ হইয়াছিল তাহা ১৯১৫ খ্রীঃ অব্দে 'গভর্ণমেণ্ট গেজেট' নামক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে যখন ইউরোপে ইংরেজ ও জার্ম্মাণীর মধ্যে এক মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হইল, তখন তিনি বরোদাতে জনসাধারণের এক সভা আহ্বান করেন এবং বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে দেশে, 'ওয়ার রিলিফ ফাণ্ড' গঠন করা হইয়াছে এবং প্রজারা যেন এই ফাণ্ডে টাকা জমা দেয়। ১৯১৬ খ্রীঃ অব্দে বরোদাতে এক স্বাস্থ্য প্রদর্শনী হয়। এই কার্য্য মাধবরাও অতি যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করেন। সেই বৎসরেই বরোদাতে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনার জন্য এক সভা গঠন করেন এবং তাহার ফলস্বরূপ একটি সংস্কৃত পাঠশালা

স্থাপিত হয়।

১৯১৬ খ্রীঃ অব্দে মিঃ মাধবরাও বরোদাতে সঙ্গীত চর্চ্চার জন্য এক সমিতি গঠন করেন এবং এই কার্য্যে তিনি সফলকাম হইয়াছিলেন। তিনি লোকদিগকে শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য, উৎসাহিত করিতেন। ফলে দেখা গেল যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে তত্রত্য অধিবাসীরা শিল্পকার্য্যে বিশেষ উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে, মিঃ মাধবরাওয়ের সময়ে বরোদাতে স্থানীয় সায়ত্ব শাসনের প্রবর্ত্তন হয়। ইহার ফল স্বরূপ গ্রাম্য পঞ্চায়েত, লোকেল বোর্ড, জিলা বোর্ড এবং বিশিষ্ট পঞ্চায়েত সভার সৃষ্টি হয়। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শাসন কার্য্যে মাধবরাওয়ের অসীম দক্ষতা ও ন্যায়নিষ্ঠা রাজ্যের ও প্রজাগণের বিশেষ মঙ্গলের কারণ হইয়াছিল।

মিঃ মাধবরাও তাঁহার দেশবাসীদের ত্রুটি সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং তাহাদের এই সমস্ত ভুল ত্রুটির সংশোধনের জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাহাদের মানসিক দুর্ব্বলতা পরিহার করিবার জন্য, উত্তেজনা পূর্ণ বাক্যে তিনি বক্তৃতা করিতেন। ব্যক্তিগত ভাবে এবং শাসকরূপে তিনি তাঁহার দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

তাঁহার উন্নত চরিত্র, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব নিঃস্বার্থপরতা এবং ধর্ম্ম জীবনের পরিচয় আমরা পাই, যখন আমরা তাঁহার জীবনের সাফল্য দর্শন করি।

তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। তিনি মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিধর্ম্মী জাতির প্রতিও সর্ব্বদা ভাল ব্যবহার করিতেন, ফলে সকল লোকই তাঁহার হিতাকাঙ্খী হইয়া উঠিয়াছিল।

১৯১৬ খ্রীঃ অব্দে বড়দিনের ছুটিতে, তিনি নিখিল ভারতীয় হিন্দু সভার সভাপতিত্ব করিবার জন্য, লক্ষ্ণৌতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

শিক্ষা ব্যাপারেও মাধবরাওয়ের কার্য্যাবলী প্রশংসনীয়। আটচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে কুম্বাকোনাম কলেজ হইতে বি, এ পাশ করিয়াছিলেন। তথায় ১৯১৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি সেই কলেজের জুবিলী উৎসবের সময় সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন এবং সংস্কৃত সাহিত্য পাঠের অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য একটি বৃত্তি দিবার বন্দোবস্ত করিয়া, বাৎসরিক একশত টাকা আয় হয়, এইরূপ একটি ফাণ্ড গঠন করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ১৯১৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি কাভালোরে 'মাদ্রাজ প্রাদেশিক কংগ্রেস' সভার সভাপতিত্ব করেন।

১৯১৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি জাতীয় মহাসমিতির প্রতিনিধি দলের সভাপতি রূপে ইংলণ্ডে গমন পূর্ব্বক জয়েণ্ট

পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটির সম্মুখে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯২০ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের পরে ডাক্তারের উপদেশে, তিনি জনসাধারণের কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালে তিনি ত্রিবাঙ্কুর শ্রীমূলক পোপুলার এসেম্‌লীর সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

বিশ্বনাথ ভট্ট—এই জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিত 'রত্নমঞ্জরী' নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

বিশ্বনাথ মিশ্র—একজন টীকাকার। তিনি মিথিলার অধিবাসী এবং খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম বলভদ্র ও মাতার নাম বিজয়শ্রী। তিনি 'মেঘদূত' কাব্যের 'মুক্তাবলী' নামে একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ভাস্কর প্রণেতা পদ্মনাথ মিশ্র (প্রদ্যোতন) তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন।

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী, দেওয়ান—তিনি চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত টাকীর জমিদার শ্যামসুন্দর রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতৃব্য রামকান্ত মুন্সীর সাহায্যে তিনি ইংরেজ সরকারে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি যে প্রণালীতে বর্দ্ধমান রাজ্যে পত্তনী বিলি করিয়াছিলেন, তদনুকরণে ইংরেজ সরকার ১৮১৯ খ্রীঃ অব্দে পত্তনী আইন (৮ আইন) বিধিবদ্ধ করেন। ইহা তাঁহার অসীম পাণ্ডিত্যের ও কার্য্য কুশলতার পরিচায়ক। তিনি ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

বিশ্বনাথ শিরোমণি—গৌতমের ন্যায় সূত্রের উপর 'ন্যায় সূত্র বৃত্তি' নামক ব্যাখ্যা গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

বিশ্বনাথ সিংহ—(১) তিনি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও অতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন। রামচন্দ্রের সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক তিনি 'সর্ব্বসিদ্ধান্ত' নামে বেদান্ত মতে এক গ্রন্থ রচনা করেন।

বিশ্বনাথ সিংহ—(২) মণিপুরপতি মারজিত সিংহের সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মারজিত সিংহ কাছাড়পতি গোবিন্দ নারায়ণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, কাছাড় অধিকার করিয়াছিলেন এবং স্বীয় কনিষ্ঠ বিশ্বনাথ সিংহ প্রভৃতি তিন ভ্রাতাকে কাছাড় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দে ব্রহ্মরাজ মণিপুর রাজ্য উচ্ছিন্ন করিলে মারজিত কাছাড়ে যাইয়া স্বীয় ভ্রাতা চৌড়জিত, গম্ভীর সিংহ ও বিশ্বনাথ সিংহের সহিত কিছুকাল রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন—তিনি একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত। তাঁহার পিতার নাম বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্য। তিনি নিম্ন লিখিত গ্রন্থগুলির লেখক (১) ভাষা পরিচ্ছেদ রচিত ১৬৩৪ খ্রীঃ

অব্দ। (২) অলঙ্কার পরিষ্কার (৩) পঞ্চ বাদটীকা (৪) ন্যায় সূত্রবৃত্তি (৫) সুবর্ণ তত্ত্বালোক বা কারক চক্র। (৬) ন্যায় তন্ত্রবোধিনী বা ন্যায় বোধিনী (৭) পদার্থ তত্ত্বাবলোক,-রঘুনাথের পদার্থ খণ্ডনের ব্যাখ্যা। (৮) ভাষা পরিচ্ছেদ (৯)পিঙ্গল প্রকাশ।

বিশ্বনাথ সেন—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকার। তাঁহার পিতার নাম নরসিংহ দেব। পথ্যাপথ্য নামক গ্রন্থ বৈদ্য বিশ্বনাথ বিরচিত।

বিশ্ববর্ম্মা—তিনি মালবের অধিপতি নরবর্ম্মার পুত্র। বিশ্ববর্ম্মা ৪২৩ খ্রী অব্দে রাজা হইয়াছিলেন। নরবর্ম্মা ও বিশ্ববর্ম্মা গুপ্ত সাম্রাজ্যের করদ রাজা ছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব নরপতিরা স্বাধীন ছিলেন।

বিশ্বভূ—থেরাবাদী বৌদ্ধমতে, মহাত্মা শাক্য সিংহ বুদ্ধের পূর্ব্বে আরও চল্লিশ জন বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বিশ্বভূ একবিংশতম।

বিশ্বম্ভর ঘোষ—একজন সংবাদপত্র সেবী। 'জ্ঞানরত্নাকর' নামক পত্রের তিনি সম্পাদক ছিলেন।

বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব—ইনি নবদ্বীপের স্বনামধন্য পণ্ডিত কমলাকর জ্যোতিষীর বংশাবতংস বাক্‌সিদ্ধ পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের ৯ই নবেম্বর তারিখে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খালকুলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যকালে গ্রামস্থ মধ্যবাংলা বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া বাগাট-নিবাসী রামচন্দ্র তর্কভূষণের নিকট কলাপ ব্যাকরণ এবং কোঁড়কদী নিবাসী কৈলাসচন্দ্র তর্করত্নের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তিনি পিতার নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র ও অধ্যয়ন করিতেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার অসামান্য গণিত প্রতিভা প্রকাশ পাইতে থাকে। ইনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত শিরোমণি, গ্রহ লাঘব, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, মনোরমা প্রভৃতি কঠিন কঠিন গণিত গ্রন্থ আয়ত্ত করেন, এবং জাতকালঙ্কার, জাতকাভরণ, বৃহজ্জাতক, জৈমিনিতন্ত্র, পরাশর সংহিতা, গর্গসংহিতা, জ্যোতির্নিবন্ধ, সারাবলী প্রভৃতি ফলিত জ্যোতিষের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সমূহেও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

তাঁহার অসাধারণ স্মৃতি শক্তি ছিল। তিনি তাঁহার অধ্যাপক কৈলাসচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে একখানি স্মৃতির পুঁথি কয়েক দিনের জন্য চাহিয়াছিলেন। কিন্তু উহা অতি দুর্লভ বলিয়া অধ্যাপক মহাশয় তাঁহাকে উহা গৃহে লইয়া যাইবার জন্য অনুমতি দিলেন না। কয়েক দিন পরে তিনি যখন দেখিলেন যে উহা রৌদ্রে দেওয়া হইয়াছে তখন গামছা মাথায় দিয়া

উহার পার্শ্বে বসিয়া সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই কণ্ঠস্থ করিয়া লইলেন এবং গৃহে আসিয়া আদ্যোপান্ত অবিকলভাবে লিখিয়া ফেলিলেন। পরে, এই বিষয় অধ্যাপক মহাশয়ের গোচরীভূত হইলে, তিনি অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হন এবং তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া স্বীকার করেন এবং স্মৃতিশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ তাঁহাকে শিক্ষা দেন।

১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে, নাবালক ভ্রাতৃগণের লালন পালনের সমগ্রভার তাঁহার উপর পতিত হয়। তিনি অসামান্য যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণে ভ্রাতৃগণকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম ভ্রাতা অধ্যাপক শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী একজন সুসাহিত্যিক হইয়াছিলেন, দ্বিতীয় ভ্রাতা মহামহোপাধ্যায় ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যা-ভূষণ এম্ এ, পি, এইচ, ডি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে উন্নিত হইয়াছিলেন; এবং তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রভূষণ আচার্য্য আবগারী বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্টরের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

নবদ্বীপের পণ্ডিত দুর্গাদাস বিদ্যা-রত্নের মৃত্যুর পর তিনি নবদ্বীপের প্রধান জ্যোতির্ব্বিদের পদ অলঙ্কৃত করেন এবং নদীয়ার জজসাহেব ও মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্ট তাঁহাকে গভর্ণ-মেণ্টের প্রধান পঞ্জিকাকারের পদে মনোনীত করেন। পরে, বাংলা ও আসামের গভর্ণরগণ তাঁহার নিকট হইতে পঞ্জিকা লইতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার গণনা ও ব্যবস্থানুসারে সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালিত হইতে থাকে। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার প্রতিষ্ঠাতা দুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয় তাঁহাকে গুপ্তপ্রেসের প্রধান পঞ্জিকাকারের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি আটত্রিশ বৎসর কাল এই পঞ্জিকার গণনা ও সম্পাদন কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার যশ ও প্রতিভা সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এদিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গণিত জ্যোতিষের সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা তুমুল বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং হিন্দু গণিত জ্যোতিষের পঞ্জিকা সংস্কার করা অতীব প্রয়োজন হইয়া উঠে। এই জন্য দ্বারকা মঠের শ্রীমদ্‌জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য মহারাজের উৎসাহে ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাই নগরে ভারতবর্ষের পণ্ডিত মণ্ডলীর এক বিরাট অধিবেশন হয়। এই সভায় বরোদাধিপতি মহা-রাজ গায়কোয়াড় প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি এই সভায় বঙ্গদেশের জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রতিনিধি স্বরূপ নিমন্ত্রিত হইয়া, সংস্কৃত ভাষায় পঞ্জিকা সংস্কার সম্বন্ধে একটী সুন্দর

প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং হিন্দু জ্যোতিষের সূক্ষ্ম গণনা পৃথিবীর অন্যান্য গণনা অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ তাহা সগৌরবে প্রমাণ করেন

পরে, তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির অনুরোধে 'রবিসিদ্ধান্ত মঞ্জরী' 'দিন কৌমুদী' ও 'বিদগ্ধতোষণী' নামক তিনখানি জ্যোতিষগ্রন্থ সম্পাদন করেন। গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর মাসিক পঁচিশ টাকা হিসাবে তাঁহাকে একটি 'সাহিত্যিক-বৃত্তি' প্রদান করেন। তিনি এই বৃত্তি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভোগ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে এই বৃত্তিলাভ করেন। তিনি কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত এসোসিয়েশনের সদস্য ও জ্যোতিষশাস্ত্রের পরীক্ষক এবং প্রশ্ন প্রস্তুত কারক ছিলেন। নবদ্বীপ বঙ্গ বিবুধ জননী সভা ও অন্যান্য বহু সংসদের সদস্য পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুর আট বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ব পুরুষগণের অধ্যুষিত নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। কেবল বঙ্গ দেশের নহে অন্যান্য দেশের ছাত্রগণও ইহার টোলে অধ্যয়ন করিতেন। ব্রজবাসী পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত দামোদরলাল গোসাই শাস্ত্রী, তাঁহার একজন বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। ইনি বহু ছাত্রকে নানা প্রকার উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব তাঁহার নিকট হইতেই 'জ্যোতিষার্ণব' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি শিশুর ন্যায় সরল ছিলেন এবং ইহাঁর ব্যবহার এরূপ মধুর ছিল যে, যিনি একবার ইহাঁর সংস্পর্শে আসিতেন তিনি আর ইহাঁকে ভুলিতে পারিতেন না। ইহাঁর দান শীলতা অতীব প্রশংসার বিষয় ছিল। মাঝে মাঝে লোকজনকে না খাওয়াইলে ইনি যেন তৃপ্তি বোধ করিতেন না। এই সকল কারণে সময়ে সময়ে মাত্রা ঠিক রাখিতে না পারিয়া, আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিয়া বসিতেন। কিন্তু ইহার উপর ভগবানের এমনই কৃপা ছিল যে, কখনও ইহার অভাব ঘটিত না। ইনি একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। ইহার ন্যায় নানাগুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংখ্যা অতি বিরল ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না

তৎকালে বঙ্গদেশে জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত বিষয়ে, ইহার মীমাংসাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইত। স্মৃতিশাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। ১৯১২ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে প্রাতঃকালে বঙ্গের একজন খ্যাতনামা স্মার্ত্ত পণ্ডিত, একটী স্মৃতির বিষয়ের মীমাংসার জন্য, নবদ্বীপ তাঁহার ভবনে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকা সত্বেও

তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এরূপ মীমাংসা করিয়া দিলেন যে, উক্ত পণ্ডিত মহাশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। কিন্তু মীমাংসা লিখিয়া দিবার কয়েক ঘণ্টা পরেই ইনি সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইয়া, দেহত্যাগ করেন। ইনি সুযোগ্য ছয় পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র জ্যোতীরত্ন এবং দ্বিতীয় পুত্র গভর্ণমেণ্ট কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বিদ্যানিধি, ভাগবত-ভূষণ; এম্, এ; বি, টি।

বিশ্বম্ভরদীন্দা—কাঁথির একজন খ্যাতনামা বিদ্যোৎসাহী দানশীল জমিদার ও সমাজ সংস্কারক। ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ২৪শে চৈত্র মেদিনীপুর জিলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত ভবানীচক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা রাধাকৃষ্ণ দীন্দার ছয় পুত্রের মধ্যে সর্ব্ব কণিষ্ঠ ছিলেন। রাধাকৃষ্ণ দীন্দা ধনবান হইয়াও পুত্রদের লেখাপড়া শিক্ষার প্রতি কোন প্রকার যত্ন নিতেন না।

বাল্যকালে পাঠশালাতেই বিশ্বম্ভর দীন্দার শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু শিক্ষায় প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। 'তত্ত্বকৌমুদী', 'সঞ্জীবনী' 'প্রবাসী' এবং অন্যান্য সদ্‌গ্রন্থ পাঠে তিনি সর্ব্বদা নিরত থাকিতেন। উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি বিশেষ অনুতপ্ত ছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি শিক্ষা বিস্তার কল্পে প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহার একমাত্র পুত্র প্রভাতকুমার দীন্দা কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছিলেন; ঐ সময়ই তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের পর সপ্তাহ মধ্যে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। একমাত্র প্রাণপ্রিয় পুত্রের অকাল মৃত্যুতে বিশ্বম্ভর দীন্দা অতিশয় শোকাতুর হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরে তিনি পুত্রের স্মৃতি রক্ষার্থ এবং শত শত পুত্রের হিতার্থে কাঁথি 'প্রভাতকুমার' কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

সমাজ সংস্কারে তিনি বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। আত্মীয়স্বজনের বিশেষ বাঁধা নিষেধ উপেক্ষা করিয়া তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দেশের বাল বিধবাদের দুরবস্থা দূরীকরণার্থ তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া নিজ বংশেরই দুইটী বাল-বিধবাকে বিবাহ দিয়াছিলেন এবং পরিশেষে নিজের একমাত্র বিধবা পুত্র-বধূকেও পুনরায় বিবাহ দিয়াছিলেন। দানশীলতাই তাঁহার চরিত্রে প্রধানতম গুণ ছিল। শি দা ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানে তিনি সহস্র সহস্র টাকা দাম করিতেন। কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ ব্যতীত তাঁহারই চেষ্টায় ও দানে নিজ গ্রাম

ভবানীচকে অঘোরচাঁদ মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়, নানাস্থানে প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং এই সকলের বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য তিনি অর্থ ও ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। কাঁথি 'চন্দ্রমণি' ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য তিনি কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ফণ্ডে শতকরা ৩॥০ টাকা সুদে তিন হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজেও তাঁহার অর্থ দান আছে। শিক্ষার জন্য তিনি মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য, তিনি তিনজন ছাত্রকে নিজ অর্থব্যয়ে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অনেক দীন দরিদ্র ছাত্রও তাঁহার সাহায্যে শিক্ষা লাভ করিত। কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ স্থাপনের জন্য তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং কলেজ স্থাপনের পূর্ব্বেই পঁচিশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯২৬ খ্রীঃ অব্দে প্রভাতকুমার কলেজ স্থাপিত হয়। তাঁহাকে কলেজ গবর্ণিং বডির আজীবন সভ্য ও সম্পাদক করা হইয়াছিল। তিনি ১৯২৭খ্রীঃ অব্দে এক উইল সম্পাদন করিয়া প্রায় দুই লক্ষ টাকার সমস্ত সম্পত্তি কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজের হিতার্থে দান করেন। উহাতে একমাত্র সর্ত্ত ছিল যে, স্ত্রী জীবিত থাকিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত দেড় শত টাকা করিয়া মাসিক ভাতা পাইবেন। এই উইলের পর তিনি তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির বাকী পঁচিশ হাজার টাকা অতি সত্বর দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তৎপরে দেশব্যাপী অর্থ সঙ্কটে ও মেদিনীপুরের রাজনীতিক অবস্থার জন্য, সাধারণের ন্যায় তাঁহারও অর্থাভাব ঘটিয়াছিল। ছাত্র সংখ্যা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে কলেজেরও আর্থিক দুরবস্থা ঘটে। অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ স্বেচ্ছায় আশাতীত অল্প বেতনে কাজ করিয়া কলেজ রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর হন। তথাপি মাসিক শতাধিক টাকা ঘাটতি পড়িতে থাকে। এই সময় হইতে তিনি কয়েক বৎসর যাবত মাসিক একশত টাকা সাহায্য করিয়া কলেজের ঘাটতি পূরণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি প্রভাতকুমার কলেজে সর্ব্ব সমেত কিঞ্চিদধিক পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দান করেন। তথাপি তিনি শেষ বয়সে তাঁহার কলেজের সহকর্ম্মীগণের নিকট হইতে অপমান ও বিরুদ্ধাচরণই পাইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি গভীর দুঃখে কাঁথি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছিলেন। কলিকাতায় তিনি গভর্ণিং বডির কার্য্যাবলী ও কলেজের ভবিষ্যত সম্পর্কে অনেক আলোচনা করিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি দ্বিতীয়বার উইল করিয়া পুত্রের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ

প্রভাতকুমার কলেজকে প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত করিবার জন্য ও নিজ বংশের সন্তানদিগের শিক্ষা বিস্তারের জন্য, প্রায় দেড় লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। ঐ সম্পত্তির অনুমানিক আয় বার্ষিক বার হাজার টাকা হইবে। কাঁথিতে প্রায় ষোল হাজার টাকা মূল্যের তিনখানি বাড়ী চিকিৎসার্থী জ্ঞাতি ও স্বজন, বংশের শিক্ষার্থী ছাত্র ও ছাত্রী ও চিকিৎসার্থী গরীব জনসাধারণের সাময়িক ব্যবহার করার জন্য দিয়াছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের জন্যও তিনি কাঁথিতে একখানি বাড়ী দান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মধ্য ইংরেজী ও প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রভৃতির জন্যও অর্থের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। দেশের সেবা ও দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন। কোন সময় কোন দেশ সেবক বিপন্ন হইলে, তিনি অযাচিত ভাবে তাঁহাকে অর্থ ও নানাভাবে সাহায্য করিতেন। তাঁহার গোপন দানও অনেক ছিল। দেশের দশের জন্য তিনি নীরবে কাজ করিতেই ভাল বাসিতেন। তিনি অনাড়ম্বর ও বিলাসিতা বর্জ্জিত ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রীঃ অব্দের ৬ঠা মে তিনি কলিকাতায় পরলোক গমন করেন।

বিশ্বম্ভরনাথ, পণ্ডিত—যুক্ত প্রদেশের রাজনৈতিক নেতা ও দেশহিতব্রতী। তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ আইনজীবী ছিলেন। একবার তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধিরূপে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য হইয়াছিলেন। ১১শ কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁহার সভাপতি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বার্দ্ধক্যবশতঃ তিনি ঐ পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত সভ্য ছিলেন। তিনি মাদকতা নিবারণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি দেশহিতকর কার্য্যে বিশেষ উৎসাহী ও সহায়ক ছিলেন। বহুকাল রাজনীতিক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া তিনি বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দের ১৪ই আগষ্ট পরিণত বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

বিশ্বম্ভর ন্যায়রত্ন—তিনি খাটুরার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামরুদ্র ন্যায় বাচস্পতির অন্যতম ছাত্র ছিলেন এবং চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

বিশ্বম্ভর শূর—নোয়াখালীর ভুলুয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। জনশ্রুতি আছে যে, ভুলুয়ার শূর রাজবংশ জাতিতে ক্ষত্রিয় এবং বিশ্বম্ভর শূর আদিশূরের বংশসম্ভূত। ভুলুয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও একটী কিম্বদন্তী আছে। ১২০৩ খ্রীঃ অব্দে বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গ-

বিজয়ের সময়ে বিশ্বম্ভর শূর নামে মিথিলা দেশীয় এক রাজকুমার চট্টগ্রামের অন্তর্গত চন্দ্রনাথ তীর্থে আগমন করেন। তৎপর দেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে নাবিকগণ দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া বঙ্গোপসাগরের উপকূলে একটী দ্বীপ প্রাপ্ত হন এবং তথায় পোতসমূহ নোঙ্গর করেন। রাত্রিকালে বিশ্বম্ভরের প্রতি দৈববানী হইল যে, তাঁহার পোতের দক্ষিণ পার্শ্বে বারাহী দেবী জলমগ্না আছেন; সমুদ্র হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক যথাবিধি দেবীর অর্চ্চনা করিলে, এই দ্বীপপুঞ্জে তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তি ঘটিবে। তদনন্তর তিনি বারাহী দেবীকে সমুদ্র হইতে উত্তোলন করিয়া, যথাবিহিত দেবীর অর্চ্চনা করেন। ঐ দিন আকাশ ভয়ানক কুয়াশাচ্ছন্ন থাকায় দেবীকে পূর্ব্বাস্য করিয়া, পূজা করা হয়। পূর্ব্বাস্য ও উত্তরাস্য করিয়া দেব দেবী প্রতিষ্ঠা করা বিধি বহির্ভূত। দেবীর প্রীত্যার্থে ছাগ বলিনাদকালেও দিগ্‌ভ্রান্তবশতঃ ছাগ পশ্চিমাভিমুখে স্থাপিত হয়, পরে সূর্য্যোদয়ে কুয়াশা দূরিভূত হইলে ভুল বুঝিতে পারিয়া "ভুল হুয়া" স্থির করেন। এই 'ভুল হুয়া' শব্দ 'ভুলুয়া' নামে উৎপত্তি হইয়াছে। পরে বিশ্বম্ভর শূর এই স্থানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার রাজ্য ভুলুয়া নামে অভিহিত হয়। এখনও ঐ প্রদেশের বহু স্থানে দেব দেবীর নিকট পশ্চিমাস্য করিয়া ছাগ বলি দেওয়া হইয়া থাকে। রাজা বিশ্বম্ভর কল্যাণপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া বারাহী দেবীকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে আমিশাপাড়ায় রাজো-পুরোহিত বাড়ীতে বারাহী দেবীকে স্থানান্তরিত করা হয়। তৎপর হইতে বারাহী দেবী ঐ স্থানেই বিদ্যমান আছেন। বঙ্গোপসাগরের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত দ্বীপপুঞ্জ নিয়া ভুলুয়া পরগণা অবস্থিত। বিশ্বম্ভরের পরবর্ত্তী পুরুষগণ ত্রিপুরারাজের সামন্তরাজ শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ত্রিপুরার অধীন সামন্ত রাজগণের মধ্যে ভুলুয়া রাজ্য সর্ব্ব প্রধান ছিলেন। প্রাচীন ত্রিপুরার রাজাদের অভিষককালে ভুলুয়ার রাজগণ তাঁহাদের ললাটে রাজ টীকা প্রদান করিতেন। ত্রিপুরাধিপতিরা সিংহাসনে প্রথম উপবেশন করিলে, ভুলুয়ার রাজগণ প্রথম নজর প্রদান করিতেন। রাজা বিশ্বম্ভরের গণপতি, মনোহর, হেমন্ত ও দামোদর নামে চারি পুত্র ছিল।

বিশ্বরূপ—শ্রীচৈতন্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। জগন্নাথ মিশ্রের পত্নী শচীদেবী প্রথমে ৮টী কন্যা ক্রমাগত প্রসব করেন। তাঁহারা সকলে শৈশবেই গতায়ু হয়। তৎপর ১৩৯৮ শকে (১৪৭৬ খ্রীঃ অব্দ) শচীদেবী বিশ্বরূপকে প্রসব করেন। তাহার আট বৎসর পরে ১৪০৭ শকের (১৪৮৫ খ্রীঃ অব্দ) ফাল্গুনী দোল পূর্ণিমা দিনে চন্দ্রগ্রহণের

সময় শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বরূপ অল্প বয়সেই জ্ঞান ও বিদ্যার্জ্জন করেন। ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই তিনি সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন। এই সময়ে তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম হয় শ্রীশঙ্করারণ্য। ১৮ বৎসর বয়সে ১৪১৬ শকে (১৪৯৩খ্রীঃ অব্দে) দ্বারকার নিকটে পাণ্ডুপুর নামক স্থানে পরলোক গমন করেন। কথিত আছে তিনিই নিত্যানন্দকে সন্ন্যাসী করিয়াছিলেন।

বিশ্বরূপ—(২) বিশ্বরূপ নামে জ্যোতিষের একজন গ্রন্থকার ছিলেন। 'রত্নমালা' গ্রন্থের টীকাকার মাধব তাঁহার টীকায় বিশ্বরূপের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

বিশ্বরূপ আচার্য্য— মণ্ডনমিশ্রের নামান্তর। মণ্ডন মিশ্র দেখ।

বিশ্বরূপ সেন—তিনি বঙ্গের সেন বংশীয় নরপতি বল্লাল সেনের পৌত্র। লক্ষ্মণ সেনের অন্যতমা পত্নী তান্দ্রাদেবী বা তাড়াদেবীর গর্ভে বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন নামে দুই পুত্র জন্মে। লক্ষ্মণ সেনের পরলোক গমনের পরে তাঁহার পুত্র মাধব সেন প্রথমে বাঙ্গালার রাজা হইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেন পর পর বাঙ্গালার রাজা হইয়াছিলেন।

বিশ্বসিংহ—কামরূপের কোচবংশীয় একজন শ্রেষ্ঠ রাজা ও কোচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মহাভারতোক্ত ভগদত্ত, প্রাগ জ্যোতীষপুরের অধিপতি ছিলেন। তদীয় বংশধরেরা বহুকাল এই প্রদেশে রাজত্ব করিয়া অবশেষে লুপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপর খ্রীঃ অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত;'পাল রাজগণ বাঙ্গালায় রাজত্ব করেন। সে সময় কামরূপে পাল শাসনকর্ত্তাদিগের বিষয় অবগত হওয়া যায়। কামরূপের ধর্ম্মপালের বংশীয় জনৈক রাজা দুর্ব্বল হওয়ায়, খেম নামে পরিচিত আদিম অধিবাসীদিগের জনৈক সর্দ্দার তাঁহাকে বিনাশ করিয়া, নীলধ্বজ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা হন। এই নীলধ্বজের পুত্র চক্রধ্বজ এবং চক্রধ্বজের পুত্র নীলাম্বর। নীলাম্বর ১৪৩০ খ্রীঃ অব্দে প্রাগজ্যোতীষপুরের রাজা হন। ১৪৯৮ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গের মুসলমান শাসনকর্ত্তা হোসেন শাহ, তাঁহার রাজধানী কামতাপুর আক্রমণ করিয়া, অধিকার করেন। অতঃপর কামাখ্যা প্রদেশে বিশ্বসিংহের হয়। রাজা নীলাম্বরের পতনের পর হইতে কয়েক বৎসর অরাজকতা ছিল। ১৪৮০ খ্রীঃ অব্দে কামরূপ রাজ্য কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়। সেই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের একটীতে কোচারি নামে এক অসভ্য জাতি বাস করিত। কালক্রমে ক্ষুদ্র রাজ্য সমূহের মধ্যে কোচারি রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী হয়। এই কোচারিদিগের আক্রমণে মুসলমানগণ কামতাপুর পরিত্যাগ

করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর কামতা-পুর রাজ্যের অধিকাংশ কোচদিগের অধিকৃত হইয়া কোচবিহার নামে অভি-হিত হইতেছে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে হাজো নামে একব্যক্তি অতিশয় ক্ষমতাশালী ছিলেন। তিনি ক্রমে সমগ্র রংপুর ও কামরূপের অধিকাংশ স্থান তাঁহার অধিকারভুক্ত করেন। হাজোর জীরা ও হীরা নামে দুই কন্যা ছিল। হরিদ্য (হারিয়া) নামে জনৈক পরাক্রমশালী লোক জীরা ও হীরাকে বিবাহ করেন। জীরার দুই পুত্র চন্দন ও মদন। হীরার দুই পুত্র বিশু ও শিশু। তৎকালে কয়েক খানি গ্রাম লইয়া চিক্‌মা পর্ব্বতে একটী ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য ছিল। তাঁহারা চারি ভ্রাতা মিলিত হইয়া ঐ রাজ্যের হিন্দু রাজাকে নিহত করেন। এই যুদ্ধে জীরার কনিষ্ঠ পুত্র মদন নিহত হয়। তৎপরে তিন ভ্রাতা চিক্‌মা রাজের তিন কন্যাকে বিবাহ করেন। হীরার বংশধরগণ 'দেব বা ভূপ' আখ্যায় অভিহিত হন এবং সিংহাসনে সমাসীনকালে 'নারায়ণ' আখ্যায় মনোনীত হন। আসাম প্রদেশের বিজনী ও দরঙ্গের রাজবংশ জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুরের রায়কং রাজগণ এবং রংপুর জেলার পাঙ্গার রাজগণ একই বংশসমুদ্ভূত। কিন্তু পুরাণ ইতিহাস আলোচনায় জ্ঞাত হওয়া যায় যে, কোচবিহার রাজবংশ দেবাধি-দেব মহাদেবের অংশে সমুৎপন্ন। মহাদেবের ঔরসে মাধবী দেবীর গর্ভে বিশ্বসিংহের জন্ম উল্লিখিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বিশ্বসিংহ হইতে বর্ত্তমান কোচবিহার রাজবংশের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

হীরার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশু ১৪৯৭ খ্রীঃ অব্দে বিশ্বসিংহ নাম গ্রহণ করিয়া হিন্দুরাজ চিকমার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময় তাঁহার সম্প্রদায় রাজপুত নামে পরিচিত হয়। বিশ্বসিংহ রাজা হইয়া চিক্‌মা পর্ব্বত পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোচবিহারে আসিয়া বসতি করেন। তিনি মৈথিল ও শ্রীহট্ট হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া, যথাক্রমে তাঁহাদিগকে গুরু ও পুরোহিত পদে বরণ করিয়াছিলেন। তিনি একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার সৈন্য সংখ্যা ৫,২২,০০০ ছিল। তিনি গৌড়দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হন। কামরূপ অধিকার করিয়া, তিনি মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। সেই সময় ভোটগণ মাঝে মাঝে তাঁহার রাজ্যে উপদ্রব করিত বলিয়া, তিনি ভোটরাজের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন। উত্তর আসামের আহম জাতির সহিতও তাঁহার সন্ধি হইয়াছিল। প্রাগ-জ্যোতীষপুরে ভগদত্তের বংশধরগণের রাজত্ব শেষ হওয়ার পর, রাজ্যে অতিশয়

বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। কাল-বশে হিন্দুধর্ম্মের উপর বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তৃত হইতে লাগিল, হিন্দুধর্ম্মের সহিত হিন্দুর দেবমন্দিরাদিও বিনাশ প্রাপ্ত হইল। ভারতের বিখ্যাত কামাখ্যা পীঠের উপরিস্থ মন্দিরও সেই সময় ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। পীঠ বহুকাল অরণ্য মধ্যে লুপ্তাবস্থায় ছিল। বিশ্ব-সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর একদা ভ্রাতা শিবসিংহ (শিশু)সহ কামাখ্যা শৈলে উপস্থিত হন। তথায় মেচ বা কোচ জাতীয় কয়েক ঘর লোক বাস করিত। তাঁহারা পথভ্রষ্ট হইয়া ঐ কোচ জাতিয় লোকদের গৃহে উপস্থিত হন। তথায় কোন পুরুষের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই, একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। স্ত্রীলোকটী একটী অশ্বথ বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। ঐ বৃক্ষের নীচে একটী মাটির স্তুপ (ঢিপ) ছিল। রাজা উহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া বৃদ্ধার নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে, ইহা তাহাদের দেবতা। তখন রাজা তাঁহার পথহারা সঙ্গীদের সহিত মিলিত হইবার জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিলেন। শীঘ্রই তাঁহার সঙ্গীগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপর অনুসন্ধানে রাজা উহা শক্তিপীঠ বলিয়া জ্ঞাত হইলেন এবং মানস করিলেন যে, যদি দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ স্থাপিত হয়, তবে তিনি তথায় সোনার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা :স্থাপিত হইয়াছিল। অতঃপর রাজার আদেশে ঐ অশ্বথ বৃক্ষ কর্ত্তিত হইল এবং তাহার নীচে পীঠ স্থান আবিস্কৃত হইল। প্রাচীন মন্দিরের নিম্নভাগ ভূগর্ভের নীচে পাওয়া গেল। তদুপরি রাজা বিশ্বসিংহ মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। প্রত্যেক ইটের সহিত এক রতি সোনা দিয়া এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিশ্বসিংহ হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কোচবিহার হইতে কয়েকজন ব্রাহ্মণকে দেবীর সেবার জন্য কামাখ্যায় প্রেরণ করিলেন। নবদ্বীপ, মিথিলা ও কান্য-কুব্জ প্রভৃতি স্থান হইতে, ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া বিশ্বসিংহ পুরাণ ও তন্ত্রের চর্চ্চায় নিযুক্ত হইলেন এবং স্বয়ং শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। ১৫২৮ খ্রীঃ অব্দে রাজা বিশ্বসিংহ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তাঁহার নৃসিংহ নারায়ণ, শুক্লধ্বজ